ইসলামের শাস্তি আইন

ড. আহমদ আলী

ইসলামের
শাস্তি আইন

ড. আহমদ আলী

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

প্রথম প্রকাশ : শাওয়াল ১৪৩০
কার্তিক ১৪১৬
অকটোবর ২০০৯

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : একশত সত্তর টাকা মাত্র

Islamer Sasti Aien Written by Dr. Ahmad Ali & Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition October 2009 Price Taka 170.00 only.

প্রকাশকের কথা

ইসলামের শাস্তি আইন একটি বাস্তবসম্মত আইন। অপরাধ দমনে এই আইনের কোন বিকল্প নেই।

তবে ইসলামের শাস্তি আইন ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোথাও প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা বড়ো ধরনের যুল্‌ম। অর্থাৎ ইসলামী আইন প্রয়োগ করতে হবে ইসলামী রাষ্ট্রে, অন্য কোথাও নয়।

উল্লেখ্য, কোন ভূ-খণ্ডের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ইসলামী জীবন বিধানের কল্যাণময়তা উপলব্ধি করে ইসলামী রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তুলতে আগ্রহী হলে, তবেই কায়েম হবে ইসলামী রাষ্ট্র।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা হাতে পেয়েই সরকার অপরাধ দমনের জন্য ইসলামী শাস্তি আইন প্রয়োগ শুরু করবেন, এটি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শেখানো কর্মনীতি নয়।

ইসলামের শাস্তি আইন প্রয়োগের পূর্বে ইসলামী সরকারের কর্তব্য ইসলামের দৃষ্টিতে কোন্ কোন্ বিষয়, কোন্ কোন্ কাজ, কোন্ কোন্ ভূমিকা অপরাধ তা জনগণকে ভালোভাবে অবহিত করা। এই জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো এবং প্রচার মাধ্যমকে নিয়োজিত করা অত্যাবশ্যক। তদুপরি ইসলামী সরকারের কর্তব্য হবে ইসলামী অর্থনীতি প্রবর্তন করে অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্য দূর করা, অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা এবং সকল নাগরিকের অন্য-বস্ত্র-বাসস্থান প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। সাথে সাথে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার সুড়সুড়ি প্রদানকারী সকল কর্মকাণ্ডের মূলোৎপাটন করে ইসলামী নীতি-নৈতিকতার প্রসার ঘটানো।

অর্থাৎ রাষ্ট্রের পরিবেশ পরিস্থিতি এমনভাবে পরিবর্তন করে নিতে হবে যাতে কোন ব্যক্তি অভাবের কারণে চুরি করতে বাধ্য না হয়। যৌন উত্তেজক উপকরণের প্রভাবে কিংবা সামাজিক প্রতিকূলতার কারণে বিয়ে করতে অক্ষম হয়ে অবৈধ যৌন কর্মে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য না হয়।

ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান কার্যকর করে একটি কল্যাণময়, সুবিচারপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ এবং পরিশীলিত সমাজ গঠন করে মানুষের জন্য অপরাধমুক্ত জীবন যাপনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা ইসলামের শাস্তি আইন প্রয়োগের পূর্ব শর্ত।

প্রতিটি মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পরই সরকার অপরাধ দমনের জন্য ইসলামের শাস্তি আইন প্রয়োগের অধিকার প্রাপ্ত হয়।

ইসলামের শাস্তি আইনের স্বরূপ, এর প্রয়োগের পূর্বশর্ত এবং প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই এক শ্রেণীর মানুষ এর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে থাকে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আহমদ আলী সুনিপুণভাবে ইসলামের শাস্তি আইনের বিভিন্ন দিক বিশদভাবে এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। সন্দেহ নেই এটি একটি অনবদ্য গ্রন্থ।

আমাদের বিশ্বাস, এই গ্রন্থটি ইসলামের শাস্তি আইন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টিতে এবং ইসলামের শাস্তি আইন সম্পর্কে বিভ্রান্তি নিরসনে বড়ো রকমের অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

সূচীপত্র

ক. হুদূদের বিবরণ (৫১-২২৮)

১. চৌর্যবৃত্তির শাস্তি (৫১-৭৮)

২. সশস্ত্র ডাকাতি ও লুণ্ঠনের শাস্তি (৭৯-৯৬)

৩. জোর করে সম্পদ অপহরণের শাস্তি (৯৭-১০৫)

খ. কিসাস (২২৯-২৭৬)

গ. দিয়াত (রক্তপণ) (২৭৭-৩১১)

ঘ. তা'যীর (সাধারণ দণ্ড) (৩১২-৩৬০)

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামের শাস্তি আইন

ভূমিকা

অপরাধ সভ্যতার জন্য হুমকি এবং সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য বড় বাধা। মাবন জীবন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে অশান্তি ও অকল্যাণে ভরে ওঠে। অপরাধ এবং অপরাধ প্রবণতা থেকে মানুষকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে ন্যায় বিচারের মাধ্যমে শাস্তির বিধান কার্যকর করার জন্য ইসলামে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে।

ইসলামী শাস্তি আইনের মূল উদ্দেশ্য কাউকে শাস্তি দেয়া নয়; বরং অপরাধ সংঘটনের সুযোগকে বাধাগ্রস্ত করা। এ কারণেই মানব রচিত আইনে যেখানে অপরাধ সংঘটনের পরেই কেবল শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, সেক্ষেত্রে ইসলাম অপরাধ সংঘটনের পূর্বেই এর সকল উপায়-উপকরণ ও পন্থা রোধ করে দেয়ার প্রতিই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ রূপ প্রতিবন্ধকতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরও কেউ অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়লে তখন ইসলাম তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

ইসলাম শুধু অপরাধ ও শাস্তি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং প্রত্যেক অপরাধ ও শাস্তির সাথে আল্লাহভীতি ও পরকালের চেতনা উপস্থাপন করে মানুষের ধ্যান-ধারণাকে এমন এক জগতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, যার কল্পনা মানুষকে যাবতীয় অপরাধ ও গোনাহ থেকে পবিত্র করে দেয়। জনমনে আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের ভয় সৃষ্টি করা ছাড়া জগতের কোন আইন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীই অপরাধ দমনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। ইসলামের এই বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতিই জগতে অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে এবং এমন লোকদের সমাজ গঠন করেছে, যারা পবিত্রতায় ফেরেশতাদের চাইতেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।[১]

পৃথিবীতে সাধারণ আইনে অপরাধ সম্পর্কিত সব শাস্তিকেই 'দণ্ডবিধি' নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু ইসলামী আইন এ রূপ নয়। ইসলামী আইনে

---

১. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, المؤمن أكرم على الله من بعض الملائكة الذين عنده. - "মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তাঁর নিকটস্থ অনেক ফেরেশতার চেয়েও অধিকতর সম্মানের অধিকারী।" (ইবনু মাজাহ, [কিতাবুল ফিতান], হা.নং: ৩৯৪৭)

অপরাধের শাস্তিকে হুদূদ, কিসাস ও তা'যীরাত- এ তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এ তিন প্রকারের শাস্তির বিধানসমূহে অনেক বিষয়েই পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং যারা নিজেদের পরিভাষার আলোকে প্রত্যেক অপরাধের শাস্তিকে দণ্ড বলে এবং ইসলামী আইনের পরিভাষাগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা ইসলামী আইনের বিধি-বিধানে অনেক বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়। দণ্ডগত শাস্তিকে অবস্থানুযায়ী লঘু থেকে লঘুতর, কঠোরতর এবং ক্ষমাও করা যায়। কিন্তু হুদূদের বেলায় কারো সামান্যতম পরিবর্তন, লঘু অথবা পরিবর্তন করার অধিকার নেই। স্থান ও কাল ভেদেও এতে কোন পার্থক্য হয় না এবং কোন শাসক ও বিচারক তা ক্ষমাও করতে পারে না।

ইসলামী আইন বিশেষ কয়েকটি অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়নি; বরং বিচারকের অভিমতের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। বিচারক স্থান, কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপরাধ দমনের জন্য যে রূপ ও যতটুকু শাস্তি প্রয়োজন মনে করবেন, ততটুকুই দেবেন। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, এ পর্যায়ের অপরাধসমূহ বুঝি প্রকৃত অপরাধ নয়; বরং আসল কথা হল- দলীল-প্রমাণ সীমিত আর অপরাধ ও অপরাধমূলক ঘটনাবলীর তো শেষ নেই। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি যখন বিকৃত ও বিপথগামী হয়ে পড়ে, তখন তা নিত্য নতুন ও রকমারি অপরাধ উদ্ভাবন করে। ইসলামী শরী'আত এ অবস্থার বাস্তবতা ও গুরুত্ব স্বীকার করেছে।

স্মর্তব্য যে, যে সব অপরাধের দরুন অন্য মানুষের কষ্ট বা ক্ষতি হয়, তাতে একদিকে সৃষ্টি জীবের প্রতি অন্যায় করা হয় এবং অপরদিকে স্রষ্টারও নাফরমানী করা হয়। তাই এ জাতীয় অপরাধে 'আল্লাহর হক' ও 'বান্দাহর হক' উভয়টিই ক্ষুণ্ন হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উভয়ের কাছেই অপরাধী বলে বিবেচিত হয়।

শাস্তির সংজ্ঞা

শাস্তির আরবী প্রতিশব্দ হল العقاب। এর আভিধানিক অর্থ হল মানুষকে তার অপকর্মের প্রতিদান দেয়া।[২] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. -"আর যদি তোমরা অপকর্মের প্রতিদান দাও, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিদান দেবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়।"[৩] শরী'আতের পরিভাষায় শাস্তি বলতে কাউকে তার অপকর্মের জন্য শারীরিক বা মানসিক যাতনা বা উভয়বিধ কষ্ট দেয়াকে বোঝানো হয়। অন্য কথায় শাস্তি হল

---

২. ইবনু মানযুর বলেন,.العقاب و المعاقبة أن تجزي الرجل بما فعل من سوء - "মানুষ যে খারাপ কাজ করে তার প্রতিদানই হল শাস্তি। (ইবনু মনযূর, *লিসানুল আরব*, খ.৪, পৃ. ৩০২৭)

৩. আল-কুর'আন, ১৬ ঃ ১২৬

মানুষের অপকর্মের প্রতিফল, যা সমাজের কল্যাণ ও ব্যক্তির প্রয়োজনের স্বার্থে অপরাধীর বিরুদ্ধে নির্ধারণ করা হয়।

ইমাম তাহাভী বলেন, هى (العقوبة) الألم الذي يلحق الإنسان مستحقا على الجناية. - "অপরাধের কারণে মানুষ যে যাতনা ভোগ করে তাকে শাস্তি বলা হয়।"[৪]

মুফতী 'আমীমুল ইহ্সান (রা) বলেন, الجزاء بالشر هو ما يلحق الإنسا ن بعد الذنب من المحنة في الآخرة أو ما يلحقه من المحنة بعد الذنب في الدنيا فيسمى عقوبة. - "অপরাধ সংঘটনের পর অপরাধীকে প্রতিদান হিসেবে দুনিয়া বা আখিরাতে যে কষ্ট ভোগ করতে হবে তাকে শাস্তি বলে।"[৫]

উল্লেখ্য যে, শাস্তি বলতে যদিও আখিরাতের মন্দ প্রতিফলকেও বোঝানো হয়; তবে এ অভিসন্দর্ভে আমাদের আলোচনা রাষ্ট্রের বিচার বিভাগীয় শাস্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

শাস্তির শ্রেণী বিন্যাস

ইসলামী আইনে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শাস্তিকে প্রধানত তিনটি প্রকারভেদে ভাগ করা হয়।

শাস্তির প্রথম প্রকারভেদ ঃ

কোন কোন অপরাধে বান্দাহর অধিকারের পরিমাণ এবং কোন কোন অপরাধে আল্লাহর অধিকারের পরিমাণ প্রবলভাবে ক্ষুণ্ন হয়ে থাকে এবং এ প্রাবল্যের ওপর ভিত্তি করেই শাস্তিকে চারভাগে ভাগ করা হয়। যথা -

এক. যে সব শাস্তিতে আল্লাহর অধিকার বাস্তবায়নের দিকটি প্রবল। মানুষের মৌল প্রয়োজনসমূহ পূরণ ও সংরক্ষণ, সমাজের সামষ্টিক কল্যাণ সাধন ও সার্বিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা আল্লাহর অধিকার (Public Right) বাস্ত বায়ন হিসেবে বিবেচিত হয়। যিনা, চুরি ও মাদক সেবন প্রভৃতির শাস্তি এ প্রকারের অর্ন্তভুক্ত।

দুই. যে সব শাস্তিতে ব্যক্তি বিশেষের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি মুখ্য। কিসাস হল এ প্রকারের শাস্তি।

তিন. যে সব শাস্তিতে আল্লাহর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ- দুটিই প্রবল থাকে। মিথ্যা অপবাদের শাস্তি এ প্রকারের শামিল।

চার. যে সব শাস্তিতে কেবল আল্লাহর অধিকার সংরক্ষণই উদ্দেশ্য। যেমন

---

৪. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা*, কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ..., খ.৩০, পৃ. ২৬৯

৫. 'আমীমুল ইহসান, মুফতী মুহাম্মাদ, *কাওয়া'ইদুল ফিকহ*, পৃ. ৩৮৩

নামায পরিত্যাগ করার শাস্তি এবং বিনা 'ওযরে রমযানে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযাভঙ্গের শাস্তি।

শাস্তির দ্বিতীয় প্রকারভেদ ঃ

প্রকৃতি ও স্বরূপ বিচারে শাস্তিকে চারভাগে ভাগ করা হয়। যথা -

এক. মৌলিক শাস্তি। যিনা, চুরি ও মাদক সেবন প্রভৃতির শাস্তি এ প্রকারের অর্ন্তভুক্ত।

দুই. পরিপূরক শাস্তি। যেমন নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকার স্বত্ব থেকে হত্যাকারীকে বঞ্চিত করা।

তিন. 'ইবাদাতের আমেজ মিশ্রিত শাস্তি, যাতে শাস্তির চাইতে ইবাদাতের দিকটি মুখ্য। যেমন শপথ ও হত্যার কাফ্ফারা।

চার. 'ইবাদাতের আমেজ মিশ্রিত শাস্তি, যাতে ইবাদাতের চাইতে শাস্তির দিকটি মুখ্য। যেমন রমযানে রোযা ভাঙ্গার কাফ্ফারা।

শাস্তির তৃতীয় প্রকারভেদ ঃ

শাস্তি নির্ধারণের ভিত্তিতে অপরাধসমূহের শাস্তিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

এক. হুদূদ (সুনির্ধারিত শাস্তিসমূহ)

'হুদূদ' (حدود) শব্দটি 'হদ্দ'-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ বাধা দান বা বারণ করা।[৬] সুতরাং প্রত্যেক জিনিস যা মানুষকে কোন কিছু থেকে বারণ করে রাখে তাকে হদ্দ বলা হয়। এ অর্থের নিরিখে আরবীতে দারোয়ান ও কারারক্ষীকে 'হাদ্দাদ' বলা হয়ে থাকে। কেননা তাদের একজন অপরিচিত কাউকে বাইর থেকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। অপরজন কয়েদীদেরকে ভেতর থেকে বাইরে যেতে বারণ করে। আর 'হুদূদুল্লাহ' বলতে আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ বস্তুগুলোকে বোঝানো হয়। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় 'হুদূদ' হল কুর'আন ও সুন্নাহতে বর্ণিত বিভিন্ন অপরাধের সুনির্ধারিত শাস্তিসমূহ।[৭] এ

---

৬. দু বস্তুর মধ্যবর্তী প্রতিবন্ধককেও হদ্দ বলা হয়। এ অর্থের নিরিখে সীমানা, পরিধি ও প্রান্তভাগ প্রভৃতি অর্থেও এটি ব্যবহার করা হয়। (*আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, ইউ.পি.: কুতুবখানা হুসায়নিয়্যাহ, দেওবন্দ পৃ.১৬০)

৭. হানাফীগণের মতে হদ্দ হল- عقوبة مقدرة شرعا وجبت حقا لله تعالى. - "আল্লাহর অধিকার বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রবর্তিত শরী'আতের সুনির্ধারিত শাস্তি।" (সারাখ্সী, আবূ বকর মুহাম্মদ, *আল-মাবসূত*, দারুল মা'আরিফা,খ.৯, পৃ. ৩৬) তবে শাফি'ঈ স্কুলের ইমামগণের মতে হদ্দ হল- عقوبة مقدرة تجب على معصية مخصوصة حقا لله او لآدمي او لهما- "যে সব অপরাধে আল্লাহর কিংবা কোন মানুষের অধিকার অথবা একসাথে আল্লাহ ও মানুষের অধিকার বিঘ্নিত হয়- সে সব অপরাধের সুনির্ধারিত শাস্তিকে হদ্দ বলা হয়। (আল-জুমাল, *ফুতুহাতুল ওয়াহহাব*, দারুল ফিকর, খ.৫, পৃ. ১৩৬) এ রূপ শাস্তিকে এ জন্য হদ্দ বলা হয় যে, তা পুনরায় অপরাধ করা এবং

ধরনের শাস্তিসমূহে বান্দাহর অধিকারের চাইতে আল্লাহর অধিকারের বাস্তবায়নের দিকটি প্রবল ধরা হয়।[৮] কেননা হদ্দের আওতাভুক্ত অপরাধগুলোর দ্বারা সামগ্রিকভাবে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শাস্তি কার্যকর করলে সমাজ উপকৃত হয়। শরী'আতের হদ্দগুলো হল ঃ চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ ও মদ্যপানের শাস্তি। তবে কোন কোন ফকীহ ধর্মান্তর ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তিকেও হদ্দ বলে উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, কোন কোন হদ্দ সাধারণত অত্যন্ত কঠোর। এগুলো প্রয়োগ করার আইনও নির্মম। কোন অবস্থাতেই তা পরিবর্তন ও লঘু করা যায় না এবং কেউ ক্ষমা করারও অধিকারী নয়। কিন্তু সামগ্রিক ব্যাপারে সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে অপরাধ এবং অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলীও অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে। নির্ধারিত শর্তাবলীর মধ্য থেকে যদি কোন একটি শর্তও অনুপস্থিত থাকে, তবে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তদুপরি অপরাধ প্রমাণে কিংবা অপরাধের শর্তাবলীর মধ্য থেকে কোন একটিতে সন্দেহ দেখা দিলেও হদ্দ অকার্যকর হয়ে যাবে।

স্মর্তব্য যে, কোন সন্দেহ অথবা কোন শর্তের অনুপস্থিতির কারণে হদ্দ অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এ নয় যে, অপরাধী অবাধ ছাড়পত্র বা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে, যার ফলে তার অপরাধ প্রবণতা আরো বেড়ে যাবে; বরং বিচারক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে তাকে সাধারণ দণ্ড দেবেন। যেমন চুরি প্রমাণের জন্য নির্ধারিত শর্তসমূহে কোন ত্রুটি অথবা সন্দেহ দেখা দেয়ার কারণে চোরের হাত কেটে দেয়া যাবে না বটে; কিন্তু এমতাবস্থায় সে সম্পূর্ণ মুক্তও হয়ে যাবে না; বরং তাকে অবস্থানুযায়ী সাধারণ অন্য কোন দণ্ড দেয়া হবে।

দুই. কিসাস (সদৃশ শাস্তি)

কিসাস শব্দের অর্থ একই রূপ কাজ করা, পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলা। শরী'আতের পরিভাষায় কিসাস হল অপরাধীর সাথে তার বাড়াবাড়ির অনুরূপ আচরণ করা।[৯] অর্থাৎ অপরাধী কোন ব্যক্তির যেই পরিমাণ দৈহিক ক্ষতি সাধন

অপরাধে অভ্যস্ত হয়ে পড়া থেকে নিষেধ করে। অনুরূপভাবে তা অপরকে অপরাধের পথে চলা থেকে বারণ করে।

৮. এ কারণেই কিসাসকে হদ্দ বলা হয় না। কেননা এতে আল্লাহর অধিকারের চাইতে বান্দাহর অধিকার বাস্তবায়নের দিক প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে। অনুরূপভাবে তা'যীরকেও হদ্দ বলা হয় না। কেননা এটা সুনির্ধারিত নয়। কারো কারো মতে, কিসাসও হদ্দের অন্তর্ভুক্ত। তাদের মতে, বিভিন্ন অপরাধের জন্য শরী'আতের সুনির্ধারিত শাস্তিসমূহই হল হুদূদ। চাই তা আল্লাহর হক প্রতিষ্ঠার জন্য ফরয করা হোক কিংবা বান্দাহর হক প্রতিষ্ঠার জন্য করা হোক। (আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*,খ.৯, পৃ. ৩৬)

৯. ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, খ.৮, পৃ. ৩৪১; আল-রুকবান, 'আবদুল্লাহ, *আল-কিসাস ফিন নাফস*, বৈরূতঃ মু'আস্সাতুর রিসালাহ, ১৪০০হি., পৃ.১৩; আল-জাযীরী বলেন, أما القصاص فهو

করবে তারও সে-ই পরিমাণ দৈহিক ক্ষতি সাধন করাই হচ্ছে কিসাস। অপরাধী তাকে হত্যা করলে প্রতিশোধ স্বরূপ সেও মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হবে এবং যখম করে থাকলে প্রতিশোধ স্বরূপ তাকেও যখম করা হবে।

উল্লেখ্য যে, কিসাসের শাস্তিও হুদূদের মতোই কুর'আন মজীদে নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, হুদূদকে আল্লাহর অধিকার বা জনস্বার্থ হিসেবে বাস্তবায়ন করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করলেও তা ক্ষমা হবে না এবং হদ্দ অকার্যকর হবে না। কিন্তু কিসাসের ব্যাপারটা এর ব্যতিক্রম। কিসাসে বান্দাহর অধিকার প্রবল হওয়ার কারণে হত্যা প্রমাণিত হওয়ার পর হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের ইখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়। সে ইচ্ছে করলে কিসাস হিসেবে তার মৃত্যুদণ্ডও দাবী করাতে পারে। ক্ষমাও করে দিতে পারে।[১০] নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীদেরকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিলে হত্যাকারীদের সাহস বেড়ে যাবে কিংবা ব্যাপক হারে হত্যাকাণ্ডও শুরু হয়ে যাবে- এ রূপ আশঙ্কা করা ঠিক নয়। কেননা, হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করা ছিল নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অধিকার। তারা তা ক্ষমা করে দিয়েছে। কিন্তু অপরাপর লোকদের প্রাণরক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। তাই ইসলামী আইন মতে, সরকার এ দায়িত্ব পালনের জন্য হত্যাকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা কোন শাস্তি দিয়ে এ বিপদাশঙ্কা রোধ করতে পারে। জখমের ব্যাপারটাও তদ্রূপ।

أن يعاقب الجاني بمثل جنايته على أرواح الناس أو عضو من أعضائهم . - "অর্থাৎ মানুষের প্রাণ কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর অপরাধী যেরূপ অপরাধ করেছে, তাকে ঠিক সেরূপ বদলা দেয়াকে কিসাস বলা হয়।" (আল-জাযীরী, আবদুর রহমান, *কিতাবুল ফিকহ 'আলাল মাযাহিবিল 'আরবা'আহ*, খ.৫, পৃ. ২৪৪)

১০. এ ছাড়া কিসাস ও হুদূদের মধ্যে আরো কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে। যেমন- ১. হদ্দের বেলায় কোন রূপ সুপারিশ করা জায়িয নয়। কিন্তু কিসাসের বেলায় সুপারিশ করা জায়িয। ২. হদ্দসমূহ (যিনার অপবাদের হদ্দ ছাড়া) দাবীর ওপর নির্ভরশীল নয়। দাবী থাকুক আর না-ই থাকুক হদ্দ অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। কিন্তু কিসাসের ব্যাপারটি পুরো দাবীর ওপর ভিত্তিশীল। কিসাসের দাবী না থাকলে তা কার্যকর করা যাবে না। ৩. হুদূদের বেলায় স্বীকারোক্তি ফিরিয়ে নেয়া বিধিসম্মত। কিন্তু কিসাসের বেলায় তা বিধিসম্মত নয়। ৪. হানাফীদের মতে, কোন কোন হদ্দের বেলায় অপরাধ করার পর দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না। কিন্তু কিসাসের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন পরেও সাক্ষ্য গ্রহণ করতে বাধা নেই। ৫. অধিকাংশ ইমামের মতে, হুদূদের ক্ষেত্রে বিচারক নিজের দেখা ও জানা মতে ফায়সালা করতে পারবে না। কিন্তু কিসাসের বেলায় পারবে। ৬. সাধারণত হুদূদের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীদের দাবী কার্যকর হয় না; কিন্তু কিসাসের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীদের দাবী কার্যকর হয়। (*আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা*, খ.১৭,পৃ. ১৩৪;খ.১২, পৃ. ২৫৪-২৫৭)

তিন. তা'যীর (সাধারণ দণ্ড)

'তা'যীর' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল বারণ করা ও ফিরিয়ে রাখা।[১১] তবে শব্দটি সম্মান ও সাহায্য করা অর্থেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শরী'আতের পরিভাষায় তা'যীর হল ঃ هو عقوبة غير مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد و لا كفارة غالبا. - "আল্লাহ বা মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট যে সব অপরাধের জন্য শরী'আত নির্দিষ্ট কোন শাস্তি কিংবা কাফ্‌ফারা নির্ধারণ করে দেয়নি সে সব অপরাধের শাস্তিকে তা'যীর বলে।[১২] স্থান, কাল-অবস্থার নিরিখে কল্যাণের দাবি অনুপাতে এ ধরনের অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত হবে। সুতরাং অপরাধ, অপরাধী, সময় ও পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিচারক যতটুকু ও যেরূপ শাস্তি দান করা যৌক্তিক মনে করবেন, ততটুকুই দেবেন। ইসলামী সরকার যদি 'আলিম ও মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শক্রমে শরী'আতের রীতি-নীতি বিবেচনা করে এ সব অপরাধের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে বিচারকদেরকে তা মেনে চলতে বাধ্য করে, তবে তাও জায়িয। যেমন আজকাল এসেম্বলীর মাধ্যমে দণ্ডবিধি নির্ধারণ করা হয় এবং বিচারক ও জজগণ নির্ধারিত দণ্ডবিধির অধীনে মামলা-মোকদ্দমায় রায় দেন। হুদূদ ও কিসাস জাতীয় কয়েকটি অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট সব অপরাধই তা'যীরী অপরাধ।[১৩] যেমন- বেগানা মহিলাকে চুমো দেয়া, যিনা ব্যতিরেকে কাউকে অন্য

---

১১. যেহেতু শাস্তি অপরাধীকে অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে এবং পুনঃপুনঃ অপরাধ করা থেকে বারণ করে, ফিরিয়ে রাখে, তাই শাস্তিকেও তা'যীর বলা হয়।

১২. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কদীর*, খ. ৪, পৃ, ৪১২; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.১২,পৃ. ২৫৪ মাওয়ার্দী বলেন,. تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود - "হদ্দ নির্ধারণ করা হয়নি- এ ধরনের অপরাধসমূহের শাস্তিকে তা'যীর বলে। (আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ.২৯৩)

১৩. হুদূদ ও তা'যীরাতের মধ্যে আরো বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন- ১. অপরাধ প্রমাণে কিংবা অপরাধের শর্তাবলীর মধ্য থেকে কোন একটিতে সামান্যটুকু সন্দেহ দেখা দিলে হদ্দ অকার্যকর হয়ে যায়। কিন্তু সন্দেহ দেখা দিলে তা'যীর কার্যকর করা যায়। ২. হুদূদের বেলায় স্বীকারোক্তি ফিরিয়ে নেয়া বিধিসম্মত। কিন্তু তা'যীরের ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি ফিরিয়ে নিলে তা'যীর মাফ হবে না। ৩. হুদূদ অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য প্রযোজ্য হয় না। কিন্তু তা'যীর অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্যও প্রযোজ্য হয়। ৪. কারো কারো মতে, অপরাধে লিপ্ত হবার পর দীর্ঘ সময় ধরে নালিশ পেশ না হওয়ার কারণে বা সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে শাস্তি না হবার কারণে কোন কোন হদ্দ রহিত হয়ে যায়; কিন্তু তা'যীর রহিত হয় না। ৫. হুদূদ ও কিসাস নির্দিষ্ট কিছু শর্ত সাপেক্ষে কেবল উপযুক্ত সাক্ষ্য-দলীল ও স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায়। কিন্তু তা'যীর সাক্ষ্য-দলীল ও স্বীকারোক্তি ছাড়া অন্যভাবেও যেমন শপথ, গণসাক্ষ্য ও বদনাম দ্বারাও প্রমাণ করা যায়। ৫. হুদূদ সকলের ক্ষেত্রে পুরোপুরি ও যথাযথ কার্যকর করা কর্তব্য। কিন্তু তা'যীর লোকদের পার্থক্যানুপাতে বিভিন্ন হয়ে থাকে। (ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ.৬১; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা*, খ.১২, পৃ. ২৫৭; আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ.২৯৩; আবদুর রহীম, মুহাম্মাদ, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইফাবা,২০০৭, পৃ.২০৩-২০৪)

কোন অপরাধের অপবাদ দেয়া, বিনা হেফাযতের মাল চুরি করা, খাদ্যে ভেজাল দেয়া, মাপে কম দেয়া, প্রতারণা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ও ঘুষ খাওয়া প্রভৃতি। এ সব অপরাধের শাস্তির মধ্যে কোনটাতে আল্লাহর অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্য প্রবল থাকে, আবার কোনটাতে বান্দাহর অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্য প্রবল থাকে।

ইসলামী শাস্তি আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

১. অপরাধীদের অবস্থাগত পার্থক্যের মূল্যায়ন

ইসলাম অপরাধীদের অবস্থার পার্থক্যের কারণে একই অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে। ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণে ইসলাম বিবাহিত ও অবিবাহিতের মধ্যে পার্থক্য করেছে এবং দুজনের অপরাধের শাস্তিও ভিন্ন ভিন্ন নির্ধারণ করেছে। বিবাহিতের জন্য প্রস্তর নিক্ষেপের ব্যবস্থা এবং অবিবাহিতের জন্য বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করেছে। অনুরূপভাবে মহিলাদেরকে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ দেয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম স্বামী ও অন্যদের মধ্যে পার্থক্য করেছে। অস্বামীর জন্য বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা এবং স্বামীর জন্য 'লি'আন'-এর ব্যবস্থা করেছে।

২. অপরাধের প্রেক্ষাপট মূল্যায়ন

অপরাধী কেন অপরাধ করল, কোন জিনিস তাকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ বা বাধ্য করেছে, ইসলামী আইনে দণ্ডের ফায়সালা দেয়ার সময় তা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হয়। বিস্তারিত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করে যদি জানা যায় যে, তার অপরাধকরণে কোন বৈষয়িক কারণ ছিল, তা হলে অপরাধীকে অবশ্যই 'সন্দেহ-সুবিধা' দিতে হবে। এ কারণে ইমামগণ বলেছেন, একজন কুমারী মেয়েকে অন্তঃসত্ত্বা দেখেই তাকে দণ্ড দেয়া যাবে না- যতক্ষণ না সে ব্যভিচার করার স্বীকারোক্তি দিচ্ছে। সে অপরিচিতা হোক কিংবা পরিচিতা এবং বলাৎকারের ফলে হয়েছে কিংবা তখন সে নির্বাক ও অপ্রতিবাদী ছিল, এই প্রশ্নও অবান্তর। অথবা সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা ব্যভিচার প্রমাণিত হবে। অন্যথায় সন্দেহের সুযোগ তাকে দিতে হবে ও হদ্দ অকার্যকর থাকবে।

৩. কঠোরতা ও দয়ার সমন্বয়

এ কথা সত্য যে, ইসলামের কোন কোন হদ্দ অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম; কিন্তু এতে সমাজের প্রতি ইসলামের যে ব্যাপক দয়া বা দায়-দায়িত্ব বোধ প্রকাশ

পেয়েছে, সে কথা কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া চলে না। কতিপয়ের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে সমষ্টির ক্ষতি সাধন করা কিছু মাত্র যৌক্তিক হতে পারে না। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, শাস্তির কঠোরতা-নমনীয়তার সাথে অপরাধের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। ইতিহাস এটা প্রমাণ করে যে, যখন সমাজে অপরাধের কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে, তখনই অপরাধের সংখ্যা দ্রুত শূণ্যের কোঠায় নেমে এসেছে। পাশাপাশি যখন শাস্তির কঠোরতার মাত্রা কম করা হয়েছে, অপরাধের সংখ্যা তখনই হু হু করে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অপরদিকে এ-ও লক্ষ্যণীয় যে, ইসলাম হদ্দ জাতীয় শাস্তি প্রমাণের ক্ষেত্রে কল্পনাতীত কঠোরতার নীতি অবলম্বন করেছে। অপরাধ প্রমাণে কোন রূপ সন্দেহ দেখা দিলে হদ্দ কার্যকর হবে না।

৪. সমষ্টি ও ব্যষ্টি- উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণ

মানব রচিত আইনে অপরাধের শাস্তিদানের উদ্দেশ্য শুধু সমাজের কল্যাণ সাধন, সাধারণত অপরাধীর স্বার্থ সেখানে উপেক্ষিত। কিন্তু ইসলামে শাস্তির ফায়সালার ক্ষেত্রে যেমন অপরাধীর অপরাধে লিপ্ত হবার প্রেক্ষাপটের মূল্যায়ন করতে হয়, তেমনি অপরাধের সময় আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক অবস্থা ও অপরাধীর মানসিক ভারসাম্য কি রূপ ছিল- এ সব বিষয়ের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[১৪] তদুপরি অপরাধীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে শাস্তি বিলম্বিত করার ব্যবস্থাও ইসলামে রয়েছে এবং তা দয়াশীলতার এক উজ্জ্বল নির্দশন।

৫. শিক্ষামূলক ও দৃষ্টান্তমূলক

ইসলামে বড় বড় অপরাধের শাস্তি শুধু কঠোরই নয়; শিক্ষামূলক ও দৃষ্টান্ত মূলকও। আজ পর্যন্ত দুনিয়ায় এটাই দেখা গেছে যে, জনগণকে যে কাজ থেকে বিরত রাখা কাম্য, তা করার অপরাধের শাস্তি সাধারণত প্রকাশ্যেই কার্যকর করা হয়েছে। শাস্তি যতই শিক্ষামূলক ও দৃষ্টান্তমূলক হবে, অপরাধের প্রবণতা সমাজে ততই বাধাগ্রস্ত হবে। এ কারণেই ইসলামে বড় বড় অপরাধের শাস্তিসমূহ গোপনে নয়; প্রকাশ্যভাবে ও জনগণের উপস্থিতিতে কার্যকর করার ব্যবস্থা করেছে।

---

১৪. এ কারণেই ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেছেন, হদ্দসমূহ কার্যকর করতে হলে সমাজে এ সকল অপরাধ সংঘটিত হবার সম্ভাব্য সকল দ্বার পূর্বেই রুদ্ধ করে দিতে হবে। এর পর যদি অপরাধ সংঘটিত হয় এবং তা হয় কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, তাহলেই সে জন্য অপরাধীকে হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে।

তবে তা'যীরী অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে অপরাধীর অবস্থা ও পরিবেশ বিবেচনা করে নিবর্তনমূলক শাস্তি দান অর্থাৎ প্রয়োজনে অপরাধীকে জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কারাগারে কয়েদ করা রাখার ব্যবস্থাও ইসলামে রয়েছে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বর্তমান কালে কারাগারগুলোর অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। বলতে গেলে এ যুগের কারাগারসমূহ অপরাধ বিজ্ঞানের সুদৃঢ় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের কোন অপরাধী কিছুকাল কারাজীবন লাভ করতে পারলে সে একজন অতীব দক্ষ ও পাকাপোক্ত এবং দুঃসাহসী অপরাধী হয়ে বের হয়ে আসে। তাই বিষয়টি এখন গভীরভাবে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। অপরাধীকে অপরাধবিমুখ এবং সমাজকে অপরাধমুক্ত বানাতে হলে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন কোন তা'যীরী অপরাধের জন্যও হুদূদের মতো নিবর্তনমূলক শাস্তির চাইতে দৃষ্টান্তমূলক দৈহিক শাস্তিদানের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

ইসলামী শাস্তি আইনের উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

ইসলামে অপরাধের যে শাস্তি বিধান করা হয়েছে, তার মূল লক্ষ্য কাউকে কষ্ট দান করা নয়; বরং এ বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিধান করার জন্য। তা কেবল সে ব্যক্তির জন্য নয় যে অপরাধ করেছে; বরং তা গোটা সমাজের জন্য।

১. মানুষের মৌলিক বিষয়সমূহের সংরক্ষণ

দীন সংরক্ষণ, বংশ সংরক্ষণ, বিবেক-বুদ্ধি সংরক্ষণ, ধন-সম্পদ সংরক্ষণ ও ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষণ- এ পাঁচটি মানুষের মৌলিক প্রয়োজনরূপে চিহ্নিত। এ বিষয়গুলো যথাযথভাবে কার্যকর না থাকলে মানুষের জীবন ও কল্যাণের চিন্তা করা যায় না। ইসলামী শাস্তি আইনে এ পাঁচটি বিষয়ে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করাকে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ রূপে গণ্য করা হয়েছে। এ কয়টি বিষয় যাতে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত থাকে, এর কোন একটি ক্ষেত্রেও যাতে কোন রূপ সীমা লঙ্ঘন না হয়, তাই যে তার সীমা লঙ্ঘন করতে উদ্যত হবে বা তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি করবে, তাকে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এমন কাজ আর কেউ করতে সাহস না পায়। যিনার হদ্দ নির্দিষ্ট করা হয়েছে মানুষের বংশ বিকৃতি বা বিনষ্ট করার পদক্ষেপ থেকে মানুষকে বিরত রাখার লক্ষ্যে, চুরি ও ডাকাতি অপরাধের শাস্তি বিধান করা হয়েছে জনগণের জান-মালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে। মানুষের মান-সম্মান ও ইজ্জত-আব্রু হিফাযতের জন্য

কাযফের হদ্দ ঘোষিত হয়েছে এবং মানুষের বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা রক্ষার জন্য মদ্যপান অপরাধেরও শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২. সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন

ইসলামী শাস্তি আইনে বিভিন্ন অপরাধের জন্য যে সব শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে, বাহ্যত তাতে যদিও অপরাধীকে কষ্ট দান করা হয়; কিন্তু আসলে কষ্ট দান করাই তার প্রধান লক্ষ্য নয়। আসল লক্ষ্য হল- এ শাস্তি কার্যকরণের মাধ্যমে ইসলামী সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। এ কল্যাণের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল অন্যায় ও যুলমের বিস্তার ও ব্যাপকতা প্রতিরোধ এবং আইন অমান্য করার প্রবণতা রুদ্ধকরণ। কারো প্রতি নির্মমতা প্রদর্শন বা কারো থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ আদৌ তার লক্ষ্য নয়। বস্তুত এ শাস্তি হচ্ছে রোগ প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক ঔষধ। জীবন রক্ষার জন্য যেমন পচে যাওয়া অঙ্গ কেটে ফেলা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, সমাজকে রক্ষার জন্য অপরাধীদের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়াও ঠিক তেমনি।

৩. অপরাধীকে পবিত্রকরণ

ইসলাম অপরাধীর প্রতি হিংসা বা শত্রুতা পোষণ করে না; বরং শাস্তি কার্যকর করার পরও তাকে অত্যন্ত দয়া-অনুগ্রহ ও প্রীতির চক্ষে দেখা হয়। অপরাধীর ওপর শাস্তি কার্যকর করার পর তাকে অপরাধের দোষ থেকে মুক্ত মনে করে ইসলামী শরী'আত মনস্তাত্ত্বিকভাবে- যে পরিবেশের মধ্যে পড়ে সে অপরাধ করেছিল সেখান থেকে বের করে সেই পরিবেশের মধ্যে নিয়ে যেতে চায়, যেখানে সে স্বীয় মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন হতে পারবে, মনে করতে পারবে যে, সে মনুষ্যত্বের মান থেকে নিচে নেমে যায় নি, সে সাময়িকভাবে ভুল করেছিল মাত্র এবং সে ভুলটা নিতান্তই মানবিক কারণে।

অধিকন্তু, ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধের যে শাস্তি দেয়া হয়, তা অপরাধীকে পরিশুদ্ধ করে, তার পাপ ধুয়ে-মুছে ফেলে এবং তাকে পরকালীন আযাব থেকে রক্ষা করে। এ কারণে অপরাধী শাস্তি ভোগ করার পরও নিজের মধ্যে তৃপ্তি ও প্রশান্তি অনুভব করে। সমাজের প্রতি তার মনে কোন রূপ আক্রোশ জাগে না। কেননা সে জানতে পারে যে, এ শাস্তি কারো মনগড়া নয়; তা আল্লাহরই শরী'আত। মানুষের আইনে প্রদত্ত শাস্তি এবং আল্লাহর আইনে প্রদত্ত শাস্তির মধ্যে এটাই বড় পার্থক্য। মানুষের আইনে দণ্ডিত ব্যক্তির মনে সমাজ সমষ্টির প্রতি প্রতিহিংসা জেগে ওঠে। আর আল্লাহর আইনে দণ্ডিত ব্যক্তির মনে আত্ম-উপলব্ধির সঞ্চার হয়।

শাস্তির ক্ষেত্রে সুপারিশের বিধান ঃ

ক. হুদূদের ক্ষেত্রে সুপারিশ ঃ

হুদূদের বেলায় সুপারিশ করা এবং তা আমলে নেয়া দুই-ই না জায়িয।[১৫] হুদূদ জাতীয় কোন অপরাধের নালিশ যদি বিচারকের কাছে দায়ির হয় এবং তা প্রমাণিতও হয়, তাহলে কোনভাবেই এ অপরাধের শাস্তি ক্ষমা বা লঘু করার সুপারিশ করা কারো জন্য জায়িয নয়। কেননা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুদূদের মধ্যে আল্লাহর অধিকার বাস্তবায়নের দিকটি প্রবল থাকে। তাই এমতাবস্থায় সুপারিশ করার অর্থ হলো আল্লাহর অধিকার বাস্তবায়নে বাধা দান করা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। বর্ণিত রয়েছে, একবার হযরত উসামা ইবনু যায়দ (রা) মাখযুম গোত্রের জনৈকা মহিলা চোরের শাস্তি লঘু করার ব্যাপারে সুপারিশ করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, أ تشفع في حد من حدود الله ؟ - "তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত একটি হদ্দের ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করছো? অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, يايها الناس إنما ضل من كان قبلكم انهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ' و إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليها الحد ' و أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. - "হে মানবমণ্ডলী, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো এ জন্যে ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের মধ্যকার কোন অভিজাত লোক যদি চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখনই কোন দুর্বল লোক চুরি করতো, তখনি তার ওপর তারা হদ্দ কায়িম করতো। আল্লাহর শপথ! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করতো, তা হলেও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবশ্যই তাঁর হাত কেটে ফেলতো।"[১৬] হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضادّ الله في أمره. - "যার সুপারিশের কারণে আল্লাহর কোন হদ্দ কায়িম বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, সে অবশ্যই তাঁর নির্দেশ নিয়ে তাঁর সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছে।[১৭]

---

১৫. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, বৈরূত ঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, খ.৪, পৃ.৪; আল-ফাওযান, ড. সালিহ ইবন ফাওযান, *আল-মুলাখ্খস আল-ফিকহী*, রিয়াদঃ ইদারাতুল বুহুছ আল-'ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা', ১৪২৩ হি. পৃ ৫২৪-৫২৫

১৬. সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুল আম্বিয়া), হা.নংঃ ৩২৮৮; সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নংঃ ৪৩৮৬, ৪৩৮৭

১৭. আবূ দাউদ, (কিতাবুল আকদিয়াহ), হা.নংঃ ৩৫৪৭; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুল বুয়ূ'): ২২২২; আহমদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নংঃ ৫৩৬২

তবে অপরাধের নালিশ বিচারক বা শাসকের কাছে দায়ির করার আগে বাদীর কাছে অপরাধীকে ছেড়ে দেয়ার বা মাফ করে দেয়ার জন্য সুপারিশ করা দূষণীয় নয়। সাফওয়ান ইবনু উমাইয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁর একটি চাদর চুরি করেছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এর বিচার দায়ের করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ব্যক্তিটির হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এরপর সাফওয়ান নিজেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে তাকে মাফ করে দেয়ার আবেদন জানালেন। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন, আবূ ওয়াহাব! তাহলে তুমি আমার কাছে তাকে নিয়ে আসার আগে কেন তাকে ক্ষমা করলে না? এ বলে তিনি তার হাত কেটে ফেললেন।[১৮] এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, বিচারক বা শাসকের কাছে মামলা দায়ের করার আগে অপরাধীকে মাফ করে দিতে এবং বাদীর কাছে অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য সুপারিশ করতে কোন অসুবিধা নেই।

তবে অপরাধ যদি অমার্জনীয় হয় এবং অপরাধীও বিপজ্জনক হয়, তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়ার বা মাফ করে দেয়ার সুপারিশ করা উচিত নয়; বরং তার ওপর যথাযথভাবে হদ্দ কার্যকর করার ব্যবস্থায় সহযোগিতাই করাই উত্তম।[১৯]

খ. কিসাসের বেলায় সুপারিশ ঃ

কিসাসের মধ্যে যেহেতু মানুষের অধিকার বাস্তবায়নের প্রাবল্য রয়েছে, তাই এ ক্ষেত্রে সুপারিশ করা এবং তা আমলে নেয়া দুই-ই জায়িয। হত্যা প্রমাণিত হওয়ার পর হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের ইখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়। সে ইচ্ছে করলে কিসাস হিসেবে মৃত্যুদণ্ডও দাবী করতে পারে। ক্ষমাও করে দিতে পারে।

গ. তা'যীরাতের বেলায় সুপারিশ ঃ

যে সব তা'যীরাতে মানুষের অধিকারের প্রাবল্য রয়েছে, আদালতে নালিশ পেশ হবার আগে ও পরে উভয় অবস্থায় তাতে সুপারিশ করা ও তা শ্রবণ করা- দুই-ই

---

১৮. আবূ দাউদ, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ৪৩৯৪; নাসাঈ, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ৪৮৯৩; ইবনু মাজাহ, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ২৫৯৫

১৯. এটা ইমাম মালিকের অভিমত। (আল-বাজী, সুলায়মান, *আল-মুনতকা' শারহুল মু'আত্তা*, দারুল কিতাবিল ইসলামী, খ.৭,পৃ. ১৬৩)

জায়িয।[২০] আর আল্লাহর অধিকারের সাথে জড়িত তা'যীরাত কিংবা যে সব তা'যীরাতে আল্লাহর অধিকারের প্রাবল্য রয়েছে, তাতে কারো সুপারিশ করা দূষণীয় নয়; তবে শাসক বা বিচারকের দরবারে তার নালিশ পৌঁছার পর ক্ষমা করার ব্যাপারটি শাসক বা বিচারকের হাতে ন্যস্ত থাকবে। শাসক বা বিচারক সার্বিক অবস্থা বিবেচনা পূর্বক ভাল মনে করলে সুপারিশ গ্রহণ করে শাস্তি ক্ষমাও করে দিতে পারেন। আবার সুপারিশ অগ্রাহ্য করে জনস্বার্থে শাস্তি কার্যকরও করতে পারেন।[২১]

শাস্তি থেকে রেহাই পাবার বিশেষ অবস্থাসমূহঃ

১. মৃত্যু

অপরাধীর শাস্তি যদি তার দেহের সাথে সম্পর্কিত হয় (যেমন-মৃত্যুদণ্ড, কারাদণ্ড ও বেত্রাঘাত প্রভৃতি) তা হলে সে মারা গেলে তার শাস্তিও রহিত হয়ে যাবে। কেননা এমতাবস্থায় শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রই বিদ্যমান নেই। তবে তার শাস্তি যদি তার দেহের সাথে সম্পর্কিত না হয়ে তার অর্থ-সম্পদের সাথে সম্পর্কিত হয় (যেমন অর্থদণ্ড ও সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ প্রভৃতি), তাহলে বিচারের পর তার মৃত্যু হলেও শাস্তি রহিত হবে না। কেননা এমতাবস্থায় তার সম্পদের ওপর বিচারের রায় কার্যকর করা সম্ভব। ঋণের মতো তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে অর্থদণ্ডের পরিমাণ আদায় করা যাবে।

২. ক্ষমা

ক্ষমা শাস্তি থেকে রেহাই লাভের কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম। হুদূদের ক্ষেত্রে সাধারণত ক্ষমা করা জায়িয নয়। তবে যিনার অপবাদের শাস্তির মধ্যে যেহেতু আল্লাহর হকের সাথে বান্দাহর হকও জড়িত রয়েছে, তাই অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি ইচ্ছে করলে অপবাদদানকারীকে ক্ষমা করে দিতে পারে। বিচারকের

---

২০. অধিকাংশদের মতে, সাধারণত তা'যীরাতের ক্ষেত্রে সুপারিশ করা জায়িয। কারো কারো দৃষ্টিতে মুস্তাহাবও। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, اشفعوا تؤجروا - "তোমরা সুপারিশ করো, তোমাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।" (বুখারী, (কিতাবুয যাকাত), হা.নংঃ ১৩৬৫)

২১. আশ-শারবীনী আল-খতীব, *মুগনিউল মুহতাজ*, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, খ.৫, তা'যীর অধ্যায় ; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, খ.৩০, পৃ.১৮৫। তবে মালিকীগণের মতে, আল্লাহর হকের সাথে জড়িত তা'যীরাত হলে এবং যার জন্য সুপারিশ করা হবে সে যদি অসৎ হয়, তাহলে শাস্তি কার্যকর করাই হল শাসকের একান্ত কর্তব্য। (আর-রু'আয়নী, মুহাম্মদ, *মাওয়াহিবুল জলীল*, দারুল ফিকর, খ.৬, পৃ.৩২১)

দরবারে নালিশ পেশ করার আগেও এবং পরেও।[২২] তদ্রূপ চুরির বেলায় যদিও আল্লাহর হক প্রবলভাবে ক্ষুণ্ণ হয়; তবে মানুষের অধিকারের বিষয়ও যেহেতু তার সাথে জড়িত রয়েছে, তাই বিচারকের দরবারে চুরির নালিশ পেশ করার আগে চোরকে ক্ষমা করে দেয়া দূষণীয় নয়, তবে নালিশ পেশ করার পর তাকে ক্ষমা করে দেয়া জায়িয হবে না। অনুরূপভাবে যিনার অপবাদের শাস্তির ক্ষেত্রে যেহেতু আল্লাহ ও মানুষের দুজনেরই হকের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, এ কারণেই শাফি'ঈ ও হাম্বলী স্কুলের ইমামগণের মতে, তাতে বিচারকের কাছে নালিশ পেশ করার পরও তাকে ক্ষমা করে দেয়া জায়িয। তবে হানাফীগণের মতে জায়িয নয়। কিসাসের মধ্যে যেহেতু বান্দাহর হকের প্রাবল্য রয়েছে, তাই নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছদের কিসাসের দাবী করার অধিকার কিংবা তার পরিবর্তে দিয়াত কিংবা বিনা বিনিময়ে ক্ষমা করার অধিকারও রয়েছে। তা'যীরাত ক্ষমা করে দেয়া দূষণীয় নয়।[২৩] যদি তা'যীরাত বান্দাহর হক হয়, তবে বান্দাহ নিজেই তা ক্ষমা করে দিতে পারে। আর যদি আল্লাহর হক হয়, তাহলে অপরাধীর অবস্থা ও জনস্বার্থ বিবেচনা করে শাসক ইচ্ছা করলে তার শাস্তি মাফ করে দিতে পারেন।[২৪]

---

২২. তবে হানাফী ইমামগণের মধ্যে কারো কারো মতে, নালিশ পেশ করার পরে অপবাদদানকারীকে ক্ষমা করা জায়িয নেই। (শায়খী যাদাহ, *মাজমা'উল আনহুর*, দারু ইহয়ায়িত তুরাছিল 'আরবী, খ.১, পৃ.৬০৭)

২৩. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لا تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة إلا في حد من حدود الله- "মানবিকগুণ সম্পন্ন লোকদের শাস্তির ব্যাপারে তোমরা কড়াকড়ি করো না। তবে কোন হদ্দ হলে ভিন্ন কথা।" (আল-কাদা'ঈ, *মুসনাদুশ শিহাব*, হা.নং: ৭২৫; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ.৮১)এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, ব্যক্তির মর্যাদা ও অবস্থা অনুপাতে সাধারণ দণ্ড ক্ষমা করতে দোষ নেই।

২৪. কারো কারো মতে, আল্লাহর হকের সাথে জড়িত তা'যীর (যেমন নামায পরিত্যাগ করার শাস্তি) ক্ষমা করে দেয়া জায়িয নেই। ইস্তাখ্‌রী বলেন, যে ব্যক্তি কোন সাহাবীর দুর্নাম করবে, তাকে শাস্তি দেয়া শাসকের কর্তব্য। তাকে ক্ষমা করে দেয়ার অধিকার তার নেই। আবার কারো মতে, যে সব অপরাধের ব্যাপারে শরী'আতে সুস্পষ্ট শাস্তির কথা বর্ণিত রয়েছে (যেমন নিজের স্ত্রীর দাসী কিংবা শরীকী দাসীর সাথে সহবাস করা), তা কার্যকর করা ওয়াজিব। তা ক্ষমা করে দেয়া জায়িয নেই। আবার কারো মতে, অভিজাত ও পবিত্র চরিত্রের লোকদের পদস্খলন ও অসাবধানতাবশত ত্রুটিই কেবল ক্ষমার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। অনুরূপভাবে তা'যীর যদি বান্দাহর হক হয়, তাহলে কারো কারো মতে, বাদীর দাবী সত্ত্বেও শাসক ইচ্ছে করলে আল্লাহর হকের সাথে জড়িত তা'যীরের মতো তাও ক্ষমা করে দিতে পারেন। তবে অধিকাংশের মতে, বাদীর দাবী থাকলে শাসকের পক্ষে তা ক্ষমা করা জায়িয নয়। তদুপরি সমাজের সামগ্রিক স্বার্থ যেখানে জড়িত, সে ক্ষেত্রে বাদী অপরাধীকে ক্ষমা করে দিলেও শাসকের জন্য তাকে শাস্তি দেয়া জায়িয। নালিশ পেশ করার আগেও, পরেও। (আল-হায়তমী, ইবনু হাজর, *তুহফাতুল মুহতাজ*, আল-মাতবা'আতুল ইয়ামানিয়্যা, খ. খ.৯, পৃ. ১৮১; *আল-মাওসু'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ৩০, পৃ. ১৮৪-১৮৬)

৩. তাওবা

কোন অপরাধী যদি লজ্জিত হয়ে পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তাওবা করে অপরাধ থেকে ফিরে আসে, তাহলে প্রবল আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবা কবুল করবেন। এতে আখিরাতে তার গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে এবং সেখানকার হিসাব-কিতাব থেকে সে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। তবে তাওবা দ্বারা অপরাধের ইহজাগতিক শাস্তি থেকে নিস্কৃতি লাভ করা যাবে কি না - তা অপরাধের প্রকৃতি ও স্বরূপের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।[২৫]

ক. হুদূদ জাতীয় অপরাধসমূহের বেলায় তাওবা ঃ

তাওবা করলেও সাধারণতঃ হুদূদ মাফ হবে না।[২৬] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত মা'ইয আসলামী ও গামিদিয়্যাহকে রজম করেছেন, আর চুরির স্বীকারোক্তির জন্য কারো কারো হাতও কেটেছেন। তাঁরা সকলেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে এসে তাওবা করেছিলেন। অধিকন্তু, তিনি গামিদিয়্যাহর তাওবা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. - "এ নারী যে ধরনের তাওবা করেছে তা মদীনার সত্তরজন লোকের মধ্যে বন্টন করে দিলে তা তাদের

---

২৫. অত্র অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাওবা গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের এ মতবিরোধ দুনিয়ার শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। বান্দাহ যদি প্রকৃত তাওবা করে, তাহলে তার তাওবা আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন। এতে কারো দ্বিমত নেই।

২৬. এটাই অধিকাংশ ইসলামী আইনতত্ত্ববিদের অভিমত। (ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ.৪) তবে কতিপয় শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামের মতে, কেউ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে খালিস তাওবা করে সংশোধিত হয়ে গেলে হদ্দ কার্যকরা করা হবে না। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি হদ্দের উপযোগী হয়েছি। আপনি আমার ওপর হদ্দ কার্যকর করুন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কাছ থেকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। ইত্যবসরে নামাযের সময় উপস্থিত হয়ে গেল। ব্যক্তিটি তাঁর সাথে নামায আদায় করলেন। নামাযের পর লোকটি দাঁড়িয়ে পুনরায় তার আরয পেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে নামায পড়নি। লোকটি জবাব দিল: হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন।" –সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুল মুহারিবীন), হা.নং: ৬৪৩৭ ও সহীহ মুসলিম, (কিতাবুত তাওবাহ), হা.নং: ২৭৬৪, ২৭৬৫) এ হাদীস থেকে জানা যায়, অপরাধী তাওবা করলে তার অপরাধ মাফ হয়ে যাবে। তাছাড়া ডাকাতির ক্ষতি ও প্রভাব মারাত্মক হওয়া সত্ত্বেও যেখানে তার শাস্তি তাওবা করলে মাফ হয়ে যায়, তাহলে অন্যান্য অপরাধের শাস্তি তো আরো অধিক উত্তমভাবে তাওবা করলে মা'ফ হয়ে যাবার কথা। (আল-বহুতী, মানসূর, *কাশশাফুল কিনা'*, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, খ. ৬, পৃ. ১৫৩-৪; আল-হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯, পৃ. ১৫৮-৯)

জন্য যথেষ্ট হবে।"[২৭] তাই বলে তিনি তাঁদেরকে হদ্দ থেকে রেহাই দেননি। তবে ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের শাস্তির বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। ডাকাত ও সন্ত্রাসী যদি গ্রেফতারীর পূর্বে তাওবা করে এবং তার আচার-আচরণ দ্বারা তাওবার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়, তবেই তাকে হদ্দ থেকে রেহাই দেয়া যাবে। তবে সাধারণ দণ্ড থেকে তাকে নিস্কৃতি দেয়া উচিত নয়। তার গ্রেফতার পরবর্তী তাওবা ধর্তব্য নয়। এ তাওবা আন্তরিকতার তাওবা হিসেবে বিবেচিত হবে না। তদ্রূপ ধর্মত্যাগী যদি তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসে তাহলে তাহলে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে এবং তার জন্য ধর্মত্যাগের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না।[২৮] অন্যান্য হদ্দ তাওবা করলেও মাফ হবে না। বিচারকের নিকট মামলা দায়েরের আগেও মাফ করা হবে না, পরেও মাফ করা হবে না। কেননা তাওবার মাধ্যমে যদি হদ্দ থেকে পরিত্রাণ পাবার সুযোগ থাকে, তাহলে একদিকে অপরাধীরা তাওবাকে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবার মাধ্যমে পরিণত করবে। অপরদিকে অপরাধীদেরকে তাওবার পর বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেয়ার প্রবণতা শুরু হবে।

খ. তা'যীরাতের বেলায় তাওবার প্রভাব ঃ

তাওবা করলে এবং তাওবার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেলে তা'যীরাত ক্ষমা করে দেয়া দূষণীয় নয়। যদি তা'যীরাত বান্দাহর হক হয় (যেমন কাউকে গালমন্দ ও মারধর করার শাস্তি), তবে বান্দাহ নিজেই তা ক্ষমা করে দিতে পারে। আর যদি আল্লাহর হক হয় (যেমন নামায, রোযা ছেড়ে দেয়ার শাস্তি), তাহলে অপরাধীর তাওবা বিবেচনায় এনে শাসক ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে।[২৯]

৪. অপরাধের পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়া

অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে শাস্তি ছাড়াই দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে তা শাস্তি প্রদানে কোন ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি করবে কি

---

২৭. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদূদ, হা.নং: ১৬৯৬ ; হযরত মা'ইয (রা) সর্ম্পকেও এ ধরনের কথা বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন,.لقد تاب توبة لو قسمت بين امة لوسعتهم - "মা'ইয এমন তাওবা করেছে যে, তা গোটা মুসলিম উম্মাতের মধ্যে বন্টন করে দিলে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে।" –সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ১৬৯৪

২৮. অনুরূপভাবে যারা নামায পরিত্যাগের শাস্তিকে হদ্দ হিসেবে বিবেচনা করে, তাদের দৃষ্টিতে তাওবা করলে নামায পরিত্যাগের শাস্তি মাফ হয়ে যাবে।

২৯. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, দারুল কিতাবিল ইসলামী, খ.৫,পৃ. ৪৯-৫০; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ১২,পৃ. ২৮৬-৭; খ.১৪,পৃ.১৩২

না- তা নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ আইনতত্ত্ববিদের মতে যিনা, যিনার অপবাদ ও মদ্যপান প্রভৃতি অপরাধে যখনই উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাবে, তখনি তা আমলে নিয়ে শাস্তি কার্যকর করা যাবে। কিন্তু হানাফীগণের মতে, আল্লাহর হক প্রবলভাবে জড়িত- এ জাতীয় হদ্দসমূহে (যেমন যিনা ও মদ্যপান) কোন গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া (যেমন সাক্ষীদের দূর দেশে চলে যাওয়া বা দীর্ঘ দিন অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকা প্রভৃতি) অপরাধ করার পর দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে হদ্দ অকার্যকর হয়ে পড়বে। সুতরাং দীর্ঘ দিন পর[৩০] এ সব ক্ষেত্রে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে যিনার অপবাদের বেলায় যেহেতু আল্লাহর হকের সাথে মানুষের হকের বিষয়টিও জড়িত রয়েছে, তাই এ ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন পর সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।[৩১]

৫. সমঝোতা

হদ্দ যেমন ক্ষমা করে দেয়া জায়িয নয়, তেমনি হদ্দের ব্যাপারে সমঝোতা করা বা হদ্দের বিনিময় গ্রহণ করাও জায়িয নয়। এ কারণে কোন চোর, মদ্যপায়ী কিংবা ব্যভিচারীর সাথে কোন বিনিময় নিয়ে কিংবা কোন শর্তে সমঝোতা করে তাকে ছেড়ে দেয়া, বিচারকের কাছে নালিশ পেশ না করাও বিধিসম্মত নয়। কেননা হুদূদের বিষয়টি একান্তভাবে আল্লাহর হকের সাথে জড়িত। তাই এ ক্ষেত্রে বান্দাহর সমঝোতা করার কোনই অধিকার নেই। কেউ যদি এসব ক্ষেত্রে কোন বিনিময় নিয়েও থাকে, তা তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে। কেননা সে তা বিনা অধিকারেই গ্রহণ করেছে।[৩২]

৬. সন্দেহ

হদ্দ কার্যকর হবার জন্য অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে। যদি অপরাধ প্রমাণে কোন সন্দেহ দেখা দেয়, তাহলে হদ্দ অকার্যকর হয়ে যাবে।[৩৩]

---

৩০. দীর্ঘসময় বলতে কতদিনকে বোঝানো হয়েছে তা নিয়ে হানাফীগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (রা)-এর মতে, তা হল সর্বোচ্চ ছয় মাস। ইমাম আবূ হানীফা (রহ) এর জন্য কোন সময় নির্ধারণ করে দেন নি; বরং তা বিচারক হাতে ন্যস্ত করেছেন। বিচারক সময় ও স্থান বিবেচনা করে তা নির্ধারন করবেন। (ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, দারুল ফিকর, খ.৫, পৃ. ২৮২-২৮৩)

৩১. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীনুল হাকা'ইক শারহু কানযিদ দাকা'ইক*, দারুল কিতাবিল ইসলামী, খ.৩; ১৮৭-৮; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ১৩, পৃ. ১২২

৩২. ইবনু তাইমিয়্যা, *আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা*, খ.২৮,প. ২৯৮-৩০৪

৩৩. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪,পৃ.১৭

যেমন- যদি কেউ বিয়ের প্রথম রাত নিজের বিছানায় শায়িত কোন মেয়ে লোককে দেখে তাকে স্ত্রী মনে করেই তার সাথে সহবাস করে ফেলে এবং পরে জানতে পারে যে, শায়িত মেয়েটি তার স্ত্রী নয়, এমতাবস্থায় তার ওপর হদ্দ জারী করা যাবে না। এ ব্যাপারে ইসলামী আইনের স্বীকৃত বিধান হচ্ছে الحدود تندرئ بالشبهات . - "হুদূদ সামান্যতম সন্দেহের কারণেই অকেজো হয়ে পড়ে।"[৩৪]

৭. স্বীকারোক্তি ফিরিয়ে নেয়া

যে সব হদ্দে আল্লাহর হকের প্রাবল্য রয়েছে (যেমন যিনা, চুরি ও মদ্যপানের শাস্তি) তা যদি অপরাধীর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, সে সব ক্ষেত্রে অপরাধী যদি পরবর্তীতে নিজের স্বীকারোক্তি ফিরিয়ে নেয়, তাহলেও হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। বর্ণিত রয়েছে, হযরত মা'ইয (রা) যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট যিনার কথা স্বীকার করেছিলেন, তখন তিনি তাকে স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসার জন্য বারংবার উৎসাহিত করেছিলেন।[৩৫] এ থেকে জানা যায়, যদি স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসার কারণে হদ্দ রহিত হয়ে না যায়, তাহলে তাঁর বারংবার উৎসাহ দেবার পেছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে! তদুপরি স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসার কারণে অপরাধে লিপ্ত হবার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

তবে যিনার অপবাদে যেহেতু আল্লাহর হকের সাথে বান্দাহর হকও জড়িত রয়েছে, তাই কিসাসের মত এ ক্ষেত্রেও স্বীকারোক্তি ফিরিয়ে নিলে হদ্দের বিধান কার্যকর হবে। অনুরূপভাবে যে সব তা'যীরাতের সাথে বান্দাহর হক জড়িত, তাতে স্বীকারোক্তি ফিরিয়ে নিলেও তা'যীরের বিধান কার্যকর হবে।[৩৬]

উল্লেখ্য যে, স্বীকারোক্তি থেকে প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট ভাষায়ও হতে পারে, ইঙ্গিতাকারেও হতে পারে। এ কারণেই স্বেচ্ছায় স্বীকৃতিদানকারী ব্যভিচারীকে লোকেরা যদি প্রস্তর নিক্ষেপ করতে শুরু করে আর সে যদি পালিয়ে যায় এবং ফিরে না আসে, তা হলে তার পিছু গমন করা যাবে না। অনুরূপভাবে স্বেচ্ছায়

---

৩৪. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ادرءوا الحدود بالشبهات. - "সন্দেহের কারণে হদ্দ রহিত কর।" (আল- কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুর'আন*, খ.১৩,পৃ.২৯৮)

৩৫. সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুল মুহারিবীন), হা.নং: ৬৪৩৮; মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ১৬৯২, ১৬৯৩

৩৬. আস-সারাখ্সী, *আল-মাবসূত*, খ.৯,পৃ. ৯২-৩; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ. ১৪৩; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ১৭, পৃ. ১৩৪-১৩৫

স্বীকৃতিদানকারী অপরাধীকে বেত্রাঘাত শুরু করার পর পালিয়ে গেলে তারও পিছু গমন করা যাবেনা। কেননা এমতাবস্থায় পালিয়ে যাওয়ার একটি অর্থ এ হতে পারে যে, সে তার স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে এসেছে।[৩৭]

৮. সাক্ষীদের মৃত্যু বা সাক্ষ্য ফিরিয়ে নেয়া

অপরাধের সাক্ষীরা বিচারকের নিকট সাক্ষ্য দেয়ার আগেই যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলেও হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[৩৮] তাছাড়া বিচারের পর শাস্তি কার্যকর করার আগেই যদি সাক্ষীরা সকলেই কিংবা প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাক্ষী নিজেদের সাক্ষ্য ফিরিয়ে নেয়, তা হলেও হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[৩৯]

৯. মিথ্যা প্রতিপন্ন করা

মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মাধ্যমেও অনেক সময় হদ্দের বিধান রহিত হয়ে পড়ে। যেমন- কোন পুরুষ যদি স্বেচ্ছায় কোন মহিলার সাথে যিনা করার কথা স্বীকার করে, কিন্তু তার ওপর হদ্দ জারি করার আগে মহিলাটি যদি তার কথাকে মিথ্যা বলে দাবী করে, তাহলেও হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[৪০]

শাস্তির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীদের দাবী

সাধারণত হুদূদের ক্ষেত্রে বাদীর মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীদের দাবী আমলে নেয়া হবে না। তবে শাফি'ঈ ইমামগণের মতে, যিনার অপবাদের সাথে যেহেতু বান্দাহ অধিকারও জড়িত রয়েছে, তাই এক্ষেত্রে অপবাদ-আরোপিত ব্যক্তির মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের দাবী আমলে নেয়া হবে। কিসাসের বেলায় নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছরা উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নয়; বরং নিহত ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসেবে কিসাসের দাবী করবে। তা'যীরাত যদি মানুষের অধিকারের সাথে জড়িত হয়, তা হলে সে ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীদের দাবী আমলে নেয়া হবে। আর যদি তা আল্লাহর অধিকারের সাথে জড়িত হয়, তাহলে উত্তরাধিকারীদের দাবী আমলে নেয়া হবে না।[৪১]

---

৩৭. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ১৭, পৃ. ১৩৪-১৩৫
৩৮. আল-কাসানী, *বদা'ই আস-সনা'ই*, খ.৭,পৃ.৩৩,৬৭, ২৩৩
৩৯. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫,পৃ.২৪-২৫; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ২২, পৃ. ১৫১
৪০. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ১৭, পৃ. ১৩৬
৪১. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫,পৃ. ৩৯; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ১৭, পৃ. ১৩৬

অপরাধীর ওপর হদ্দ কায়িম করার শর্তসমূহ ঃ

নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পাওয়া গেলেই কেবল একজন অপরাধীর ওপর হদ্দ কার্যকর করা হয়।

১. **প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ঃ** অপরাধীকে প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। অতএব অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন ছেলে বা মেয়ে হুদূদ জাতীয় কোন অপরাধ করলে তার ওপর হদ্দ কায়িম করা যাবে না। তবে সাধারণ দণ্ড দেয়া যাবে।

২. **সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া ঃ** অপরাধীকে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। অতএব কোন ব্যক্তি অপরাধ করার পর পাগল হয়ে গেলে তার ওপরও হদ্দ কায়িম করা যাবে না। তদ্রূপ পাগল অবস্থায় কেউ কোন রূপ অপরাধে লিপ্ত হলে তার জন্যও তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। রাসূলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, : رفع القلم عن ثلثة عن الصبي حتى يبلغ ' و عن النائم حتى يستيقظ ' و عن المجنون حتى يفيق. - "তিন শ্রেণীর মানুষকে (শাস্তি থেকে) অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। ক. নাবালিগ বালিগ না হওয়া পর্যন্ত, খ. ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত ও গ. পাগল সুস্থবুদ্ধি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত।"[৪২]

৩. **অপরাধ সম্পর্কে অবগত থাকা ঃ** অপরাধ সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। অতএব কোন অমুসলিম দেশের নাগরিক মুসলিম দেশে এসে যদি মুসলিম হয় এবং এর পর মদ সেবন করে, অতঃপর সে যদি বলে যে, মদের নিষেধাজ্ঞাটি আমার জানা ছিল না, তাহলে তাকে মদপানের শাস্তি দেয়া যাবে না। তবে সে যদি চুরি করে কিংবা যেনা করে এ রূপ বলে, তা হলে তার কথা আমলে নেয়া হবে না। কেননা কোন ধর্মেই তো এ কাজগুলো বিধিসম্মত নয়। তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে।[৪৩]

৪. **সুস্থ হওয়া ঃ** সুস্থ হতে হবে। বেত্রাঘাতের দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি এমন কোন রোগে আক্রান্ত হয়, যে রোগ থেকে তার সুস্থ হবার আশা রয়েছে, তাহলে রোগাক্রান্ত অবস্থায় তার ওপর হদ্দ কায়িম করা উচিত নয়। তবে রোগ থেকে সুস্থ হবার আশা না থাকলে রোগাক্রান্ত অবস্থায় হদ্দ জারি করতে

---

৪২. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল আশরিবা), হা.নং: ২০০৯ ; আবূ দাউদ, (কিতাবুল আশরিবা), হা.নং: ৩৬৭৯ ও (কিতাবুল হুদূদ), হা,নং: ৪৪০২; সুনান আন্ নাসাঈ, (কিতাবুল আশরিবা), হা.নং: ৫৫৭৯; তিরমিযী, (কিতাবুল আশরিবা), হা.নং: ১৮৬২

৪৩. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৪, পৃ.৩১

হবে। প্রস্তরনিক্ষেপে হত্যার দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অসুস্থ অবস্থায় সাজা দেয়া যাবে।[৪৪]

৫. **স্বেচ্ছায় অপরাধে লিপ্ত হওয়া ঃ** স্বেচ্ছায় অপরাধে লিপ্ত হতে হবে। অতএব, কোন ব্যক্তি যদি কারো প্রবল চাপে ঠেকায় পড়ে কোন অপরাধে লিপ্ত হয়, তাহলেও তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه. - "আমার উম্মাত থেকে ভুল-ভ্রান্তি, বিস্মৃতি এবং যে কাজে তাদের জোরপূর্বক বাধ্য করা হবে, তা ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।"[৪৫]

৬. **আর্থ-সামাজিক পরিবেশ বিবেচনা করা ঃ** হদ্দের ফায়সালা দান কালে অপরাধীর আর্থ-সামাজিক পরিবেশকেও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। অর্থাৎ অপরাধের শাস্তি বিধানের সময় অপরাধী ঠিক কি অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে পড়ে গিয়ে অপরাধটা করেছিল বা করতে বাধ্য হয়েছিল- তা অবশ্যই মূল্যায়ন করা দরকার। হতে পারে, আর্থ-সামাজিক কঠিন পরিস্থিতি অপরাধীকে অপরাধ করতে বাধ্য করেছে। বর্ণিত রয়েছে, হযরত উমার (রা) দুর্ভিক্ষের সময় চোরের হাত কাটার বিধান মওকুফ করে দিয়েছিলেন।[৪৬] তার কারণ এই ছিল যে, দুর্ভিক্ষ ও প্রচণ্ড অভাব-অনটন কালে কে অভাবগ্রস্ততার দরুন, আর কে কোনরূপ প্রয়োজন ছাড়াই চুরির কাজ করেছে, তা নিরূপণ করা কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। এ রূপ সংশয়জনক অবস্থায় হাত কাটার নির্দেশ কার্যকর করা সম্ভব হতে পারে না।

৭. **অপরাধ সম্পন্ন করা ঃ** অপরাধ সম্পন্ন করলেই হদ্দ কার্যকর করা হবে। অপরাধের কাজ শুরু করার মুহূর্তে কেউ ধরা পড়লে হদ্দ জারি করা যাবে না। যেমন কেউ যদি ঘরের দরজা ভেঙ্গে বা সিঁদ কেটে ঘরে ঢুকবার পূর্ণ

---

৪৪. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ. ২৫৪
৪৫. ইবনু হাজর 'আসকালানী, *আদ-দিরায়াহ ফী তাখরীজি আহাদীছিল হিদায়াহ*, বৈরূত : দারুল মা'আরিফা, খ.১, পৃ. ১৭৫
৪৬. ইবনু কুদামা আল-মাকদিসী, *আল-কাফী ফী ফিকহি ইবনি হাম্বল*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, খ.৪, পৃ. ১৮১

ব্যবস্থা করার পর ঘরের লোকেরা টের পেয়ে যায় অথবা পাহারাদারের চোখে পড়েছে মনে করে চুরি করা থেকে ফিরে যায়, তাহলে তার ওপর হদ্দ জারি করা যাবে না। তবে সাধারণ দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে।[৪৭]

৮. **অপরাধ ইসলামী রাষ্ট্রে সংঘটিত হওয়া ঃ** অপরাধ ইসলামী রাষ্ট্রে সংঘটিত হতে হবে। অমুসলিম রাষ্ট্রে কোন মুসলিম হদ্দযোগ্য কোন অপরাধ করলেও সে জন্য হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। কারণ, ইসলামী শরী'আ আইনে হদ্দ কার্যকর করার একমাত্র বৈধ অধিকারী হলেন ইসলামী সরকার বা তার প্রতিনিধি। অমুসলিম রাষ্ট্রে যেহেতু ইসলামী সরকারই নেই, তাই সেখানে হদ্দ কায়েম করা যাবে না।[৪৮] তবে কোন অমুসলিম কিংবা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যদি মুসলিমদের জন্য পৃথক শরী'আ আইন ও আদালত কার্যকর থাকে, তা হলে মুসলিম কাযীগণই হদ্দযোগ্য অপরাধের জন্য হদ্দ কার্যকর করার যাবতীয় শর্ত বিবেচনায় এনে অপরাধীদের ওপর হদ্দ প্রয়োগ করতে পারবে।

একই সাথে হদ্দ ও সাধারণ দণ্ড (তা'যীর) প্রয়োগের বিধান ঃ

ইসলামী আইনের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী হদ্দের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধীকে একই সাথে তা'যীরের আওতায়ও শাস্তি দেয়া সমীচীন নয়। কিন্তু জনস্বার্থ ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে একই সাথে উভয় ধরনের শাস্তি দেয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে চারি মাযহাবের ইমামগণের মত রয়েছে।

হানাফীগণের দৃষ্টিতে, অবিবাহিত ব্যভিচারীকে যিনার নির্ধারিত শাস্তি (হদ্দ) বেত্রাঘাত প্রদানের অতিরিক্ত এক বছরের জন্য নির্বাসন দণ্ড প্রদান করা হলে তা তা'যীর হিসেবে গণ্য হবে। তাঁর মতানুযায়ী হদ্দের সাথে নির্বাসন দণ্ডও যুক্ত হতে পারে।[৪৯]

ইমাম মালিক (রহ)-এর মতে, মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত হদ্দ ও কিসাসের আওতাভুক্ত অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে একই সাথে হদ্দ ও তা'যীরের শাস্তি প্রদান

---

৪৭. আওদাহ্, আবদুল কাদের, *আত-তাশরী'উল জিনা'ঈ আল-ইসলামী*, বৈরূত : মু'আসসাতুর রিসালাহ্, ১৪০১হি., খ.১, পৃ.৩৫০-১

৪৮. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭,পৃ.৯২

৪৯. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭,পৃ.৩৯; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৪,পৃ. ১৩৬

করা যায়।[৫০] ইমাম শাফি'ঈ (রহ)-এর মতেও উভয় ধরনের শাস্তি একত্রে প্রদান করা যেতে পারে। মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামগণের মতে, যখমকারী থেকে কিসাস গ্রহণ করার পর তা'যীর হিসেবে যদি অন্য কোন সাধারণ দণ্ড দেয়া হয়, তাতে কোন অসুবিধা নেই। মালিকী ইমামগণ আরো বলেন, নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা যদি হত্যাকারীর কিসাস মাফ করে দেয় কিংবা যে ক্ষেত্রে আইনত হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা যায় না (যেমন পিতা পুত্রকে হত্যা করলে হত্যাকারী পিতাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে না), সে সব অবস্থায় হত্যাকারীকে অবশ্যই রক্তপণ দিতে হবে। অধিকন্তু তাকে তা'যীর হিসেবে একশটি বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এক বছর বন্দী করে রাখতে হবে। ইমাম শাফি'ঈ (রহ)-এর মতে, মদ্যপানের শাস্তি চল্লিশ বেত্রাঘাত, এর অতিরিক্ত বেত্রাঘাত করা হলে তা তা'যীর হিসেবে গণ্য হবে।[৫১]

অপরাধের পুনরাবৃত্তিতে হদ্দের কার্যকারিতা ঃ

কেউ যদি একটা অপরাধ (যেমন যিনা বা ব্যভিচারের অপবাদ বা মদ্যপান বা চুরি) বারংবার করল, এমতাবস্থায় তার জন্য এক জাতীয় সব অপরাধের জন্য একটি মাত্র হদ্দ কার্যকর করা যাবে। কেননা যে সব শাস্তিতে আল্লাহর হকের প্রাবল্য রয়েছে, তাতে হদ্দের উদ্দেশ্য হল দুনিয়াকে বিপর্যয় থেকে মুক্ত করা এবং ভবিষ্যতে অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিকে অপরাধ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। আর এ উদ্দেশ্য একটি মাত্র হদ্দ প্রয়োগ দ্বারা অর্জিত হতে পারে। তাই একটি অপরাধ বারংবার করলেও সবগুলোর জন্য একটি হদ্দই যথেষ্ট হবে। তবে একটা অপরাধের শাস্তির হবার পর ফিরে যদি আবার সে একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে দ্বিতীয়বারের অপরাধের জন্য নতুনভাবে হদ্দ প্রয়োগ করতে হবে।[৫২]

এক সাথে কয়েকটি অপরাধের শাস্তি ঃ

কেউ যদি এক সাথে যিনাও করল, অপরকে যিনার অপবাদও দিল, চুরিও করল

---

৫০. আল-হত্তাব, *মাওয়াহিবুল জলীল*, দারুল ফিকর, খ.৬,পৃ. ২৪৭, ২৬৮; *শারহুদ দুরায়দীর*, খ.৪, পৃ.২২৪

৫১. আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, দারুল কিতাবিল ইসলামী, খ.৪,পৃ. ১৬২; আর-রামলী, শামসুদ্দীন, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, দারুল ফিকর, খ.৮,পৃ. ১৮

৫২. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১০১

এবং মদও সেবন করল, এমতাবস্থায় তাকে প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য পৃথক পৃথক হদ্দ প্রয়োগ করতে হবে। কেননা প্রত্যেক অপরাধের শাস্তির পেছনে শরী'আতের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন যিনার হদ্দের উদ্দেশ্য হল বংশের পবিত্রতা রক্ষা করা, অপবাদের হদ্দের উদ্দেশ্য হল মানুষের মান-মর্যাদা রক্ষা করা আর মদ্যপানের শাস্তির উদ্দেশ্য হল বিবেকের সুস্থতা রক্ষা করা, চুরির হদ্দের উদ্দেশ্য সমাজের সম্পদ রক্ষা করা। তদুপরি কোন কোন অপরাধের শাস্তির প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন।[৫৩] সুতরাং কোন একটি অপরাধের হদ্দ কায়িম করা হলে অপর অপরাধের শাস্তির উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না।[৫৪]

উল্লেখ্য যে, কারো ওপর একটা অপরাধের শাস্তি আংশিকভাবে কার্যকর করা হয়েছে, এমতাবস্থায় সে যদি পুনরায় ভিন্ন জায়গায় আবার সে অপরাধে লিপ্ত হয়, তাহলে তার ওপর দ্বিতীয় অপরাধের জন্য নতুনভাবে হদ্দ কার্যকর করা হবে। যেমন কোন ব্যভিচারী কিংবা মদ্যপায়ীকে আংশিকভাবে হদ্দ কার্যকর করার পর পালিয়ে গিয়ে সে যদি আবার ব্যভিচারে লিপ্ত হয় কিংবা মদ পান করে, তাহলে দ্বিতীয়বারের অপরাধের জন্য তাকে নতুনভাবে হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু অপবাদের হদ্দ কার্যকর করার সময় যদি সে অপর কাউকে অপবাদ দেয় এবং তার শাস্তি থেকে এক ঘা ছাড়া সবকটি বেত্রাঘাত করা হয়, তাহলে তার প্রথম অপবাদের শাস্তিই পূর্ণ করা হবে। দ্বিতীয় অপবাদের জন্য নতুন কোন হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না।[৫৫]

শাস্তি দেয়ার বৈধ অধিকারী কে ?

হদ্দ কার্যকর করার জন্য একমাত্র দায়িত্বশীল হচ্ছেন সরকার প্রধান। তবে সরকার প্রধানের পক্ষে যেহেতু সব সময় সর্বত্র ব্যক্তিগতভাবে ও নিজ হাতে এ কাজ সম্পন করা সম্ভব নয়; তাই তিনি তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে এ কাজ আঞ্জাম দেবেন।[৫৬] সরকারপ্রধান কিংবা তাঁর প্রতিনিধি ছাড়া কারো হদ্দ কার্যকর করার

---

৫৩. মালিকীগণের মতে, যেহেতু অপবাদ ও মদ্যপানের শাস্তির পরিমাণ একই, তাই কেউ এ দুটি অপরাধে এক সাথে লিপ্ত হলে তার জন্য একটি হদ্দই যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ যদি একটির শাস্তি দেয়া হয়, অন্যটির শাস্তি দেয়া লাগবে না।

৫৪. আল-বাবরতী, মুহাম্মাদ, *আল-'ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ*, দারুল ফিকর, খ.৫, পৃ. ৩৪১-২; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪,পৃ.৫২

৫৫. এটা হানাফীগণের অভিমত (ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪,পৃ.৫২)

৫৬. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৯, পৃ. ৮৭

অধিকার নেই। বর্তমানে প্রশাসন ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবেই এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কেউ যদি সরকার প্রধানের অনুমতি ছাড়াই কারো ওপর হদ্দ কায়িম করে, তাকে তার এ উদ্ধত আচরণের জন্য দণ্ডিত করা যাবে।[৫৭] কিসাসের বিধানও হদ্দের অনুরূপ।

তবে সাধারণ শাস্তি (তা'যীরাত)সমূহের কোন কোনটি সরকার প্রধানের অনুমতি ছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান, সমাজপতি এবং আলিমগণও কার্যকর করতে পারেন। যেমন শিক্ষকগণ ছাত্রদেরকে পড়ালেখায় অবহেলা এবং অশিষ্ট আচরণের জন্য শাস্তি দিতে পারবেন। অনুরূপভাবে প্রাতিষ্ঠানিক প্রধানগণ তাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অশুভ আচরণের জন্য শাস্তিমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

বিলম্বে শাস্তি প্রয়োগ করার বিধান ঃ

অপরাধ প্রমাণিত হবার পর বিলম্ব না করেই দ্রুত শাস্তি কার্যকর করাই হচ্ছে মূল বিধান। তবে কিছু কিছু কারণে অপরাধীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে দেরীতেই শাস্তি কার্যকর করাই হল উত্তম। আবার কখনো তা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। ইসলামী শাস্তি আইনে এটা দয়াশীলতার এক উজ্জ্বল নির্দশন। এ কারণগুলো হলো ঃ

১. প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বা গরম

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বা গরমের মধ্যে বেত্রাঘাত জাতীয় হদ্দসমূহ দেরিতে কার্যকর করা ওয়াজিব। কেননা এ অবস্থায় হদ্দ কায়িম করা হলে তাদের প্রাণ নাশের আশঙ্কা থাকে।[৫৮]

২. রোগ-ব্যাধি

রুগ্ন ব্যক্তির রোগ থেকে সুস্থ হবার আশা থাকলে তাকে রোগাবস্থায় বেত্রাঘাতের হদ জারি করা যাবে না; বরং সুস্থ হবার পরেই হদ্দ কার্যকর করা যাবে। তবে রোগ থেকে সুস্থ হবার আশা না থাকলে দেরি না করেই হদ্দ কার্যকর করতে হবে।[৫৯]

---

৫৭. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা*, খ.৪, পৃ. ১৪৬

৫৮. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৯, পৃ. ১৮৪; আল-হাদ্দাদী, আবূ বকর, *আল-জাওহারাতুন নাইয়িরাহ*, খ.২, পৃ.১৭০

৫৯. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৯, পৃ. ১০১

৩. গর্ভধারণ ও নিফাস (প্রসবজনিত রক্তস্রাব)

নিফাস ক্ষরণের সময় বেত্রাঘাতের হদ্দ জারি করা যাবেনা। তদ্রূপ গর্ভবতী মহিলাকেও সন্তান প্রসব এবং নিফাস থেকে পবিত্র হবার আগে বেত্রাঘাতের হদ্দ জারি করা যাবে না। সন্তান প্রসবের পর নিফাস বন্ধ হয়ে গেলে সাথে সাথে হদ্দ কার্যকর করা যাবে, যদি মহিলা শক্তিশালী হয় এবং হদ্দ প্রয়োগে তার জীবন নাশের কোন আশঙ্কা না থাকে। যদি নিফাস বন্ধ হবার পর মহিলা এতোই দুর্বল ও ক্ষীণা হয় যে, যদি হদ্দ কার্যকর করা হয় তাহলে তার জীবন নাশের আশঙ্কা থাকে, এরূপ অবস্থায় নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে পরিপূর্ণ শক্তিশালী হবার পরেই হদ্দ কার্যকর করা যাবে।[৬০]

তবে প্রস্তর নিক্ষেপ পর্যায়ের হদ্দ জারী করার ক্ষেত্রে একমাত্র গর্ভবতী মহিলা ছাড়া কারো জন্য দেরি করার সুযোগ নেই। গর্ভবতী মহিলা হলে সন্তান প্রসবের পর পরই প্রস্তর নিক্ষেপের হদ্দ জারী করা যাবে।[৬১] তবে সন্তানকে দুগ্ধ পান করানোর মত কাউকে পাওয়া না গেলে অথবা কেউ তাকে দুগ্ধ পান করানোর দায়িত্ব গ্রহণ না করলে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত শাস্তি বিলম্বিত করতে হবে।[৬২] গর্ভবতী মহিলার ক্ষেত্রে কিসাস ও ধর্মত্যাগের হদ্দের বিধানও অনুরূপ।

৪. অভিভাবকদের অনুপস্থিতি/ অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়া

কিসাসের ক্ষেত্রে অভিভাবকরা যদি উপস্থিত থাকে, তা হলে দেরী করার সুযোগ নেই। তবে অভিভাবকরা যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয় কিংবা অনুপস্থিত থাকে, তাহলেই ছোটরা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত এবং অনুপস্থিতরা হাজির হওয়া পর্যন্ত কিসাসের বিধানকে বিলম্বে কার্যকর করা যাবে।[৬৩]

৫. ধর্মত্যাগ

ধর্মত্যাগীদেরকে তাওবার জন্য তিন দিনের সুযোগ দান করা বিধিসম্মত।[৬৪] এ

---

৬০. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৯, পৃ. ৭৪; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন,* খ.৩, পৃ.১৭৫; আল-বাবরতী, *আল-'ইনায়াহ,* খ.৫,পৃ.২৪৫

৬১. কারো কারো মতে, বাচ্চাকে শালদুধ পান করানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

৬২. বর্ণিত রয়েছে যে, গামিদ গোত্রের জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে চারবার যিনার স্বীকারোক্তি করলে তিনি তাকে রজমের নির্দেশ দেন; কিন্তু গর্ভ খালাস ও সন্তানের দুধপানকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি কার্যকর করা স্থগিত রাখেন। (সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ১৬৯৫)

৬৩. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা,* খ.১৬,পৃ.২৯৫-৬

৬৪. কারো মতে, এটা ওয়াজিব। কারো মতে, মুস্তাহাব। (আল-জাস্সাস, *আহকামুল কুর'আন,* দারুল ফিকর, খ.২, পৃ.৪০২-৩)

সময়ে তাকে বন্দী করে রাখা হবে। যদি সে তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসে, তা হলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে।[৬৫]

৬. নেশা

নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিও মূলত পাগলের মতোই। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর হদ্দের কার্যকারিতা নেশা থেকে মুক্ত হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করতে হয়। যাতে হদ্দের যে উদ্দেশ্য তা পরিপূর্ণ রূপে অর্জিত হয়। প্রচণ্ড নেশাবস্থায় কিংবা হুঁশ না থাকলে শাস্তির যন্ত্রণা অনেক সময় লঘু মনে হতে পারে। তাই অনেকেই বলেছেন, জ্ঞান ফিরে পাবার আগে যদি নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাজা দেয়া হয়, তা হলে জ্ঞান ফিরে পাবার পর পুনরায় তাকে সাজা দিতে হবে।[৬৬]

৬৫. আল-জাস্‌সাস, *আহকামুল কুর'আন*, খ.২, পৃ.৪০২-৩; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭,পৃ.১৩৫
৬৬. আল-কাসানী, *বদা'ই*,খ.৫, পৃ.১১২

[ক] হুদূদের বিবরণ

ইসলাম বড় বড় কয়েকটি অপরাধের জন্য হদ্দের বিধান ফরয করে দিয়েছে। এগুলো হল ঃ চুরি, ডাকাতি ও সন্ত্রাস, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ - এ চারটির শাস্তির পরিমাণ কুর'আনে বর্ণিত রয়েছে। পঞ্চম মদ্যপান, এর শাস্তি হাদীস ও সাহাবা কিরামের ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত। অনেকের মতে, ধর্মান্তর এবং রাষ্ট্র বা সরকারদ্রোহিতার শাস্তিও হদ্দের শামিল। এগুলোর শাস্তিও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। নিম্নে এ হদ্দগুলোর সম্পর্কে বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হলো ঃ

১. চৌর্যবৃত্তির শাস্তি

ধন-সম্পদ মানব জীবনের অস্তিত্বের রক্ষাকবচ। মানব দেহের জন্য যেমন রক্তের প্রয়োজন, মানব জীবনের জন্য অর্থ-সম্পদও ঠিক ততোখানি গুরুত্বপূর্ণ। মানব জীবনের চাঞ্চল্য ও চাকচিক্য বলতে গেলে ধন-সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। ইসলাম এ ধন-সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় ভোগের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান পেশ করেছে। হালাল পথে উপার্জিত ধন-সম্পদকে হালাল ঘোষণা করেছে আর অন্যায় পথে অর্জিত ধন-সম্পদকে সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে এবং এর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কঠোর শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে।

নিতান্ত প্রয়োজন মেটানোর কোন ব্যবস্থাই না থাকলে মানুষ একান্ত ঠেকায় পড়ে হয়ত চুরি করতে পারে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রত্যেকটি নাগরিকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার এমন সুন্দর ব্যবস্থা করে থাকে, যাতে কেউ না খেয়ে বা অভাব-অনটনে কষ্ট পেতে পারে না। এ কারণেই ইসলামী রাষ্ট্রে কারো চুরি করার প্রয়োজন পড়ে না। এ রূপ সুব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কেবল সে লোকই চুরি করতে পারে, যে অন্যায়ভাবে অধিক সম্পদ অর্জন করার অভিলাষী কিংবা যে অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা বা বেহিসাব অর্থ ব্যয় করতে অভিপ্রায়ী। তাই সুস্থ সমাজ বিনির্মাণের পক্ষে এ ধরনের চুরি খুবই মারাত্মক ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। এ কারণে ইসলাম চুরিকে নিষিদ্ধ করেছে, চুরির যাবতীয় পথ ও উপলক্ষকে সর্বাত্মকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে।

চুরির সংজ্ঞা ঃ

চুরি বলতে সাধারণত অপরের মাল গোপনে করায়ত্ত করাকে বোঝানো হয়।[১]

---

১. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১৩৩

শরী'আতের পরিভাষায় কোন মুকাল্লাফ (বালিগ ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি) কর্তৃক অপরের মালিকানা বা দখলভুক্ত নিসাব পরিমাণ বা তার সমমূল্যের সম্পদ সংরক্ষিত স্থান থেকে গোপনে করায়ত্ত করাকে 'চুরি' বলে।[২]

চুরির মৌলিক উপাদান ঃ

চুরির চারটি মৌলিক উপাদান রয়েছে। এগুলো হল ঃ চোর, মালের মালিক অর্থাৎ যার সম্পদ চুরি করা হয়েছে, চুরিকৃত সম্পদ ও গোপনে সম্পদ হস্তগত করা। এ উপাদানসমূহের প্রত্যেকটির সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় শর্ত রয়েছে, যেগুলো পাওয়া গেলেই হদ্দের বিধান প্রযোজ্য হবে।

চোরের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী ঃ

চুরির শাস্তি হিসেবে হাত কাটতে হলে চোরের মধ্যে আটটি শর্ত পাওয়া যেতে হবে। এ শর্তগুলো হল ঃ

১. মুকাল্লাফ (প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ বিবেক সম্পন্ন) হওয়া

চোরকে বালিগ অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা চুরি করলে তাদের ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। অনুরূপভাবে চোরকে সুস্থ বিবেকসম্পন্নও হতে হবে। কোন পাগল চুরি করলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না, যদি সে পুরো পাগল হয় । যদি সে মাঝে মাঝে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, তা হলে এরূপ অবস্থায় চুরি করলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে।[৩] অনুরূভাবে মানসিক বিকারগ্রস্ত এবং মতিভ্রম ব্যক্তিদের ওপরও হদ্দ কার্যকর করা হবে না, যদি তারা ঐ অবস্থায় চুরি করে।[৪] তবে কোন মাতাল ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে যে কোন মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে মাতাল অবস্থায় চুরি করলে এর জন্য সে হদ্দযোগ্য হবে। কারণ সে নিজেই তার মতি বা বোধশক্তি নষ্ট করেছে এবং তা এমন জিনিস দ্বারা করেছে যা গ্রহণ করা স্বয়ং একটি দণ্ডযোগ্য অপরাধ। এরূপ অবস্থায় শাস্তি থেকে রেহাই দেয়া হলে দুষ্কৃতিকারীরা মদ্যপান করে অপরাধ করতে দুঃসাহসী হবে।[৫]

---

২. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ. ৩৫৫; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা*, খ.২৪, পৃ.২৯৩ (আরবী ভাষ্য হল : السرقة هي أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا ' ملكا للغير ' أو ما قيمته ' لا شبهة فيه ' على وجه الخفية.)

৩. মালিক, ইমাম, *আল-মুদাওয়ানাহ*, দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, খ.৪, পৃ. ৫৩৪; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৬৭

৪. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, رفع القلم عن ... عن المعتوه حتى يصح / يعقل .. - "তিন শ্রেণীর মানুষকে (শাস্তি থেকে) অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।...মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত..।" (আল হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ৮১৭০, ৮১৭১)

৫. আওদাহ, *আত-তাশরী'উল জিনা'ঈ*..., খ.১, পৃ.৫৮৩

২. মুসলিম বা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক হওয়া

চুরির শাস্তি কার্যকর করার জন্য চোরকে মুসলিম বা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক হতে হবে। অমুসলিম রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম নিরাপত্তা চুক্তির ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করে যদি কোন মুসলিম কিংবা অমুসলিম নাগরিকের কোন মাল চুরি করে, তা হলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে কি না- তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মালিকী ও হাম্বলী স্কুলের ইমামগণ এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ) প্রমুখের মতে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করতে হবে। কেননা নিরাপত্তা চুক্তির ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, সে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান স্বীকার করে নিয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) প্রমুখের মতে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। কেননা সে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধানের বাধ্যগত অনুবর্তী নয়। তাঁদের মতে, সে চুরিকৃত সম্পদের জন্য দায়ী থাকবে।[৬]

৩. চুরির উদ্দেশ্য মাল হস্তগত করা

হস্তগতকৃত মাল অন্যায়ভাবে দখল বা মালিকানাভুক্ত করে নেওয়ার অভিপ্রায় থাকতে হবে। কোন মাল হস্তগত করা চুরি কি না তা হস্তগতকারীর নিয়াতের ওপর নির্ভর করে। যেখানে অন্যায়ভাবে গ্রহণের নিয়াত থাকে না, সেখানে তা চুরি বলে গণ্য হবে না। যেমন কেউ যদি কারো কোন মাল ব্যবহার করে পরে ফিরিয়ে দেবে -এ উদ্দেশ্যে হস্তগত করল কিংবা হাস্যচ্ছলে হস্তগত করল অথবা মালিককে কেবল অবহিত করার উদ্দেশ্যে বা এই মনে করে হস্তগত করল যে, মালিক নাখোশ হবে না, তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না, যদি তার কথার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়।[৭]

৪. অপরের মাল জেনে শুনে হস্তগত করা

অপরের মাল জেনে-শুনে তার কোন রূপ অবগতি কিংবা সম্মতি ছাড়া হস্তগত করলেই তা চুরি হিসেবে ধর্তব্য হবে। তাই কেউ যদি কোন মালকে মুবাহ (বৈধ) বা পরিত্যক্ত মনে করে হস্তগত করে, তা হলে তার ওপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[৮]

৫. স্বেচ্ছায় ও প্রলোভনবশত চুরি করা

কোন চোর যদি একেবারে অনন্যোপায় হয়ে চুরি করতে বাধ্য হয় যেমন

---

৬. আস-সারাখ্সী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.১৭৮; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা*, খ.২৪, পৃ.২৯৬

৭. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা*, খ.২৪, পৃ.২৯৮

৮. *তদেব*

দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার তাড়নায় চুরি করল, তার ওপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لا قطع في مجاعة مضطر. - "ক্ষুধায় বাধ্য হয়ে চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।"[৯] ইমামগণের সর্বসম্মত হল, দুর্ভিক্ষের সময়ের চুরির অপরাধের কারণে হাত কাটা যাবে না।[১০] অনুরূপভাবে কারো একান্ত চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে চুরি করলেও হদ্দ কার্যকর করা হবে না, যদি কোন ধরনের চাপ প্রয়োগ প্রমাণিত হয়।[১১]

৬. চোর ও মালিক পরস্পর রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় না হওয়া

চোর ও মালিক যদি পরস্পর রক্ত সম্পর্কীয় ঊর্ধ্ব বা অধঃস্তন জাতীয় আত্মীয় হয় (যেমন- পিতামাতা ও পুত্রকন্যা এবং তাদের ঊর্ধ্ব ও অধঃস্তন পুরুষগণ), তা হলেও চোরের ওপর হদ্দ কার্যকর হবে না। উপর্যুক্ত আত্মীয়-স্বজন ছাড়া অপরাপর আত্মীয়-স্বজন (যেমন ভাইবোন, চাচা-চাচী, ফুফা-ফুফী, মামা-মামী, খালা-খালু বা তাদের ছেলেমেয়ে, দুধ মা ও ভাইবোন, সৎ পিতামাতা, শ্বাশুড়-শ্বাশুড়ি ও স্ত্রীর অপর ঘরের ছেলেমেয়ে প্রভৃতি) একে অপরের মাল চুরি করলে অধিকাংশ ইমামের মতে হাত কাটা হবে। তবে হানাফীগণের মতে, রক্তসম্পর্কীয় মুহরাম আত্মীয়-স্বজনরা (যেমন ভাইবোন, চাচা, মামা, ফুফী, খালা প্রভৃতি) একে অপর থেকে চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। তাঁদের বক্তব্য হল- তারা প্রায়শ একে অপরের কাছে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে। এর ফলে তাদের চুরির ক্ষেত্রে একটি সন্দেহ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। অধিকন্তু চুরির কারণে তাদের হাত কাটা হলে তাতে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্কও নষ্ট হয়ে যাবে। তবে রক্তসম্পর্কীয় অমুহরাম আত্মীয়-স্বজনরা (যেমন- চাচাতো ভাইবোন, ফুফাতো ভাইবোন, মামাতো ভাইবোন প্রভৃতি) একে অপর থেকে চুরি করলে হাত কাটা যাবে। কেননা তাদের সচরাচর একে অপরের কাছে বিনা অনুমতি প্রবেশ করার রেওয়াজ ও বিধান নেই। রক্তসম্পর্কীয় নয় এমন মুহরাম আত্মীয়স্বজন (যেমন- দুধ মা ও বোন) একে অপরের মাল চুরি করলে হাত কাটা হবে কি না- তা নিয়ে হানাফীগণের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) প্রমুখের মতে, হাত কাটতে হবে। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ)-এর মতে দুধ মা থেকে চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।[১২]

---

৯. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.১৪০; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.৫৮

১০. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ,৯, পৃ.১৪০-১

১১. হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯,পৃ.১৫০; 'উলায়স, মুহাম্মদ, *মিনহুল জলীল*, দারুল ফিকর, খ.৯,পৃ.৩২৯

১২. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ. ৯৭; আল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাহ...*, খ.২,পৃ. ১৬৭; শাফি'ঈ, ইমাম, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ.১৬৩; হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯,পৃ.২১০

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের মাল চুরি করলেও হদ্দ কার্যকর হবে না, যদি তারা এক সাথে থাকে। যদি তারা এক সাথে না থাকে কিংবা একসাথে থাকলেও তারা নিজেদের মাল যদি একে অপর থেকে দূরে সরিয়ে নিজেদের একান্ত হিফাযতে রাখে, তাহলেও অধিকাংশ ইমামের মতে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তবে কারো কারো মতে, এমতাবস্থায় হদ্দ কার্যকর করতে হবে। এটা মালিকী স্কুলের ইমামগণের অভিমত এবং শাফি'ঈগণের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য অভিমত।[১৩]

৭. হস্তগত মালের মধ্যে চোরের কোনরূপ মালিকানা বা অধিকার না থাকা

চোর যদি চুরিকৃত মালের অংশীদার হয় এবং তার নিজের অংশ বাদ দেবার পর চুরিকৃত অবশিষ্ট মালের মূল্য নিসাব পরিমাণ হয়, তা হলেও অপরাধীর ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না; বরং তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া হবে।[১৪]

ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতার মাল থেকে চুরি করে এবং চুরিকৃত মাল থেকে প্রাপ্তব্য পরিমাণ বাদ দেয়ার পর 'নিসাব' পরিমাণ অবশিষ্ট না থাকে, তা হলেও হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[১৫]

অনুরূপভাবে কোন আমানতদাতা যদি আমানতগ্রহীতা থেকে তার অনুমতি ছাড়া গচ্ছিত মালটি চুরি করে, তা হলেও হদ্দ কার্যকর করা হবে না।[১৬]

---

১৩. মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ. ৫৩৫; শাফি'ঈ, ইমাম, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ.১৬৩; আল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাহ...*, খ.২,পৃ. ১৬৮

১৪. হানাফী ও শাফি'ঈ ইমামগণের মতে, চোর চুরিকৃত মালের অংশীদার হলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। (ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ.৩৭৭; আল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাহ...*, খ.২,পৃ. ১৬৮; যাকারিয়া আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪,পৃ.১৪০-১; রামালী, নিহায়াতুল মুহতাজ, খ,৭, পৃ. ৪৪৫) তবে মালিকীগণের মতে, দুটি শর্তে তার হাত কাটা যাবে না। শর্তদুটি হল ঃ ক. চুরিকৃত মালটি যদি তার অপর অংশীদার থেকে চুরি করে। যদি মাল অংশীদার ছাড়া বাইরের কারো দায়িত্বে সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে, তা হলে হাত কাটতে হবে। খ. তার অংশটি তার শরীকদারের অংশের চাইতে বেশি হতে হবে। (আল-খারশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, খ.৮,পৃ.৯৭)

১৫. হানাফী ইমামগণের মতে চুরিকৃত মাল যদি তার পাওনার আন্দাজ মত টাকাকড়ি হয়, তবে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। কেননা ঋণগ্রহীতা থেকে টাকাকড়ি গ্রহণের অধিকার তো তার রয়েছে। তবে চুরিকৃত মাল যদি টাকাকড়ি না হয়ে আসবাব পত্র হয়, তাহলে হদ্দ কার্যকর করতে হবে। যেহেতু আসবাবপত্রের মূল্যের মধ্যে তফাৎ হয়ে থাকে, তাই বিনিময় নেয়ার ক্ষেত্রে দুজনেরই পারস্পরিক সম্মতি থাকা আবশ্যক। তবে সে যদি দাবী করে যে, সে তা বন্ধক হিসেবে তার পাওনার আন্দাজ মত নিয়েছে, তাহলে হাত কাটা যাবে না। (আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ,৯,পৃ.১৭৮; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ,৫,পৃ. ৩৭৭; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন..*, খ.৩, পৃ. ২১৮)

১৬. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ,৭,পৃ.৮০

যদি কেউ বায়তুল মাল বা গনীমতের মাল থেকে চুরি করে, তবে তার ওপরও হদ্দ প্রযোজ্য হবে না।[১৭] অনুরূপভাবে ওয়াক্ফকৃত মাল থেকে যদি কেউ চুরি করে, তাহলেও তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[১৮]

৮. চুরির নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা

অধিকাংশ ইমামের নিকট চুরি প্রমাণিত হলে চোরের হাত কাটা হবে, চুরির নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক- তাতে কোন পার্থক্য হবে না।[১৯] পক্ষান্তরে শাফি'ঈগণের মতে চুরিকর্মের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে চোরের জ্ঞান থাকতে হবে। সুতরাং তাঁদের মতে, যার চুরির নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান নেই- এ ধরনের কেউ চুরি করলে তার জন্য তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। হযরত 'উমার (রা) ও 'উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, لا حد إلا من علمه. - "হদ্দের শাস্তি বর্তাবে না তবে যারা তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অবহিত কেবল তাদের ওপর।" তবে কেউ যদি জানে যে চুরি নিষিদ্ধ, তা হলে এর নির্ধারিত শাস্তি সম্পর্কে তার জ্ঞান না থাকলেও তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে। এ ক্ষেত্রে তার জ্ঞান না থাকা হদ্দ রহিতকরণের কারণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।[২০]

মালের মালিকের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী ঃ

চুরির দ্বিতীয় মৌলিক উপাদান হল চুরিকৃত মালের মালিক বিদ্যমান থাকতে হবে। যদি চুরিকৃত মাল কারো মালিকানাধীন না হয় (যেমন তা যদি সকলের

---

১৭. এটা হানাফী ও হাম্বলীগণের অভিমত। তাঁদের বক্তব্য হল ঃ যেহেতু বায়তুল মালে প্রত্যেক মুসলমানের অধিকার রয়েছে, তাই বায়তুল মাল থেকে কেউ কিছু চুরি করলে হদ্দযোগ্য হবে না। তবে মালিকীগণের মতে, সে হদ্দযোগ্য হবে। (ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ.৩৭৭; আল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাহ...*, খ.২,পৃ. ১৬৮; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ. ১০, খ.২৭৯; রুহায়বানী, *মাতালিবু উলিন নুহা*, খ. ৬,পৃ.২৪৩)

১৮. কেননা তা যদি সর্বসাধারণ্যের কল্যাণের জন্য ওয়াকফকৃত হয়, তাহলে তার হুকম বায়তুল মালের মতোই। আর যদি তা বিশেষ কোন কাওমের জন্যও ওয়াকফকৃত হয়, চাই চোর ওয়াকফকৃত কাওমের মধ্যে শামিল থাকুক আর না থাকুক, তাহলেও হদ্দ কার্যকর হবে না। কেননা তার সুনির্দিষ্ট কোন মালিক নেই। এটা হানাফীগণের অভিমত। তবে তাঁদের কারো কারো মতে, চোর যদি ওয়াক্ফকৃত কাওমের অন্তর্ভুক্ত না হয়, তা হলে মুতাওয়াল্লীর দাবীর প্রেক্ষিতে তার হাত কাটতে হবে। এটা শাফি'ঈগণেরও অভিমত। তবে মালিকীগণের মতে, ওয়াক্ফকৃত মাল চুরি করলে যে কোন অবস্থায় চোরের হাত কাটতে হবে। (ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.৬০-১)

১৯. নববী, *আল-মাজমু'*, খ.৭, পৃ.৩৬২; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা*, খ.২৪, পৃ.২৯৭

২০. হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯,পৃ.১৫০; রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ.৭,পৃ. ৪৬২; আল-বহুতী,*কাশফুল কিনা'*, খ.৬, পৃ. ১৩০

ব্যবহার জন্য উন্মুক্ত হয় কিংবা পরিত্যক্ত হয়), তা হলে এ রূপ মাল হস্তগত করার কারণে হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। হদ্দযোগ্য চুরি প্রমাণের জন্য ইমামগণ মালের মালিকের জন্য প্রযোজ্য কয়েকটি শর্ত আরোপ করেছেন। এ শর্তগুলো হল ঃ

১. মালের মালিক জানা থাকতে হবে

চুরির হদ্দ কার্যকর করার জন্য চুরিকৃত মালের মালিক জানা থাকতে হবে। যদি চুরি প্রমাণিত হল; কিন্তু মালিক কে- তা জানা যাচ্ছে না বা তার কোন সন্ধান নেই, এরূপ অবস্থায় হদ্দ কার্যকর হবে না। কেননা হদ্দ কার্যকর করতে হলে মালিক বা হকদারের পক্ষ থেকে দাবী থাকা চাই। আর এ ক্ষেত্রে যেহেতু মালিকের কোন খবরই নেই, তাই চুরিকৃত মালের জন্য কোন দাবীই প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তবে চোরকে কারাগারে বন্দী করে রাখা যাবে, যে যাবত না মালিক উপস্থিত হয়ে দাবী পেশ করবে। এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে মালিকীগণের মতে, চুরি প্রমাণিত হলেই হদ্দ কার্যকর করতে হবে। চাই মালিক জানা থাক বা না থাক। তাঁদের দৃষ্টিতে হদ্দ কার্যকর করার জন্য মালিকের দাবী থাকা শর্ত নয়।[২১]

২. মালের যথাযথ মালিক বা অধিকারী হতে হবে

যার থেকে মাল চুরি করা হয়েছে তাকে চুরিকৃত মালের যথাযথ মালিক অথবা যে কোন রীতিসিদ্ধ উপায়ে[২২] মালের বৈধ অধিকারী হতে হবে। যদি কেউ কোন অপহরণকারীর অপহৃত বস্তু কিংবা অন্য চোরের চুরিকৃত বস্তু চুরি করে, তাহলে তার ওপরও হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[২৩]

---

২১. মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ. ৫৩১; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭,পৃ.২৯৭

২২. যেমন আমানত, মুদারবাহ, কিফালাহ, ওয়াকালাহ, জামানত, ইরতিহান, ইজারা ও এ'আরা প্রভৃতি।

২৩. তবে এ বিষয়ে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। হানাফী ইমামগণের মতে অপহরণকারী থেকে কেউ তার অপহৃত বস্তু চুরি করলে, তবেই হদ্দ কার্যকর হবে। কিন্তু অন্য চোরের চুরিকৃত বস্তু চুরিতে দ্বিতীয় চোরের ওপর হদ্দ বর্তাবে না। তাঁদের বক্তব্য হল, অপহরণকারীকে যেহেতু অপহৃত মাল কিংবা তার মূল্য মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে, তাই অপহরণের ক্ষেত্রে মালের ওপর তার হস্তগতকরণকে একজন জামিনের হস্তগতকরণ হিসেবে ধর্তব্য হবে। আর জামিন হিসেবে মালের হস্তগতকরণ একটি রীতিসিদ্ধ ব্যাপার। পক্ষান্তরে চোর যেহেতু চুরিকৃত মালের আমানতদারও নয়, জামিনও নয়, তাই চুরিকৃত মালের ওপর তার কোনরূপ হস্ত গতকরণের ন্যায্য অধিকার আছে বলে ধর্তব্য হবে না। মালিকীগণের মতে, অপহরণকারী থেকে চুরি করুক কিংবা অন্য চোর থেকে চুরি করুক- উভয় অবস্থায় চোরের ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে। কেননা সে সুরক্ষিত স্থান থেকে মাল হস্তগত করেছে। উপরন্তু, চুরি কিংবা

৩. মুসলিম কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক হতে হবে

মালের মালিক মুসলিম কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক হলে তবেই চোরের হাত কাটা হবে। অমুসলিম রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম নাগরিক ইসলামী রাষ্ট্রে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করল- এমতাবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের কোন মুসলিম বা অমুসলিম নাগরিক তার মাল চুরি করলে তাতে হদ্দ কার্যকর হবে না। তবে অমুসলিম রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম নাগরিক ইসলামী রাষ্ট্রে বৈধ উপায়ে প্রবেশ করল- এমতাবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের কোন মুসলিম বা অমুসলিম নাগরিক তার মাল চুরি করলে তাতে হদ্দ কার্যকর হবে কি না- তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফী ও শাফি'ঈ স্কুলের ইমামগণের মতে, হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। তবে তা'যীরের আওতায় সাধারণ শাস্তি দেয়া হবে। আর মালিকী ও হাম্বলী স্কুলের ইমামগণের মতে, হদ্দ প্রযোজ্য হবে।[২৪]

চুরিকৃত মালের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী ঃ

চুরির তৃতীয় মৌলিক উপাদান হল চুরিকৃত মাল। এর সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় শর্ত রয়েছে। এগুলো পাওয়া গেলে চুরির হদ্দ কার্যকর করা যাবে। শর্তগুলো হল ঃ

১. চুরিকৃত বস্তু 'মাল' হওয়া

হানাফী ও শাফি'ঈ ইমামগণের মতে, চুরিকৃত জিনিস যদি মাল না হয় (যেমন মানব শিশু), তাহলে চুরির হদ্দ কার্যকর হবে না। তবে তার সাথে যদি নিসাব পরিমাণ বা তার অধিক মূল্যের দামী কাপড়-চোপড় বা অলঙ্কার থাকে, তা হলেও অধিকাংশ হানাফী ইমামের মতে হাত কাটা হবে না। তাঁদের বক্তব্য হল, এ ক্ষেত্রে কাপড়-চোপড় বা অলঙ্কার শিশুর অনুবর্তী হিসেবে ধর্তব্য হবে। তবে

অপহরণের পরও মালের ওপর মালিকের মালিকানা স্বত্ব বহাল থাকে। প্রথম চোর কিংবা অপহরণকারী কর্তৃক উক্ত মাল অবৈধ উপায়ে হস্তগতকরণের ফলে তার মালিকানা স্বত্বের ওপর কোন প্রভাব পড়বে না। হাম্বলীগণের মতে এ দুঅবস্থার কোন অবস্থাতেই হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তাঁদের মতে মালিক কিংবা প্রকৃত হকদারের নিকট থেকে কোন মাল চুরি হলেই তা-ই যথার্থ চুরি হিসেবে ধর্তব্য হবে। যদি অন্য কারো থেকে কোন মাল সে নেয়, তা হলে মনে হবে করা যে, সে যেন কারো কোন হারানো মাল পেয়ে কুড়িয়ে নিয়েছে। (আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১৪৪-৫; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭,পৃ. ৮০;ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*,খ.৬,পৃ.১৩৪; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ. ২৮২; মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ. ৫২৯; সাভী, *বুলগাতুস সালিক...*, খ.৪, পৃ.৪৬৯)

২৪. মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ. ৫৪৬; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১৮১; আল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাহ...*, খ.২,পৃ. ১৬৩; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ. ৮৩; রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ.৭,পৃ. ৪৬৩; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ.৬,পৃ.৬৩৮

ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ)-এর মতে চোরের হাত কাটা হবে। তাঁর কথা হলঃ শিশু ছাড়াও যদি কেউ নিসাব পরিমাণ বস্তু চুরি করে, তাতে হদ্দ প্রযোজ্য হয়। তা হলে কেউ শিশুসহ নিসাব পরিমাণ বস্তু চুরি করলে তাতে তো আরো অধিক কঠোরভাবে হদ্দ প্রযোজ্য হবার কথা।[২৫] ইমাম মালিকের (রহ) মতে, যদি কোন ঘরে সংরক্ষিত অবস্থা থেকে কোন শিশু চুরি করা হয়, তাহলে চোরের হাত কাটা হবে। তাঁর দলীল হল ঃ বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে জনৈক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হল, যে শিশুদের চুরি করে নিয়ে অন্য জায়গা বিক্রি করে দিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার হাত কাটতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২৬]

অধিকাংশ হানাফীর মতে, কুর'আন শরীফ বা অন্য কোন ধর্মীয় বই-পুস্তক- যদিও তার গাত্রে নিসাব পরিমাণ মূল্যের সাজসরঞ্জাম থাকে- চুরি করলে চোরের ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। কেননা কুর'আন শরীফ কিংবা ধর্মীয় বই-পুস্তক হস্তগতকারী এরূপ ব্যাখ্যা করতে পারে যে, সে তা পড়ার জন্য নিয়েছে। তবে মালিকী ও শাফি'ঈগণ এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ)-এর মতে, যেহেতু লোকেরা সচরাচর কুর'আন শরীফ ও ধর্মীয় বই-পুস্তককে উৎকৃষ্ট মাল হিসেবে গণ্য করে, তাই কেউ এগুলো চুরি করলে তাতে হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে, যদি ঐগুলোর মূল্য নিসাব পরিমাণ হয়।[২৭]

২. চুরিকৃত বস্তুর আর্থিক মূল্য থাকা

বস্তুর আর্থিক মূল্য থাকার অর্থ হল তা এমন হওয়া যা কেউ নষ্ট করলে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত করলে তার মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়। অতএব শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে যে সব বস্তুর কোন মূল্য নেই (যেমন- শূকর, মাদক দ্রব্য, মৃতপ্রাণী, বাদ্য যন্ত্র, অশ্লীল বই-পুস্তক, ক্রুস চিহ্ন ও মূর্তি) তা কেউ চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।

হানাফী ও হাম্বলী ইমামগণের মতে ক্রুসের চুরিতে হাত কাটা হবে না, যদি তার মূল্য নিসাব পরিমাণও হয়। তবে মালিকীগণ এবং হানাফী ইমামগণের মধ্যে

---

২৫. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১৪০, ১৬১; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ. ৩৬৯-৭০; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ. ৭, পৃ. ৬৭; হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ৯, পৃ.১৪৭-৮; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ.৬,পৃ.৬৩৮

২৬. মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ. ৫৩৮; বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ.১৮০

২৭. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১৫২; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ. ৮, পৃ, ৩৭০; যাকারিয়া আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ. ১৪০

ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ)-এর মতে, যদি ক্রসের মূল্য নিসাব পরিমাণ হয় এবং তা যদি কারো হিফাযতে থাকে, তা চুরি করা হলে হাত কাটা হবে। অনুরূপভাবে পাত্রসহ কেউ মদ চুরি করলে এবং পাত্রের মূল্য যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে হাত কাটা হবে। শাফি'ঈ ইমামগণের মতে, ক্রস, মূর্তি, বাদ্যযন্ত্র ও মদের পাত্র প্রভৃতি বস্তু ভেঙ্গে ফেলার পর মূল্য যদি নিসাব পরিমাণে পৌঁছে, তা হলে হাত কাটা হবে।[২৮]

৩. চুরিকৃত মাল তুচ্ছ বস্তু না হওয়া

তুচ্ছ বস্তু বলতে এমন মালকে বোঝানো হয় যা সচরাচর লোকেরা গুরুত্বের সাথে হিফাযত করে না (যেমন-মাটি, ঘাস, ভুষি, বাঁশ ও লাকড়ি প্রভৃতি)। এ ধরনের কোন মাল চুরি করা হলে তাতে হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে না। তবে শিল্পজাত করে যদি এ সব মালকে দামী সামগ্রীতে পরিণত করা হয়, তবেই হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে। তবে মালিকীগণ এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ)-এর মতে মাল তুচ্ছ কিংবা গুরুত্বপূর্ণ যে ধরনেরই হোক না কেন, তা যদি সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে এবং নিসাব পরিমাণ হয়, তা চুরি করা হলে হাত কাটা হবে। কেননা যা বেচাকেনা করা বৈধ এবং যা নষ্ট করা হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, তা চুরি করা হলে হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে।[২৯]

৪. চুরিকৃত বস্তু সংরক্ষণযোগ্য হওয়া

চুরিকৃত মাল যদি অসংরক্ষণযোগ্য দ্রুত পচনশীল দ্রব্য হয়, তা হলেও হদ্দ কার্যকর হবে না; বরং তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া হবে। তবে মালিকীগণ এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ)-এর মতে, দ্রুত পচনশীল দ্রব্যও যদি নিসাব পরিমাণে চুরি করা হয়, তাতেও হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে গাছে ঝুলন্ত ফল চুরির জন্যও হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে না। এমন কি যদিও হিফাযত করার উদ্দেশ্যে তাকে মাচায় বেঁধে রাখা

---

২৮. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১৫২-৫; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ. ৭, পৃ. ৬৮-৯; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ. ৬, পৃ, ১৫৯; হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ৯, পৃ.১২৮; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*,খ.৬,পৃ.১২৬; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ. ২৬০-১; মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ. ৫৩০ ও *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ.১৫৭

২৯. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১৪৩, ১৫৩, ১৮০; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ. ৭, পৃ. ৬৭-৮; দাসূকী, *আলহাশিয়াতু 'আলাশ শারহিল কাবীর*, খ.৪, পৃ. ২৩৪; সাভী, *বুলগাতুল সালিক*, খ.৪, পৃ. ৪৭২

হোক কিংবা ঘেরা দেয়া হোক। কেননা ফল যে যাবত গাছে থাকে, ততক্ষণ নষ্ট হবার আশঙ্কা লেগেই থাকে। তবে আড়তে সংরক্ষিত ফল চুরি করা হলে তাতে হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে, যদি তা ভালভাবে শুকিয়ে যায়। কেননা এমতাবস্থায় তা সংরক্ষণের উপযোগিতা লাভ করেছে এবং তা সহজেই নষ্ট হবে না। যদি তা ভালভাবে না শুকায়, তাহলে যেহেতু এমতাবস্থায় তা সংরক্ষণ করে রাখার পূর্ণ উপযোগিতা অর্জন করে নি, তাই তা চুরি করা হলেও হাত কাটা যাবে না।[৩০]

৫. চুরিকৃত বস্তু সাধারণভাবে সকলের জন্য বৈধ না হওয়া

চুরিকৃত মাল যদি এমন কোন বস্তু হয় যা ব্যবহার করা সকলের জন্য সাধারণভাবে বৈধ (যেমন- পানি, আগুন বা ঘাস প্রভৃতি), তাহলেও হদ্দ কার্যকর করা হবে না। এমন কি তা যদি কারো অধীনে সংরক্ষিত থাকা অবস্থায় চুরি করে, তাহলেও হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে না। তবে মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামগণ এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ)-এর মতে, এ ধরনের মাল যদি সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে এবং মূল্যবান হয়, তাহলে চুরির জন্য হাত কাটা হবে, যদি তার মূল্য নিসাব পরিমাণে পৌঁছে।[৩১]

৬. চুরিকৃত মাল অপরের দখলভুক্ত হওয়া

হস্তগতকৃত মাল অপরের দখলভুক্ত অর্থাৎ মালিকানাভুক্ত কিংবা আমানত বা দায়িত্বাধীন থাকতে হবে। দখলবিহীন বা মালিকানাহীন কোন মাল কেউ হস্তগত করলে তার এ কাজ চুরি বলে গণ্য হবে না। কারণ এতে কারো আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা নেই।[৩২]

৭. চুরিকৃত মাল নিরাপদ সংরক্ষিত স্থান থেকে করায়ত্ত করা

করায়ত্তকৃত মাল সযত্নে বা পাহারা বা কারো তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। অযত্নে কিংবা অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা মাল কেউ হস্তগত করলে তাকে চুরির শাস্তি প্রদান করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لا

---

৩০. আল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাহ*, খ.২, পৃ. ১৬৬; হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ৯, পৃ.১৩১; দাসূকী, *আলহাশিয়াতু 'আলাশ শারহিল কাবীর*, খ.৪, পৃ. ২৩৪

৩১. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১৫৩, ১৮১; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ. ৭, পৃ. ৭০; সাভী, *বুলগাতুল সালিক*, খ.৪, পৃ. ৪৭২; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*,খ.৬,পৃ.১২৪; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ. ২৫৬

৩২. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১৫৪; হায়তমী,*তুহফাতুল মুহতাজ*, খ৯, পৃ.১২৮; রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ.৭, পৃ. ৪৪৩

قطع في تمر معلق ، و لا في حريسة جبل ، فإذا أواه المراح و الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن. - "প্রাচীরের বাইরে ঝুলন্ত ফল কিংবা রাতের বেলা পাহাড় থেকে ধরে নেয়া কোন মেষের জন্য হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না। তবে মেষ খোঁয়াড়ে আবদ্ধ থাকলে এবং ফল শুকাবার খোলায় বা গোলায় থাকাবস্থায় হস্তগত করলে হাত কাটা হবে, যদি তার মূল্য একটি বর্মের সমান হয়।"[৩৩]

উল্লেখ্য যে, সংরক্ষণ দুভাবে হতে পারে। ক. কোন নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করা ও খ. সংরক্ষণকারী কর্তৃক সংরক্ষণ করা। স্থানের সংরক্ষণ হলঃ সম্পদ এমন স্থানে সংরক্ষণ করা, যা সম্পদের হিফাযতের জন্য তৈরি করা হয়েছে। মালিকের নির্দেশ ছাড়া সেখানে প্রবেশ করা নিষেধ। যেমন- গুদাম, দোকান, ঘর, তাবু, পশুর আস্তাবল, গোশালা ইত্যাদি। তাতে হিফাযতকারী থাকা জরুরী নয়। চাই ঘরের দরজা খোলা থাকুক কিংবা বন্ধ। ময়দানে হোক কিংবা জনপদে। সংরক্ষণকারী কর্তৃক সংরক্ষণ এমন স্থানে হয়ে থাকে, যে স্থান কোন কিছু সংরক্ষণের জন্য তৈরি করা হয়নি এবং সর্বসাধারণ সেখানে অবাধে প্রবেশ করতে পারে। যেমন- মসজিদ, সাধারণ জনপথ, খোলা ময়দান প্রভৃতি স্থান। এ সব স্থানে সংরক্ষণের অর্থ হল ঃ মালের পার্শ্বে ব্যক্তি এমনভাবে বিদ্যমান থাকবে, যেখান থেকে সে তার মাল দেখতে পায়। চাই সে ঘুমন্ত কিংবা জাগ্রত অবস্থায় থাকুক আর সম্পদ তার শরীর কিংবা মাথার নিচে কিংবা পার্শ্বে থাকুক। মালটি চাই তার পরিধেয় বস্ত্র হোক কিংবা নগদ অর্থ হোক বা অন্য কোন বস্তু। অতএব কারো পকেট থেকে কিংবা কারো কাপড় কেটে গোপনভাবে টাকা-পয়সা কিংবা কোন মূল্যবান বস্তু নিয়ে যাওয়া হলে এবং তার মূল্য যদি চুরির নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তা চুরি হিসেবে ধর্তব্য হবে।[৩৪]

মেহমান যদি মেজবানের বাড়ী থেকে কোন মাল চুরি করে তা হলে চুরির শাস্তি কার্যকর হবে না। কেননা মেহমানের ঘরে প্রবেশের অনুমতি থাকার কারণে চুরির ধারণায় সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে কোন চাকর বা কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি যদি তার মনিবের বা নিয়োগকর্তার মাল নিরাপদে সংরক্ষিত স্থান থেকে

---

৩৩. মালিক, ইমাম, *আল-মু'আত্তা,* (কিতাবুল হুদূদ), হা. নং: ১৫১৭; বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা,* (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ১৭০০১;

৩৪. আল-কাসানী, *বদা'ই,* খ.৭, পৃ. ৭৫; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর,* খ.৫. পৃ.৩৮৪; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী,* খ.৯, পৃ. ৯৮-৯৯; যাকারিয়া আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব,* খ.৪, পৃ. ১৪০; মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ,* খ.৪, পৃ. ৫৩২

চুরি করে, যেখানে তাকে প্রবেশ করার অধিকার দেয়া হয়েছে, তা হলেও হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। কেননা তার এ অশুভ আচরণকে বিশ্বাসঘাতকতা বলা যায়; চুরি নয়। আর শরী'আতে বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি হাত কর্তন নয়। এ জন্য তাকে তা'যীরের আওতায় অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী যে কোন শাস্তি দেয়া যাবে।[৩৫] অনুরূপভাবে দোকানে যে সময় সর্বসাধারণের প্রবেশের অনুমতি থাকে তখন কেউ দোকানে ঢুকে কিছু চুরি করলে তার ওপরও হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তবে যে সময় সর্বসাধারণের প্রবেশানুমতি নেই, সে সময় ঢুকে চুরি করলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে।[৩৬]

কোন ব্যক্তি চারণভূমি থেকে পশু চুরি করলে তার ওপরও হদ্দ কার্যকর করা যাবে না; বরং সে তা'যীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে। চারণভূমিতে রাখাল থাকুক বা না থাকুক- তাতে হুকুমে কোন পার্থক্য হবে না। এটা হানাফী ও মালিকীগণের অভিমত। তবে শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, রাখালের দৃষ্টিসীমাতে অবস্থিত চারণভূমি থেকে বিচরণরত পশু চুরি করা হলে তাতে হদ্দ কার্যকর করা হবে।[৩৭]

কোন ব্যক্তি কবর থেকে কাফন চুরি করলে তাকেও চুরির শাস্তি দেয়া যাবে না। কেননা সংরক্ষিত মাল চুরি না করলে তা চুরি বলে গণ্য হবে না। কাফন নিরাপদে হিফাযতে রাখা মাল নয়। এটা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) প্রমুখের মত। মালিকী ও হাম্বলী এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ) প্রমুখ ইমামগণের মতে, কাফন চোরদের হাত কাটা হবে, যদি তার মূল্য নিসাব পরিমাণ হয়।[৩৮]

৮. করায়ত্তকৃত মাল চোর কর্তৃক পুরোপুরি নিজের দখলভুক্ত হওয়া

চুরিকৃত মাল সম্পূর্ণরূপে চোরের দখলে যেতে হবে। চোর কর্তৃক সংরক্ষিত স্থান থেকে মাল সরিয়ে নিলে হবে না, সম্পূর্ণরূপে তার দখলভুক্ত হতে হবে। অন্যথায় তা চুরি বলে গণ্য হবে না।[৩৯]

---

৩৫. মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ. ৫৩২ ; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.১৪১; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ ৩৮৭

৩৬. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ ৩৮৭

৩৭. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা*, খ.৩১, পৃ. ৩০০; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩,পৃ. ২১৭-৮; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫. পৃ.৩৯১-২

৩৮. আস-সারাখ্সী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১৬১; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩,পৃ. ২১৭-৮; বহুতী, *দকা'ইক..*, খ.৩, পৃ. ৩৭৪; রুহায়বানী, *মাতলিব..*, খ.৬, পৃ. ২৩৯; মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ. ৫৩৭

৩৯. আস-সারাখ্সী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১৩৯, ১৪৭; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯,পৃ. ৯৮

৯. করায়ত্তকৃত মাল চুরির নিসাব পরিমাণ মূল্যের হওয়া

চুরিকৃত মালের নিসাব পরিমাণ মূল্য হতে হবে। অন্যথায় হদ্দ কার্যকর করা হবে না; তবে তা'যীরের আওতায় শাস্তি কার্যকর করা হবে।

চুরির নিসাব ঃ

কি পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে চুরির হদ্দ কার্যকর করা ওয়াজিব হবে- তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।[৪০] মালিকীগণের মতে, চুরির নিসাব তিন দিরহাম। তাঁদের দলীল হল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং হযরত 'উছমান (রা) দুজনেই তিন দিরহাম মূল্যের বর্ম চুরিতে হাত কেটেছেন।[৪১] শাফি'ঈগণের মতে, এক দীনারের [৪২] এক চতুর্থাংশ।[৪৩] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. - "এক দীনারের এক চতুর্থাংশ বা তার বেশি পরিমাণ মূল্যের সম্পদ চুরি করলে তার শাস্তিস্বরূপ হাত কাটা যাবে।"[৪৪] অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. -"বর্মের মূল্যের চাইতে কম মূল্যের বস্তুর চুরিতে হাত কাটা যাবে না।" রাবী বলেন, হযরত 'আয়িশা (রা)কে জিজ্ঞেস করা হলো, বর্মের মূল্য কত? তিনি বললেন, এক দীনারের এক চর্তুথাংশ।[৪৫] তবে এক দীনারের এক চতুর্থাংশের পরিমাণ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ (রহ)-এর মতে তিন দিরহাম[৪৬], ইবনু আবী লায়লা (রহ)-এর মতে পাঁচ দিরহাম।[৪৭]

---

৪০. ইবনু হাযম, *আল-মুহাল্লা*, খ.১২, পৃ. ৩৪৪-৫; আস-সারাখ্সী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১৩৬-৯; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ৭৭-৯

৪১. মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ.৫২৬ (হযরত 'ইবনু 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: إن رسول الله قطع في مجن ثمنه ثلثة دراهم. - "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিন দিরহাম মূল্যের বর্মের চুরিতে হাত কেটেছেন।" (বুখারী, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ৬৪১১, ৬৪১২, ৬৪১৩)

৪২. দীনার ঃ ২০ কীরাত ওযনের স্বর্ণের তৈরি মুদ্রা বিশেষ। বর্তমানে তা ৪.২৫ গ্রামের সমান।

৪৩. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬,পৃ. ১৪০

৪৪. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ১৬৮৪

৪৫. আল বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ১৬৯৪৯; নাসাঈ, *আস-সুনান আল-কুবরা*, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ৭৪২২

৪৬. এ ভিত্তিতে তাঁর মতের সাথে ইমাম মালিক (রহ)-এর মতের মিল রয়েছে।

৪৭. দাউদ আয-যাহিরীর মতে, কম-বেশি যা চুরি করুক তার জন্য হাত কাটার শাস্তি প্রযোজ্য হবে। তাঁর বক্তব্য হলঃ جزاء بما كسبا (অর্থাৎ যা তারা রোজগার করেছে তারই শাস্তি স্বরূপ)-এ আয়াতে ما শব্দটি কম-বেশি সব পরিমাণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। (ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ. ৯, পৃ. ৯৪-৫)

হানাফীগণের মতে, ন্যূনতম দশ দিরহাম[৪৮] বা তার সমমূল্যের কোন বস্তু চুরি করা হলে তবেই চুরির হদ্দ কার্যকর করা হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,. لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم - "এক দীনার বা দশ দিরহামের কমে হাত কাটা যাবে না।"[৪৯] তাঁদের বক্তব্য হল ঃ মালিকী ও শাফি'ঈগণের বর্ণিত হাদীসসমূহে সুনির্দিষ্ট পরিমাণের কথা উল্লেখ নেই। এগুলোতে বিভিন্ন ব্যাখার অবকাশ রয়েছে। হযরত ইবনু 'আব্বাস (রা)-এর মতে বর্মটির দাম দশ দিরহাম, আবার ইবনু উমার (রা) থেকে তিন দিরহাম বর্ণিত রয়েছে। কেউ কেউ আবার চার দিরহাম এবং পাঁচ দিরহামের কথাও উল্লেখ করেছেন। অপর দিকে হযরত 'আয়িশা (রা)-এর মতে, এক দীনারের এক চতুর্থাংশ সমান দশ দিরহাম। হানাফীগণের মতে, যেহেতু বর্মটির মূল্য কত- তা নিয়ে সাহাবীগণের মধ্যেও মতপার্থক্য রয়েছে, তাই এ ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণের বর্ণনা সম্বলিত রিওয়ায়াতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কারণ তার চাইতে কম পরিমাণের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আর সন্দেহযুক্ত অবস্থায় হদ্দ কার্যকর না করাই হল ইসলামী শাস্তি আইনের একটি বৈশিষ্ট্য।[৫০]

বর্তমানে দশ দিরহামের সমপরিমাণ প্রায় ২৯.৭৫ গ্রাম রৌপ্য বা তার সমমূল্যের কোন মাল চুরির নিসাব হিসেবে গণ্য হবে।[৫১] এর কম মূল্যের কোন বস্তু চুরি করলে তা হদ্দের আওতায় পড়বে না; তবে তা'যীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে।

যদি একসাথে একাধিক ব্যক্তি চুরি করে এবং চুরিকৃত মাল চুরিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করে দিলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ চুরির নিসাব পরিমাণ বা তার অধিক হয়, তা হলেই সকলের ওপর হদ্দ কার্যকর হবে। অন্যথায় তা'যীরের আওতায় সাধারণ শাস্তি কার্যকর করা হবে।[৫২]

---

৪৮. দিরহাম ঃ রৌপ্যের তৈরি মুদ্রা বিশেষ। বর্তমানে তা ২.৯৭৫ গ্রামের সমান।

৪৯. আত্ তিরমিযী (কিতাবুল হুদূদ), হা. নং: ১৪৪৬

৫০. আস-সারাখ্সী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১৩৬-৯; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ৭৭-৯

৫১. এটা হানাফী ইমামগণের মতানুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে। তাঁরা মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে রৌপ্যকে প্রাধান্য দেন। পক্ষান্তরে শাফি'ঈগণ মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বর্ণকে প্রাধান্য দেন। তাই তাঁদের মতানুযায়ী .২৫ দীনারের সমপরিমাণ প্রায় ১.০৬২৫ গ্রাম স্বর্ণ বা তার সমমূল্যের কোন মাল চুরির নিসাব হিসেবে গণ্য হবে। তদুপরি চুরি করার সময় চুরিকৃত বস্তুর যা দাম ছিল মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তা-ই বিবেচ্য হবে। তবে হানাফীগণের মতে, হাত কাটার সময় চুরিকৃত বস্তুর মূল্য হ্রাস পেয়ে নিসাবের চাইতে কমে গেলে হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। (ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ. ৪০৭; শায়খী যাদাহ, *মাজমা'উল আনহুর..*, খ.১, পৃ. ৬২৬)

৫২. আস-সারাখ্সী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১৪৩; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১২০

১০. করায়ত্তকৃত মাল স্থানান্তরযোগ্য হওয়া

করায়ত্তকৃত মাল স্থানান্তরযোগ্য হতে হবে। এটা চুরির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কারণ চুরির অর্থ হল অন্যের সম্পদ সরিয়ে নিজের দখলে নিয়ে যাওয়া। এটা কেবল স্থানান্তরযোগ্য মালের বেলায় সম্ভব। যে সব মাল এক স্থান থেকে সরিয়ে অন্যত্র নেওয়া যায় না, তা চুরি করা যেতে পারে না।[৫৩]

গোপনে মাল সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করা ঃ

চুরির চতুর্থ উপাদান হল গোপনে মাল হস্তগত করা অর্থাৎ মালিকের সম্মতি বা অবগতি ছাড়া কিংবা তার অনুপস্থিতিতে অথবা নিদ্রিতাবস্থায় তার দখলভুক্ত কোন মাল হস্তগত করে নেয়া। এ ক্ষেত্রে মাল সম্পূর্ণরূপে হস্তগত হতে হবে।[৫৪] সম্পূর্ণরূপে হস্তগতকরণ বোঝাতে নিম্নের তিনটি শর্ত পূর্ণ হতে হবে। ক. চোর চুরিকৃত বস্তু নিরাপদ সংরক্ষিত স্থান থেকে বের করে আনবে।[৫৫] খ. চুরিকৃত মাল মালিকের দখলভুক্ত হতে হবে। গ. তা সম্পূর্ণরূপে চোরের নিজের দখলে আসতে হবে। এ তিনটি শর্তের কোন একটি পূর্ণ না হলে হস্তগতকরণ পূর্ণাঙ্গ বলে পরিগণিত হবে না এবং সে ক্ষেত্রে চুরির হদ্দও প্রযোজ্য হবে না। হস্তগত

---

৫৩. *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন* (সংকলন), ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪, খ.১,পৃ.৩২১; Siddiqi, Mohammad Iqbal, *Penal law of Islam*, New Delhi,1988, P. 38.

৫৪. আস-সারাখ্সী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১৩৯, ১৪৭-৮; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ৬৫-৬; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ৯৮-১০৩

৫৫. অধিকাংশ হানাফীর মতে, হদ্দযোগ্য চুরির জন্য চোরের সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশ করতে হবে, যদি সেখানে প্রবেশ করা সম্ভব হয় যেমন-ঘর ও দোকান। অতএব, কোন ব্যক্তি যদি কারো সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশ না করেই গোপনে কারো মাল হস্তগত করে তা চুরি বলে ধর্তব্য হবে না। এ অবস্থায় হদ্দের পরিবর্তে তা'যীরের শাস্তি প্রযোজ্য হবে। তাঁদের দলীল হল ঃ হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "চোর যদি বিচক্ষণ হয়, তা হলে তার হাত কাটা যাবে না।" এ কথা বলার পর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, তা কি করে হয় ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ চোর ঘরে সিঁদ কাটবে; কিন্তু তাতে প্রবেশ না করেই আসবাবপত্র বের করে নিয়ে আসবে।" (আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.১৪৭-৮) তবে অন্যান্য অধিকাংশ ইমামের মতে, সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশ করেই মাল হস্তগত করতে হবে- তা চুরির জন্য শর্ত নয়। যদি সংরক্ষিত স্থান থেকে হাত কিংবা কোন কিছুর সাহায্যে মাল বের করে নিয়ে আসে তা চুরি হবার জন্য যথেষ্ট। (মালিক, *মুদাওয়ানাহ*, খ. ৪, ৫৩; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ৯৮-১০৩) বর্ণিত রয়েছে, জনৈক ব্যক্তি তার বাঁকানো লাঠির সাহায্যে হাজীদের আসবাবপত্র চুরি করত। তাকে বলা হল- তুমি কি হাজীদের আসবাবপত্র চুরি করছ? সে বলল ঃ আমি তো না; লাঠিই চুরি করছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার খবর জানতে পেরে বলেছেন ঃ رأيته يجر قصبه في النار. - "আমি তাকে জাহান্নামে তার নাড়িভূঁড়ি টানতে দেখেছি।" (সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল কসূফ), হা.নং: ৯০৪)

হবার ব্যাপারটি যদি অপূর্ণ থাকে[৫৬] তাহলে চুরি সম্পূণ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে না; বরং চুরি শুরু হয়েছে বলে ধরা হবে। এ অবস্থায় হদ্দের পরিবর্তে তা'যীরের শাস্তি প্রযোজ্য হবে।[৫৭]

কেউ জোরপূর্বক কিংবা প্রকাশ্যে দ্রুতবেগে কারো থেকে কোন বস্তু ছিনিয়ে নিলে বা বিশ্বাসঘাতকতা করে কারো কোন মাল নিয়ে নিলে তাও চুরি বলে ধর্তব্য হবে না।[৫৮] এর জন্য হাত কাটার পরিবর্তে তা'যীরের শাস্তি প্রযোজ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ليس على خائن 'و لا منتهب 'و لا مختلس قطع. - "কোন বিশ্বাসঘাতক, জোরপূর্বক অপহরণকারী ও প্রকাশ্যে ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না।"[৫৯]

যদি একসাথে একাধিক ব্যক্তি চুরি করতে যায় এবং তাদের মধ্যে কেউ সরাসরি চুরিকর্মে অংশগ্রহণ করে (যেমন- ঘরের সিদ কেটে মাল বের করে নিয়ে আসা কিংবা মালিকের হিফাযত থেকে মাল নিজের করায়ত্তে নিয়ে আসা প্রভৃতি) আর কেউ চুরিকর্মে সহায়তা করে (যেমন চুরিকৃত মালের স্থান দেখিয়ে দেয়া, মালিকের সাহায্যে এগিয়ে আসা লোকদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য বাইরে দাঁড়ানো, ভেতর থেকে বেরকৃত মাল অন্যত্র সরিয়ে ফেলা প্রভৃতি),

---

৫৬. যেমন- কেউ তালা ভেঙ্গে বা খুলে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করল কিংবা দরজা বা জানালা ভাঙ্গল অথবা ছাঁদে বা দেয়ালে সিদ কাটল কিংবা কারো পকেটে হাত ঢুকাল; কিন্তু কোন কিছু হস্তগত করার আগেই মালিকের গতিবিধি আঁচ করতে পেরে পালিয়ে গেল অথবা ধরা পড়ল।

৫৭. এর দলীল হল ঃ হযরত 'আমর ইবন শু'আয়ব (রা) থেকে বর্ণিত, একবার এক চোর মুত্তালিব ইবন আবি ওয়াদা'আর গুদামে সিদ কেটে ঢুকে মাল জমা করল; কিন্তু মাল বের করে নেয়ার আগেই ধরা পড়ে গেল। তাকে লোকেরা 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-এর নিকট নিয়ে আসল। তিনি তাকে বেত্রাঘাত করলেন এবং হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। ইত্যবসরে ঘটনাটি জানতে পেরে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-এর নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি তার হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বললেন, তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করা হল কেন ? তিনি উত্তর দিলেন, রাগের বশে। এরপর আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বললেন, তার হাত কাটা যাবে না, যে যাবত না সে ঘর থেকে মাল বের করে নিয়ে আসে। আপনার কি অভিমত, যদি আপনি কোন পুরুষকে কোন মহিলার দুপায়ের মাঝখানে দেখতে পান; কিন্তু সে আজো যৌনসঙ্গম করে নি, এমতাবস্থায় তার ওপর কি আপান হদ্দ প্রয়োগ করবেন? তিনি বললেন, না। (*আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.২৪, পৃ. ৩২৯)

৫৮. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ৬৫-৬; বাবরতী, *আল-'ইনায়াহ*, খ.৫, পৃ. ৩৮৯-৯০; যাকারিয়া আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ. ১৪৭ ও *আল-গুরারুল বহিয়্যা*, খ. ৫, খ.৮৯-৯০

৫৯. আত্ তিরমিযী, (কিতাবুল হুদূদ),হা.নং: ১৪৪৮

তাহলে সরাসরি চুরিকর্মে অংশগ্রহণকারীদের জন্য হদ্দের বিধান প্রযোজ্য হবে এবং সাহায্যকারীদেরকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া হবে।[৬০]

চুরির শাস্তি ঃ

চুরির শাস্তি হল হাত কাটা। পবিত্র কুর'আনে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم. - "পুরুষ চোর ও নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তারা যা উপার্জন করেছে তার প্রতিফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্ত। আর আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানী।"[৬১] এ আয়াত থেকে জানা যায়, এ শাস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। এ বিষয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ সম্পূর্ণ একমত।[৬২] তবে হাত কতটুকুন কাটতে হবে, কিভাবে কাটতে হবে এবং কোন হাত কাটতে হবে- এ সকল বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। চার মাযহাবের ইমামগণের মতে প্রথমবারের চুরিতে ডান হাত কবজি থেকে কাটতে হবে। কেননা, এ ডান হাত দিয়ে সাধারণত চুরির কাজ সম্পন্ন হয় এবং ধরা-ছোঁয়ার কাজেও ডান হাতের ব্যবহার হয় বেশি। তাই চুরির অপরাধে ডান হাত কর্তন করাটাই অধিকতর যথার্থ শাস্তি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার চুরির শাস্তি ঃ

দ্বিতীয়বার চুরি করলে বাম পা কেটে ফেলতে হবে।[৬৩] এতে প্রসিদ্ধ ইমামগণের কারো দ্বিমত নেই। তবে তৃতীয়বার চুরি করলে কি শাস্তি দেয়া হবে- তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফী ও কতিপয় হাম্বলী ইমামের মতে তৃতীয় বারের চুরির শাস্তি হল কারাগারে আটক রাখা। তাঁদের বক্তব্য হলঃ তৃতীয়বারও যদি তার হাত বা পা কেটে ফেলা হয়, তাহলে জীবনে তার চলার ও বেঁচে থাকার আর কোন শক্তিই থাকবে না। এটা প্রকারান্তরে তাকে ধ্বংস

---

৬০. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ. ৩৮৯-৯০; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১২২; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০,পৃ. ২৬৭-৬৯

৬১. আল-কুর'আন, ৫ ঃ ৩৮

৬২. ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১০৫-৬

৬৩. ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১০৫-৬ । হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ' إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله. -"চোর চুরি করলে তার হাত কেটে দাও। এরপর ফিরে আবার চুরি করলে তার পা কেটে দাও।" (দারু কুতনী, *আস-সুনান* (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ২৯২)

করারই নামান্তর। হদ্দের উদ্দেশ্য কাউকে ধ্বংস করা নয়; বরং অপরাধের প্রতি ভীতি তৈরি করাই হল হদ্দের একান্ত উদ্দেশ্য।[৬৪] মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামগণের মতে, তৃতীয়বার চুরি করলে বাম হাত, আর চতুর্থবার চুরি করলে ডান পা কেটে ফেলতে হবে। তারপরও যদি চুরি করে, তবেই তাকে তা'যীরের আওতায় কারাগারে বন্দী করে রাখা হবে।[৬৫] তাঁদের দলীল হল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن عاد فاقطعوا يده' فإن عاد فاقطعوا رجله. - "যখন চোর চুরি করে, তার হাত কেটে দাও। যদি পুনরায় চুরি করে তার পা কেটে দাও। যদি আবার চুরি করে, তাহলে তার হাত কেটে দাও। ফিরে আবারো চুরি করলে তার পা কেটে দাও।"[৬৬] হানাফীগণ এ হাদীসের জবাবে বলেন, মুসলিম খলীফাদের অনেকেই এ হাদীসের ওপর আমল করেন নি; তাঁরা কেউ তৃতীয়বার চুরি করলে তাকে কারাগারে বন্দী করে রাখতেন। সম্ভবত বর্ণনার বিভিন্নতার কারণে তাঁরা হাদীসটি গ্রহণ করেন নি।

উল্লেখ্য যে, তৃতীয় এবং তার পরবর্তী চুরিগুলোর শাস্তি হদ্দ হিসেবে নয়; তা'যীরের আওতায় কার্যকর করা হবে। তাই এ সব ক্ষেত্রে বিচারক কারাদণ্ড কিংবা তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী যে কোন শাস্তি দিতে পারবে। বর্ণিত আছে যে, একসময় হযরত 'আলী (রা)-এর দরবারে হাত-পা কাটা এক চোরকে আনা হল। তখন হযরত 'আলী (রা) উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি? তাঁরা বললেন, তাঁর অঙ্গ কর্তন করুন, হে আমীরুল মু'মিনীন! উত্তরে 'আলী (রা) বললেন, তা করলে তো তাকে ধ্বংসই করে ফেললাম। সে কি দিয়ে আহার করবে, কিভাবে নামাযের ওযু করবে, কিভাবে অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা হাসিল করবে? তাকে কয়েকদিন কারাগারে রেখে দাও। এর কিছু দিন পর তাকে কারাগার থেকে বের করে পুনরায় তিনি সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলে তাঁরা প্রথমবারের মতোই জবাব দিলেন। অতঃপর 'আলী (রা) তাকে কঠিনভাবে বেত্রাঘাত করলেন। অতঃপর তাকে ছেড়ে দিলেন।[৬৭]

---

৬৪. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১৪০-১; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৮৬-৮৭; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, ১০৯-১১০

৬৫. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৮, পৃ. ৩৭১; মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ. ৫৩৯; আল-মাওয়াক, *আত-তাজ ওয়াল ইকলীল*, খ.৮, পৃ. ৪১৪; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, ১০৯-১১০

৬৬. দারা কুতনী, *আস-সুনান* (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ২৯২

৬৭. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১৪০-১; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৮৬-৮৭

হাত ও পা কাটার নিয়ম ঃ

চোরের ডান হাতের কব্জি থেকে কাটতে হবে। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে فاقطعوا ايديهما (অর্থাৎ তাদের হাত কেটে দাও।) এখানে কোন হাত কাটতে হবে- তা সুনির্দিষ্ট করে বলা হয় নি। তবে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা)-এর فاقطعوا ايديهما -এর পরিবর্তে فاقطعوا ايمانهما (তাদের ডান হাত কেটে দাও।) প্রসিদ্ধ কিরা'আত[৬৮] দ্বারা জানা যায় যে, চোরের ডান হাতই কাটতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও ডান হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া খুলাফা রাশিদূনের আমল ও বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, কব্জি থেকে হাত কাটতে হবে। পরবর্তীকালের মুসলিম শাসকগণও কব্জি থেকে কেটেছেন।[৬৯] দ্বিতীয়বার চুরির ক্ষেত্রে বাম পা গোড়ালি থেকে কাটা হবে। তবে কারো কারো মতে, পায়ের গোড়ালি বরাবর ঠিক রেখে বাকী অংশ কেটে ফেলতে হবে, যাতে সে পায়ের ওপর ভর করে চলাফেরা করতে পারে।[৭০]

হাত-পা কাটার পর সাথে সাথে বেন্ডিজ করে দিতে হবে, যাতে রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে যায়। প্রচণ্ড শীত বা গরমের সময় কর্তন করা সমীচীন নয়। তদুপরি যতটুকু সম্ভব অতি দ্রুত ও সহজভাবে কাটার কাজ সেরে ফেলতে হবে।[৭১]

চোরের হাত কাটার পর হাতকে তার গলায় লটকিয়ে রাস্তায় কিংবা বাজারে প্রচারের উদ্দেশ্যে ঘুরাতে হবে কি না- তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, এটা সুন্নাত।[৭২] কেননা রাসূলুল্লাহ

---

৬৮. আত্ তাবারী, *আত-তাফসীর*, খ.৬, পৃ.২২৮; জাসসাস, *আহকামুল কুর'আন*, খ.৪, পৃ. ৬৪

৬৯. কারো কারো মতে, শুধু আঙ্গুলগুলোই কাটতে হবে। কেননা ধরা, নেওয়া ইত্যাদি কাজ আঙ্গুল দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এতে হাত কাটার উদ্দেশ্যও অর্জিত হয়। খারিজীদের মতে, ডান হাতের কাঁধের জোড়া থেকে কাটা হবে। কেননা হাত বলতে সবটারই নাম। আবার কারো মতে, হাতের মধ্যখান থেকে কাটতে হবে। তবে এ মতগুলোর পক্ষে কোন দলীল নেই। অধিকন্তু, সাহাবা কিরামের আমল দ্বারাও তা প্রমাণিত নয়। (যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ. ২২৪-২২৫; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, ১০৬)

৭০. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ. ২২৪-২২৫; আল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাহ*, খ.৩, পৃ. ১৭০; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, ১০৬

৭১. হানাফীগণের নিকট এটা ওয়াজিব। তাঁদের বক্তব্য হলঃ যদি রক্ত বন্ধ করা না হয়, তাহলে এতে অন্য অঙ্গহানির সম্ভাবনা থাকে। শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের নিকট বেন্ডিজ করা ওয়াজিব নয়; তবে মুস্তাহাব। (আল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাহ*, খ.৩, পৃ. ১৭০; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, ১০৬)

৭২. শাফি'ঈগণের মতে, এক ঘন্টার জন্য লটকানো যাবে। তবে হাম্বলীগণ এজন্য কোন সময় নির্ধারণ করে দেন নি।

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৭৩] হানাফীগণের মতে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকল চুরির ঘটনায় এ রূপ করেছেন- তা প্রমাণিত নয়। ব্যাপারটি প্রশাসক কিংবা বিচারকের সুবিবেচনার ওপর ন্যস্ত থাকবে। তাঁরা প্রয়োজন কিংবা কল্যাণকর মনে করলে তা করতে পারেন।[৭৪]

চুরির তা'যীরী শাস্তি ঃ

চুরি প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও কোন শর্তে ত্রুটি দেখা দেবার কারণে বা অন্য কোন কারণে যদি চোরের ওপর হদ্দ কার্যকর করা সম্ভব না হয়, তা হলে সে আদালতের সুবিবেচনা অনুযায়ী তা'যীরী শাস্তি ভোগ করবে।

চুরিকৃত মাল কিংবা তার মূল্য ফেরত দান ঃ

চুরিকৃত মাল যদি মজুদ থাকে, তা হলে চোর অবস্থাসম্পন্ন হোক কিংবা দারিদ্রক্লিষ্ট, চাই চোরের হাত কাটা হোক বা না হোক, চাই চুরিকৃত মাল চোরের কাছে থাকুক বা অন্যের কাছে - সর্বাবস্থায় মাল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। এ বিষয়ে ইমামগণ সকলেই একমত।[৭৫] বর্ণিত রয়েছে, হযরত সাফওয়ান (রা)-এর চাদর চুরির ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চোরের হাত কাটার পর চাদর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।[৭৬] তদুপরি চুরি প্রমাণিত হবার পর কোন কারণে যদি চোরের হাত কাটা সম্ভব না হয় এবং চুরিকৃত মাল নষ্ট বা খরচ হয়ে যায়, তাহলে চুরিকৃত মালের মূল্য কিংবা তার সমতুল্য মাল মালিককে পরিশোধ করে দিতে হবে। তবে চুরির শাস্তি হিসেবে যদি চোরের হাত কাটা হয়, তাহলে চুরিকৃত মাল নষ্ট হয়ে গেলে কিংবা খরচ হয়ে গেলে তার মূল্য কিংবা তার সমতুল্য মাল পরিশোধ করতে হবে না। আল কুর'আনের আয়াতে শুধু হাত কাটার শাস্তির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ সে

---

৭৩. ফাদালা ইবন 'উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, "একবার এক চোরকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত করা হল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথমে তার হাত কাটার নির্দেশ দেন। এরপর তাঁর নির্দেশে চোরের কর্তিত হাতটি তার গলায় লটকিয়ে দেয়া হল।"(আবূ দাউদ, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ৪৪১১ ও তিরমিযী, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ১৪৪৭)

৭৪. ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, ১০৭; হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯,পৃ. ১৫৬-৭; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ.২২৫; সাবিক, সাইয়িদ, *ফিকহুস সুন্নাহ*, খ.২, পৃ. ৪২৬

৭৫. ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ. ৫, পৃ. ১৭১; খ.৯, ১১৩-৪; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৮৯-৯০; গানিম, *মাজমা'উদ দিয়ানাত*, পৃ. ২০৩

৭৬. আন্ নাসাঈ, (কিতাবু কাত'ইস সারিক) , হা.নং: ৭৩৬৯

যে অপরাধ করেছে তার সবটুকুর শাস্তি হল হাত কাটা। অতএব, এর সাথে আর কোন শাস্তি যুক্ত করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إذا قطع السارق فلا غرم عليه. - "চোরের হাত কাটা হলে তাকে কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।"[৭৭] এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, চোরের হাত কাটা ও চুরিকৃত মালের ক্ষতিপূরণ দেয়ার শাস্তি একসাথে দেওয়া যাবে না। এটা হানাফীগণের প্রসিদ্ধ অভিমত। মালিকীগণের মতে, চোর যদি চুরি করার সময় থেকে হাত কাটা পর্যন্ত সময় অবস্থাসম্পন্ন ছিল, তাহলে নষ্ট বা ব্যয় হয়ে যাওয়া মালের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে চুরি প্রমাণিত হলে চোরকে সর্বাবস্থায় চুরিকৃত মাল কিংবা তার মূল্য মালিকের নিকট ফেরত দিতে হবে এবং চোরের হাতও কাটতে হবে। তাঁদের যুক্তি হল, হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে আল্লাহর হুকম লঙ্ঘন করার কারণে আর ক্ষতিপূরণ বান্দাহর হক নষ্ট করার কারণে।[৭৮]

চুরির প্রমাণ ঃ

যথাযথ সাক্ষ্য-প্রমাণ কিংবা চোরের স্বীকারোক্তি দ্বারা চুরি প্রমাণিত হবে। তবে কারো কারো মতে শপথের সাহায্যে এবং বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারাও চুরি প্রমাণ করা যেতে পারে।

১. সাক্ষ্য-প্রমাণ

চুরি প্রমাণের জন্য দুজন ন্যায়-পরায়ণ মুসলিম পুরুষের সাক্ষ্যের প্রয়োজন। সাক্ষী যদি দুজনের কম হয় অথবা একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং অপরজন শ্রোতা সাক্ষী হয়, অথবা একজন পুরুষ সাক্ষী ও দুজন মহিলা সাক্ষী হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে অভিযুক্তের ওপর চুরির হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[৭৯]

মিথ্যা বা ভুল সাক্ষ্য দান ঃ

যদি সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্যদান করতে ভুল করে এবং এর ফলে কারো হাত কাটা হয় এবং পরে তাদের সাক্ষ্য মিথ্যা হওয়া প্রকাশ পায় কিংবা তারা বলে যে, তারা

---

৭৭. ইবন 'আবদিল বাররা, *আত-তামহীদ*, খ.১৪, পৃ.৩৮৩; জসসাস, *আহকামুল কুর'আন*, খ.৪, পৃ.৮৪

৭৮. মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ. ৫৩৯; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ. ১৬৪; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ. ৫, পৃ. ১৭১; খ.৯, ১১৩-৪; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৮৯-৯০; গানিম, *মাজমা'উদ দিয়ানাত*, পৃ. ২০৩; আল-মারদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ.২৮৯

৭৯. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৮১; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ. ৮৬-৮৭; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১১৮

জেনে শুনেই তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে, তা হলে কর্তিত হাতের জন্য সাক্ষীদ্বয়কে দিয়াত আদায় করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে হাতের বিনিময়ে হাত কাটা যাবে না।[৮০]

২. মৌখিক স্বীকৃতি

চোরের অভিযোগে অভিযুক্ত সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি[৮১] যদি স্বেচ্ছায় আদালতে বিচারকের সামনে চুরির সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি করে তাহলে চুরি প্রমাণিত হবে[৮২] এবং তাকে চুরির হদ্দ ভোগ করতে হবে।[৮৩] এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। তবে কতবার স্বীকারোক্তি দিতে হবে- তা নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশদের মতে, একবার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। তবে হাম্বলীগণ এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ)-এর মতে, দু'এজলাসে দুবার স্বীকৃতি দ্বারা চুরি প্রমাণিত হবে। যদি একবার স্বীকারোক্তি দেয়, তাহলে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তবে তা'যীরী শাস্তি দেয়া যাবে এবং চুরিকৃত মাল কিংবা তার মূল্য ফিরিয়ে দিতে হবে।[৮৪]

স্বীকারকারী যদি নিজের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয় এবং বলে যে, সে একান্ত চাপে পড়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছে, তাহলে তার কথা আমলে নেয়া হবে এবং তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না।[৮৫]

---

৮০. আল-জাযীরী, *কিতাবুল ফিকহ 'আলাল মাযাহিবিল 'আরবা'আ*, খ.৫, পৃ.১৬৫

৮১. হানাফীগণের মতে স্বীকারোক্তিদানকারীকে বাকশক্তি সম্পন্ন হতে হতে হবে। কোন বোবা ব্যক্তির স্বীকৃতিমূলক ইঙ্গিত দ্বারা হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।

৮২. অধিকাংশের মতে, মালিকের দাবীর প্রেক্ষিতেই যদি চোর স্বীকারোক্তি করে, তবেই তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। এ কারণেই অজ্ঞাত কিংবা অনুপস্থিত কোন লোকের মাল কেউ চুরি করলে তাতে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। পক্ষান্তরে মালিকীগণের মতে, স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবার জন্য মালিকের দাবী থাকার শর্ত নেই। এ কারণে তাঁদের দৃষ্টিতে, অজ্ঞাত কিংবা অনুপস্থিত কোন লোকের মাল কেউ চুরি করলে তাতে হদ্দ কার্যকর করতে হবে। (মালিক, *মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ.৫৪৯)

৮৩. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৮১; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ. ৮৬-৮৭; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১১৮

৮৪. ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১১৮; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.১৮২; আল-বাহুতী, *কাশফুল কিনা'*, খ.৬, পৃ.১৪৪-৫; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরু'*, খ.৬, পৃ.১২২

৮৫. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.১৪১; আল-বাজী, *আল-মুন্তাকা*, খ.৭,পৃ. ১৬৮; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১১৯-২০। তবে বিচারকের কাছে যদি বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি সত্যিই অপরাধী। তা হলে মালিকীগণ এবং হানাফীগণের মধ্যে পরবর্তীকালের অনেক মুফতীই চাপের মুখে চোরের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে বলে মত

৩. শপথ

যখন চুরিকৃত সম্পদের মালিকের দাবীর পক্ষে কোন সাক্ষী থাকে না, আর চোরও স্বীকার করে না, তখন চোরকে শপথ করতে বলা হবে। যদি সে শপথ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন সম্পদের মালিককে শপথ করতে বলা হবে। যদি সে দাবীর পক্ষে শপথ করে বলে, তাহলে শাফি'ঈগণের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মালিকের এ শপথ দ্বারা চুরি প্রমাণিত হবে এবং চোরের হাতও কাটা যাবে। তবে হানাফী, মালিকী ও হাম্বলী ইমামগণের নিকট এ রূপ অবস্থায় চোরের হাত কাটা যাবে না।[৮৬]

৪. লক্ষণ-প্রমাণ

কারো কারো মতে বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারাও চুরি প্রমাণিত হবে, যদি তাতে সুস্পষ্টভাবে চুরির প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ভিত্তিতে চোরের হাতও কাটা হবে এবং তাকে মালের ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। ইবনুল কাইয়েম বলেন, মুসলিম খলীফা ও শাসকগণ চুরির অভিযুক্ত ব্যক্তির হাত কাটতে নির্দেশ দিতেন, যদি তার কাছে চুরিকৃত মাল পাওয়া যেত। কেননা সাক্ষ্য ও চোরের স্বীকারোক্তির চাইতে চুরি সাব্যস্ত করার জন্য সুস্পষ্ট লক্ষণ অধিকতর শক্তিশালী প্রমাণ। কারণ, সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি যেহেতু এক প্রকার সংবাদ দান, তাই এগুলোর মধ্যে সত্য-মিথ্যার একটা অবকাশ সবসময় বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে চুরিকৃত মাল অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে পাওয়া গেলে তাতে চুরির ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকবার কথা নয়।[৮৭] তবে অধিকাংশ ইমামের মতে, সাক্ষ্য-প্রমাণ কিংবা স্বীকারোক্তি ছাড়া অন্য কোনভাবেই হদ্দযোগ্য চুরি প্রমাণ করা যাবে না।[৮৮]

শাস্তি রহিত হবার কারণসমূহ ঃ

বিভিন্ন কারণে ও অবস্থার প্রেক্ষিতে চুরির হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। তন্মধ্যে কিছু বিষয় চোরের সাথে (যেমন-তাওবা), আর কিছু বিষয় চুরিকৃত বস্তুর মালিকের সাথে (যেমন- ক্ষমা ও সুপারিশ), আর কিছু বিষয় চুরিকৃত মালের সাথে (যেমন-

---

দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য হল, চোরেরা স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দেবে- এ ধরনের ঘটনা তো সচরাচর ঘটে না। (*আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা*, খ.২৪, পৃ. ৩৪৩)

৮৬. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.১৫০; যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৪, পৃ. ২৯৭; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১২২; যাকারিয়া আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ. ১৫০

৮৭. ইবনুল কাইয়েম আল-জাওযিয়্যা, *ই'লামুল মু'আক্কি'ঈন*, খ.২, পৃ. ৭৬-৭৭

৮৮. ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১১৮

চুরিকৃত বস্তুতে চোরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া) সংশ্লিষ্ট। আবার কখনো আদালতে নালিশ পেশ করতে বেশি দেরি হয়ে গেলেও শাস্তি রহিত হয়ে যায়।

১. সুপারিশ

মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন এবং তাওবার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে আদালতে চুরির দাবী উত্থাপিত হওয়ার আগে চোরের জন্য সুপারিশ করা জায়িয, যদি সে কুখ্যাত ও পেশাদার চোর না হয়। তবে আদালতে নালিশ দায়েরের পর তার জন্য সুপারিশ করা হারাম। বর্ণিত রয়েছে, হযরত উসামা (রা) যখন মাখযুম গোত্রের জনৈকা মহিলা চোরের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে সুপারিশ নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি রাগত স্বরে বলেছিলেন, أتشفع في حد من حدود الله ؟ - "তুমি কি আল্লাহর একটি হদ্দের প্রসঙ্গে আমাকে সুপারিশ করছ?"[৮৯] এ হাদীস থেকে জানা যায়, বিচারকের নিকট দাবী উত্থাপিত হবার পর হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করা জায়িয নয়। তবে বিচারকের নিকট দাবী উত্থাপিত হবার আগে হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করতে কোন অসুবিধা নেই।[৯০] বর্ণিত আছে, একবার হযরত যুবায়র ইবনুল 'আওয়াম (রা) জনৈক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, সে একজন চোরকে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। হযরত যুবায়র (রা) তাকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য সুপারিশ করলেন। কিন্তু লোকটি বললেন ঃ না , আমি তাকে খলীফার কাছে নিয়ে যাব। তখন হযরত যুবায়র (রা) বললেন ঃ إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع و المشفع. - "যদি খলীফার কাছে বিষয়টি পৌঁছে যায়, তা হলে সুপারিশকারী ও সুপারিশ গ্রহণকারী দুজনের ওপরই আল্লাহর লানত হবে।"[৯১]

২. ক্ষমা

সুপারিশের মত আদালতে চুরির দাবী উত্থাপিত হওয়ার আগে চোরকে ক্ষমা করে দিতে অসুবিধা নেই। তদুপরি তা উত্তম হবে, যদি সে কুখ্যাত ও পেশাদার চোর না হয়। তবে আদালতে নালিশ দায়েরের পর তাকে ক্ষমা করে দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من فقد وجب. - "তোমরা পরস্পর একে

---

৮৯. সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুল আম্বিয়া), হা.নং: ৩২৮৮; মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ৪৩৮৬, ৪৩৮৭

৯০. মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ. ৪, পৃ. ৫৩১; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ. ১৬৩; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১২০

৯১. আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ. ১৬৩

অপরকে হদ্দ ক্ষমা করে দাও। তবে যে মাত্র আমার কাছে হদ্দের নালিশ আসবে, তখন হদ্দের কার্যকারিতা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়বে।" [৯২]

৩. তাওবাহ

চোর যদি তাওবাহ করে চুরিকৃত মাল মালিককে ফেরত দেয় এবং নিজেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পন করে, তা হলেও হদ্দ রহিত হবে না। এটাই অধিকাংশ ইমামের অভিমত।[৯৩] বর্ণিত আছে, হযরত 'আমর ইবনু সামূরা (রা) উষ্ট্র চুরির ঘটনায় তাওবা করে পবিত্র হবার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলে তিনি তার হাত কেটে দেন।[৯৪] এ থেকে জানা যায়, তাওবা করলেও হদ্দ রহিত হবে না। তবে শাফি'ঈ ও হাম্বলী মতাবলম্বী কারো কারো মতে, চোর যদি তাওবাহ করে চুরিকৃত মাল মালিককে ফেরত দেয় এবং নিজেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পন করে, তা হলে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[৯৫]

৪. স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার

চোরের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে চুরি প্রমাণিত হবার পর হাত কাটার আগে সে যদি নিজের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে হদ্দ কার্যকর হবে না। কারণ এমতাবস্থায় অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে কারো কারো মতে, চোর স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং হদ্দও রহিত হবে না। যেমন কারো প্রাপ্যের কথা স্বীকার করার পর যদি কেউ তার কথা থেকে ফিরে আসে তা যেমন গ্রহণযোগ্য হয় না, তেমনি চুরির ক্ষেত্রেও স্বীকারোক্তি করার পর তা প্রত্যাহার করে নিলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে না।[৯৬]

৫. হদ্দ অনুপযোগীদের সাথে চুরিতে অংশগ্রহণ

হদ্দের শাস্তিযোগ্য নয় (যেমন- অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগল) এমন লোকদের সাথে

---

৯২. ইবনু 'আবদিল বারর, *আত-তামহীদ*, খ.১১, পৃ. ২২৪; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১২০

৯৩. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ,১০৪; আস-সাভী, *বুলগাতুস সালিক*, খ.৪, পৃ. ৪৮৯

৯৪. ইবনু মাজাহ, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ২৫৮৮

৯৫. আল-বাহুতী, *কাশফুল কিনা'*, খ.৬, পৃ.১৫৩-১৫৪; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা*, খ.২৪, পৃ.৩৪৩

৯৬. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.১৪১; আল-বাজী, *আল-মুন্তাকা*, খ.৭,পৃ. ১৬৮; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১১৯-২০

মিলে কেউ চুরি করলে কারো জন্য হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। কেননা এখানে চুরিকর্ম হল একটিই। অতএব একটি অপরাধে জড়িত বিভিন্নজনকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির শাস্তি দেয়া যুক্তিযুক্ত নয়। এটা অধিকাংশ হানাফী ও হাম্বলীগণের অভিমত। তবে হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ)-এর মতে এ রূপ অবস্থায় হদ্দযোগ্য লোকদের হদ্দ রহিত হবে না। তবে যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা পাগলরা নিজেরাই চুরির মাল বের করে নিয়ে আসে এবং অন্যান্য লোকেরা কেবল বাইরে অবস্থান করে তাদের সহযোগিতা করে, তাহলেই তারা হদ্দযোগ্য হবে না। মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামগণের মতে চুরিতে শরীক হদ্দযোগ্য লোকদের জন্য হদ্দের বিধান প্রযোজ্য হবে।[৯৭]

৬. মালিকানা স্বত্ব অর্জন

হদ্দের রায় ঘোষণা দেবার আগেই যদি চোর যে কোন উপায়ে চুরিকৃত বস্তুর মালিক বনে যায় (যেমন- চোর চুরিকৃত বস্তুটি মালিক থেকে কিনে নিল কিংবা মালিক বস্তুটি তাকে দান করে দিল), তা হলেও চোরের হাত কাটা যাবে না। কেননা চুরির রায় দেবার জন্য যেখানে আর্জি পেশ করার শর্ত রয়েছে, সেক্ষেত্রে বিচারকের রায় দেবার আগে চোরের চুরিকৃত বস্তুর মালিক বনে যাওয়া দ্বারা বোঝা যায় যে, এখানে চুরির ব্যাপারে কারো কোন আর্জিই নেই। তবে মালিকীগণের মতে এ রূপ অবস্থায় হদ্দ রহিত হবে না।

তবে রায় ঘোষণার পর এবং হাত কাটার আগে যদি চোর কোনভাবে চুরিকৃত বস্তুর মালিক বনে যায়, তা হলে অধিকাংশদের মতে হদ্দ রহিত হবে না। তবে কতিপয় হানাফী মতাবলম্বীর মতে, এ রূপ অবস্থায়ও হদ্দ রহিত হবে।[৯৮]

৭. হদ্দ কার্যকারিতায় বিলম্ব

চুরির রায় দেবার পর দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে হাত কাটার বিধান রহিত হয়ে যাবে। এটাই অধিকাংশ হানাফী ইমামের অভিমত। তবে অন্যান্য সকল ইমামের মতে, চুরির রায় দেবার পর- যত দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হোক না কেন- হাত কাটার বিধান রহিত হবে না। কেননা এ রূপ অবস্থায় হদ্দ রহিত হয়ে গেলে অপরাধীদের মধ্যে অপরাধ করার পর পালিয়ে হদ্দ থেকে রেহাই পাবার প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠবে।[৯৯]

---

৯৭. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.১২৯, ১৮৯; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.৫৫; মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪,পৃ. ৩৩৫; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১২১

৯৮. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৭৯, ১৮৬; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ৮৯; আল-বাজী, *আল-মুন্তাকা*, খ.৭,পৃ. ১৬৩; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১১২

৯৯ আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.১৭৬; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, খ.২, পৃ. ১৮৩

৮. কর্তনের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্গ না থাকা

প্রথমবার চুরিতে চোরের ডান হাত কাটতে হবে- এটাই হল ইসলামী শাস্তি আইনের বিধান। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, চুরি করার আগে ডান হাত দুর্ঘটনায় পড়ে বা অন্য কোন অপরাধের শাস্তি (যেমন কিসাস) হিসেবে কেটে ফেলা হয়েছে, তা হলে চুরির শাস্তি হিসেবে তার বাম পা কাটতে হবে। যদি তা চুরি করার পরে কেটে ফেলা হয়, তা হলে হাত কর্তনের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে, চাই এ হাতকর্তন চুরির পরে বিচারকের কাছে আর্জি পেশ করার আগে হোক কিংবা পরে, চুরির রায় ঘোষণা দেবার আগে হোক বা পরে, চাই তার হাত কোন বিপদে কাটা যাক কিংবা কোন অপরাধের শাস্তি হিসেবে কাটা যাক- সর্বাবস্থায় এ হুকম প্রযোজ্য হবে। কেননা প্রথমবার চুরিতে কর্তনের নির্দেশ চোরের ডান হাতের সাথে জড়িত। অতএব, চুরির পর যেহেতু তা ধ্বংসই হয়ে গেল, তাই কর্তনের বিধানটিও রহিত হয়ে যাবে। এটি হল অধিকাংশ ইমামের অভিমত। হানাফীগণের মতে আর্জি পেশ করার পরে রায় দেবার আগে কিংবা মালিকের আর্জি পেশ ও বিচারকের রায় দেবার পরেই যদি তার ডান হাত কেটে ফেলা হয়, তবেই চুরির শাস্তি হিসেবে হাত কর্তনের বিধান রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে চুরির আগে কিংবা চুরির পরে মালিকের আর্জি পেশ করার আগেই যদি ডান হাত কেটে ফেলা হয়, তা হলে ডান হাতের পরিবর্তে বাম পা কাটতে হবে।

অনুরূপভাবে যদি দেখা যায় যে, তার ডান হাত সুস্থ আছে; কিন্তু বাম হাত বেকার কিংবা কর্তিত, তাহলে তার ডান হাত কর্তন করা যাবে না। কেননা এ রূপ অবস্থায় তার ডান হাত কাটা হলে তার জীবনই বিপন্ন হয়ে যাবে। এটা হানাফীগণের অভিমত। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামগণের দৃষ্টিতে এমতাবস্থায় তার ডান হাত কাটতে হবে। অনুরূপভাবে পায়ের ক্ষেত্রেও এ বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ যদি দেখা যায় যে, তার বাম পা সুস্থ আছে; কিন্তু ডান পা বেকার কিংবা কর্তিত, তাহলে তার বাম পা কর্তন করা যাবে না। কেননা এ রূপ অবস্থায় তার বাম পা কাটা হলে তার জীবনই বিপন্ন হয়ে যাবে। এটা হানাফীগণের অভিমত। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামগণের দৃষ্টিতে এমতাবস্থায় তার বাম পা কাটতে হবে।[১০০]

---

১০০. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.১৭৫; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ-১০৫; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১০৮; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ.৪, পৃ.১৩৬-৭, আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ. ২৮৬-৭; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬,পৃ. ১৪২-৩; হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯, পৃ.২৫৪-৫; আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারিল খলীল*, খ.৮, পৃ.১০৩

২. সশস্ত্র ডাকাতি ও লুণ্ঠনের শাস্তি

ধন-সম্পদের নিরাপত্তা লাভ ব্যক্তিজীবনের উন্নতির প্রধান চাবিকাঠি। তদুপরি সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগতির জন্যও এটি মৌলিক প্রয়োজন হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্যের সম্পদের ওপর যে কোন ধরনের সীমালঙ্ঘনকে ইসলাম চরমভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কারো অগোচরে তার সম্পদ হরণ করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি শক্তি প্রদর্শন করে দাপটের সাথে কারো সম্পদ লুঠ করাও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। চুরিতে মানুষের জান ও ইজ্জত-আব্রুর ওপর আক্রমণ করা হয় না; কিন্তু ডাকাতি ও অপহরনের সময় মানুষের জান ও ইজ্জত-আব্রু-দুইয়ের ওপরই নগ্ন হামলা করা হয়। তাই এর শাস্তিও স্বাভাবিকভাবে কঠোর হওয়া চাই। তাই ইসলামও এ অপরাধের জন্য অত্যন্ত কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে। তদুপরি এ ধরনের অপরাধীকে পবিত্র কুর'আনে 'আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধকারী' ও 'যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী' রূপে আখ্যা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসে উম্মাতকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন,. من حمل السلاح علينا فليس منا - "যে ব্যক্তি আমাদের প্রতি অস্ত্র ধারণ করবে, সে আমার উম্মাতের অর্ন্তভুক্ত নয়।"[১]

'হিরাবাহ'-এর সংজ্ঞা ঃ

সশস্ত্র ডাকাতি ও লুণ্ঠনকে আরবীতে حرابة বলা হয়।[২] এর আভিধানিক অর্থ হল যুদ্ধ কিংবা লুণ্ঠন ও অপহরণ[৩]। শরী'আতের পরিভাষায় এর অর্থ হল, কারো সম্পদ অর্জন করা, কিংবা কাউকে হত্যা করা বা কারো ইজ্জত-আব্রু নষ্ট করা[৪]

---

১. আল বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা,* (বাবঃ তাহরীমুল কাতল...), হা.নংঃ ১৫৬৩৩

২. আরবীতে غصب (লুটতরাজ) ও قطع الطريق (ডাকাতি) প্রভৃতি শব্দও এর সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩. এটি حرب শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর 'রা' বর্ণ সাকিন হলে শান্তির বিপরীত অর্থাৎ যুদ্ধ অর্থে এবং 'রা' বর্ণ যবরযুক্ত হলে লুণ্ঠন ও অপহরণ অর্থে ব্যবহার করা হয়। (ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব,* খ.১, পৃ. ৩০৪)

৪. হাম্বলীগণের মতে, কেবল সম্পদ হরণের উদ্দেশ্যে কারো ওপর সশস্ত্র চড়াও হওয়াকে 'হিরাবাহ' বলা হয়। তবে শাফি'ঈ ও মালিকী ইমামগণ সম্পদ হরণের উদ্দেশ্যকে শর্তারোপ করেন নি; বরং কাউকে হত্যা করা কিংবা কারো ইজ্জত আব্রু নষ্ট করা অথবা পথ-ঘাট বন্ধ করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ত্রাস সৃষ্টি করা প্রভৃতি অপরাধও 'হিরাবাহ'-এর পর্যায়ভুক্ত। পরবর্তী কালের হানাফীগণও সম্পদ হরণের উদ্দেশ্যকে শর্তারোপ করেননি।

অথবা ত্রাস সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অবস্থায় প্রকাশ্যে দাপটের সাথে কারো ওপর চড়াও হওয়া।[৫] অধিকাংশ ইমামের মতে, এ রূপ আক্রমণ যেখানেই হোক- চাই তা শহর-নগর-গ্রাম-জনপদে হোক কিংবা নির্জন পথে-ঘাটে কিংবা মাঠে-ময়দানে হোক- তা 'হিরাবাহ' (ডাকাতি) হিসেবে ধর্তব্য হবে।[৬] উপর্যুক্ত সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে, নিম্নে বর্ণিত যে কোন অপরাধ حرابة (ডাকাতি ও লুণ্ঠন) রূপে গণ্য হবে।

ক. কারো সম্পদ ছিনতাই, কিংবা কাউকে হত্যা বা কারো ইজ্জত-আব্রু নষ্ট করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অবস্থায় দাপটের সাথে বের হওয়া। যদিও কারো সম্পদ ছিনিয়ে নিতে বা ইজ্জত-আব্রু নষ্ট করতে কিংবা কাউকে হত্যা করতে সমর্থ হয় নি।

খ. কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অবস্থায় দাপটের সাথে বের হয়ে কাউকে হত্যা করেছে কিংবা মারধর করেছে; কিন্তু সম্পদ ছিনিয়ে নেয় নি।

গ. কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অবস্থায় দাপটের সাথে বের হয়ে কাউকে হত্যাও করে নি কিংবা মারধরও করে নি; তবে সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে।

ঘ. সশস্ত্র অবস্থায় দাপটের সাথে বের হয়ে কারো সম্পদও ছিনিয়ে নিয়েছে এবং কাউকে হত্যাও করেছে কিংবা মারধর করেছে।[৭]

'হিরাবাহ'কে বড় চুরিও বলা হয়। চুরি এ জন্য বলা হয় যে, দেশের সর্বত্র নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু ডাকাত ও অপহরণকারীরা সরকারের অগোচরেই মানুষের সম্পদ নষ্ট করে। বড় চুরি বলার কারণ হল, এর অপকারিতা ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সর্বসাধারণ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৮]

---

৫. ইবনু 'আরাফাহ, মুহাম্মাদ, *আল-হুদূদ*, পৃ. ৫০৮; যাকারিয়া আল-আনসারী, *আল-গুরর আল-বহিয়্যা*, খ. ৫, পৃ. ১০১; আল-মারদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ. ১০, পৃ. ২৯১; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ. ১৬৯

৬. ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতে, কেবল জনপদের বাইরে সংঘটিত সশস্ত্র ডাকাতিই কেবল হদ্দযোগ্য অপরাধ। (আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ২০১-২; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১২৪)

৭. আল-বাবরতী, *আল-'ইনায়াহ*, খ. ৫, পৃ. ৪২৪-৬; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, খ. ৪২৩-৪

৮. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ. ২৩৫

ডাকাতির মূল উপাদান ঃ

ডাকাতির মূল উপাদান হল ঃ প্রকাশ্যে অস্ত্র বা শক্তি প্রদর্শন করে কারো ওপর চড়াও হয়ে তার সম্পদ হরণ করা। এ অস্ত্র ও শক্তি প্রদর্শনকারী চাই এক ব্যক্তি হোক কিংবা একদল। অতএব, প্রকাশ্য অস্ত্র বা শক্তি প্রদর্শন করে সম্পদ লুণ্ঠন করা না হলে তা ডাকাতি হবে না; চুরি হবে। আর যদি সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে ছিনতাইকারী বলা হবে। তাদের অপরাধ ডাকাতির আওতায় আসবে না।[৯]

ডাকাতির শর্তাবলী ঃ

ডাকাতির হদ্দ প্রয়োগ করার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু ডাকাতের সাথে, আর কিছু যাদের ওপর হানা দেয়া হয় তাদের সাথে, আর কিছু উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাছাড়া ডাকাতিকৃত সম্পদ এবং যে স্থানে ডাকাতি করা হয় তার সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় শর্তও রয়েছে।

ডাকাতের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী ঃ

১. মুসলিম কিংবা যিম্মী হতে হবে।

ডাকাতির হদ্দ প্রয়োগ করতে হলে ডাকাতকে মুসলিম হতে হবে কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক হতে হবে। রাষ্ট্রের কোন অস্থায়ী অমুসলিম নাগরিকের ওপর ডাকাতির জন্য হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তবে দেশীয় আইনে তাদের বিচার করা যাবে।[১০]

২. প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন হতে হবে।

হদ্দ প্রয়োগের জন্য ডাকাতকে প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন হতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা কোন পাগল ডাকাতি করলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তবে কোন পুরুষ যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা কোন পাগলের সাথে মিলে ডাকাতি করে, তাহলে অধিকাংশ ইমামের মতে- তার হদ্দ রহিত হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতে, তাদের কারো ওপর হদ্দ জারি করা যাবে না, চাই সে অপরাধে লিপ্ত হোক বা না হোক। তাঁর কথা হল, এখানে অপরাধ যেহেতু

---

৯. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ৯০-১; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ. ৯, পৃ. ১২৪; আল-বহুতী, *কাশ্শাফ*, খ.৬, পৃ. ১৫০

১০. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১৯৫; মুল্লা খাসরু, *দুরারুল হুক্কাম*, খ.২, পৃ. ৮৫; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ. ৯, পৃ. ১৩১

একটা, তাই একটা অপরাধের জন্য অপরাধীদের কাউকে হদ্দ প্রয়োগ করা হবে, আবার কাউকে হদ্দ থেকে রেহাই দেয়া হবে- তা সমীচীন নয়। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ)-এর মতে- সে অপরাধে লিপ্ত হলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে।[১১]

৩. পুরুষ হতে হবে।

হানাফীগণের মতে, হদ্দ কার্যকর করতে হলে ডাকাতকে পুরুষ হতে হবে। কোন নারী ডাকাতের ওপর ডাকাতির হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ, নারীরা যেহেতু স্বভাবগতভাবে কোমল ও নরম এবং দৈহিকভাবে দুর্বল হবার কারণে কারো ওপর দাপটের সাথে চড়াও হতে পারে না, তাই 'ডাকাতি' শব্দটি তাদের জন্য পুরো প্রযোজ্য নয়। অনুরূপভাবে কোন পুরুষ যদি তাদের সাথে মিলে ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করে, তার ওপরও হদ্দ কার্যকর যাবে না, চাই সে নিজে অপরাধে লিপ্ত হোক কিংবা না হোক। তবে হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ)-এর মতে, যদি কোন মহিলা সরাসরি কারো ওপর চড়াও হয়ে তার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তাহলে তার সহযোগী পুরুষদের ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে। তাঁর কথা হল, মহিলাদের ওপর ডাকাতির হদ্দ কার্যকর করা বিধেয় না হবার কারণ তাদের নিজস্ব কোন অযোগ্যতার কারণে নয়; বরং সচরাচর তাদের থেকে এ ধরনের ঘটনা ঘটে না, তাই বলে তাদেরকে এ হদ্দ থেকে রেহাই দেয়া হয়। কিন্তু তার সহযোগী পুরুষের বেলায় তো আর এ অজুহাত নেই। তার ওপর হদ্দ কার্যকর করতে কোন বাধা নেই।[১২]

অন্যান্য তিন মাযহাবের ইমামগণের মতে, পুরুষের মতো নারীদেরও ওপরও ডাকাতির হদ্দ কার্যকর করা যাবে। তাঁদের মতে, কয়েকজন নারী যদি মিলিত হয়ে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে অপরের ওপর চড়াও হয়, তাহলে তাদের অপরাধ ডাকাতির হদ্দের আওতায় ধর্তব্য হবে।[১৩]

৪. ডাকাতদেরকে সশস্ত্র হতে হবে।

হানাফী ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, হদ্দ কার্যকর করার জন্য ডাকাতদের সাথে যে কোনরূপ অস্ত্র থাকতে হবে। তা ধারালো কোন অস্ত্রও হতে পারে কিংবা

---

১১. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ৯০-১; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ. ৯, পৃ. ১৩১; মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ. ৫৫৫; রু'আয়নী, *মাওয়াহিবুল জলীল*, খ.৬, পৃ. ৩১৪

১২. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১৯৭-৮; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ৯০-১; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ. ৯, পৃ. ১৩১

১৩. মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ. ৫৫৫; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৪, পৃ. ৩১২; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ. ৯, পৃ. ১৩১; আল-বহুতী, *কাশ্শাফ*, খ.৬, পৃ. ১৫২

আগ্নেয়াস্ত্রও হতে পারে। লাঠি-সোটা ও পাথর ইত্যাদিও অস্ত্রের মধ্যে গণ্য হবে। মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামগণ কোনরূপ অস্ত্রের শর্ত আরোপ করেন নি। তাঁদের মতে, ডাকাতির জন্য ডাকাতদের নিজস্ব শক্তি ও অঙ্গ ব্যবহার করতে (যেমন- কিল, ঘুষি ও লাথি প্রভৃতি) সামর্থবান হওয়াই যথেষ্ট। উপরন্তু, ইমাম মালিক (রহ)-এর মতে, প্রতারণা করতে সক্ষম হওয়া, ঘায়েল করা, মাদক দ্রব্য সেবন করানো- যথেষ্ট হবে। শক্তি ব্যবহার না করেও চাতুর্যের সাথে যদি এগুলো করতে পারে সেও ডাকাত রূপে গণ্য হবে।[১৪]

ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ) রাত ও দিনের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। দিনের বেলা হলে তিনি ডাকাতির জন্য অস্ত্রের শর্তারোপ করেছেন আর রাতের জন্য অস্ত্রের শর্তারোপ করেন নি। তাঁর মতে- শুধু লাঠি ও পাথর দ্বারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করাই যথেষ্ট হবে।[১৫] হানাফীগণের মধ্যে পরবর্তীকালের বিশেষজ্ঞগণের নিকট এ মতটি অধিকতর অগ্রগণ্য।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ঘরে-বাইরে নিরীহ ব্যক্তিদের ওপর আক্রমণের জন্য ডাকাতির বহু প্রকারের আধুনিক পদ্ধতি[১৬] আবিস্কৃত হয়েছে। দিন ও রাতে সমানভাবে বিনা অস্ত্রে তা ব্যবহৃত হচ্ছে। ডাকাতদের নিত্যনতুন কৌশলের হাতে যিম্মী লোকদের পক্ষে কারো সাহায্য চাওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। তাই বর্তমান অবস্থায় ডাকাতদের নির্মূল করার প্রয়োজনে হানাফী ও হাম্বলীগণের মতের চাইতে মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামগণের মতই অধিকতর বাস্তবধর্মী ও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলীঃ

১. মুসলিম বা যিম্মী হতে হবে

আক্রান্ত ব্যক্তি মুসলিম কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক হলেই কেবল ডাকাতদের ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে।[১৭] যদি আক্রান্ত ব্যক্তি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী কিংবা কোন চুক্তির ভিত্তিতে সাময়িকভাবে অনুপ্রবেশকারী

---

১৪. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ. ১১৪; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ. ৭, পৃ. ৯২; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, খ.৭৪; মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৭, পৃ. ৫৫৭; আশ-শারবীনী, *মুগনিউল মুহতাজ*, খ.৪, পৃ. ১৮০

১৫. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ. ৭, পৃ. ৯২;

১৬. যেমন নেশাজাত কিংবা অজ্ঞানকারী কোন বস্তু সেবন করানো কিংবা ঘ্রাণ ছড়ানো, গামছা জড়িয়ে অজ্ঞান করে হত্যা করা প্রভৃতি।

১৭. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ. ১৬৪; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ. ৭, পৃ. ৯১

অমুসলিম হয়, তা হলে ডাকাতদের ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না; তবে তা'যীরের আওতায় আদালতের সুবিবেচনা অনুযায়ী শাস্তি দেয়া যাবে।

২. সম্পদের ওপর তাদের যথার্থ মালিকানা থাকতে হবে

লুটকৃত সম্পদের ওপর আক্রান্ত ব্যক্তির বিশুদ্ধ মালিকানা থাকতে হবে কিংবা তার আমানতদার বা দায়িত্বশীল হতে হবে। যদি লুটকৃত সম্পদের ওপর আক্রান্ত ব্যক্তির মালিকানা বা দখল স্বত্ব বিশুদ্ধ না হয় (যেমন চুরিকৃত মালের ওপর চোরের অধিকার), তা হলেও ডাকাতের ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[১৮]

ডাকাত ও আক্রান্ত ব্যক্তি-দুপক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী ঃ

১. ডাকাত আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় হবে না

ডাকাত যদি আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তসম্পর্কীয় কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় (যেমন- পিতা, দাদা, ছেলে, নাতি ও ভাই প্রভৃতি) হয়, তা হলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[১৯] কারণ, এ সব আত্মীয়ের মধ্যে যেহেতু একে অপরের কাছে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে এবং পরস্পরের সম্পদ ভোগ করার বেলায় বাড়তি কিছু সুযোগ পেয়ে থাকে, তাই এর ফলে তাদের ডাকাতির ক্ষেত্রে একটি সন্দেহ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। অধিকন্তু ডাকাতির কারণে তাদের ওপর হদ্দ কার্যকর হলে তাতে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্কও নষ্ট হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে ডাকাতদের মধ্যে কোন একজন আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তসম্পর্কীয় কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলে অবশিষ্ট ডাকাতদের ওপরও হদ্দ কার্যকর করা বাধ্যতামূলক হবে না। এটা হানাফী স্কুলের অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের মতে অবশিষ্ট ডাকাতদের ওপর হদ্দ কার্যকর করতে হবে।[২০]

লুটকৃত সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী ঃ

ইতঃপূর্বে চুরির হদ্দ কার্যকর করার জন্য চুরিকৃত সম্পদের জন্য যে সব শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে সব শর্ত ডাকাতির মালের জন্যও প্রযোজ্য হবে।[২১] এ শর্তগুলোর মধ্যে প্রধান প্রধান শর্ত হল ঃ

---

১৮. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ. ৭, পৃ. ৯১
১৯. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ. ৭, পৃ. ৯২
২০. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ. ৭, পৃ. ৯২; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১৩১
২১. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ. ৭, পৃ-৯২ (বিস্তারিত জানার জন্য চুরির অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

১. আর্থিক মূল্যসম্পন্ন হওয়া

২. কারো মালিকানা বা বৈধ দখলভুক্ত হওয়া

৩. সংরক্ষিত থাকা

৪. নিসাব পরিমাণ হওয়া অর্থাৎ দশ দিরহামের সমপরিমাণ কিংবা ততোধিক হওয়া।[২২] যদি ডাকাতরা ভাগে প্রত্যেকেই ন্যূনতম দশ দিরহামের সমপরিমাণ সম্পদ না পায়, তা হলে সম্পদ লুঠের জন্য তাদের কারো ওপর ডাকাতির হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[২৩]

স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী ঃ

১. ইসলামী রাষ্ট্রে হতে হবে

ডাকাতি ইসলামী রাষ্ট্রে সংঘটিত হলেই হদ্দ কার্যকর করা হবে। অমুসলিম কিংবা অ-ইসলামী রাষ্ট্রে সংঘটিত কোন ডাকাতির জন্য কোন ডাকাতের ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[২৪]

২. শহরের বাইরে হতে হবে

হানাফী ও অধিকাংশ হাম্বলী ইমামের মতে শহর-নগর-গ্রাম-জনপদের বাইরে দূরে পথে-ঘাটে, নির্জন মাঠে-ময়দানে, নদীতে-মরুভূমিতে ডাকাতি হলেই তার জন্য হদ্দ কার্যকর করা হবে। কোন শহর বা জনপদে ডাকাতি হলে সে জন্য ডাকাতির হদ্দ প্রয়োগ করা সমীচীন নয়। তাঁদের বক্তব্য হল ঃ যারা শহর বা জনপদে বাস করে, তারা আক্রমণের সময় চিৎকার করতে পারে এবং চিৎকার শুনে খুব কাছাকাছি থেকে লোকজন এসে জড়ো হতে পারে কিংবা নিরাপত্তা কর্মীরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারে। তখন স্বাভাবিকভাবে হামলাকারীদের দাপট খতম হয়ে যায়। তাই এ ধরনের কর্মকে ডাকাতি নয়; ছিনতাই বলা হয়। এ জন্য হদ্দ নয়; তা'যীরের আওতায় আদালতের সুবিবেচনা অনুযায়ী যে কোন শাস্তি নির্ধারিত হবে।[২৫]

---

২২. ইমাম হাসান ইবন যিয়াদ আল-হানাফী (রহ)-এর মতে ডাকাতির নিসাব চুরির দ্বিগুণ অর্থাৎ বিশ দিরহাম। তাঁর বক্তব্য হল ঃ চুরিতে যেহেতু একটা হাত বা পা কর্তন করা হয় আর ডাকাতিতে দুটি অঙ্গই কর্তন করা হয়, তাই এর জন্য বিশ দিরহামের নিসাব নির্ধারণ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। (আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ. ৭, পৃ. ৯২)

২৩. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ. ২৩৬; আল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাহ*, খ.২,পৃ. ১৭২

২৪. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ. ৭, পৃ. ৯২

২৫. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ২০১-২; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১২৪

শাফি'ঈ ও মালিকী ইমামগণের মতে শহর-জনপদ এবং দূরের পথ-ঘাট ও নির্জন মাঠে-ময়দানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে তাঁরা আক্রান্তদের ফরিয়াদের সাড়া দেয়ার মত কারো না থাকার শর্ত আরোপ করেছেন।[২৬] অতএব তাঁদের মতে, যারা কোন শহর বা জনপদের বাড়িতে ঢুকে অস্ত্রের মুখে বাড়ির সদস্যদেরকে যিম্মী করে রাখে, তারাও ডাকাতরূপে গণ্য হবে। তাঁদের বক্তব্য হলঃ প্রথমত কুর'আনের আয়াতে يحاربون শব্দটি ব্যাপক। এটি সকল প্রকারের মুহারিব- সশস্ত্র আক্রমণকারীকে শামিল করে। দ্বিতীয়ত শহর বা জনপদের মধ্যে এ ধরনের আক্রমণ অধিক ভয়ের কারণ ও বেশি ক্ষতিকর হয়ে দেখা দিতে পারে। কেননা জনপদ হচ্ছে শান্তি-নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার ক্ষেত্র। এখানে লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়ার ও পাওয়ার পরিবেশ বিদ্যমান। এ ধরনের স্থলে সশস্ত্র আক্রমণ স্বাভাবিকভাবে ব্যাপক প্রস্তুতিসহ তীব্র ও প্রচণ্ডরূপে হয়ে থাকে। উপরন্তু, তারা লোকদের ঘরে বা দোকানে আক্রমণ চালিয়ে যথাসর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু দূরের পথে-ঘাটে, নির্জন মাঠে-ময়দানে আক্রমণ খুব প্রচণ্ড হয় না, আর সর্বস্ব হারাবারও ভয় থাকে না। কেননা সেখানে লোকেরা পথযাত্রী। আর পথযাত্রী অবস্থায় তার সাথে খুব সামান্য সম্পদ থাকাই স্বাভাবিক।[২৭]

পরবর্তীকালের অধিকাংশ হানাফী ইমাম প্রয়োজনের তাকিদ এবং মানুষের সার্বিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিবেচনা করে মত দিয়েছেন যে, হদ্দ কার্যকর করার জন্য ডাকাতি শহরের বাইরে সংঘটিত হওয়া শর্ত নয়। তেমনি ডাকাতদের সাথে অস্ত্র থাকা এবং সম্পদ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্য থাকাও শর্ত নয়। ইবনু নুজায়ম বলেন, এর ওপরই হানাফীগণের ফাতওয়া। তাঁরা বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (রহ) তাঁর সময়ের লোকদের অভ্যাস-আচরণের ওপর ভিত্তি করেই এ সম্পর্কে মতামত প্রদান করেছিলেন। কেননা তখন লোকেরা প্রায়শ জনপদের বাইরেই সশস্ত্র ডাকাতির সম্মুখীন হত। এ কারণে লোকেরা শহর ও গ্রামের মধ্যে যাতায়াত করার সময় তাদের সাথে অস্ত্র রাখত। আর বর্তমানে শহর-নগর-গ্রাম-জনপদেও সশস্ত্র, এমনকি বিনা অস্ত্রেও নানা নিত্য নতুন কৌশলে ডাকাতির

---

২৬. হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ এবং হাম্বলীগণের মধ্যেও অনেকেই এ মত পোষণ করেন। (আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ২০১; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১২৪)

২৭. মালিক,*আল-মুদাওয়ানাহ*, খ. ৪, পৃ. ৫৩৪, ৫৫৫; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ. ১৬৪; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ. ১৬৯; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১২৪-৫

ঘটনা দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। তাই পথে-ঘাটে ও নির্জন মাঠে-ময়দানে ডাকাতি হলে যেমন হদ্দ কার্যকর করতে হবে, তেমনি বর্তমানে শহর-নগর-জনপদের মধ্যে সংঘটিত যে কোন ডাকাতিও হদ্দের পর্যায়ভুক্ত অপরাধ রূপে বিবেচিত হবে।[২৮]

ডাকাতির প্রমাণ ঃ

নিম্নের দুটি উপায়ের মধ্যে যে কোন একটি পদ্ধতিতে ডাকাতি প্রমাণ করা যাবে।

১. স্বীকারোক্তি

চুরির মত ডাকাতির অভিযোগেও অভিযুক্ত সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় আদালতে উপস্থিত হয়ে বিচারকের সামনে ডাকাতির সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি করে তাহলে ডাকাতি প্রমাণিত হবে এবং তাকে ডাকাতির হদ্দ ভোগ করতে হবে। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। তবে কতবার স্বীকারোক্তি দিতে হবে- তা নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশের মতে, একবার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। তবে হাম্বলীগণ এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ)-এর মতে, দু এজলাসে দুবার স্বীকৃতি দ্বারা ডাকাতি প্রমাণিত হবে। যদি একবার স্বীকারোক্তি দেয়, তাহলে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তবে তা'যীরী শাস্তি দেয়া যাবে এবং লুটকৃত মাল কিংবা তার মূল্য ফিরিয়ে দিতে হবে।

স্বীকারকারী যদি নিজের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলেও তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তবে সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে, যদি সে সম্পদ নেয়ার ব্যাপারটি স্বীকার করে। কেননা অপর কোন মানুষের কোন অধিকার একবার স্বীকার করার পর তা প্রত্যাহার করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না; যদিও অপরাধ সংঘটনে সন্দেহ সৃষ্টির কারণে হদ্দের কার্যকারিতা রহিত হয়ে যাবে।[২৯]

২. সাক্ষ্য-প্রমাণ

দুজন ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা ডাকাতি প্রমাণ করা যাবে। অনুরূপভাবে ডাকাতদের হাতে আক্রান্ত দলের দু ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারাও ডাকাতি প্রমাণিত হবে,

---

২৮. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ. ১১৭; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ. ৪৩১-২

২৯. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ২০১; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ. ৪৩৩; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ.৬,পৃ.১৪০; আল-বহুতী, *আল-কাশশাফ*, খ.৬, পৃ.১৫০

যদি তারা নিজেদের ব্যাপারে আক্রান্ত হবার সাক্ষ্য না দেয়। অতএব যখন আক্রান্ত দলের দুজন ব্যক্তি দলের অন্যান্যদের আক্রান্ত হবার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে, তখন তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। বিচারকের জন্য এটা জানতে চাওয়ার প্রয়োজনও নেই যে, তারাও আক্রান্ত হয়েছিল কি না। বিচারক জানতে চাইলে তাদের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি তারা বলে যে, ডাকাত দল আমাদের যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে আমাদের মাল-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে, তা হলে তাদের সাক্ষ্য না তাদের বেলায় গ্রহণযোগ্য হবে, না অন্যদের বেলায়। কেননা এমতাবস্থায় তারা ডাকাতের প্রতিপক্ষে পরিণত হয়ে গেল। তবে ইমাম মালিকের মতে, এমতাবস্থায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এমন কি তাঁর দৃষ্টিতে, কারো থেকে শুনে ডাকাতির সাক্ষ্য দিলেও তাও গ্রহণযোগ্য হবে। যদি দুজন ব্যক্তি আদালতে বিচারকের সামনে এসে কোন কুখ্যাত ডাকাতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যে, সে একজন ডাকাত, তাহলে তাঁর দৃষ্টিতে তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ডাকাতি প্রমাণ করা যাবে, যদিও তারা তাদেরকে ডাকাতি করতে দেখেনি।[৩০]

ডাকাতির শাস্তি ঃ

ইসলামী শরী'আতে সশস্ত্র ডাকাত ও লুটেরাদের সুনির্দিষ্টভাবে চার ধরনের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এগুলো হল ঃ হত্যা করা, শূলবিদ্ধকরণ, হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা ও দেশ থেকে চির নির্বাসন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ط ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم. - "যে সব লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালায় এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে তাদের শাস্তি হচ্ছে- তাদের হত্যা করা হবে বা শূলে চড়ানো হবে কিংবা তাদের হাত ও পা বিপরীত পরম্পরায় কেটে ফেলা হবে কিংবা তাদের নির্বাসিত করা হবে। এই অপমান তো তাদের জন্য দুনিয়ায় আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।"[৩১]

---

৩০. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ৯, পৃ-২০৪; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ-১৩৪; মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ. ৪, পৃ. ৫৫৬; আল-খারাশী, *শারহু মুখতাসারিল খলীল*, খ.৮, পৃ.১০৭

৩১. আল-কুর'আন, ৫ঃ৩৩

উপর্যুক্ত আয়াতটিতে আল্লাহ ও রাসূল তথা তাঁদের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামী এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের চার ধরনের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। ইমামগণের মধ্যে তাদেরকে এ শাস্তিগুলো দেয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। তবে এ চারটি শাস্তি অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা অনুপাতে প্রয়োগ করা হবে, না কি বিচারকের সুবিবেচনা অনুযায়ী এ শাস্তি গুলোর মধ্য থেকে যে কোন একটি শাস্তি দেয়ার ইখতিয়ার রয়েছে- তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা অনুপাতে এ শাস্তিসমূহের কোন একটি প্রয়োগ করতে হবে। যেমন যে হত্যাকাণ্ডও ঘটাল, ধন-সম্পদও অপহরণ করল তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে। আর যে হত্যা করল; ধন-মাল অপহরণ করল না, তাকে শুধু হত্যা করা হবে। আর যে ধন-মাল অপহরণ করল, হত্যাকাণ্ড ঘটাল না, তার ডান হাত ও বাম পা কেটে ফেলা হবে। আর যে লোক ত্রাস সৃষ্টি করল; হত্যা বা ধন-মাল অপহরণ কিছুই করল না, তাকে নির্বাসিত করা হবে।

পক্ষান্তরে হানাফী ও মালিকী ইমামগণের মতে, বিচারক এ চারটি শাস্তির যে কোন একটি এ পর্যায়ের যে কোন অপরাধে প্রয়োগ করতে পারেন। কৃত অপরাধের দৃষ্টিতে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী তা নির্ধারণ করবেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতে- হত্যাকাণ্ড ঘটানোর কিংবা কারো কোন ধন-মাল ছিনিয়ে নেয়ার আগে কোন ডাকাতকে গ্রেফতার করা হলে তাকে তা'যীরের আওতায় যে কোন উপযুক্ত শাস্তি দেবার পর তাকে কারাবন্দী করে রাখা হবে, যে যাবত না সে বিশুদ্ধ তাওবাহ করবে এবং তার প্রমাণ মিলবে। তাঁর মতে, আয়াতের মধ্যে نفي দ্বারা তা-ই বোঝানো হয়েছে। যদি নিসাব পরিমাণ কারো ধন-মাল অপহরণ করে, তবেই তার হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে নেয়া হবে। যদি কেউ নিরাপরাধ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করল; কিন্তু কোন ধন-মাল অপহরণ করল না, তা হলে তাকে হত্যা করা হবে। যদি কেউ হত্যাকাণ্ডও ঘটাল এবং ধন-মালও অপহরণ করল, তা হলে তার ব্যাপারে বিচারকের ইখতিয়ার থাকবে যে, তিনি নিম্নের তিনটি শাস্তির যে কোন একটি প্রয়োগ করতে পারবেন। ক. প্রথমে বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে ফেলবে, তারপর হত্যা করবে। খ. শুধু হত্যাই করবে। গ. শূলে চড়িয়ে মেরে ফেলবে। তাঁর মতানুযায়ী এ ধরনের গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে কেবল হাত-পা কেটে দেয়াই যথেষ্ট হবে না; বরং এর সাথে হত্যা কিংবা শূলবিদ্ধকরণকে যোগ করতে হবে।[৩২]

---

৩২. ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ) প্রমুখের মতে, এমতাবস্থায় শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে; হাত-পা কাটা হবে না।

ইমাম মালিক (রহ)-এর মতে, যদি কেউ হত্যাকাণ্ড ঘটায়, তা হলে তো তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে।[৩৩] তাঁর দৃষ্টিতে, এ পর্যায়ের অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীর হাত-পা কর্তন এবং নির্বাসন দণ্ড দেয়ার ইখতিয়ার বিচারকের থাকবে না; তবে তাকে শূলে চড়ানো ও হত্যা করার মধ্যে যে কোন একটি কার্যকর করার ইখতিয়ার তাঁর থাকবে। যদি কেউ ধন-মাল অপহরণ করে; কিন্তু হত্যাকাণ্ড ঘটায় নি, তাহলে তাকে নির্বাসিত করার ইখতিয়ার বিচারকের নেই; হত্যা করা কিংবা শূলে চড়ানো বা হাত-পা কর্তন- এ তিনটি দণ্ডের মধ্যে যে কোন একটি শাস্তি দেয়ার ইখতিয়ার তাঁর রয়েছে। আর যে লোক কেবল ত্রাস সৃষ্টি করল; হত্যা বা ধন-মাল অপহরণ কিছুই করল না, বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী তাকে হত্যা করতেও পারবে কিংবা শূলেও চড়াতে পারবে বা হাত-পাও কেটে দিতে পারবে বা নির্বাসন দণ্ডও দিতে পারবে।

বিচারকের ইখতিয়ার থাকার তাৎপর্য হচ্ছে, এই পর্যায়ে বিচারককে দেখতে হবে যে, সশস্ত্র বিপর্যয়সৃষ্টিকারী যদি গভীর বিবেক-বুদ্ধি ও ব্যবস্থাপনা যোগ্যতা সম্পন্ন হয়, তাহলে তাকে হত্যা কিংবা শূলবিদ্ধ করাই হবে যুক্তিযুক্ত। কেননা তার হাত-পা কাটা হলেও তার ক্ষতি থেকে জনগণকে আশঙ্কা মুক্ত করা যাবে না। আর যদি সে গভীর বুদ্ধি ও ব্যবস্থাপনা যোগ্যতা সম্পন্ন না হয়, তবে স্বাস্থ্যবান ও দৈহিক শক্তিসম্পন্ন, তাহলে তার হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলতে হবে। আর এ দুটি বিশেষত্বের কোন একটিও তার না থাকলে তার জন্য হালকা শাস্তি নির্ধারণ করলেই চলবে।

উল্লেখ্য যে, ডাকাতির শাস্তির ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে যে মতবিরোধ রয়েছে তার কারণ হল এতদ্‌সংশ্লিষ্ট আল কুর'আনের আয়াতটির বর্ণনাপদ্ধতি। অধিকাংশ ইমামের মতে, এখানে أَو (অথবা) শব্দটি ইখতিয়ার বোঝানোর জন্য নয়; বরং অপরাধ অনুপাতে শাস্তির বিভিন্নতা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা অনুপাতে শাস্তির মাত্রা কম-বেশি হবে- এটাই স্বাভাবিক। কুর'আন ও সুন্নাহ দ্বারাও এ কথা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, جزاء سيئة مثلها - "মন্দ কাজের প্রতিফল তদসদৃশই হবে।" অতএব, ছোট অপরাধের জন্য বড় শাস্তি দেয়া, অনুরূপ বড় অপরাধের জন্য ছোট শাস্তি দেয়া শরী'আহ আইনের

---

৩৩. তবে সরকার যদি মনে করে যে, তাকে হত্যা করার চাইতে তাকে বাঁচিয়ে রাখাই অধিকতর কল্যাণকর হবে, তবেই তাকে হত্যা থেকে রেহাই দেয়া যাবে।

পরিপন্থী। তদুপরি এ বিষয়ে সকলেই এক মত যে, ডাকাতরা যদি হত্যাকাণ্ড ঘটায় এবং ধন-মালও হরণ করে, তাহলে তাদের শাস্তি কোনভাবেই কেবল নির্বাসন দণ্ড নয়। এ থেকে জানা যায়, আয়াতে ইখতিয়ার বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। অতএব, ডাকাতির প্রকৃতি যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে[৩৪] তাই শাস্তির মাত্রাও ভিন্ন হবে- এটিই যুক্তিযুক্ত।

হানাফী ও মালিকীগণের মতে, এখানে أو (অথবা) শব্দটি ইখতিয়ার বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ; অপরাধ অনুপাতে শাস্তির বিভিন্নতা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয় নি। কেননা আরবীতে أو (অথবা) শব্দটির ব্যবহার এ অর্থেই বহুল প্রচলিত। হযরত সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়াব, মুজাহিদ, হাসান বসরী ও 'আতা ইবনু রিবাহ (রহ) প্রমুখ তাবি'ঈগণ এ মত পোষণ করেন।

উল্লেখ্য যে, ডাকাতির উপর্যুক্ত শাস্তি পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য। মহিলা ডাকাতকে শূলে বিদ্ধ করা কিংবা নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা বিধেয় নয়। তাদের ডাকাতির শাস্তি হল, বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে দেয়া অথবা হত্যা করা।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, ডাকাতি করতে গিয়ে কাউকে শুধু হত্যা করলে তার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। এতে সকলে একমত। তবে এ মৃত্যুদণ্ডে কি হদ্দের দিকটি প্রাধান্য পাবে না কি কিসাসের দিকটি প্রাধান্য পাবে - তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য দেখা যায়। হানাফী ও মালিকীগণের মতে, হদ্দের দিকটি প্রাধান্য পাবে। এ কারণে তাঁদের দৃষ্টিতে অসর্তকতামূলক হত্যার জন্যও ডাকাতকে হত্যা করতে হবে। তদুপরি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা শাস্তি ক্ষমা করে দিলেও তার মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হবে না। তা ছাড়া হত্যাকারীর নিহত ব্যক্তির সমান অবস্থান ও মর্যাদা বিষয়টিও ধর্তব্য হবে না। এ কারণে গোলামের পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তিকে এবং যিম্মীর পরিবর্তে মুসলিমকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে। অপরদিকে শাফি'ঈ মাযহাবের বিশুদ্ধতম মত হল, যেহেতু হত্যা ব্যক্তিবিশেষের অধিকারের সাথে জড়িত অপরাধ, তাই এ ক্ষেত্রে কিসাসের দিকটি প্রাধান্য পাবে। এ কারণে ডাকাতকে কিসাসের ভিত্তিতেই হত্যা করতে হবে। যদি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা তাকে ক্ষমা করে দেয়, তবেই হদ্দের ভিত্তিতে তাকে হত্যা করা যাবে। অধিকন্তু, এ কারণে তাঁদের দৃষ্টিতে হত্যাকারীর নিহত ব্যক্তির সমান অবস্থান ও মর্যাদা বিষয়টিও ধর্তব্য হবে। তাই যিম্মীর

---

৩৪. যেমন কেউ শুধু ধন-মাল ছিনিয়ে নিল, আবার কেউ ধন-মালও ছিনিয়ে নিল, হত্যাকাণ্ডও ঘটাল, আবার কেউ শুধু হত্যাকাণ্ড ঘটাল, আবার কেউ শুধু ত্রাস সৃষ্টি করল।

প্রতিশোধ হিসেবে কোন মুসলিমকে এবং গোলামের প্রতিশোধ হিসেবে কোন আযাদ ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না। যিম্মীর হত্যার জন্য তাকে রক্তমূল্য দিতে হবে এবং গোলাম হত্যার জন্য তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। ইমাম আহমাদ (রহ) থেকে এ ধরনের একটি মত বর্ণিত রয়েছে।[৩৫]

লুটকৃত সম্পদের ফেরত দান ও আঘাতের বদলা গ্রহণ ঃ

ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেবার কিংবা আঘাত করে ক্ষত-বিক্ষত করার শাস্তি হিসেবে ডাকাতদেরকে নির্ধারিত শাস্তি দেবার পর লুটকৃত সম্পদ কি ফিরিয়ে দিতে হবে এবং আঘাতের বদলা গ্রহণ করা যাবে কি না - এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীগণের মতে, যদি লুটকৃত মাল মজুদ থাকে, তবেই তা মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি তা ধ্বংস হয়ে যায় বা তা খরচ হয়ে যায়, তা হলে এ জন্য তাদের জরিমানা দিতে হবে না। তাঁদের মতে, হদ্দ ও জরিমানা এক সাথে কার্যকর করা বিধেয় নয়। অনুরূপভাবে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কোন আঘাতের জন্যও কোন বদলা গ্রহণ করা যাবে না।[৩৬]

অন্যান্য ইমামের দৃষ্টিতে লুটকৃত মাল মজুদ থাকলে তো ফিরিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় জরিমানা দিতে হবে। শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, কেবল অপহরণকারী ডাকাতের ওপরই এ জরিমানার শাস্তি বর্তাবে; তার সহযোগীদেরকে জরিমানা দিতে হবে না, যদি না তারা সরাসরি অপহরণে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু মালিকীগণের মতে, ডাকাত দলের প্রত্যেকেই লুটকৃত সম্পদের জন্য দায়ী থাকবে, যদিও সে সরাসরি অপহরণে অংশ গ্রহণ না করে। ডাকাতরা যেহেতু পরস্পরের সহযোগী, তাই যদি ডাকাতদলের কেউ ধরা পড়ে, তার ওপরই লুটকৃত যাবতীয় সম্পদের ফিরিয়ে দেয়ার কিংবা জরিমানা দানের দায়িত্ব বর্তাবে। যদি তাকে তার ভাগের অতিরিক্ত কিছু পরিশোধ করতে হয়, সে তার সহযোগীদের থেকে আদায় করে নেবে। অনুরূপভাবে বদলা গ্রহণ করা যায়- এ ধরনের আঘাত যদি সেরে ওঠে, তা হলে তার বদলা নেবার ব্যাপারটি বাধ্যতামূলক নয়; বরং আক্রান্ত ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছে করলে বদলাও নিতে পারবে, ইচ্ছে করলে অর্থের বিনিময়ে কিংবা বিনা বিনিময়ে ক্ষমাও

---

৩৫. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ. ১৬৪-৫; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১৯৫-৭; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭,পৃ. ৯৩-৪; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১২৭-৯; আস-সাভী, *বুলগাতুল সালিক*, খ.৪, পৃ. ৪৯৪-৬; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০,পৃ.২৯৬-৮

৩৬. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭,পৃ. ৯৫;যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ.২৩১-২; গানিম,*মাজমা'*.., পৃ. ২০৩

করে দিতে পারে।[৩৭] তবে আঘাত সেরে না ওঠলে; বরং তা বেড়ে গিয়ে মারা গেলে ডাকাতকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।[৩৮]

হত্যা করা ঃ

ডাকাত যদি হত্যাকাণ্ড ঘটায়; কিন্তু ধন-মাল অপহরণ করে নি, তাহলে তার শাস্তি হল মৃত্যদণ্ড।।[৩৯]

শূলবিদ্ধ করা ঃ

যে ডাকাত বা ডাকাতদল নিরাপরাধ ও নিরীহ লোকদের ওপর হামলা করে হত্যা করে এবং তাদের ধন-মাল ছিনিয়ে নেয়, তাদের জন্য কঠোরতম শাস্তি হল হত্যা ও প্রকাশ্যে শূলবিদ্ধকরণ, যাতে তা দেখে অন্যান্য ডাকাত ও বিপর্যয়সৃষ্টিকারীরা সমাজে কোন রূপ ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে সাহস না পায়।[৪০] তবে অধিকাংশের মতে, শূলবিদ্ধকরণ হদ্দের অর্ন্তভুক্ত, যা অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতে, হত্যা কিংবা শূলবিদ্ধকরণ দণ্ড থেকে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী যে কোনটিই বেঁচে নিতে পারবেন অথবা দুটিই কার্যকর করতে পারবেন।[৪১]

হানাফী ও মালিকীগণের মতে, জীবিত অবস্থায় শূলে চড়ানো হবে এবং শূলবিদ্ধ অবস্থায় বর্শা দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করা হবে। তাঁদের কথা হলঃ শূলবিদ্ধকরণও একটি শাস্তি, যা জীবিতদের জন্য প্রযোজ্য; মৃতদের জন্য নয়। উপরন্তু, তা লুণ্ঠন ও বিপর্যয়সৃষ্টির বদলা। তাই অন্যান্য অপরাধের শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে যেমন জীবনের শর্ত রয়েছে, তেমনি শূলবিদ্ধকরণের ক্ষেত্রেও

---

৩৭. তবে ইমাম শাফি'ঈ ও আহমাদ (রহ)-প্রমুখের এক একটি বর্ণনা মতে, হত্যা করার মত আঘাত করার বেলায়ও বাধ্যতামূলক বদলা নিতে হবে। তবে ইমাম শাফি'ঈ (রহ) -এর অন্য একটি মতানুসারে কেবল দুহাত ও দু পা আক্রান্ত হলেই বাধ্যতামূলক বদলা নেয়া হবে।

৩৮. মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ. ৫৫৪. ৫৫৭, আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ. ১৭৪; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৪, পৃ.৩১২; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১২৭, ১৩১; আর-রুহায়বানী, *মাতালিব..*, খ.৬,পৃ.২৫৩; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০,পৃ.২৯৫; বুজায়রমী, *আত-তাজরীদ*, খ.৪, পৃ. ২৩০

৩৯. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১৩৪; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭,পৃ. ৯৩; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ.৬, পৃ.১৪১; আল-বহূতী, *কাশশাফ*, খ.৬, পৃ.১৫১; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৪, পৃ.৩১০

৪০. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১৩৫; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ৯৪; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১২৫; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৮, পৃ.৩৭২

৪১. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭,পৃ. ৯৪; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১২৭, ১৩১

জীবনের শর্ত প্রযোজ্য হবে। শাফি'ঈগণের কারো কারো মতে, জীবিত অবস্থায় শূলে চড়ানো হবে। তারপর নামিয়ে হত্যা করা হবে। হাম্বলী ও শাফি'ঈগণের মতে, প্রথমে হত্যা করা হবে। তারপর শূলবিদ্ধ করা হবে। তাঁদের বক্তব্য হল, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু আয়াতের মধ্যে হত্যার কথা আগে বলেছেন, তারপর শূলবিদ্ধ করার কথা বলেছেন, তাই আয়াতের ইঙ্গিত অনুসারে প্রথমে হত্যা করেই তারপর শূলে চড়ানো হবে। তদুপরি জীবিত অবস্থায় শূলে চড়ানো হলে তাকে অতিরিক্ত কষ্ট দান করা হবে। তাঁদের মতানুযায়ী, তাকে প্রথমে হত্যা করা হবে, তারপর গোসল দেয়া হবে, কাফন পরানো হবে, জানাযা পড়া হবে। তারপর শূলে চড়ানো হবে।

হানাফীগণের মতে, মৃত্যুর পর তাকে শূলবিদ্ধ অবস্থায় তিনদিন রেখে দিতে হবে। এর বেশি সময় ধরে রেখে দেয়া সমীচীন নয়। হাম্বলীগণের মতে, কোন সময় নির্ধারিত নয়; শাসক তার সুবিবেচনা অনুযায়ী প্রচারের জন্য যে কয়দিন প্রয়োজন মনে করবেন, ততদিন রাখতে পারবেন। মালিকীগণের মতে, দেহ পঁচে গিয়ে দুর্গন্ধ ছড়ানোর আশঙ্কা দেখা দিলে তাকে নামিয়ে ফেলবে।[৪২]

হাত-পা কেটে ফেলা ঃ

যে পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে হাত কাটা যায় (অর্থাৎ দশ দিরহাম), সে পরিমাণ সম্পদ কেউ ডাকাতি করে নিলে তার শাস্তি হল ডান হাত ও বাম পা কেটে ফেলা।[৪৩] চোরের হাত-পা কাটার নিয়ম ডাকাতের ক্ষেত্রেও অনুসৃত হবে। অর্থাৎ ডান হাত কব্জি থেকে আর বাম পা গোড়ালী থেকে কাটতে হবে।[৪৪]

নির্বাসিত করা ঃ

হানাফী ও মালিকী ইমামগণের মতে, এ আয়াতে نفي (নির্বাসন) দ্বারা বন্দী করে রাখাকে বোঝানো হয়েছে। কেননা কাউকে তো আর সমগ্র পৃথিবী থেকে বের

---

৪২. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭,পৃ. ৯৫;মুল্লা খসরু, *দুরারুল হুক্কাম*, খ.২, পৃ.৮৫; আল-জসসাস, *আহকামুল কুর'আন*, খ.২, পৃ. ৫৭৮; ইবনুল 'আরবী, *আহকামুল কুর'আন*, খ.২, পৃ. ১০০; আল-জুমল, *ফুতুহাতুল ওয়াহহাব*, খ.৫, পৃ.১৫৫; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ.১৭২

৪৩. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.১৩২; আল-জসসাস, *আহকামুল কুর'আন*, খ.২, পৃ. ৫৮১; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১২৮-৯

৪৪. হযরত 'উমার (রা) এই রূপ করতেন বলে বর্ণিত রয়েছে। তবে কারো কারো মতে, গোড়ালি বরাবর ছেড়ে রেখে পায়ের পাতার অর্ধেকাংশ থেকে কেটে ফেলতে হবে, যাতে সে গোড়ালি ওপর ভর করে চলাফেরা করতে পারে। হযরত 'আলী (রা) এই রূপ করতেন বলে বর্ণিত আছে।

করে দেয়া যাবে না। তদুপরি অন্য কোন দেশে নির্বাসনে পাঠানো হলে তা হবে সে দেশের অধিবাসীদেরকে অযাচিত কষ্টদান করার নামান্তর। অতএব, এখানে নির্বাসন দ্বারা কারাগারে বন্দী করে রাখাকেই সুনির্দিষ্ট করে বোঝানো হয়েছে। কেননা কারারুদ্ধ ব্যক্তি বলতে গেলে প্রকারান্তে নির্বাসিত ব্যক্তি। সে পারে না দুনিয়ার কোন সুখ সম্ভোগ করতে, পারে না আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করতে। ইমাম শাফি'ঈ বলেন, যদি কোন ডাকাত হত্যাকাণ্ডও ঘটাল না এবং ধন-মালও অপহরণ করল না, তাহলে তাকে তা'যীরের আওতায় কারাগারে আটকও রাখা যাবে এবং নির্বাসন দণ্ডও দেয়া যাবে।[৪৫]

ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগীদের শাস্তি ঃ

ডাকাতি ও সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগীদের শাস্তিও ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের শাস্তির অনুরূপ হবে। অর্থাৎ ডাকাত ও সন্ত্রাসীরা যদি তাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের সম্মুখীন হয়, তাদের পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগীরাও সে একই ধরনের শাস্তি ভোগ করবে। যদিও তারা সরাসরি ডাকাতি ও সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়নি। কেননা ডাকাতি ও সন্ত্রাসের ঘটনাগুলো প্রায়শ দলবদ্ধ প্রচেষ্টায় সংঘটিত হয়ে থাকে। কেউ সরাসরি অপরাধকর্মে লিপ্ত হয়, আবার কেউ তাদেরকে রক্ষা করার কাজে রত হয়। ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগীদেরকে যদি তাদের মত একই রূপ হদ্দের শাস্তি দেয়া না হয়, তাহলে দেশে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার পথ দিন দিন বেড়েই চলবে। এটাই হানাফী, মালিকী ও হাম্বলী ইমামগণ সহ অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে শাফি'ঈগণের মতে, যারা ডাকাত কিংবা সন্ত্রাসীদের সাহায্য-সহযোগিতা করে কিংবা তাদের সাথে অবস্থান করে তাদের দল ভারী করে কিংবা তাদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করে তাদের ওপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না; তবে তা'যীরের আওতায় তাদেরকে কারাগারে বন্দী করে রাখা যেতে পারে বা তাদেরকে নির্বাসন দণ্ডও দেয়া যেতে পারে।[৪৬]

ডাকাতের তাওবা ঃ

ডাকাতির শাস্তি যেহেতু হদ্দের পর্যায়ভুক্ত এবং এর সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত, তাই ডাকাতকে আক্রান্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের অথবা সরকারের ক্ষমা

---

৪৫. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭,পৃ. ৯৫; আল-জসসাস, *আহকামুল কুর'আন*, খ.২, পৃ. ৫৭৮; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১২৯; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ.১৬৪

৪৬. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯,পৃ.১৩২; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯,পৃ.১৩১; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬,পৃ.১৬৪

করে দেয়ার ইখতিয়ার নেই। তবে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়ার আগেই যদি সে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বিশুদ্ধ তাওবা করে ভাল হয়ে যায় এবং এর প্রমাণও মিলে, তবেই এ তাওবা তাকে নির্ধারিত শাস্তি থেকে রেহাই দেবে। তবে মানুষের অধিকারের সাথে যা কিছু জড়িত তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দাবীর ওপর নির্ভরশীল হবে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন, إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. - "কিন্তু যারা তোমাদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই তাওবাহ করবে, জেনে রেখো, আল্লাহ তা'আলা মহাক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"[৪৭] এ আয়াতে যে ক্ষমার কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, ঐ অপরাধের দরুন আল্লাহর অবাধ্যতা যতটা করেছে, তার জন্য। এ কারণে ডাকাতির হদ্দ হিসেবে হয়ত তার হাত-পা কাটা যাবে না বা হত্যার হাত থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু জনগণের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন প্রাণ নাশ, যখম ও ধন-মাল লুট ইত্যাদি- তা কখনো ক্ষমা পাবে না। আল্লাহ্ মা'ফ করবেন না। সে ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট লোকদের সাথে জড়িত। তারা ইচ্ছে করলে দাবী পেশ করবে, ইচ্ছে করলে দাবী প্রত্যাহারও করতে পারে। ওরা কাউকে হত্যা করে থাকলে উত্তরাধিকারীদের সম্মতির ভিত্তিতে তাদেরকে হত্যা করার দণ্ড রহিত হবে বটে; কিন্তু তারা চাইলে দিয়াত (রক্তমূল্য) দিতে হবে আর তারা তাও ক্ষমা করে দিতে পারে। অনুরূপভাবে কারো নিকট থেকে ধন-মাল ছিনিয়ে নিলে তা ফিরিয়ে দিতে হবে।

অনুরূপভাবে ডাকাতি করাকালে কোন নারীকে ধর্ষণ করলে কিংবা মদ পান করলে বা চুরি করলে অথবা কাউকে যিনার অপবাদ দিলে এবং ধরাপড়ার আগে তাওবা করলেও তার হদ্দ রহিত হবে না। এটাই মালিকী ও অধিকাংশ শাফি'ঈ ও হানাফী ইমামের অভিমত। তবে হাম্বলীগণের মতে, ধরাপড়ার আগে তাওবা করলে এগুলোর হদ্দ রহিত হয়ে যাবে; কিন্তু অপবাদের হদ্দ রহিত হবে না।[৪৮]

৪৭. আল-কুর'আন, ৫:৩৩-৩৪

৪৮. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.১৯৮-৯; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১২৯-১৩০; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৭, পৃ.৫৯; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ.২৯৯

৩. জোর করে সম্পদ অপহরণের শাস্তি

জীবন ও ইজ্জত-আব্রুর মত সম্পদও মানুষের জন্য একটি পবিত্র বস্তু। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন ঃ إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم حرام عليكم. - "তোমাদের জীবন, ইজ্জত-আব্রু ও সম্পদ পবিত্র বস্তু, যেগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করা হারাম।"[১] ইসলামের দৃষ্টিতে কারো সম্পদ -সামান্য পরিমাণ হলেও- অন্যায়ভাবে দখল করা, ছিনিয়ে নেয়া ও ভোগ করা মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. - "হে ঈমানদাররা! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কর না। তবে ব্যবসার মাধ্যমে পরস্পরের সম্মতিতে খেতে পার।"[২] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه. - "কারো সন্তুষ্টি ছাড়া তার সম্পদ ভোগ করা মোটেই বৈধ নয়।"[৩]

'غصب'-এর সংজ্ঞা ঃ

জোর করে অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেয়াকে আরবীতে 'غصب' বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ কোন কিছু অন্যায়ভাবে জোর করে ছিনিয়ে নেয়া। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় কোন বালিগ ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক অপরের অধিকারভুক্ত সম্পদ অন্যায়ভাবে জোর করে অপহরণ করাকে غصب বলা হয়।[৪]

---

১. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ২৩৫৩৬; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, হা.নং: ৫৩৮

২. আল-কুর'আন, ৪ঃ২৯

৩. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ২৩৫৩৬; দারু কুতনী, *আস-সুনান*, (কিতাবুল বুয়ু') হা.নং: ৯১

৪. ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (রহ)-এর মতে 'غصب'এর সংজ্ঞা হল ঃ إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة و المغالبة بفعل في المال. - "কারো প্রকাশ্যে জবরদস্তি মূলক হস্তক্ষেপের ফলে আর্থিক মূল্য বিশিষ্ট সম্পদ থেকে মালিকের দখলস্বত্ব অপসারিত হওয়া।" (আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.১৪৩) মালিকী ইমামগণের মতে, أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة. "বিনা অস্ত্রে কেবল জোর খাটিয়ে কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেয়া।" (আস-সাভী, *বুলগাতুস সালিক*, খ.৩, পৃ. ৫৮১) শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে জোর করে দখল করে নেয়াকে 'غصب' বলা হয়। (আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.২, পৃ.৩৩৬; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ.৪,পৃ.৪৯২)

'غصب' -এর প্রকৃতি ঃ

কোন্ প্রকৃতির অপহরণ শরী'আতে 'غصب' রূপে গণ্য হবে- তা নিয়ে ইমামগণের দুটি মত দেখা যায়।

১. অধিকাংশ ইমামের মতে, কারো সম্পদ তার অনুমতি ছাড়া কেবল জোর করে করায়ত্ত করলেই 'غصب' সাব্যস্ত হবে। চাই তাতে মালিকের দখলস্বত্ব বজায় থাকুক বা না থাকুক।

২. ইমাম আবূ হানীফা (রহ) ও আবূ ইউসূফ (রহ) প্রমুখের মতে, কারো সম্পদ অপহরণকারীর ছিনিয়ে নেবার পর যদি মালিকের দখলস্বত্বও চলে যায়, তাহলেই 'غصب' সাব্যস্ত হবে।[৫]

এ মতবিরোধের প্রেক্ষিতে অপহৃত সম্পদ থেকে উৎপন্ন বস্তু (যেমন- বাগানের ফল) ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ অপহরণকারীকে আদায় করতে হবে কি না- তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। হানাফীগণের মতে অপহরণের ফলে যেহেতু মালিকের দখলস্বত্ব চলে যায়, তাই অপহরণকারীকে উক্ত বস্তুর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। পক্ষান্তরে অন্য ইমামগণের দৃষ্টিতে অপহরণের জন্য যেহেতু মালিকের দখলস্বত্ব চলে যায় না, তাই অপহরণকারীকে উক্ত বস্তুর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[৬]

অপহরণকারীর শাস্তি ঃ

অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনা করে বিচারক অপহরণকারীকে কারাদণ্ড কিংবা বেত্রাঘাত অথবা উভয়বিধ শাস্তি দিতে পারবে। উল্লেখ্য যে, অপহরণের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির অধিকার যেমন খর্ব হয়, তেমনি জনস্বার্থও বিঘ্নিত হয়। তাই অপহরণের মামলা আদালতে উপস্থাপিত হবার পর সম্পদের মালিক যদি তাকে ক্ষমাও করে দেয়, তা হলেও বিচারক জনস্বার্থ বিবেচনা করে এবং সমাজে সার্বিক ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার খাতিরে শাস্তি কার্যকর করবে; তাকে ক্ষমা করে দেবে না।[৭]

উপরন্তু, অপহৃত বস্তু যদি অপহরণকারীর দখলে থাকে, তাহলে তাও মালিককে

---

৫. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.১৪৩; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৬, পৃ.১৮৭; মুল্লা খসরু, *দুরারুল হুক্কাম*, খ.২, পৃ.২৬৩

৬. মুল্লা খসরু, *দুরারুল হুক্কাম*, খ.২, পৃ.২৬৩

৭. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা*, খ.৩১, পৃ.২৩৫; ইবনু 'আবিদীন, *আল-'উকূদ..*, খ.২, পৃ.১৬১; ইবনু ফারহুন, *তাবছিরাহ..*, খ.২, পৃ.২০৯

ফিরিয়ে দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لا يأخذن احدكم متاع أخيه لاعبا و لا جادا' و من أخذ عصا أخيه فليردها.
"তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের কোন বস্তু গ্রহণ না করে, খেলাচ্ছলেও নয় এবং বাস্তবিকভাবে তো নয়ই। যদি কেউ তার ভাইয়ের ছড়িও নেয়, সে যেন তা ফিরিয়ে দেয়।"[৮]

অপহৃত বস্তু যদি নষ্ট হয়ে যায় কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা হারিয়ে যায়, তাহলে অপহৃত বস্তুর হুবহু সমজাতীয় ও সমমানের বস্তু পাওয়া গেলে মালিককে ক্ষতিপূরণ হিসেবে তা-ই দিতে হবে। আর যদি অপহৃত বস্তুর হুবহু সমজাতীয় ও সমমানের বস্তু পাওয়া না যায়, তাহলে মালিককে অপহৃত বস্তুর মূল্য ফেরত দিতে হবে।[৯] মূল্য ফেরত দেবার ক্ষেত্রে অপহরণের দিনে বস্তুর যে মূল্য ছিল তা-ই বিবেচনায় নিতে হবে। এটা হানাফী ও মালিকীগণের অভিমত। শাফি'ঈগণের মতে, সম্পদ অপহরণের দিন থেকে ধ্বংস হবার সময় পর্যন্ত যে চড়া দামটি ছিল, তা-ই পরিশোধ করতে হবে। হাম্বলীগণের মতে, সম্পদ নষ্ট হবার দিনের মূল্যকে বিবেচনায় নিতে হবে।[১০]

উল্লেখ্য যে, সম্পদ যে জায়গা থেকে অপহরণ করা হয়েছে, তা ঠিক সে জায়গায় পৌঁছিয়ে দিতে হবে। কেননা অনেক সময় স্থানভেদে জিনিসের মূল্যের মধ্যে তফাত হয়ে থাকে। আর পৌঁছানোর যাবতীয় ব্যয়ভার অপহরণকারীকেই বহন করতে হবে।[১১]

একটি আপত্তির জবাব ঃ

চুরির মত অপহরণও একটি গুরুতর সামাজিক অপরাধ। চুরির জন্য ইসলামে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। অথচ অপহরণের কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তির উল্লেখ নেই। এটা অবশ্যই একটা দুর্বোধ্য বিষয়। এর উত্তর হল, চুরি ও অপহরণের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অপহরণের ব্যাপারটি প্রায়ই প্রকাশ্যে সংঘটিত হয়। তাই সাবধান হলে এ ধরনের অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করা অনেকটা

---

৮. আবূ দাউদ, হা.নং ঃ ৫০০৩; বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা.নং: ১১২৭৯, ১১৩২৪

৯. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ১৪৮-১৫১; আল-বাবরতী, *আল-'ইনায়াহ*, খ.৯,পৃ.৩২২-৩;

১০. আস-সারাখ্সী, *আল-মাবসূত*, খ.১১,পৃ.৪৯; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ১৫০-১; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৫, পৃ.২৭৪; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.২,পৃ. ৩৪৭; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.৬, পৃ.১৯১-২

১১. আস-সারাখ্সী, *আল-মাবসূত*, খ.১১,পৃ.৫৩; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৮, পৃ.১২৪

সহজ হয় এবং তার প্রমাণ উপস্থিত করাও তেমন কঠিন ব্যাপার হয় না। পক্ষান্তরে চুরির ঘটনা ঘটে গোপনে, লোক চক্ষুর আড়ালে। ফলে তা প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অধিকন্তু, চোর থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব। সে ঘরে সিঁদ কাটে, তালা ভাঙ্গে, গ্রিল কাটে। এ রূপ অপরাধে কঠোরতর শাস্তি দেয়া না হলে সমাজে চুরির মাত্রা দিন দিন বেড়ে যাবে এবং এর ফলে লোকেরা কঠিন বিপদে পড়ে যেতে পারে। তাই গোপনে সংঘটিত অপরাধটি যদি অকাট্যভাবে প্রমাণ করা যায়, তা হলে তার শাস্তি কঠোরতর হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে তা অন্যরা দেখে শিক্ষা অর্জন করতে পারে, সতর্ক হবার প্রয়োজন অনুভব করে। অপরদিকে অপহরণ প্রায়শ জনগণের চোখের সামনে প্রকাশ্যে সংঘটিত হয়। জনগণ সতর্ক হলে অপহরণকারীকে হাতে-নাতে ধরা সম্ভব এবং অপহৃত বস্তুটি মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া যায়। তদুপরি লুটকারীর বিরুদ্ধে সরকারের নিকট মামলাও দায়ের করা যায়; কিন্তু চোরের ব্যাপারটি সে ধরনের নয়।[১২]

'غصب' প্রমাণের পদ্ধতি ঃ

চুরি ও ডাকাতির মত সাধারণত যথাযথ সাক্ষ্য-প্রমাণ কিংবা অপহরণকারীর স্বীকারোক্তি দ্বারা অপহরণ প্রমাণিত হবে। তবে কারো কারো মতে শপথের সাহায্যে এবং বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারাও অপহরণ প্রমাণ করা যেতে পারে।[১৩]

১. সাক্ষ্য-প্রমাণ

অপহরণ প্রমাণের জন্য দুজন ন্যায়-পরায়ণ মুসলিম পুরুষের সাক্ষ্যের প্রয়োজন। সাক্ষী যদি দুজনের কম হয় অথবা একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং অপরজন শ্রোতা সাক্ষী হয়, অথবা একজন পুরুষ সাক্ষী ও দুজন মহিলা সাক্ষী হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া হবে।

২. মৌখিক স্বীকৃতি

অপহরণের অভিযোগে অভিযুক্ত সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় আদালতে বিচারকের সামনে অপহরণের সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি করে তাহলে অপহরণ প্রমাণিত হবে ।

---

১২. ইবনুল কাইয়িম, *ই'লামুল মুআক্কি'ঈন*, খ.২, পৃ.৪৭; আবদুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, পৃ. ২৪৭

১৩. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ২১৪; ইবনু ফারহুন, *তাবছিরাহ..*, খ.২, পৃ.১৬৯ (বিস্তারিতের জন্য চুরি ও ডাকাতি অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

৩. শপথ

যখন অপহরণকৃত সম্পদের মালিকের দাবীর পক্ষে কোন সাক্ষী থাকে না, আর অপহরণকারীও স্বীকার করে না, তখন অপহরণকারীকে শপথ করতে বলা হবে। যদি সে শপথ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন সম্পদের মালিককে শপথ করতে বলা হবে। যদি সে দাবীর পক্ষে শপথ করে বলে, তাহলে শাফি'ঈগণের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মালিকের এ শপথ দ্বারা অপহরণ প্রমাণিত হবে এবং এ জন্য অপহরণকারী শাস্তিযোগ্য হবে। তবে হানাফী, মালিকী ও হাম্বলী ইমামগণের নিকট এ রূপ অবস্থায় অপহরণ প্রমাণিত হবে না এবং এ জন্য অপহরণকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

৪. লক্ষণ-প্রমাণ

কারো কারো মতে বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারাও অপহরণ প্রমাণিত হবে, যদি তাতে সুস্পষ্টভাবে অপহরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ভিত্তিতে অপহরণকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে এবং তাকে মালের ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। কেননা সাক্ষ্য ও অপহরণকারীর স্বীকারোক্তির চাইতে অপহরণ সাব্যস্ত করার জন্য সুস্পষ্ট লক্ষণ অধিকতর শক্তিশালী প্রমাণ। কারণ, সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি যেহেতু এক প্রকার সংবাদ দান, তাই এগুলোর মধ্যে সত্য-মিথ্যার একটা অবকাশ সবসময় বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে অপহরণকৃত মাল অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে পাওয়া গেলে তাতে অপহরণের ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকবার কথা নয়।

যে সব সম্পদে অপহরণের বিধান প্রযোজ্য হবে ঃ

ক. স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ ঃ

অপহরণকৃত সম্পদ স্থানান্তরযোগ্য হলে তাতে অপহরণের বিধান প্রযোজ্য হবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে এ জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। এগুলো পাওয়া গেলেই অপহরণের শাস্তি কার্যকর করা যাবে। শর্তগুলো হল ঃ

১. অপহরণকৃত বস্তুর আর্থিক মূল্য থাকা

বস্তুর আর্থিক মূল্য থাকার অর্থ হল তা এমন হওয়া যা কেউ নষ্ট করলে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত করলে তার মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়। অতএব যে সব বস্তুর কোন মূল্য নেই (মৃত প্রাণী ও রক্ত প্রভৃতি) তা কেউ অপহরণ করলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

২. অপহরণকৃত সম্পদ শার'ঈভাবে ভোগ বা ব্যবহারের উপযোগী হওয়া

শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে যে সব বস্তু ভোগ করা বা ব্যবহার করা হারাম (যেমন- শূকর, মাদক দ্রব্য, মৃত প্রাণী ও অশ্লীল বই-পুস্তক) তা কেউ অপহরণ করলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

৩. অপহরণকৃত মাল অপরের দখলভুক্ত হওয়া

অপহরণকৃত মাল অপরের দখলভুক্ত অর্থাৎ মালিকানাভুক্ত কিংবা আমানত বা দায়িত্বাধীন থাকতে হবে। দখলবিহীন বা মালিকানাহীন কোন মাল কেউ অপহরণ করলে তার এ কাজ শাস্তিযোগ্য অপহরণ বলে গণ্য হবে না। কারণ এতে কারো আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশংকা নেই।

৪. অপহরণকৃত বস্তু সাধারণভাবে সকলের জন্য বৈধ না হওয়া

অপহরণকৃত মাল যদি এমন কোন বস্তু হয় যা ব্যবহার করা সকলের জন্য সাধারণভাবে বৈধ (যেমন- পানি, আগুন বা ঘাস প্রভৃতি), তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

খ. স্থাবর সম্পদ ঃ

অধিকাংশ ইমামের মতে স্থাবর সম্পদ (যেমন জমি-জমা ও বাড়ি-ঘর) জোর করে ছিনিয়ে নেয়া হলে তাতেও অপহরণের বিধান প্রযোজ্য হবে এবং এর কোন রূপ ক্ষতি সাধিত হলে, এমনকি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধ্বংস কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অপহরণকারীকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তাঁদের মতে, অপহরণের বিধান প্রযোজ্য হবার জন্য অপহরণকৃত বস্তুর ওপর অপহরণকারীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ায় যথেষ্ট। যেমন ঘর-বাড়ি তৈরি করে কিংবা আসবাবপত্র জমা রেখে স্থাবর সম্পদের ওপর অপহরণকারী নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এর ফলে স্থাবর সম্পদ থেকে মালিকের কর্তৃত্ব হাতছাড়া হয়ে যায়। তাঁদের দলীল হল ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين. - "যে ব্যক্তি এক বিগত পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে করায়ত্ত করবে, কিয়ামাতের দিন শাস্তিস্বরূপ তার গলায় সাত তবক জমি বেড়ি হিসেবে পরিয়ে দেয়া হবে।"[১৪] এ হাদীস থেকে জানা যায়, স্থাবর সম্পদের বেলায়ও অপহরণের বিধান প্রযোজ্য হবে। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনু হাজর বলেছেন, "এ হাদীসে জমি-জমা অপহরণ উপযোগী হবার প্রমাণ রয়েছে।"

---

১৪. সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুল মাযালিম), হা.নং: ২৩২১

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (রহ) ও ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ) প্রমুখের মতে, অপহরণের বিধান প্রযোজ্য হবার জন্য সম্পদ স্থানান্তরযোগ্য হতে হবে। কারণ, তাঁদের মতে, অপহরণ সাব্যস্ত হবার জন্য সম্পদের ওপর মালিকের কর্তৃত্ব শূণ্য হয়ে যেতে হবে। সম্পদ স্থানান্তরযোগ্য হলেই কেবল সম্পদের ওপর মালিকের কর্তৃত্ব শূণ্য হতে পারে। সুতরাং স্থাবর সম্পত্তি যেহেতু স্থানান্তরযোগ্য নয়, তাই তাতে অপহরণের বিধানও প্রযোজ্য হবে না।

অতএব ইমাম আবূ হানীফা (রহ) ও ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ) প্রমুখের দৃষ্টিতে যে কেউ কারো স্থাবর সম্পদ ছিনিয়ে নেবার পর যদি ছিনতাইকারীর হাতেই কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগেই (যেমন- বন্যা, বজ্রপাত ও অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি) তা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে অপহরণকারীকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কারণ, তাঁদের মতে যেহেতু স্থাবর সম্পদে অপহরণের পরও মালিকের কর্তৃত্ব হাতছাড়া হয় না, তাই এ ক্ষেত্রে অপহরণের বিধান কার্যকর হবে না। তবে অপহরণকারীর কারণেই যদি তা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, (যেমন সে নিজেই ঘর ভেঙ্গে ফেলল) তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর এ ক্ষতিপূরণ অপহরণের কারণে নয়; বরং অপরের মাল ধ্বংস বা ক্ষতি করার কারণেই ওয়াজিব হবে।[১৫]

সম্পদের ভোগাধিকার অপহরণ ঃ

উপর্যুক্ত মতবিরোধের প্রেক্ষিতে বলা যায়, অধিকাংশ ইমামের দৃষ্টিতে ঘরে বসবাসের অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার জন্যও অপহরণের বিধান প্রযোজ্য হবে। কেননা তাঁদের দৃষ্টিতে যেহেতু স্থাবর সম্পদের বেলায়ও অপহরণ হতে পারে, তাই তার ভোগাধিকারও অপহরণ হতে পারে। অতএব কোন ব্যক্তি যদি অপরকে তার ঘরে বসবাস করতে বাধা দেয়, সে ঘরের বাসাধিকার অপহরণকারী রূপে পরিগণিত হবে। এ জন্য ঘরটি যতদিন অপহরণকারীর দখলে থাকবে, ততদিনের জন্য তাকে ঐ ঘরের ভাড়ার সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। চাই সে ঘরে নিজে বসবাস করুক কিংবা অন্যকে বসবাস করতে দিক বা খালি পড়ে থাকুক। অনুরূপভাবে যে কোন সম্পদের ভোগাধিকার থেকে কেউ কাউকে বঞ্চিত করলে সে জন্যও এ অপহরণের বিধান কার্যকর হবে।

---

১৫. যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৫, পৃ. ২২৫; আল-বাবরতী, *আল-'ইনায়াহ*, খ.৯,পৃ.৩২৪; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.৬,পৃ. ১২৩; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.২, পৃ.৩৪০; দাসূকী, *আল-হাশিয়াতু 'আলাশ শারহিল কাবীর*, খ.৩,পৃ.৪৪৮; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৫, পৃ.১৪০-১

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ) প্রমুখের দৃষ্টিতে ঘরের বসবাসের অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার জন্য অপহরণের বিধান কার্যকর হবে না। কারণ, বসবাসের অধিকার এটা সম্পদ নয়; বরং সম্পদের উপকারভোগ। অনুরূপভাবে যে কোন সম্পদের ভোগাধিকার কেউ ছিনিয়ে নিলে তার জন্য অপহরণের বিধান প্রযোজ্য হবে না । তাঁদের দৃষ্টিতে, অপহরণের বিধান কেবল সম্পদ ছিনতাইয়ের জন্য কার্যকর হবে। অতএব, কেউ কারো ঘর জোর করে ছিনিয়ে নিলে বা কাউকে তার সম্পদের ভোগাধিকার থেকে বঞ্চিত করলে তাকে ঐ ঘর বা সম্পদ দ্বারা যে লাভ বা উপকারিতা অর্জন করা যেত তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তবে পরবর্তীকালের হানাফী ইমামগণ নিম্নোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দান ওয়াজিব হবার কথা বলেছেন।[১৬]

এ তিনটি ক্ষেত্র হল ঃ

১. ওয়াকফ সম্পত্তি

কেউ যদি জনকল্যাণে ওয়াকফকৃত কোন সম্পদ -যা বসবাসের ঘরও হতে পারে, এমন কি মসজিদও হতে পারে- জোর করে দখল করে (যেমন কেউ মসজিদকে নিজের ঘর বানিয়ে নিল), তা হলে তা যতদিন তার দখলে ছিল ততদিনের জন্য তাকে ভাড়া দিতে হবে।

২. ইয়াতীম ও ইয়াতীমের সম্পদ

কোন ইয়াতীমকে তার কোন আত্মীয়-স্বজন যদি বেশ কিছু দিন ধরে অন্যায়ভাবে তার কোন নিজস্ব কাজে খাটায়, তা হলে বালিগ হবার পর তাকে তার কাজের মজুরী দিতে হবে, যদি তাকে প্রদত্ত খোর-পোষ তার মজুরীর সমান না হয়।

অনুরূপভাবে ইয়াতীমের সম্পদ কেউ অন্যায়ভাবে জবরদখল করে রেখে তা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতে বাধা দিলে কিংবা নিজে অন্যায়ভাবে ভোগ করলে তার ক্ষতিপূরণ বা বিনিময় পরিশোধ করতে হবে। এ কারণেই ইয়াতীমের মা যদি তার নতুন স্বামীর সাথে তার ইয়াতীম বাচ্চার ঘরেই বসবাস করে তা হলে স্বামীকে ঐ ঘরের ভাড়া দিতে হবে।

৩. আর্থিক উপকার লাভের উদ্দেশ্যে নির্মিত ঘর

আর্থিক উপকার লাভের উদ্দেশ্য কেউ কোন ঘর তৈরি করলে কিংবা ক্রয় করলে কেউ যদি তা জোর করে দখল করে নেয়, তা হলে ছিনিয়ে নেবার ফলে ঐ

---

১৬. শায়খী যাদাহ, *মাজমা'*.., খ.২, পৃ. ৪৬৭; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৬, পৃ. ২০৬-৭

ঘরের মালিক যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তা তাকে পুষিয়ে দিতে হবে।

মানব অপহরণ ঃ

যদি কেউ অপর কোন মানুষকে -ছোট হোক বা বড়- অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে কোন কাজে খাটায়, তা হলে তাকে তার কাজের যথাযথ পারিশ্রমিক আদায় করে দিতে হবে। আর যদি কোন কাজে না খাটিয়ে কেবল আটকে রাখা হয়, তাহলেও যেহেতু অপহরণকারী তার উপার্জনের মূল্যবান সময় নষ্ট করেছে, তাই তাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[১৭]

যদি অপহৃত ব্যক্তি অপহরণকারীর কাছে থাকা কালে কোন কারণে নিহত হয় কিংবা হিংস্র কোন প্রাণির আঘাতে বা সাপের দংশনে মারা যায় অথবা দেয়াল বা ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়, তাহলে অপহরণকারীকে তার রক্তপণ আদায় করতে হবে। যদি হঠাৎ কিংবা জ্বরে মারা যায়, তাহলে তার রক্তপণ আদায় করতে হবে না।[১৮]

যদি কেউ কোন মহিলাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে, তাহলে অপহরণকারীর ওপর যিনার হদ্দ কার্যকর করতে হবে। অধিকন্তু তাকে মহিলাটির যথাযোগ্য মাহর সমপরিমাণ জরিমানা আদায় করতে হবে।[১৯]

---

১৭. তবে শাফি'ঈগণের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। (ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৫, পৃ.১৭৫; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা*, খ.১৩, পৃ. ৩৭)

১৮. এটা হানাফী ইমামগণের অভিমত। শাফি'ঈগণের মতে, এ ধরনের কোন অবস্থায় রক্তপণ আদায় করতে হবে না। (যায়ল'ঈ, তাবয়ীন, খ.৬, পৃ.১৬৬; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.১০,পৃ. ৩৭০; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৫, পৃ.১৭৫)

১৯. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা*, খ.৩১, পৃ.১৪৮

অন্যায় আক্রমণ প্রতিহতকরণের বিধান

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিকের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু অতি পবিত্র। অন্যায়ভাবে একে অপরের জান কিংবা মাল অথবা ইজ্জত-আব্রুর ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. - "এক মুসলিমের রক্ত, মাল ও ইজ্জত অপর মুসলিমের জন্য হারাম।"[১]

অন্যায় হস্তক্ষেপ ও আক্রমণ ঃ

অন্যায় হস্তক্ষেপ ও আক্রমণকে আরবীতে 'صيال ' বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ কারো ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া, অবৈধ হস্তক্ষেপ করা।[২] ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় কারো জান কিংবা মাল অথবা সতীত্বের ওপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ ও আক্রমণ করাকে 'صيال ' বলা হয়।[৩]

জান-মাল- সতীত্বের ওপর আক্রমণ ও তার প্রতিহতকরণ ঃ

কোন ব্যক্তি যদি কারো জান-মাল ও পরিবারের ওপর আক্রমণ করে, তা হলে যতটুকু সম্ভব সহজতর উপায়ে তা প্রতিহত করতে চেষ্টা করতে হবে। যদি দেখা যায়, সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া ছাড়া তাকে প্রতিহত করা সম্ভব নয়, তা হলেই নিজেকে বা নিজের পরিবারকে কিংবা ধন-সম্পদকে রক্ষার প্রয়োজনে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বাধা নেই। যদি এ সংঘর্ষে প্রতিহতকারী ব্যক্তি মারা যায়, তা হলে সে শহীদ হবে[৪] আর আক্রমণকারী মারা গেলে প্রতিহতকারীর ওপর কোন রূপ

---

১. সহীহ্ মুসলিম, (কিতাবুল বির্‌র..,), হা.নং: ২৫৬৪; আবূ দাউদ, (বাবঃ আল-গীবত), হা.নং: ৪৮৮২

২. ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, খ.১১,পৃ.৩৮৭-৮; আর-রাযী, *মুখতারুস সিহাহ*, খ.১,পৃ.১৫৬

৩. الصيال الاستطالة و الوثوب على الغير بغير حق (*আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.২৮, পৃ. ১০৩)

৪. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ من قتل دون ماله فهو شهيد ' و من قتل دون دينه فهو شهيد ' و من قتل دون دمه فهو شهيد ' و من قتل دون أهله فهو شهيد. - "যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেল সে শহীদ হবে। যে ব্যক্তি নিজের দীন রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেল সেও শহীদ। আর যে ব্যক্তি নিজের জান রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেল সেও শহীদ। অনুরূপভাবে যে নিজের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেল, সেও শহীদ।" ('আবদ ইবন হুমায়দ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ১০৬;কাদা'ঈ, *মুসনাদুশ শিহাব*, হা.নং: ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩)

কিসাস বা দিয়াতের বিধান কার্যকর হবে না। কেননা আক্রমণকারী অন্যায়ভাবে অপরের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে গিয়ে নিজেই নিজের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে। আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণ করেছে মাত্র।[৫] এর দলীল হল ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, قاتل دون نفسك. - "তোমার জীবন রক্ষার জন্য লড়াই কর।"[৬] অন্য হাদীসে রয়েছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি কেউ এসে আমার মাল জোর করে নিয়ে যেতে চায়, তা হলে আমি কি করতে পারি ? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি তাকে তোমার মাল দিয়ে দেবে না। তখন লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, যদি সে আমার সাথে লড়াই করে, তাহলে আমি কি করতে পারি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমিও তার সাথে লড়াই করবে। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, সে যদি আমাকে মেরে ফেলে, তা হলে আমার পরিণতি কি হবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাহলে তুমি শহীদ। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, যদি আমি তাকে হত্যা করি, তা হলে কি অবস্থা হবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সে জাহান্নামে যাবে।"[৭]

অধিকাংশ ইসলামী আইনতত্ত্ববিদের মতে, আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে যদি পালিয়ে গিয়ে কিংবা কোন সুরক্ষিত বাসা-বাড়িতে ঢুকে বা জনভীড়ে প্রবেশ করে বা নিরাপত্তা কর্মীদের কাছে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়, তা হলে তার জন্য তা-ই করা ওয়াজিব হবে। সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া জায়িয নয়।[৮] কেননা শরী'আতের নির্দেশ হল ঃ আক্রমণকারীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য যথাসাধ্য সহজতর পথ অবলম্বন করতে হবে। তাই যে ক্ষেত্রে অন্যকে

---

৫. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৯২;ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৬, পৃ.৫৪৫-৬; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৫১-২; আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, খ.৮, পৃ.১১২; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ.৩০৩; আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৬, পৃ.১৫৫

৬. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭,পৃ.২২৬

৭. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল ঈমান), হা.নং: ১৪০

৮. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৫১; আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, খ.৮, পৃ.১১২; আল-মাওয়াক, *আত-তাজ ওয়াল ইকলীল*, খ.৮, পৃ.৪৪৩; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ. ৩০৩; আল-আনসারী,*আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.১৬৭

কোন ধরনের ঘায়েল না করে সহজভাবে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে, সে ক্ষেত্রে সংঘাতের পথ অবলম্বন পরিহার করতে হবে।[৯]

সতীত্বের ওপর আক্রমণ ও তা প্রতিহতকরণ ঃ

ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুযায়ী নারীর সতীত্বের ওপর আক্রমণকারীকে সম্ভাব্য যে কোন উপায়ে, প্রয়োজনে লড়াই করে হলেও প্রতিহত করা ওয়াজিব। কারণ সতীত্ব জান মালের মতোই অতি পবিত্র। তা নষ্ট করা কারো জন্য জায়িয নয়।[১০] ইমাম শাফি'ঈ (রহ) ও আহমাদ (রহ) প্রমুখ বলেন, যদি কোন মহিলা তার সতীত্বকে রক্ষা করতে গিয়ে ধর্ষণেচ্ছু কোন পুরুষকে হত্যা করে ফেলে, তা হলে এর জন্য মহিলাটির ওপর কোন শাস্তি বর্তাবে না। অনুরূপভাবে কোন পুরুষ যদি দেখতে পায় যে, তার স্ত্রী কিংবা নিজের পরিবারের কেউ কিংবা অন্য কোন মহিলা কোন যালিমের হাতে জোরপূর্বক সতীত্ব হারাতে চলছে, তাহলে পুরুষটির কর্তব্য হল যালিমকে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে হলেও প্রতিহত করা। কেননা শক্তি থাকতে কাউকে চোখের সামনে কোন মহিলার সতীত্ব নষ্ট করতে দেয়া জায়িয নয়। যদি তাকে প্রতিহত করতে গিয়ে ধর্ষণকারীকে হত্যা করতে হয়, তাও জায়িয হবে এবং এ জন্য হত্যাকারীর ওপর কোন রূপ দণ্ড আরোপিত হবে না। প্রতিহত করতে গিয়ে কেউ মারা গেলে সে শহীদ হবে।[১১] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ من قتل دون أهله فهو شهيد. - "যে নিজের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেল, সেও শহীদ।"[১২]

---

৯. মালিকী ও শাফি'ঈগণের মতে, যদি বিনা কষ্টে পলায়ন করা সম্ভব হয়, তা হলেই পলায়ন করা ওয়াজিব হবে। অন্যথায় পলায়ন করা জরুরী নয়। শাফি'ঈগণের মতে, অমুসলিম দেশের কোন নাগরিক অবৈধভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করে কারো ওপর আক্রমণ করলে পলায়ন করা ওয়াজিব নয়; বরং হারাম। যে ক্ষেত্রে পলায়ন করা ওয়াজিব সে ক্ষেত্রে পলায়ন না করে যদি সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে এবং আক্রমণকারীকে হত্যা করে তাহলে শাফি'ঈ ইমামগণের এক বর্ণনা মতে, হত্যাকারীর জন্য কিসাসের বিধান প্রযোজ্য হবে। তাদের অন্য মতানুযায়ী তাকে দিয়্যাত দিতে হবে। কোন কোন হাম্বলী ও শাফি'ঈ ইমামের মতে, কোন অবস্থায় পলায়ন করা ওয়াজিব নয়। নিজের জায়গায় অবস্থান করে যথাসাধ্য সহজ উপায়ে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করবে। শাফি'ঈ ইমামগণের তৃতীয় একটি মতও বর্ণিত রয়েছে। তা হলঃ যদি আক্রান্ত ব্যক্তি নিশ্চিত হয় যে, সে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারবে, তাহলেই পালিয়ে যাওয়া ওয়াজিব হবে। অন্যথায় পালানো ওয়াজিব হবে না। (আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, খ.৮, পৃ.১১২; দাসূকী, *আল-হাশিয়াতু 'আলাশ্ শারহিল কাবীর*, খ.৪, পৃ.৩৫৮; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ. ৩০৩; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.১৬৭)

১০. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৪, পৃ. ২৩৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৫২

১১. শাফি'ঈ,*আল-উম্ম*, খ.৪, পৃ. ২৩৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৫২; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.১৬৭; রুহায়বানী, *মাতালিব..*, খ.৬, পৃ.৪২

১২. আল-কাদা'ঈ, *মুসনাদুশ শিহাব*, হা.নং: ৩৪১; ইবনু হাজর আল-কালানী, *তালখীসুল হাবীর*, (কিতাবুস সিয়াল), হা.নং: ১৮০৯

শাফি'ঈগণের মতে নিজের জান কিংবা সতীত্ব রক্ষার জন্য চেষ্টা করা জরুরী, যদি এতে নিজের প্রাণ নাশ কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধ্বংস সাধনের আশঙ্কা না থাকে।[১৩]

আক্রান্ত মহিলা নিজের সতীত্বকে বজায় রাখার জন্য যথাসাধ্য ধর্ষণেচ্ছুকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করবে। কেননা তাকে কোনভাবে সুযোগ দেয়াই জায়িয নয়। যদি তাকে প্রতিহত করা না হয়, তা হলে ধরে নেয়া হবে যে, সেও এ অপকমের্র সুযোগ দান করেছে। যদি মহিলা প্রতিহত করতে গিয়ে তাকে হত্যাই করে ফেলে - যদি হত্যা করা ছাড়া তাকে প্রতিহত করার কোন পথ না থাকে- তাহলে তার ওপর কোন রূপ শাস্তি বর্তাবে না।[১৪] বর্ণিত আছে, হুযায়ল গোত্রের এক লোক জনৈক ব্যক্তির আতিথ্য গ্রহণ করেছিল। এ সুযোগে সে তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে চাইলে মহিলাটি তাকে পাথর নিক্ষেপ করে। এর ফলে সে মারা যায়। ঘটনাটি জেনে হযরত 'উমার (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি কখনোই তার রক্তমূল্যের কথা বলতে পারি না।[১৫] বিশিষ্ট ইসলামী আইনতত্ত্ববিদ ইবনু কুদামাহ ও ইবনুল হুমাম (রহ) প্রমুখ বলেন, যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে কিংবা অন্য কোন মহিলার সাথে কোন বিবাহিত পুরুষকে ব্যভিচার করতে দেখে চিৎকার করল; কিন্তু এরপরও লোকটি পালিয়ে গেল না এবং যিনা থেকে বিরত রইল না, তাহলে লোকটির জন্য তাকে হত্যা করা বৈধ হবে। যদি সে তাকে হত্যা করে, তা হলে তার ওপর কিসাস বা দিয়াত -কোন রূপ শাস্তি বর্তাবে না।[১৬]

জান কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর আক্রমণ ও তা প্রতিহতকরণ ঃ

জান কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর আক্রমণের ক্ষেত্রে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করে নিজেকে রক্ষা করা ওয়াজিব। চাই আক্রমণকারী মানুষ হোক কিংবা কোন প্রাণি, চাই মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম, চাই সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হোক কিংবা পাগল, চাই প্রাপ্ত বয়স্ক হোক কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক।[১৭] ইসলামের দৃষ্টিতে নিজেকে হত্যা করা যেমন পাপ, তেমনি অপরের কাছে নিজেকে হত্যার জন্য সঁপে দেয়াও

---

১৩. আল-আনসারী, *আল-গুরার..*, খ.৫, পৃ.১১২-৩;আল-জুমাল, *ফুতুহাত..*, খ.৫, পৃ.১৬৮

১৪. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৫২

১৫. আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং: ১৭৯১৯

১৬. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৫৩; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ.৩৪২; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৫, পৃ.৪৫;

১৭. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৮, পৃ. ৩৭৫; আল-বাবরতী, *আল-'ইনায়াহ*, খ.১০, পৃ. ২৩২; আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৬, পৃ.১৫৫; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.১৬৬

পাপ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, و لا تلقوا بايديكم إلى التهلكة. - "তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের কবলে নিক্ষেপ করো না।"[১৮] এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। অতএব, আক্রমণকারীর কাছে নিজেকে সঁপে দেয়া যেহেতু প্রকারান্তরে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ারই নামান্তর, তাই আক্রমণকারীকে প্রতিহত করে নিজেকে রক্ষা করা ওয়াজিব হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين – يريد قتله – فقد وجب دمه. "কোন ব্যক্তি হত্যা করার উদ্দেশ্যে কোন মুসলিমকে ইঙ্গিতে কোন লৌহাস্ত্র দেখালে তাকে হত্যা করা বিধিসম্মত হয়ে যাবে ।"[১৯] অতএব, আক্রমণকারীকে প্রতিহত করে নিজের জীবন বাঁচাতে চেষ্টা করা দূষণীয় নয়; বরং ওয়াজিব। এটা হানাফী ও মালিকীগণের অভিমত।[২০] পক্ষান্তরে শাফি'ঈগণের প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী আক্রমণকারী অমুসলিম এবং আক্রান্ত ব্যক্তি মুসলিম হলে তবেই আক্রমণ প্রতিহত করা ওয়াজিব হবে। যদি আক্রমণকারী মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত নয় এমন মুসলিম হয়, তাহলে আক্রমণ প্রতিহত করা ওয়াজিব নয়; ইচ্ছে করলে সে নিজেকে তার কাছে সঁপে দিতে পারবে। চাই আক্রমণকারী অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা পাগল হোক, চাই তাকে হত্যা ছাড়াও প্রতিহত করা সম্ভব হোক বা না হোক।[২১] কতিপয় শাফি'ঈ ইমামের মতে, এ রূপ অবস্থায় আক্রমণ প্রতিহত না করে নিজেকে আক্রমণকারীর কাছে সঁপে দেওয়া উত্তম।[২২] তাঁদের দলীল হল ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, كن كابن آدم. - "তুমি আদম (আ)-এর পুত্রের (হাবিল) মত হও।"[২৩] আহনাফ ইবনু কায়স (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি গোলযোগের সময় আমার অস্ত্র নিয়ে বেরুলাম। পথিমধ্যে হযরত আবূ বাকরাহ (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হল। তিনি আমার গন্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচাতো ভাইকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ

---

১৮. আল-কুর'আন, ২: ১৯৫

১৯. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ২৬৩৩৭; আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক* (কিতাবু কিতালি আহলিল বাগ্ই), হা.নং: ২৬৬৯

২০. আল-বাবরতী, *আল-'ইনায়াহ*, খ.১০, পৃ. ২৩২; মুল্লা খসরু, *দুরারুল হুক্কাম*, খ.২, পৃ.৯২; আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, খ.৮, পৃ.১১২

২১. হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯, পৃ. ১৮৩-৪; বুজায়রমী, *তুহফাতুল হাবীব*, খ,৪, পৃ.২২১

২২. হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯, পৃ. ১৮৪; বুজায়রমী, *তুহফাতুল হাবীব*, খ,৪, পৃ.২২১

২৩. জামে আত্ তিরমিযী, (কিতাবুল ফিতান), হা.নং: ২১৯৪; আহমদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ১৬০৯

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, "দুজন মুসলিম তরবারি নিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হলে দুজনেই জাহান্নামে যাবে।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ এই তো হত্যাকারী। (সে তো প্রকৃত অপরাধী।) কিন্তু নিহত ব্যক্তির অপরাধ কি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ "সেও তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে চেয়েছে।"[২৪] এ হাদীস থেকে জানা যায়, যদি আক্রমণকারী মুসলিম হয়, তা হলে আক্রমণ প্রতিহত করার পরিবর্তে নিজেকে তার কাছে সঁপে দেয়াই উত্তম। বিদ্রোহীদের দমন করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও হযরত 'উসমান (রা) নিজেকে তাঁদের কাছে সঁপে দিয়েছিলেন। এমনকি তিনি তাঁর রক্ষীদেরকেও তাদের প্রতিহত করতে বারণ করেছিলেন।[২৫]

মালের ওপর আক্রমণ ও তা প্রতিহতকরণ ঃ

মালের ওপর আক্রমণের ক্ষেত্রে আক্রমণকারীকে সম্ভাব্য যে কোন উপায়ে, প্রয়োজনে লড়াই করে হলেও প্রতিহত করা ওয়াজিব। চাই মাল কম হোক বা বেশি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,. قاتل دون مالك - "তোমার মাল রক্ষার জন্য লড়াই কর।"[২৬] সংঘর্ষের সময় আক্রমণকারী মারা গেলে অথবা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হলে তার জন্য কোন কিসাস কিংবা দিয়াত বা কাফফারা অথবা ক্ষতিপূরণের বিধান কার্যকর হবে না। এটা হানাফীগণের এবং মালিকীগণের বিশুদ্ধতম অভিমত।[২৭] তাঁদের দৃষ্টিতে নিজের কিংবা অপরের

---

২৪. সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুল ফিতান), হা.নং : ৬৬৭২; সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল ফিতান), হা.নং: ২৮৮৮

২৫. শাফি'ঈগণের দ্বিতীয় মত হল- যে কোন অবস্থায় আক্রমণকারীর আক্রমণ প্রতিহত করে নিজেকে রক্ষা করা ওয়াজিব। চাই আক্রমণকারী কাফির হোক কিংবা মুসলিম, মানুষ হোক কিংবা কোন প্রাণি। তাঁদের থেকে অপর একটি মতও বর্ণিত রয়েছে। তা হলঃ যদি আক্রমণকারী অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা পাগল হয়, তা হলে তাদের কাছে নিজেকে সঁপে দেয়া জায়িয নেই। তাদের উদাহরণ অন্য প্রাণিদের মত। অন্য যে কোন প্রাণির আক্রমণকে প্রতিহত করে যেমন নিজের জীবন রক্ষা করা ওয়াজিব, তেমনি তাদের আক্রমণ প্রতিহত করেও নিজের জীবন রক্ষা করা ওয়াজিব। (*আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.২৮, পৃ.১০৪)
হাম্বলীগণের মতে, শান্তির সময় আক্রমণকারীর আক্রমণ প্রতিহত করে নিজেকে রক্ষা করা ওয়াজিব। তবে গোলযোগের সময় নিজেকে আক্রমণকারীর কাছে সঁপে দেয়া জরুরী নয়। কেননা হযরত উসমান (রা.) শক্তি থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহীদেরকে দমন করেন নি; বরং ধৈর্য ধারণ করেছেন। যদি তা না জায়িযই হত, তা হলে সাহাবা কিরাম তা মেনে নিতেন না। (আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৬,পৃ.১৫৫)

২৬. নাসা'ঈ, *আস-সুনান আল-কুবরা'*, হা.নং: ৩৫৪৪; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, হা.নং: ৭৪৬

২৭. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৬, পৃ.৫৪৬; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৮, পৃ.৩৪৫

মালের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদি কেউ তার মাল চুরি করছে দেখে চিৎকার করল; কিন্তু চোর পালিয়ে যাচ্ছে না অথবা কেউ কোন কুখ্যাত চোরকে তার ঘরের কিংবা অপরের ঘরের সিঁদ কাটতে দেখে চিৎকার করল; কিন্তু সে পালিয়ে যাচ্ছে না, তাহলে তাকে সম্ভাব্য যে কোন উপায়ে, প্রয়োজনে হত্যা করে হলেও তাকে দমন করা জায়িয। এ রূপ অবস্থায় চোরকে হত্যা করা হলে হত্যাকারীর জন্য কিসাস কিংবা দিয়্যাতের বিধান প্রযোজ্য হবে না।[২৮] মালিকীগণের মতে, মাল রক্ষার্থে আক্রমণকারীকে হত্যা করা তখনই জায়িয হবে, যদি তাকে ধরতে গিয়ে নিজের প্রাণনাশের কিংবা প্রচণ্ড ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। যদি এ রূপ আশঙ্কা না থাকে, তা হলে তাকে হত্যা করা জায়িয হবে না।[২৯]

তবে শাফি'ঈ ও অধিকাংশ হাম্বলীর মতে, মাল রক্ষার জন্য আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা এবং এ জন্য তার সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া ওয়াজিব নয়। কেননা মাল তো অপরকে, এমনকি যালিম অত্যাচারীকেও দান করা জায়িয।[৩০] তবে শাফি'ঈগণের মতে মাল যদি কোন প্রাণি হয় কিংবা মালে অন্য কারো কোন রূপ হক জড়িত থাকে, তাহলেই মাল রক্ষা করা ওয়াজিব হবে, যদি নিজের প্রাণনাশের কিংবা সতীত্ব নষ্ট হবার আশঙ্কা না থাকে।[৩১]

তাঁদের দৃষ্টিতে নিচের দুটি অবস্থায় মাল রক্ষার জন্য সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া জায়িয নয়।[৩২]

১. তীব্র জঠর জ্বালায় কেউ কারো খাবার জোর করে নিতে চাইলে মালিকের পক্ষে তাকে শক্তি প্রয়োগ করে বারণ করা সমীচীন নয়, যদি সে তার মত ক্ষুধায় কাতর না হয়। যদি মালিক এ রূপ ব্যক্তিকে হত্যা করে তাহলে তার ওপর কিসাস ওয়াজিব হবে।

২. যদি কেউ একান্তে চাপে পড়ে কারো মাল ধ্বংস করতে বাধ্য হয়, তা হলে তাকেও শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিহত করা জায়িয নয়; বরং এমতাবস্থায় মালিকের কর্তব্য হল মালের বিনিময়ে হলেও তার প্রাণ রক্ষা করা।

---

২৮. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৬, পৃ.৫৪৫-৬

২৯. আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ.১৭২; আল-খারাশী, *শারহ মুখতাছারি খলীল*, খ.৮, পৃ.১০৫

৩০. তবে ইমাম আহমাদ (রহ) থেকে ভিন্ন অন্য একটি মতও বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, "যদি চোরেরা তোমার জান ও মালের ওপর চড়াও হয়, তাহলে তুমি জান ও মাল রক্ষার জন্য তাদের সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হও।" (আল-বহূতী, *কাশশাফ*, খ.৬, পৃ.১৫৪)

৩১. আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.১৬৬; হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯, পৃ. ১৮৩; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ.৬, পৃ.১৪৬; আল-বহূতী, *কাশশাফ*, খ.৬,পৃ.১৫৬

৩২. আল-আনসারী, *আল-গুরার..*, খ.৫, পৃ.১১১-২; আল-বুজায়রমী, *তুহফাতুল হাবীব*, খ,৪, পৃ.২২১-২

হাম্বলীগণের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী নিজের হোক কিংবা অপরের মাল রক্ষার জন্য আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা জরুরী নয়। তাঁদের মতে মালের জন্য লড়াই করার চাইতে লড়াইয়ে না জড়ানোই উত্তম। আবার তাঁদের অনেকের মতে, অপরের মাল রক্ষার জন্যও চেষ্টা করা সমীচীন, যদি তাতে কোন পক্ষের প্রাণ নাশের কিংবা বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে। কেননা পারস্পরিক সহযোগিতা করা না হলে তো মানুষের জান-মাল রক্ষা করাই দুরূহ হয়ে পড়বে। ডাকাতরা এক একজনকে ধরে তার সর্বস্ব ছিনিয়ে নেবে আর সবাই এ পরিস্থিতি দেখতে থাকবে। তবে কারো প্রাণ নাশের কিংবা মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে মাল রক্ষার জন্য চেষ্টা করা জায়িয নয়।[৩৩]

ক্রমশ সহজতর থেকে কঠোরতর পদ্ধতিতে প্রতিহতকরণ ঃ

আক্রমণকারীর আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব সহজতর পথ থেকে ক্রমশ কঠোর পথে অগ্রসর হওয়া চাই। অর্থাৎ যাকে কথা বলে কিংবা মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে দমন করা সম্ভব, তাকে প্রহার করা হারাম। আর যাকে হাত দিয়ে প্রহার করে নিবারণ করা সম্ভব তাকে বেত্রাঘাত করা হারাম। আর যাকে বেত্রাঘাত করে দমন করা সম্ভব তাকে লাঠিপেটা করা হারাম। আর যাকে কোন অঙ্গহানি করে প্রতিহত করা সম্ভব তাকে হত্যা করা হারাম। কেননা এ সব প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাই যে ক্ষেত্রে সহজতর উপায়ে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা সম্ভব সে ক্ষেত্রে প্রতিহতকরণের কঠোরতর উপায় অবলম্বন করা জায়িয নয়।[৩৪]

অনুরূপভাবে আক্রমণকারী দৈবাত কোন বিপদে পড়ার কারণে (যেমন পানিতে বা আগুনে পড়ে গেল, কিংবা পা ভেঙ্গে গেল অথবা কোন গর্তে পড়ে গেল) যদি আক্রান্ত ব্যক্তি তার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে যায়, এমতাবস্থায় তাকে মারধর করা জায়িয নয়। কেননা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি তো তার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে। উপরন্তু যে উপায়ে তাকে সহজভাবে দমন করা সম্ভব তার চাইতে কঠোরতর পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজনও নেই।[৩৫]

এ ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি তার প্রবল ধারণা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। নিছক ধারণা বা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোন পদক্ষেপ নেবে না।

---

৩৩. ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ.৬, পৃ.১৪৬; আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৬, পৃ.১৫৬
৩৪. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯,পৃ.১৫১; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ. ৩০৩; আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৬, পৃ.১৫৪
৩৫. আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৬, পৃ.১৫৪

যদি প্রতিহতকরণের উপর্যুক্ত ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা না হয় অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে সহজ উপায়ে তাকে প্রতিহত করা সম্ভব, সে ক্ষেত্রে যদি কঠোর পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তা হলে প্রতিহতকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি আক্রমণকারী পালিয়ে যায় আর আক্রান্ত ব্যক্তি তার পেছনে ধাওয়া করে তাকে হত্যা করে, তা হলে তার জন্য কিসাস কিংবা দিয়াতের বিধান প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে গিয়ে যদি প্রথমবার মেরে ক্ষতবিক্ষত করা হয় এবং এরপর সে পালিয়ে যায়, অতঃপর প্রতিহতকারী তাকে পুনরায় ধরে যদি মারধর করে ক্ষতবিক্ষত করে এবং আক্রমণকারী যদি উভয় আঘাতের কারণে মারা যায়, তাহলে তাকে অর্ধেক রক্তমূল্য দিতে হবে। কারণ প্রথমবারের মারধরের প্রয়োজন থাকায় সে এর জন্য অভিযুক্ত হবে না। কিন্তু দ্বিতীয়বারের মারধরের প্রয়োজন না থাকার কারণে তাকে এর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[৩৬]

তবে নিম্নের অবস্থাসমূহে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা না হলেও প্রতিহতকারীকে কোন রূপ দায়ভার গ্রহণ করতে হবে না।

১. যদি আক্রমণকারীকে বেত্রাঘাত কিংবা লাঠিপেটা দ্বারা প্রতিহত করা সম্ভব হয়; কিন্তু আক্রান্ত ব্যক্তির কাছে তাকে প্রতিহত করার জন্য তরবারী কিংবা ধারালো কোন অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু না থাকে, তা হলে এরূপ অবস্থায় যেহেতু তার পক্ষে তরবারী বা এ জাতীয় অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা যাচ্ছে না, তাই তাকে তরবারী বা এ জাতীয় অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা জায়িয হবে।

২. যদি আক্রমণকারী ও আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বেঁধে যায় এবং তা ভয়ানক রূপ লাভ করে, তা হলেও প্রতিহতকারী তার হাতের নাগালে যা পাবে তা দিয়ে তাকে প্রতিহত করতে পারবে।

৩. যদি আক্রান্ত ব্যক্তির প্রবল ধারণা জন্ম নেয় যে, হত্যা করা ছাড়া আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা সম্ভব নয়, তাহলেও তার জন্য উপর্যুক্ত ধারাবাহিকতা মেনে চলা জরুরী হবে না।

৪. আক্রমণকারী যদি অন্য কোন অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তার আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রেও উপর্যুক্ত ধারাবাহিকতা মেনে চলা জরুরী হবে না।[৩৭]

---

৩৬. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৫১; আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৬, পৃ.১৫৫
৩৭. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.২৮, পৃ. ১০৭

আক্রমণের প্রমাণঃ

কোন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে যদি দাবী করে যে, সে তাকে তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গমরত অবস্থায় দেখতে পেয়েছে; কিন্তু নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা যদি তা অস্বীকার করে, তা হলে তাদের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। তবে হত্যাকারী যথার্থ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারলে তার কথা আমলে নেয়া হবে।[৩৮] তবে ইমামগণের মধ্যে সাক্ষীর সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশের মতে, চারজন সাক্ষী লাগবে।[৩৯] বর্ণিত রয়েছে, হযরত সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনার অভিমত কি, আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে কোন পুরুষকে দেখতে পাই, তা হলে কি আমি তাকে এ অবস্থায় ছেড়ে রেখে চার জন সাক্ষী ডেকে নিয়ে আসব? তিনি বললেন, হ্যাঁ...।"[৪০] হাম্বলীগণের এক বর্ণনা মতে, এ ক্ষেত্রে দুজন সাক্ষীই যথেষ্ট হবে। কেননা এখানে যে সাক্ষ্য, তা হল মেয়ের সাথে পুরুষের একত্রে মিলিত হওয়ার প্রসঙ্গে; যিনার ব্যাপারে নয়।[৪১]

অনুরূপভাবে কেউ যদি তার ঘরে কাউকে হত্যা করে দাবী করে যে, সে তার ঘরে হানা দিয়েছিল; কিন্তু নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা যদি তা অস্বীকার করে, তা হলে তাদের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। তবে হত্যাকারী যথার্থ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারলে তার কথা আমলে নেয়া হবে।[৪২] হানাফীগণের মতে, যদি হত্যাকারীর কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ না থাকে, তদুপরি নিহত ব্যক্তিও চোর কিংবা অসৎ ব্যক্তি হিসেবে কুখ্যাত না হয়, তাহলে হত্যাকারীর ওপর কিসাসের বিধান কার্যকর করা হবে। যদি সে চোর কিংবা অসৎ ব্যক্তি হিসেবে কুখ্যাত হয়, তা হলে হত্যাকারীর ওপর কিসাসের বিধান কার্যকর করা যাবে না। কেননা তার বাহ্যিক অবস্থা থেকে কিছুটা সন্দেহ দেখা দেয়। তবে তাকে রক্তমূল্য দিতে হবে।[৪৩] মালিকীগণের মতে, যদি তার সাক্ষীপ্রমাণ না থাকে, তা হলে তার কথা বিশ্বাস করা হবে না এবং তার ওপর কিসাসের বিধান প্রযোজ্য হবে। তবে এমন

---

৩৮. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৮, পৃ. ৩৭৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৫৩
৩৯. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৮, পৃ. ৩৭৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৫৩
৪০. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল লি'আন), হা.নং: ১৪৯৮; ইবনু হিব্বান, *আস-সহীহ*, হা.নং: ৪২৮২
৪১. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৫৩
৪২. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৬, পৃ.৫৪৬-৭
৪৩. *তদেব*

কোন স্থানে হত্যা করা হলে যেখানে কোন লোকের আনাগোনা নেই, তাহলে শপথের ভিত্তিতে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।[৪৪] শাফি'ঈ ইমামগণের মতে সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। সাক্ষীদের এ কথা- "তারা তাকে প্রকাশ্য অস্ত্র প্রদর্শন করে তার ঘরে প্রবেশ করতে দেখেছে"- সাক্ষ্যের জন্য যথেষ্ট হবে। তবে "তারা প্রকাশ্যে অস্ত্র প্রদর্শন ছাড়াই অস্ত্রসমেত তার ঘরে প্রবেশ করেছে"- সাক্ষীদের এ বক্তব্য সাক্ষ্যের জন্য যথেষ্ট হবে না, যদি সে কুখ্যাত সন্ত্রাসী না হয় এবং তার ও নিহত ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব শত্রুতা না থাকে।[৪৫] হাম্বলীগণের মতে, সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। সাক্ষ্যপ্রমাণ না থাকলে তার ওপর কিসাসের হুকম বর্তাবে, চাই নিহত ব্যক্তি কুখ্যাত চোর কিংবা দাগী সন্ত্রাসী হোক বা না হোক। যদি সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেয় যে, তারা তাকে প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে তার দিকে আসতে দেখেছে, তারপর সে তাকে আঘাত করেছে, তাহলে আক্রমণকারী নিজে আক্রান্ত হলে তার রক্ত বৃথা যাবে। যদি তারা সাক্ষ্য দেয় যে, তারা তাকে তার ঘরে প্রবেশ করতে দেখেছে; কিন্তু তারা তার সাথে অস্ত্র আছে কি না- তা উল্লেখ না করলে কিংবা অস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছে; তবে প্রকাশ্য প্রদর্শনের কথা বলে নি, তাহলে কিসাস রহিত হবে না। কেননা সে তো সেখানে কোন প্রয়োজনেও প্রবেশ করতে পারে। নিরেট প্রবেশ দ্বারা কারো রক্তপাত অনর্থক বিবেচিত হবে না।[৪৬]

যদি দু ব্যক্তি পরস্পর আঘাত করে এবং প্রত্যেকেই দাবী করে যে, আমি তাকে আত্মরক্ষার্থে আঘাত করেছি, তাহলে প্রত্যেকেই তার প্রতিপক্ষের দাবী মিথ্যা হবার ব্যাপারে শপথ করবে এবং প্রত্যেককেই তার কৃত আঘাতের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা এখানে প্রত্যেকেরই অপরের বিরুদ্ধে দাবী রয়েছে, যা কেউ স্বীকার করে নিচ্ছে না।[৪৭]

আক্রমণের শাস্তি এবং প্রতিহতকরণের বিধান ঃ

যদি আক্রমণের শিকার ব্যক্তি নিজের জীবন কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রক্ষা করতে গিয়ে আক্রমণকারীকে হত্যা করে, তা হলে অধিকাংশ ইমামের মতে

---

৪৪. দাসূকী, *আল-হাশিয়াতু 'আলাশ্ শারহিল কাবীর*, খ.৪, পৃ.৩৫৮; আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, খ.৮, পৃ.১১২

৪৫. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ.৩৫; হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯, পৃ. ১৮৩

৪৬. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৫৪; আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৫, পৃ.১৫৬-৭, খ.৬, পৃ.৫৩১-২; আর-রুহায়বানী, *মাতালিব..*, খ.৬, পৃ.৪১-২

৪৭. আর-রুহায়বানী, *মাতালিব..*, খ.৬, পৃ.৪২

আক্রমণকারী মানুষ হলে হত্যাকারীর ওপর কিসাস বর্তাবে না এবং তার রক্তমূল্য অথবা কাফফারা দিতে হবে না। কেননা আক্রমণকারী অন্যায়ভাবে অপরের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে নিজেই নিজের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে। আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণ করেছে মাত্র। তাই আক্রমণকারী তার হাতে নিহত হওয়ায় সে দোষী নয়।[৪৮]

আক্রমণকারী মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণি হলে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে না। তবে হানাফীগণের মতে প্রাণিটি অন্য ব্যক্তির মালিকানাধীন হলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা সে নিজেকে রক্ষা করার জন্য অপরের সম্পদ নষ্ট করেছে। যেমন ক্ষুধায় কাতর কোন ব্যক্তি কারো খাবার নিয়ে খেয়ে ফেললে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।[৪৯]

তাঁদের মতে, পাগল ও না বালিগরাও জীব জন্তুর মত। কোন আক্রান্ত ব্যক্তি যদি তাদের সশস্ত্র আক্রমণের সময় তাদের হত্যা করে অথবা তারা প্রতিহত হয়ে নিহত হয়, তাহলে আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর তাদের রক্তমূল্য বাধ্যতামূলক হবে। তবে কিসাস ওয়াজিব হবে না।[৫০]

তবে আক্রমণকারী যদি উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করতে সমর্থ হয় কিংবা তার কোন কিসাসযোগ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হানি করে, তা হলে তার ওপর কিসাসের বিধান প্রযোজ্য হবে।

আক্রমণকারীর হাত থেকে অপরকে রক্ষা করা ঃ

যদি কোন আক্রমণকারী অন্যায়ভাবে কারো প্রাণ নাশ করতে বা কারো দেহের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বংস করে দিতে উদ্যত হয়, এমতাবস্থায় আক্রমণকারীকে প্রতিহত করে তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা অন্যদের জন্য ওয়াজিব।

---

৪৮. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৯২; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৬, পৃ.৫৪৫-৬; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৫১

৪৯. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.২, পৃ.৬৭; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.১০, পৃ.২৩২-৩; গানিম, *মাজমা'..*, পৃ.১৯৩; শায়খী যাদাহ, *মাজমা'উল আনহুর*, খ.২, পৃ.৬২৪; দাসূকী, *আল-হাশিয়াতু 'আলাশ্ শারহিল কাবীর*, খ.৪, পৃ.৩৫৮; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ. ৩০৪

৫০. তবে শাফি'ঈ ইমামগণ এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ)-এর মতে দিয়াত (রক্তমূল্য) বাধ্যতামূলক হবে না। (ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.১০, পৃ.২৩২-৩; শায়খী যাদাহ, *মাজমা'উল আনহুর*, খ.২, পৃ.৬২৪)

এটা হানাফী ও মালিকীগণের অভিমত।[৫১] শাফি'ঈগণের মতে, অপরকে রক্ষা করার বিধান নিজেকে রক্ষা করার বিধানের মতোই। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে নিজেকে রক্ষা করা ওয়াজিব, সে ক্ষেত্রে অপরকেও রক্ষা করা ওয়াজিব আর যে ক্ষেত্রে নিজেকে রক্ষা করা ওয়াজিব নয়, সে ক্ষেত্রে অপরকেও রক্ষা করা ওয়াজিব নয়। কারণ নিজেকে রক্ষার চাইতে অপরকে রক্ষার গুরুত্ব বেশি হতে পারে না। অতএব, নিজেকে ধ্বংস করে নয়; বরং যে ক্ষেত্রে নিজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না, সে ক্ষেত্রে অপরকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসা ওয়াজিব। কাজেই নিজের প্রাণের বিনিময়ে অন্যকে রক্ষা করা জরুরী নয়।[৫২] হাম্বলীগণের মতে, শান্তি-শৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকাকালে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করে অপরকে রক্ষা করা ওয়াজিব, যদি নিজের এবং আক্রান্ত ব্যক্তির নিরাপত্তার ব্যাপারে আশঙ্কা না থাকে।[৫৩]

---

৫১. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.২৮, পৃ. ১০৮

৫২. এ ছাড়া শাফি'ঈগণের আরো দুটি মত রয়েছে। ক. সর্বাবস্থায় অপরের জীবন বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রক্ষা করা ওয়াজিব। কেননা নিজের স্বার্থের চাইতে অপরের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়াই হল মুসলিম চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, من أذل عنده مؤمن فلم ينصره و هو قادر على ان ينصره اذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. - "যার সামনে কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে অপদস্থ করা হল আর সে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাকে সহযোগিতা করল না, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামাতের দিন সকল সৃষ্টির সামনে অপমানিত করবেন।" (আহমদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ১৬০২৮; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, হা.নং: ৫৫৫৪) খ. অপরকে রক্ষার জন্য আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা জায়িয নয়। কেননা অপরের সহযোগিতা করতে গিয়ে প্রকাশ্যে অস্ত্রের প্রদর্শন ও ব্যবহার করা হলে দেশে চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। উপরন্তু, অপরকে রক্ষা করা জনসাধারণের কাজ নয়; এটা সরকারের একটি গুরু দায়িত্ব। (হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯, পৃ. ১৮২, ১৮৫; আশ-শারবীনী, *মুগনিউল মুহতাজ*, খ.৫)

৫৩. আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৬, পৃ.১৫৬; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ. ৩০৬

৪. যিনার শাস্তি

যিনা একটি অত্যন্ত জঘন্য ও কুৎসিত অপরাধ, যা সমাজে চরম নৈতিক বিপর্যয় ও চরম লাম্পট্য সৃষ্টি করে এবং পারিবারিক বন্ধনকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। এটা ব্যাপকভাবে সমাজে প্রসার লাভ করলে যুবক-যুবতীরা সনাতন বিবাহ পদ্ধতিতে জড়িত না হয়ে পশুদের মত চরম পাশবিক যৌনতায় মেতে ওঠে। বর্তমানে পশ্চিমা সমাজে যৌন স্বাদ আস্বাদনের কোন সীমা বা নৈতিক বিধি-নিষেধের পরোয়া করা হয় না। যিনা সে সমাজে নিতান্ত ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার রূপে গণ্য। এ কারণেই সেখানে পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তদুপরি এ অবৈধ যৌনকর্ম এইড্‌স নামক মারাত্মক ঘাতক ব্যাধির জন্ম দিয়েছে। এর ফলেই আজ বিশ্বের সচেতন জনসমাজ যিনা পরিহার করে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী বিবাহের মাধ্যমে যৌনকর্ম সমাধার জন্য প্রতিনিয়ত আহবান জানাচ্ছে।

সকল ধর্মেই অভিন্নভাবে যিনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে; তবে ইসলামী আইনে এর বীভৎস কদর্যতাকে অত্যন্ত প্রকট করে তুলেছে এবং এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। এর নিকটে যেতেও কঠিন ভাষায় নিষেধে করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, و لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة و ساء سبيلا. - "তোমরা যিনার কাছেও যেয়ো না। কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও খুব বেশি খারাপ পথ।"[১] একজন ঈমানদারের জন্য তা সম্পূর্ণ কল্পনাতীত ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان . - "কোন ব্যক্তি যখন যিনায় লিপ্ত হয় তখন তার থেকে ঈমান বের হয়ে যায়।"[২]

যিনার সংজ্ঞা ঃ

যিনার আভিধানিক অর্থ হল পাপকর্ম করা। সাধারণ অর্থে যিনা বলতে নারী-পুরুষের অবৈধ যৌনমিলনকে বোঝানো হয়। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় বিশুদ্ধ বৈবাহিক বন্ধন কিংবা সন্দেহজনিত বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া বালিগ ও সুস্থ

---

১. আল-কুর'আন, ১৭ (সূরা বনী ইসরাইল) ঃ ৩২

২. আবূ দাউদ, (কিতাবুস সুন্নাহ), হা.নং: ৪৬৯০; আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হা.নং: ৫৬

বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন দুজন নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্মতিতে নারীর সামনের যৌনাঙ্গ দিয়ে পুরুষের সঙ্গমক্রিয়াকে যিনা বলা হয়।[৩]

যিনার শাস্তি ঃ

পূববর্তী ধর্মসমূহে যিনার শাস্তি ঃ

ইসলামে বিবাহিত নর-নারীর ব্যভিচারের শাস্তি হল রজম (প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা)। কিন্তু এ শাস্তি নতুনভাবে ইসলামে প্রবর্তন করা হয়নি; বরং তাওরাতেও এ শাস্তির কথা বর্ণিত রয়েছে।[৪] আর তাওরাতের যে বিধানগুলো রহিত হয়নি, সেগুলো পরবর্তীতে অবতীর্ণ ইঞ্জিলের বিধান রূপেও গণ্য হয়ে থাকে। তাওরাতে অনেক পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে, তা সত্ত্বেও আজকের তাওরাতে সেই রজমের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে।[৫] তবে বর্তমানে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা এ শাস্তি কার্যকর করে না। তাতে অবশ্য এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না।

ইসলামে যিনার শাস্তির ক্রম বিবর্তন ঃ

ইসলামের আর্বিভাবের সময় আরব সমাজে যিনা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এ অবৈধ যৌনচর্চায় কলুষিত সমাজকে সফলভাবে সংশোধন করার দিকে লক্ষ্য

---

৩. এটা হানাফী ইমামগণের প্রদত্ত সংজ্ঞার সার কথা। আল্লামা কাসানী বলেন, أما الزنا فهو اسم للوطء الحرام في قبل المراة الحية في حالة الاختيار العاري عن حقيقة النكاح و شبهته. (আল-কাসানী, *বদাইউস সানা'ই*, খ.৭,পৃ. ৩৩-৪) শাফি'ঈগণের মতে, যিনা হল إيلاج حشفة او قدرها من ذكر في فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة. - "স্বভাবগতভাবে যৌনকামনাময়ী নিষিদ্ধ কোন লজ্জাস্থানের মধ্যে কোন ধরনের সন্দেহ ছাড়াই পুরুষাঙ্গ কিংবা তার মাথা প্রবেশ করা।" (আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ. ১২৫) হাম্বলীগণের মতে, فعل الفاحشة في قبل أو دبر. - "সামনে কিংবা পেছনের দিকে অশ্লীল কাজ করাকে যিনা বলা হয়।" (আল-বহুতী, *দকা'ইক..*, খ.৩,পৃ. ৩৪৩)

৪. হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কতিপয় ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারীর যিনা করার অপরাধের শাস্তির কথা জানতে চাইল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের তাওরাতে রজমের শাস্তি দেখতে পাও কি? জবাবে তারা বললো, এ রূপ অপরাধে আমরা তো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে লাঞ্ছিত করি এবং তাদের দুররাও মারা হয়। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছো। তাওরাতে তো বিবাহিত নারী-পুরুষের যিনার অপরাধে রজমের কথা বর্ণিত রয়েছে। অতঃপর তাওরাত আনা হলো ও খুলে ধরা হলে একজন রজমের নির্দেশ সংক্রান্ত আয়াতটি হাত দিয়ে ঢেকে রাখল ও তার পূর্বের ও পরের অংশ পাঠ করল। তখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) বললেন, তোমরা হাত তুলে ফেল। হাত তুলে নিতেই আয়াতটি সকলে দেখতে পেলেন। তখন ইয়াহুদীরা স্বীকার করল যে, তাওরাতে রজমের নির্দেশ স্পষ্ট ভাষায় লিখিত রয়েছে। অতঃপর তদনুযায়ী রজম করার নির্দেশ জারী করা হলো। –সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং : ৩৪৩৪

৫. পুরাতন নিয়ম, দ্বিতীয় বিবরণ, সূত্র- ২১, ২২ ও ২৩

রেখে ইসলামে প্রথমবারেই তার চূড়ান্ত শাস্তির বিধান জারি করা হয়নি; বরং তা ক্রমে ক্রমে জারি হয়েছে, যাতে জনগণের পক্ষে তা গ্রহণ করা সহজ হয়। ইসলামের প্রথম দিকে বিবাহিতের ব্যভিচারের শাস্তি ছিল গৃহবন্দী করে রাখা। আর অবিবাহিতের শাস্তি ছিল কথা ও কাজের সাহায্যে কিংবা বেত্রাঘাত করে কষ্টদান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا . واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. - "তোমাদের যে সব মহিলা নির্লজ্জতার কাজ করবে, তোমাদের মধ্য থেকে তাদের এ অপকর্মের চারজন সাক্ষী কায়িম কর। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাদেরকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখ, যতক্ষণ না তারা মৃত্যুবরণ করবে অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন উপায় বের করে দেন। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে দুজন এই নির্লজ্জতার কাজ করবে, তাদেরকে কষ্ট দাও। তবে তারা যদি তাওবাহ করে নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদেরকে আর কষ্ট দিওনা। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিঃসন্দেহে তাওবাহ কবুলকারী ও অতিশয় মেহেরবান।"[৬] এখানে প্রথম আয়াতে ' من نسائكم ' বলে বিবাহিতাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে 'واللذان يأتيانها' দ্বারা অবিবাহিত নারী-পুরুষদেরকে বোঝানো হয়েছে। এ দু'আয়াতে দু'ধরনের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এ দু'ধরনের শাস্তির মধ্যে একটি ছিল অধিকতর কঠোর। আর তা বিবাহিতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অপর শাস্তিটি ছিল হালকা। আর তা অবিবাহিতের জন্য প্রযোজ্য ছিল।

এ আয়াতে ব্যভিচারিণীদেরকে গৃহবন্দী করে রাখতে বলা হয়েছে, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অন্য কোন বিহিত ব্যবস্থা নির্দেশ করেন। এ থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, এ বিষয়ে অচিরেই একটি চূড়ান্ত বিধান অবতীর্ণ হবে। পরে সে বিধান নাযিল হয়েছে। হযরত 'উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, خذوا عنى ' خذوا عني ' قد جعل الله لهن سبيلا ' البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام ' و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم. - "তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর, তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য একটি

৬. আল-কুর'আন, ৪ (সূরা আন-নিসা) ঃ ১৫-১৬

ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তা হলো, অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের জন্য একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন এবং বিবাহিতদের জন্য একশত বেত্রাঘাত ও প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা।"[৭] এ হাদীস থেকে জানা যায়, যিনাকারীর অবস্থার পার্থক্যের কারণে যিনার শাস্তির মধ্যেও তারতম্য হবে। বিবাহিতের যিনার শাস্তি অবিবাহিতের তুলনায় অত্যন্ত কঠিন ও অধিকতর মর্মন্তুদ। এর কারণ এটা হতে পারে যে, অবিবাহিতদের হালাল পথে যৌনস্পৃহা পূরণের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই তাদের দ্বারা তা সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার মনে করা যায় না। অপরদিকে বিবাহিত নারী-পুরুষের যেহেতু হালাল পথেই তাদের যৌন বাসনা পূরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা রয়েছে, তাই সে ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে বাইরে গিয়ে যিনা করার মানে হল তাদের মনের মধ্যে অন্যায় প্রবণতা বাসা বেঁধেছে, যা মূলোৎপাটন করা একান্তই জরুরী। তদুপরি তারা নিজেদের মান-মর্যাদা এবং তা লঙ্ঘনের পরিণতি ও বীভৎসতা সম্পর্কে অবহিত। এ কারণেই তাদের শাস্তি তুলনামূলক অধিকতর কঠিন হওয়াই যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক।

অবিবাহিতের যিনার শাস্তি ঃ

অবিবাহিত বালিগ ও বুদ্ধিমান মুসলিম-নারী হোক বা পুরুষ- যদি যিনা করে, তার শাস্তি হল একশতটি বেত্রাঘাত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. -"ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারী- তাদের প্রত্যেককে একশটি করে বেত্রাঘাত কর।"[৮] রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, البكر بالبكر جلد مائة. - "অবিবাহিত নারী-পুরুষ যিনা করলে একশত বেত্রাঘাত।"[৯] এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। তবে শাস্তির অংশ হিসেবে ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে বেত্রাঘাত করার পরও এক বছরের জন্য নির্বাসিত করতে হবে কি না- তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিরাট মতানৈক্য রয়েছে।

হানাফীগণের মতে, ব্যভিচারীকে -নারী হোক বা পুরুষ- এক বছরের নির্বাসন দণ্ড দেয়া ওয়াজিব নয়। তবে বিচারক যদি রাষ্ট্রের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর মনে করেন, তাহলে হদ্দের অংশ হিসেবে নয়; তা'যীরী শাস্তির আওতায় এক বছরের জন্য নির্বাসন দিতে পারেন। তাঁদের বক্তব্য হলো, পবিত্র কুর'আনে তাদের শাস্তি হিসেবে কেবল বেত্রাঘাতের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় খবরে ওয়াহিদের ভিত্তিতে এক বছরের নির্বাসন দণ্ড দেয়ার মানে

---

৭. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ১৬৯০; আবূ দাউদ, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ৪৪১৫

৮. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর) ঃ ২

৯. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ১৬৯০; আবূ দাউদ, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ৪৪১৫

হল কুর'আনের অকাট্য দলীলের ওপর অতিরিক্ত বৃদ্ধি সাধন, যা যুক্তিযুক্ত নয়।[১০]

শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, ব্যভিচারী - পুরুষ হোক বা নারী- তাকে এক বছরের জন্য অবশ্যই নির্বাসিত করতে হবে। তাঁদের প্রধান দলীল হল, ইতঃপূর্বে বর্ণিত হযরত 'উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা)-এর হাদীস, যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অবিবাহিত ব্যভিচারী -নারী হোক বা পুরুষ- প্রত্যেককে এক বছরের জন্য নির্বাসন দণ্ড দিতে হবে।[১১]

মালিকীগণের মতে, কেবল ব্যভিচারী পুরুষকেই এক বছরের জন্য নির্বাসনের দণ্ড দেয়া ওয়াজিব। মহিলাদের জন্য নির্বাসন দণ্ড প্রযোজ্য নয়। তাঁদের বক্তব্য হলো, মহিলাদেরকে দূরে নির্বাসন দেয়া হলে সে সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত হয়ে যাবে। সে কোথায় থাকবে, কিভাবে দিন কাটাবে, তা একটি কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। তদুপরি তাকে একাকী অবস্থায়ও পাঠানো সম্ভব নয়। কোন অ-মুহরামের সাথে নির্বাসনে পাঠানো হলে, তাকে চরম ব্যভিচারের পথে ঠেলা দেয়া হবে। আর কোন মুহরামকে তার সাথে নির্বাসিত করা হলে, তা হবে যে অপরাধী নয় তাকে শাস্তি দান করা।[১২]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বিচারক প্রয়োজন ও কল্যাণকর মনে করলে এক বছরের জন্য নির্বাসন দণ্ড দিতে পারবে - এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। তবে বর্তমানে বিভিন্ন দেশের যে পরিবেশ- তাতে তাদেরকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে নির্বাসনে পাঠানো হলে সংশোধনের পরিবর্তে তাদের আরো অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠার আশঙ্কা রয়েছে বেশি। যদি একান্ত প্রয়োজনই হয়, তাহলে তাদেরকে নির্বাসনের পরিবর্তে এক বছরের জন্য কারাগারে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আটক রাখা যেতে পারে। এতে নির্বাসনের উদ্দেশ্যও অর্জিত হবে। সম্ভবত এ ধরনের অবস্থা বিবেচনা করেই হযরত আলী (রা) দু'জন অবিবাহিত নারী-পুরুষ যখন যিনা করল, তখন রায় দিলেন যে, তাদেরকে বেত্রাঘাত করতে হবে, নির্বাসন দেয়া যাবে না। কেননা তাতে ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে।[১৩]

---

১০. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৪৪; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ৩৯

১১. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ. ৭, পৃ.১৭১; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ. ১২৯; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ,১০, পৃ.১৭৩-৪; আল-বহুতী, *কশশাফ*, খ.৬, পৃ.৯১-২

১২. মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ.৫০৪; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ.১৩৭

১৩. আল-জাসসাস, *আহকামুল কুর'আন*, খ.৫, পৃ.৯৫

বেত্রাঘাত দণ্ড কার্যকর করার পদ্ধতি ঃ

বেত্রাঘাত দণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। এগুলো হল ঃ

১. প্রহারের ছড়িটি মাঝারি আকারের হতে হবে। অর্থাৎ বেশি মোটাও হবে না এবং বেশি সরুও হবে না। তদুপরি তাতে কোন গিরা থাকতে পারবে না।[১৪]

২. প্রহারও মধ্যম মানের হতে হবে। বেশি জোরেও মারা যাবে না, যাতে তার প্রাণ নাশ কিংবা কোন অঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে এবং এমন হালকাভাবেও মারা যাবে না, যাতে সে কোন কষ্টই অনুভব করবে না।[১৫]

৩. শরীরের এক জায়গায় প্রহার করা যাবে না; বরং বিভিন্ন অঙ্গে ভাগ করে করে প্রহার করতে হবে, যাতে ত্বক ফেটে না যায় এবং কোন অঙ্গের ভীষণ ক্ষতি সাধিত না হয়।[১৬]

৪. মাথা, চেহারা, বক্ষ, পেট, গুপ্তাঙ্গ ও কটিদেশ প্রভৃতি স্পর্শকাতর অঙ্গে প্রহার করা জায়িয নেই।[১৭]

৫. প্রহার করার জন্য মাটিতে শোয়ানো যাবে না। অনুরূপভাবে কোন কিছুর সাথে বেঁধে কিংবা গর্তে খুঁড়ে সেখানে দাঁড় করিয়ে প্রহার করাও বিধেয় নয়। পুরুষকে দাঁড়ানো অবস্থায় এবং নারীকে বসা অবস্থায় প্রহার করতে হবে।[১৮] হযরত 'আলী (রা) বলেন, "পুরুষদেরকে দাঁড়ানো অবস্থায় এবং নারীদেরকে বসা অবস্থায় হদ্দের বেত্রাঘাত করতে হবে।"[১৯] তবে ইমাম মালিকের মতে, মহিলাদের মতো পুরুষদেরকেও বসা অবস্থায় প্রহার করা হবে।[২০]

৬. প্রহার করার জন্য সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করা যাবে না। হানাফী ও মালিকীগণের

---

১৪. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ. ১৬৯-১৭০; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ. ২৩০-১
১৫. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ. ১৭০; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ. ২৩০-১
১৬. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ. ১৭০; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ. ২৩১-২
১৭. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ. ২৩২; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.১০
১৮. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৫৯-৬০; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ. ২৩২-৩; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.১০; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯,৪০
১৯. বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, হা.নং: ১৭৩৬০
২০. আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ. ১৪২; দাসূকী, *আল-হাশিয়াতু..*, খ.৪, পৃ. ৩৫৪

মতে, পুরুষের ইজার বা শরীরের নিম্নাংশ আবৃতকারী বস্ত্র ছাড়া অন্যান্য কাপড় খুলে নেয়া হবে। তবে মহিলার কাপড় খোলা যাবে না। তবে তার গায়ে যদি কোন অতিরিক্ত কাপড় কিংবা চামড়ার কোন বস্ত্র থাকে, তাহলে তা খুলে নিতে হবে।[২১] শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, পুরুষ হোক বা নারী- কারো স্বাভাবিক বস্ত্র খুলা যাবে না। তবে চামড়ার কোন বস্ত্র থাকলে কিংবা মোটা কাপড়ের জুব্বা থাকলে তা খুলে নিতে হবে।[২২]

৭. বেত্রাঘাত করার সময় বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনতার উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন।[২৩] কেননা হদ্দের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল- লোকদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা, যাতে তারা অপরাধে লিপ্ত হতে সাহস না পায়। আর এ উদ্দেশ্য তখনই অতীব উত্তমভাবে অর্জিত হতে পারে, যখন তা প্রকাশ্য দিবালোকে জনসমক্ষে কার্যকর করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. - "এক দল ঈমানদার যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"[২৪]

৮. ব্যভিচারিনী গর্ভবতী হলে গর্ভ খালাসের পর নিফাস[২৫] শেষে বেত্রাঘাতের শাস্তি কার্যকর করা হবে।[২৬]

محصن (বিবাহিত)-এর যিনার শাস্তি ঃ

'মুহসান' [২৭]- পুরুষ হোক বা নারী- যিনা করলে তার শাস্তি হল 'রজম' (প্রস্তর

---

২১. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ৭৩; যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ. ১৭৯; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ. ১৪২; দাসূকী, *আল-হাশিয়াতু..*, খ.৪, পৃ. ৩৫৪

২২. ইবনু কূদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৪২; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ. ১৬১; আল-হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯, পৃ. ১৭৪

২৩. মালিকী ও শাফি'ঈগণের মতে, ন্যূনতম চারজন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে হবে। তবে হাম্বলীগণের মতে, এক দল লোক উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। (ইবনু কূদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৪৭; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ. ২৩৪; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৫৬০)

২৪. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন- নূর) ঃ ২

২৫. স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর তার যে রক্তস্রাব হয়, তাকে নিফাস বলে। নিফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ চল্লিশ দিন।

২৬. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ৭৩; যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ. ১৭৫; ইবনু কূদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৪৮

২৭. এখানে محصن বলতে বোঝানো হয়েছে বালিগ, বুদ্ধিমান, মুসলিম ও স্বাধীন ব্যক্তি যে বিশুদ্ধ নিয়মে বিয়ে করল এবং একবার হলেও স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করল। সুতরাং নাবালেগ, পাগল ও কাফির বিয়ে করলেও 'মুহসান' রূপে গণ্য হবে না। অনুরূপভাবে অশুদ্ধ বিবাহ দ্বারাও মুহসান গণ্য হবে না। বিশুদ্ধ বিয়ের পর যৌনসঙ্গম না হলেও 'মুহসান' বিবেচিত হবে না। কোন ব্যক্তি বিবাহিত কি না- তা প্রমাণের জন্য অন্ততপক্ষে দুজন সাক্ষী লাগবে। ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইনের মতে, দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন নারীর সাক্ষ্য দ্বারা কোন ব্যক্তি

নিক্ষেপ করে হত্যা করা)। এ শাস্তির বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা ও কাজ - উভয় দিক থেকে সন্দেহাতীতভাবে পাওয়া গেছে। ইতঃপূর্বে হযরত 'উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে,.و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم - "বিবাহিতের শাস্তি বেত্রাঘাত ও রজম।"[২৮] অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, মালিকের স্ত্রীর সাথে জনৈক মজুরের যিনার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত উনায়স আল-আসলামী (রা)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, .فإن اعترفت فارجمها - "যদি মেয়েটি স্বীকার করে, তাহলে তুমি তাকে রজম কর।" মেয়েটি যিনার কথা স্বীকার করে এবং তাকে রজম করা হয়।[২৯] তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই যে কয়েকটি রজমের দণ্ড প্রদান করেছেন[৩০], তাও বিভিন্ন বিশুদ্ধ হাদীসের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত।[৩১]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, বিবাহিত নারী-পুরুষ যিনা করলে তার শাস্তি রজম; কিন্তু তার পূর্বে তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে কি না - তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে।[৩২] তবে চার মাযহাবের ইমামগণের সর্বস্বীকৃত মত হল- বিবাহিতদেরকে শুধু রজমই করতে হবে; বেত্রাঘাত নয়।[৩৩] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও খুলাফা রাশিদূনের যুগে বিবাহিতদের যিনার কিছু সংখ্যক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কোন ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও খুলাফা রাশিদূন রজমের পূর্বে বেত্রাঘাতের

বিবাহিত কি না তা প্রমাণিত হবে। তবে ইমাম যুফার (রহ)-এর মতে, চারজন পুরুষ সাক্ষীর প্রয়োজন। (আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৩৯-৪০; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ. ১৭-১৮; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৪১-৪২)

২৮. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ১৬৯০; আবূ দাউদ, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ৪৪১৫

২৯. সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুশ শুরূত), হা.নং: ২৫৭৫; সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ১৬৯৭

৩০. হযরত মা'ইয ইবন মালিক আল-আসলামী, গামিদ গোত্রের জনৈকা মহিলা ও দু ইয়াহুদীকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কর্তৃক রজমের দণ্ড প্রদান করার ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩১. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ১৬৯৫; আবূ দাউদ, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ৪৪৩৪, ৪৪৪৬

৩২. যাহিরী ও যায়দিয়্যা শী'আ ইমামগণ ইতঃপূর্বে বর্ণিত হযরত 'উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা)-এর হাদীসের ভিত্তিতে বলেন যে, রজমের আগে বেত্রাঘাত করাও জরুরী। ইমাম আহমাদ (রহ) থেকেও এক ধরনের একটি মত বর্ণিত রয়েছে। (ইবনু হাযম, *আল-মুহাল্লা*, খ.১২, পৃ. ১৭৩-৫; আল-মুরতদা, *আল-বাহরুয যখখার*, খ.৬, পৃ. ১৪১; ইবনু মুফলিহ, আল-ফুরূ', খ.৬, পৃ. ৬৭)

৩৩. আশ-শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ.১৬৭; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৩৬-৭; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৩৯

নির্দেশ প্রদান করেছিলেন- এ ধরনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, বিবাহিতদের শাস্তি -রজমের ওপর ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রজমের ব্যাপারে আপত্তি ঃ

কারো কারো মতে, বিবাহিতের যিনার শাস্তি রজম নয়; বেত্রাঘাতই।[৩৪] তাদের বক্তব্য হল, পবিত্র কুর'আনে রজমের কথা নেই। তদুপরি তা খুবই কঠোর ও নির্মম শাস্তি। তা যদি বাস্তবিকই শরী'আতের বিধান হতো, তাহলে তার উল্লেখ কুর'আনে অবশ্যই থাকতো। তাদের কারো কারো মতে, 'রজম' তা'যীরী শাস্তির আওতাভুক্ত, হদ্দ নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা'যীরী শাস্তি হিসেবেই বিভিন্ন ঘটনায় রজমের দণ্ড দিয়েছিলেন।

এ আপত্তির জবাব হল, তাদের এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা কুর'আনে কোন বিষয়ে স্পষ্ট ভাষায় কিছু উল্লেখ না থাকলেই যে তা শরী'আতের দলীল হতে পারবে না, তা ঠিক নয়। কারণ, কুর'আনের মতো সুন্নাতও শরী'আতের একটি প্রধান উৎস। সুন্নাতে স্পষ্টভাবে রজমের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া খুলাফা রাশিদূনও এ বিধান কার্যকর করেছেন। 'রজম' হদ্দ নয়; তা'যীরী শাস্তি- তাদের এ কথাও ঠিক নয়। কেননা বিভিন্ন ঘটনা প্রমাণ করে যে, যিনার হদ্দ প্রমাণ করতে সাক্ষ্যের নিসাব পূরণের প্রয়োজন পড়ে। অথচ তা'যীর প্রমাণ করতে চার জন সাক্ষ্যের প্রয়োজন পড়ে না। এ প্রসঙ্গে হযরত 'উমার (রা)-এর বক্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, إن الله بعث محمدا (ص) بالحق ' و أنزل عليه الكتاب ' فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ' فقرأناها و وعيناها ' و رجم رسول الله (ص)' و رجمنا من بعده ' و إني خشيت أن طال بالناس الزمان أن يقول قائل : ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنى من الرجال و النساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف. "আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। তাঁর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। সে অবতীর্ণ বিষয়াবলীর মধ্যে রজমের আয়াতও ছিল। আমরা তা পড়েছি এবং তা সংরক্ষণও করেছি। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রজমের দণ্ড দিয়েছিলেন। পরে আমরাও তা

৩৪. এটা খারিজীদের অভিমত। (আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৩৬-৭) বর্তমানে পাশ্চাত্য চিন্তার অনুসারী মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউও এ কথা বলে থাকে।

করিয়েছি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সময়ের ব্যবধানে লোকেরা হয়ত বলবে, আল্লাহর কিতাবে আমরা রজমের আয়াত পাচ্ছিনা। এভাবে তারা আল্লাহর নির্ধারিত ফরয ত্যাগ করে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। মনে রেখো, রজম আল্লাহর কিতাবেরই বিধান। বিবাহিত নারী-পুরুষ যিনা করলেই এবং তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলেই, অথবা গর্ভ হয়ে গেলে কিংবা কেউ স্বীকার করলেই তা কার্যকর হবে।"[৩৫] তিনি আরো বলেন, আল্লাহর শপথ! 'উমার আল্লাহর কিতাবে বৃদ্ধি করেছে লোকেরা এ কথা বলে বেড়াবে- এ আশঙ্কা না হলে আমি অবশ্যই কুর'আনে আয়াতটি লিখে দিতাম।"[৩৬]

আবার কেউ মনে করেন যে, সূরা আন্ নূরের যিনা সংক্রান্ত পূর্বোক্ত আয়াত নাযিল হবার পর রজমের বিধান রহিত হয়ে গেছে। এ কথাও ঠিক নয়। কেননা এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, সূরা আন্ নূর নাযিল হবার পরও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং রজমের দণ্ড কার্যকর করেছেন। সূরা আন্ নূরে বর্ণিত বেত্রাঘাতের হুকম থেকে রজমের বিধানকে খাস করা হয়েছে। অধিকাংশ ইমামের মতে, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা এরূপ খাস করা জায়িয। হানাফীগণের মতে, মাশহুর ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা আয়াতকে খাস করা বৈধ। যেহেতু রজমের হাদীসসমূহ অর্থগত দিক থেকে মুতাওয়াতির হাদীসের পর্যায়ভুক্ত, তাই বেত্রাঘাতের বিধান থেকে রজমের বিধানকে খাস করা অধিকাংশ ইমামের মতে সঠিক হয়েছে।[৩৭]

রজম কার্যকর করার পদ্ধতি ঃ

১. রজমের দণ্ডপ্রাপ্ত পুরুষকে দাঁড়ানো অবস্থায় প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে। তাকে শক্তভাবে বাঁধার কিংবা গর্ত খুড়ে তার মধ্যে তাকে দাঁড় করানোর প্রয়োজন নেই। হযরত 'আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন হযরত মা'ইয (রা)-কে রজম করার জন্য নির্দেশ দিলেন, তখন আমরা তাকে বাকী'র দিকে নিয়ে গেলাম। তাঁর জন্য আমরা গর্তও খনন করিনি, তাঁকে বাঁধিও নি।[৩৮] রজমের দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি মেয়ে হয়, তাহলে

---

৩৫. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ১৬৯১; আবূ দাউদ, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ৪৪১৮

৩৬. আবূ দাউদ, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ৪৪১৮

৩৭. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ. ২২৪-৫; আল-জাসসাস, *আহকামুল কুর'আন*, খ. ৩, পৃ. ৩৮৮-৯

৩৮. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ১৬৯৪; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হা.নং: ৮০৭৯; বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং: ১৬৭৭৪

তাকে বসা অবস্থায় প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে। তার জন্য গর্ত খনন করা জরুরী কি না- তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীগণের মতে, গর্ত খনন করা আর না করা বিচারক কিংবা শাসকের ইখতিয়ার। বিচারক কিংবা শাসক অবস্থানুপাতে যা ভাল মনে করবেন, তা-ই করতে পারবেন। ইমাম আবূ ইউসূফ (রা) ও অন্যান্যের মতে, তাকে গর্তের মধ্যে দাঁড় করানোই উত্তম। কেননা গর্তের মধ্যে দাঁড় করিয়ে প্রস্তর নিক্ষেপ করা হলে, তা হবে মহিলাদের পর্দার জন্য অধিকতর উপযোগী। বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গামিদিয়্যাকে রজম করার জন্য তার বুক পর্যন্ত একটি গভীর গর্ত খনন করেছিলেন।[৩৯] তবে ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (রহ) প্রমুখের মতে, গর্ত খনন না করাই উত্তম। তবে তার দেহ যাতে কোনভাবে প্রকাশ পেয়ে না যায়, এ জন্য কাপড় দিয়ে শরীরকে শক্ত করে জড়িয়ে রাখা প্রয়োজন।[৪০]

২. যিনা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগে প্রমাণিত হয়, তাহলে শাস্তিদানের অনুষ্ঠানে সাক্ষীদের উপস্থিত থাকতে হবে এবং তারাই সর্বাগ্রে প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করবে। যদি তারা প্রস্তর নিক্ষেপ করতে অস্বীকার করে, তা হলে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। এটা হানাফীগণের অভিমত। অন্যান্যদের মতে, সাক্ষীদের উপস্থিতি জরুরী নয়।[৪১]

৩. প্রস্তর নিক্ষেপের সময় কেউ পালিয়ে যেতে থাকলে তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে হত্যা করতে হবে। কারো কারো মতে, যদি পালানোর আশঙ্কা থাকে, তা হলে তাকে কোন কিছুর সাথে বেঁধে রেখে কিংবা গর্ত খুঁড়ে সেখানে দাঁড় করিয়ে প্রস্তর নিক্ষেপ করা যাবে। তবে সে স্বেচ্ছায় স্বীকৃতিদানকারী ব্যভিচারী হলে তার পশ্চাদ্ধাবন করা যাবে না; তার ওপর প্রস্তর নিক্ষেপ স্থগিত রাখতে হবে। কেননা তার এ পলায়ন তার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয়ার ব্যাপারে সন্দেহের জন্ম দেয়।[৪২]

---

৩৯. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ১৬৯৫

৪০. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৫১-২; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৫৯; মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ. ৫০৮; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ.১৩৪; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৪০; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ. ১৬১

৪১. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ. ৯-১০; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ.১২; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৪০; আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৬, পৃ. ৮৪

৪২. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৬৯-৭০; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৪০,

৪. বিশাল খোলামেলা জায়গায় রজম কার্যকর করা দরকার, যাতে কারো গায়ে কোন চোট লাগা ছাড়াই সহজে প্রস্তর নিক্ষেপ করা যায়। এ সময় বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনতার উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। শাসক কিংবা তাঁর কোন প্রতিনিধি এ সময় উপস্থিত থাকবেন। লোকজন নামাযের কাতারের মতো বিভিন্ন সারিতে ভাগ হয়ে দাঁড়াবে। একদল প্রস্তর নিক্ষেপ করার পর পেছনে সরে যাবে আর অন্য এক দল এগিয়ে এসে প্রস্তর নিক্ষেপ করবে। এটা হানাফীগণের অভিমত। হাম্বলী ও শাফি'ঈগণের মতে, যিনা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগে প্রমাণিত হয়, তাহলে তারা অপরাধীকে বৃত্তাকারে চারদিক থেকে পরিবেষ্টিত করে রাখবে, যাতে সে কোনভাবে পালাতে না পারে। তবে হাম্বলীগণের মতে, স্বেচ্ছায় স্বীকৃতিদানকারীর ক্ষেত্রে এ রূপ না করাই উত্তম। যাতে সে পালিয়ে শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।[৪৩]

৫. পাথরের আকার মাঝারি অর্থাৎ সহজে হাতে বহন যোগ্য হতে হবে। তার আকার খুব বড়ও হবে না, যাতে সে খুব দ্রুত মারা যায়। আর তাতে প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড দানের উদ্দেশ্যই ক্ষুণ্ন হবে। আবার এমন ছোটও হবে না, যাতে মৃত্যু খুবই বিলম্বিত হয় এবং পীড়ন দীর্ঘায়িত হবে।[৪৪]

৬. মালিকীগণের মতে, নাভী থেকে দেহের ওপর পর্যন্ত সহজে আক্রান্ত হয়- এরূপ দেহের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রস্তর নিক্ষেপ করা বাঞ্ছনীয়। তবে চেহারা ও গুপ্তাঙ্গে প্রস্তর নিক্ষেপ করা সমীচীন নয়। হানাফী ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, চেহারার একটি বিশেষ মর্যাদা থাকার কারণে প্রস্তরের আঘাত থেকে তাকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন।[৪৫]

৭. ব্যভিচারিণী গর্ভবতী হলে গর্ভ খালাসের পর শাস্তি কার্যকর করা হবে।

৬৩; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫,পৃ. ৮; আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ. ১৩২

৪৩. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ. ১৬৭; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ. ২২৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৪০; আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ. ১৩৩; বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৬, পৃ. ৮৪

৪৪. আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ. ১৩৩; বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৬, পৃ. ৮৯; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ. ১৩৪;

৪৫. খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, খ.৮, পৃ.৮১-২; ইবনু গুনায়ম, *আল-ফাওয়াকিহ..*, খ.২, পৃ.২০৫; আল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাহ*, খ.২, পৃ. ১৫০; আর-রুহায়বানী, *মাতালিব..*, খ.৬, পৃ. ১৭৬

যদি সন্তানকে দুগ্ধদান করার মতো কেউ না থাকে, তাহলে দুধ পানের মেয়াদ শেষ হবার পরেই শাস্তি কার্যকর করা হবে।[৪৬]

রজমের পরবর্তী কার্যক্রম ঃ

প্রস্তর নিক্ষেপে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সাথে একজন মৃত মুসলিমের মত আচরণ করতে হবে। তাকে গোসল করাতে হবে, কাফন পরাতে হবে, তার জানাযা পড়তে হবে এবং যথারীতি মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করতে হবে।[৪৭] হযরত মা'ইযের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন,, اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم - "তোমরা তোমাদের মৃত মুসলিমদের সাথে যে রূপ আচরণ করে থাক, তার সাথেও সে একই রূপ আচরণ কর।"[৪৮] তদুপরি তিনি নিজেই গামিদিয়্যার জানাযা পড়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪৯] তবে মালিকীগণের মতে, মুসলিম শাসক নিজে তার জানাযা পড়বে না। অন্যরা পড়বে।[৫০] তাঁর কথার দলীল হল, হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মা'ইযের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার প্রশংসা করেছেন বটে, তবে তার জানাযা পড়েন নি।[৫১]

যিনার শাস্তির শর্তাবলী ঃ

১. মুসলিম হওয়া

যিনার অপরাধে লিপ্ত নর-নারীকে মুসলিম হতে হবে। যদি কাফির পুরুষ কাফির নারীর সাথে যিনা করে, তাহলে তাদের ওপর শরী'আতের হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তবে রাষ্ট্রীয় শাস্তি কিংবা তাদের ধর্মীয় শাস্তি কার্যকর করা হবে। যদি কোন কাফির কোন মুসলিম নারীর সাথে তার সম্মতিক্রমে যিনা করে, তাহলে মালিকীগণের মতে, তার ওপর হদ্দের শাস্তি বর্তাবে না; তবে মুসলিম মহিলার ওপর হদ্দের শাস্তি কার্যকর করা হবে। যদি সে মুসলিম নারীকে জোরপূর্বক যিনা করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। শাফি'ঈ এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম

---

৪৬. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৭৩; যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ.১৭৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৪৮

৪৭. আস-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ৬৩; আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৬, পৃ. ৯১; আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.১৩৫

৪৮. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং : ১১০১৪

৪৯. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং : ১৬৯৬

৫০. মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ. ৫০৯

৫১. আল বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং : ১৬৭৩২

আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ)-এর মতে, মুসলিম হোক কিংবা যিম্মী (ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) সকলের ওপর হদ্দের বিধান কার্যকরা করা হবে।[৫২]

২. প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন (মুকাল্লাফ) হওয়া

যিনার অপরাধে লিপ্ত নর বা নারীকে মুকাল্লাফ (শরী'আতের নির্দেশাবলী পালনে আদিষ্ট) অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে।[৫৩] সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক নর বা নারী কিংবা পাগলরা যদি যিনা করে, তাদের ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না[৫৪]; তবে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং তা'যীরের আওতায় আদালত তাদেরকে শাস্তি দিতে পারবে।

- নাবালিগাদের সাথে যিনার বিধান

যদি কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন পুরুষ সঙ্গমের উপযোগী কোন ছোট মেয়ের সাথে সঙ্গম করে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে। যদি মেয়ে এতই ছোট হয় হয় যে, সে স্বাভাবিকভাবে সঙ্গমের উপযোগী নয়, তাহলে যিনাকারীর ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তেমনিভাবে মেয়েটির ওপরও হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[৫৫]

- পাগল মেয়ের সাথে যিনার বিধান

যদি কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন পুরুষ কোন পাগল মেয়ের সাথে সঙ্গম করে, তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে। তবে মেয়েটির ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[৫৬]

- নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির যিনার বিধান

---

৫২. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৫৫-৬; মালিক, আল-মুদাওয়ানাহ, খ.৪, পৃ. ৪৮৪, ৫০৮; শাফি'ঈ, আল-উম্ম, খ.৬, পৃ. ১৫০; হায়তমী, তুহফাতুল মুহতাজ, খ.৯, পৃ. ১০৬

৫৩. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ৩৪; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৪, পৃ. ৫৪; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ. ১৭২, ১৮৭

৫৪. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, رفع القلم عن ثلث : عن الصبي حتى يبلغ ' و عن النائم حتى يستيقظ ' و عن المجنون حتى يفيق. - "তিন ব্যক্তি থেকে অর্থাৎ বালক থেকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত, ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত এবং পাগল থেকে হুঁশ ফিরে পাওয়া পর্যন্ত কলম উঠিয়ে রাখা হয়।" অর্থাৎ তাদের দোষত্রুটিগুলো আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হবে না। (আবূ দাউদ, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং : ৪৩৯৯, ৪৪০১, ৪৪০২)

৫৫. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ৩৪; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৪, পৃ. ৫৪; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ. ১৭২, ১৮৭

৫৬. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৫৪

নেশাগ্রস্ত ও মাতাল অবস্থায় কোন ব্যক্তি কোন নারীর সাথে সঙ্গম করলে তা যিনার আওতায় পড়বে এবং অপরাধীর ওপর যিনার হদ্দ কার্যকর করতে হবে।[৫৭]

- ঘুমন্ত মহিলার সাথে যিনার বিধান

ঘুমন্ত মহিলার সাথে কেউ যিনা করলে তাতে তার ওপর হদ্দ কার্যকর হবে না।[৫৮] হযরত সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ স্বামীহীনা জনৈকা গর্ভবতী মহিলাকে হযরত 'উমার (রা)-এর দরবারে হাযির করা হল। মহিলাটি হযরত 'উমার (রা)কে বলল, তার খুব গভীর ঘুম হত। একদিন এ অবস্থায় একজন লোক রাতে তার ঘরে প্রবেশ করে ঘুমন্ত অবস্থায় তার সাথে সঙ্গম শুরু করে। সে জেগে দেখতে পায় যে, লোকটি কাজ সেরে চলে গেছে। হযরত 'উমার (রা) মহিলাটির কথা গ্রহণ করে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।[৫৯]

- ভুলবশত সঙ্গমের শাস্তি

ভুলবশত কোন পুরুষ যদি কোন মহিলার সাথে যিনা করে, তাহলেও তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে না।[৬০] যেমন দুই ভাই দু সহোদরাকে বিয়ে করল। রাত্রিবেলা ভুলবশত বাসর ঘরে একের স্ত্রীকে অপরের সাথে দেয়া হল এবং সকাল বেলা এই ভুল ধরা পড়ল। এ ক্ষেত্রে সঙ্গমক্রিয়াকে যিনা রূপে গণ্য করা হবে না এবং সঙ্গমকারী দুজনেই কোনরূপ শাস্তির সম্মুখীন হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি অন্ধকারের মধ্যে নিজের শয্যায় ঘুমন্ত কোন বেগানা মেয়েকে নিজের স্ত্রী মনে করে সহবাস করে এবং পরে দেখতে পায় যে, যার সাথে সে সহবাস করেছে সে তার স্ত্রী নয়, তাহলে তার ওপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা তার মধ্যে হারাম কাজে লিপ্ত হবার বাসনা ছিল না।

৩. পুরষাঙ্গ নারীর জননেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট করা

পুরষাঙ্গ পুরোই কিংবা পুরুষাঙ্গের কর্তিত সম্পূর্ণ অগ্রভাগ যদি নারীর যোনীতে প্রবেশ করে, তবেই হদ্দের বিধান কার্যকর করা হবে। চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক, পুরুষাঙ্গ সম্প্রসারিত হোক বা না হোক- সর্বাবস্থায় হদ্দ কার্যকর করা হবে। যদি পুরুষাঙ্গ মোটেই প্রবেশ করানো না হয় কিংবা মাথার সামান্য অংশই

---

৫৭. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ. ১৯৮; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৪, পৃ. ২৮৯
৫৮. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ. ১৮৩; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৬২
৫৯. ইবনু হাজর আল আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, খ.১২, পৃ.১৫৪
৬০. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.২৪, পৃ. ২১

প্রবেশ করানো হয়, তাতে হদ্দ সাব্যস্ত হবে না। কেননা এ ধরনের অবস্থাকে যৌন সঙ্গম বলা হয় না।[৬১]

৪. যিনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অবগত থাকা

হদ্দ কার্যকর করার জন্য যিনাকারীর যিনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। হযরত 'উমার, উসমান ও 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেছেন, لا حد إلا من علمه. - "হদ্দ কেবল সে ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য হবে, যে তা জানে।"[৬২] যদি সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী কিংবা মুসলিম সমাজ থেকে অনেক দূরে অবস্থানকারী অথবা যিনার বৈধতায় বিশ্বাসী জনসমাজের সাথে বসবাসকারী কোন ব্যভিচারী যিনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞতার দাবী করে এবং এর সুস্পষ্ট প্রমাণও মিলে, তাহলে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হওয়ায় তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[৬৩] হযরত সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানের জনৈক ব্যক্তি যিনা করেছিল। এ খবর হযরত 'উমার (রা)-এর কাছে পৌঁছার পর তিনি চিঠি লিখে জানালেন যে, إن كان يعلم أن الله حرم الزنى فأجلدوه ، و إن كان لا يعلم فعلموه ، فإن عاد فأجلدوه. - "যদি সে জানে যে, আল্লাহ তা'আলা যিনা হারাম করেছেন, তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করো। যদি সে না জানে, তাহলে তাকে বিধানটি জানিয়ে দাও। এর পর যদি সে ফের যিনা করে, তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করো।" অন্য একটি ঘটনায় যিনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞতার দাবী করায় যিনা করার পর সিরিয়ার জনৈক ব্যক্তিকেও হযরত 'উমার (রা) ছেড়ে দিয়েছিলেন।[৬৪] এসব বর্ণনা থেকে জানা যায়, হদ্দ কার্যকর করার জন্য যিনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে যিনাকারীর জ্ঞান থাকতে হবে। তবে মুসলিম সমাজে বসবাসী কোন মুসলিম যিনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞতার দাবী করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা মুসলিম সমাজে বসবাস করে যিনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অনবহিত থাকবে - তা অসম্ভব ব্যাপার।

৫. নারীর জননেন্দ্রিয়ে সঙ্গম করা

যদি নিজের স্ত্রী নয় এমন কোন নারীর সম্মুখভাগের জননেন্দ্রিয় দিয়ে সঙ্গম করা হয়, তা হলেই হদ্দ কার্যকর হবে। যদি পশ্চাদ্বার দিয়ে সঙ্গম করা হয়, তাহলেও

---

৬১. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ.২৪৮; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ. ১২৫-৬

৬২. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৫৬

৬৩. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ. ১৭৯; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৩, পৃ.২২৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৫৬

৬৪. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.২৪, পৃ.২৪

অধিকাংশ ইমামের মতে যিনার হদ্দ কার্যকর করা হবে। কেননা পশ্চাদ্বারও সম্মুখভাগের মতোই যৌনলিপ্সা পূরণের একটি গুপ্তাঙ্গ। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতে, এমতাবস্থায় হদ্দ কার্যকর করা হবে না; বরং তা'যীর করা হবে। শাফি'ঈগণের মতে, এমতাবস্থায় কেবল পুরুষের ওপরই হদ্দ কার্যকর করা হবে। নারীকে- বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত- বেত্রাঘাত করা হবে এবং নির্বাসন দণ্ড দেয়া হবে।

যদি কোন স্বামী নিজের স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়ে সঙ্গম করে, তাহলে তাদের ওপর হদ্দ জারি করা যাবে না। তবে স্বামীকে এ অযাচিত কাজে লিপ্ত হবার দরুন তা'যীর করা যাবে। শাফি'ঈগণের মতে, যদি সে বারংবার করে, তবেই তাকে তা'যীর করা যাবে।[৬৫]

৬. স্বেচ্ছায় সঙ্গম করা

যদি নারী-পুরুষ দুজনেই সম্মত হয়ে সঙ্গম করে তাহলেই হদ্দ কার্যকর হবে। যিনা অবস্থায় নারী যদি অনড় ও শান্ত থাকে, তাহলে বোঝা যাবে যে, সে এ কাজে সম্মত রয়েছে। যদি কোন মেয়েকে বলাৎকার করা হয় কিংবা জোরপূর্বক ছিনতাই করে ধর্ষণ করা হয়, তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুযায়ী তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه. - "আমার উম্মাত থেকে ভুল-ত্রুটি ও জোরপূর্বক যে সব কাজ করা হয় তার পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।"[৬৬] হযরত ওয়া'ইল (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে অন্ধকারে নামাযে যাওয়ার জন্য বের হয়। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাকে ধরে জোরপূর্বক তাঁর সতীত্ব হরণ করে। মহিলার চিৎকারে চারদিক থেকে লোকজন জড়ো হল এবং ধর্ষণকারীকে ধরে ফেলল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধর্ষণকারীকে রজমের শাস্তি দিলেন এবং মহিলাটিকে বললেন, তুমি চলে যাও, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।[৬৭]

অনুরূপভাবে কোন পুরুষকেও জোরজবরদস্তি করে যিনা করতে বাধ্য করা হলে

---

৬৫. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৭৭-৭৮; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ. ১২৫-৬; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৫৪

৬৬. ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল আযীম*, খ.২, পৃ. ১৪৫; আল-জসসাস, *আহকামুল কুর'আন*, খ.১, পৃ.৬

৬৭. আত্ তিরমিযী, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং : ১৪৫৪

তার ওপর হদ্দ কায়িম করা যাবে না, সে বেকসুর খালাস পাবে। এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। হাম্বলী ও অধিকাংশ মালিকীর মতে, তার ওপরও হদ্দ কায়েম করতে হবে। তাদের কথা হল, যদিও তাকে যিনা করতে বাধ্য করা হচ্ছে; কিন্তু রতিক্রিয়াটি যেহেতু সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা ছাড়া সুসম্পন্ন হতে পারে না, তাই শান্ত ভাবে যিনা করার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবেই যিনা করেছে। ইমাম শাফি'ঈ এবং হানাফীগণের মধ্যে সাহেবাইনের মতে, রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার বা তার প্রতিনিধি কোন পুরুষকে জোরপূর্বক যিনা করতে বাধ্য করলে যিনাকারীর শাস্তি হবে না। তবে বলপ্রয়োগকারী রাষ্ট্র প্রধান বা তার প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কেউ হলে সে আদালতের সুবিবেচনা অনুযায়ী তা'যীর (সাধারণ দণ্ড) ভোগ করবে। কোন কারণে শাস্তি মওকুফ হলে ধর্ষণকারী কর্তৃক ধর্ষিতাকে যথোপযুক্ত মাহর পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে।[৬৮]

৭. ইসলামী রাষ্ট্রে যিনা সম্পন্ন হওয়া

হানাফীগণের মতে, হদ্দ কায়েমের জন্য যিনা ইসলামী রাষ্ট্রেই সম্পন্ন হতে হবে। কোন মুসলিম যদি দারুল হারবে (অমুসলিম শত্রু রাষ্ট্র) যিনা করে দেশে ফিরে আসে এবং বিচারকের কাছে নিজের যিনার কথা স্বীকার করে, তাহলে তার ওপর হদ্দ কায়েম করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, من زنى أو سرق في دار الحرب و أصاب بها حدا ثم هرب فخرج إلينا فإنه لا يقام عليه الحد. - "যে ব্যক্তি দারুল হারবে চুরি কিংবা যিনা করে হদ্দের শাস্তি ভোগের উপযোগী হল। এরপর সে পালিয়ে আমাদের কাছে চলে আসল, তাহলে তার ওপর হদ্দ কায়েম করা যাবে না।"[৬৯]

তদুপরি হানাফীগণের মতে, কোন অভিযানের সময় শত্রুদেশে অবস্থান কালেও কারো ওপর হদ্দ কায়িম করা যাবে না।[৭০] হযরত আবুদ্দারদা (রা) সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি শত্রুদেশে কোন হদ্দের অপরাধীর ওপর হদ্দ কায়িম করতে নিষেধ করতেন।[৭১] শাফি'ঈগণের মতে, দারুল হারবে হদ্দ কায়েম করতে কোন অসুবিধা নেই, যদি অপরাধী মুরতাদ হয়ে শত্রুদের সাথে মিলিত হবার

---

৬৮. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ৫৯, খ.২৪, পৃ. ৮৯-৯০; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ১৮০-১; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ. ১৬৮; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৫, পৃ. ১৫৮, খ.৯, পৃ. ৫৭

৬৯. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ. ২৬৬

৭০. যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ. ১৮২; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৩৪; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.১৮; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫,পৃ. ২৬৬-৭

৭১. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ. ২৬৭

কোন আশঙ্কা না থাকে। হাম্বলীগণের মতে, কোন মুসলিম যদি শত্রুদেশে কোন হদ্দের অপরাধ করে, তাহলে শত্রুদেশে তার ওপর হদ্দ কায়িম করা যাবে না; বরং দেশে ফিরে আসার পরেই তার ওপর হদ্দ কায়িম করা হবে।[৭২]

৮. ব্যভিচারে লিপ্ত নারী-পুরুষ বাকশক্তি সম্পন্ন হওয়া

হানাফীগণের মতে হদ্দ কায়েমের জন্য যিনাকারীকে বাকশক্তিসম্পন্ন হতে হবে। অতএব, তাদের দৃষ্টিতে সন্দেহের অবকাশ থেকে যাওয়ায় কোন বোবার ওপর কোনক্রমেই হদ্দের শাস্তি কার্যকর করা যাবে না। এমন কি সে যদি চার চার বার লিখে কিংবা ইশারা করে বোঝায় যে, সে যিনা করেছে এবং সাক্ষীরাও যদি তার যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়, তাহলেও তার ওপর হদ্দ কায়িম করা যাবে না। তবে অপরাপর ইমামগণের মতে, যিনার হদ্দের শাস্তি প্রয়োগের জন্য ব্যভিচারীর বাকশক্তি সম্পন্ন হওয়া শর্ত নয়। তাই তাঁদের দৃষ্টিতে, বোবা যদি যিনা করে এবং সে যদি লিখে কিংবা ইশারা করে বোঝায় যে, সে যিনা করেছে অথবা সাক্ষীরা যদি তার যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তার ওপর হদ্দ কায়েম করা ওয়াজিব হবে।[৭৩]

৯. জীবিত মহিলার সাথে সঙ্গম করা

অধিকাংশ ইমামের মতে, অবৈধ যৌনকর্মকে হদ্দের উপযোগী যিনার আওতায় ফেলতে হলে নারী-পুরুষ দুজনকেই জীবিত হতে হবে। যদি কোন পুরুষ কোন মৃত মহিলার সাথে সঙ্গম করে, তা যিনা রূপে গণ্য হবে না এবং এ জন্য তাকে হদ্দের শাস্তি দেয়া যাবে না। কেননা হদ্দের বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে শরী'আতের উদ্দেশ্য হল সমাজকে এ ধরনের গর্হিত অপরাধ থেকে সুরক্ষা করা। আর এ ধরনের কাজকে বিকৃত রুচির লোক ছাড়া সুস্থ স্বভাবের সকল লোকেই ঘৃণা করে থাকে। অতএব হদ্দ প্রয়োগের মাধ্যমে এ কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখার প্রয়োজন পড়ে না। তবে অপরাধী যা করেছে তা যেহেতু নিশ্চয়ই একটি জঘন্য অপরাধ, তাই তা'যীরের আওতায় আদালতের বিবেচনা অনুযায়ী সে শাস্তিযোগ্য হবে।[৭৪] মালিকীগণের মতে, যে ব্যক্তি মৃত মহিলার সাথে যোনী কিংবা গুহ্যদ্বার

---

৭২. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ. ২৬৬-৭; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ. ১৬৯

৭৩. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৫, পৃ. ৫৫, খ.৯, পৃ. ৯৮, ১২৯; শায়খী যাদাহ, *মাজমা'..*, খ.২, পৃ. ৭৩২-৩; আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৬, পৃ.৯৯

৭৪. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৩৪; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ. ২৬৪; হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯, পৃ. ১০৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৫৪

যে কোন পথ দিয়ে সঙ্গম করবে, তার ওপরও হদ্দ কায়িম করা ওয়াজিব হবে।[৭৫]

কোন মহিলা যদি কোন মৃত পুরুষের পুরুষাঙ্গকে নিজের যোনীতে প্রবেশ করায়, তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মত মত হল, যেহেতু সে এতে কোন রূপ স্বাদ লাভ করতে পারে না, তাই তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[৭৬]

১০. দুজনের এক জন পুরুষ এবং অপরজন নারী হওয়া

যিনার হদ্দ ওয়াজিব হবার জন্য যিনাকারীদের দুজনের একজনকে পুরুষ আর অপরজনকে নারী হতে হবে। যদি দুজনই সমজাতীয় হয় কিংবা একজন পশু হয়, তাহলে কারো ওপর হদ্দ কায়িম কার্যকর করা যাবে না।

ক. পুরুষদের সমকামিতার শাস্তি

যদি দুজন পুরুষ পরস্পর সমকামিতায় লিপ্ত হয়, তাহলে হানাফীগণের মতে, তাদের ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে না; তবে তাদেরকে তা'যীর করা হবে এবং বন্দী করা হবে, যতক্ষণ না তারা তাওবা করে স্বাভাবিক সুস্থ জীবন ধারায় ফিরে আসে কিংবা মৃত্যুবরণ করে।[৭৭] যদি কেউ সমকামিতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে বিচারক রাষ্ট্রের স্বার্থ বিবেচনা করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে, চাই সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত। তবে যেহেতু এ সমকামিতা যিনার সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না, তাই এ প্রকার অপরাধীর জন্য যিনার হদ্দ প্রযোজ্য হবে না।[৭৮] ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ এবং হাম্বলীগণের মতে, সমকামী দুজনের ওপর যিনার হদ্দ কার্যকর করা হবে। যদি তারা অবিবাহিত হয়, তাহলে তাদেরকে বেত্রাঘাত করা হবে। আর যদি বিবাহিত হয়, তাহলে প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে।[৭৯] মালিকীগণের মতে, তারা বিবাহিত হোক কিংবা

---

৭৫. আল-মওয়াক, *আত-তাজ..*, খ.৫, পৃ. ১০৯, খ.৮, পৃ. ৩৮৯; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৫৪

৭৬. আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, খ.৮, পৃ. ৭৬; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.২৪, পৃ. ৩৩

৭৭. ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতে, সমকামী দুজনকেই তা'যীর হিসেবে শাসক প্রয়োজন মনে করলে জ্বালিয়ে মেরে ফেলতে পারবে। ইবনুল কাইয়িমও এমত পোষণ করেন এবং ইবনু হাবীব আল-মালিকীর মতে, তাদেরকে জ্বালিয়ে মারা ওয়াজিব। তবে অধিকাংশ ইমামের মতে, যেহেতু দুনিয়ায় কোন মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেয়া জায়িয নেই, তাই সমকামীদেরকেও আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলা জায়িয নয়। (*আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.২, পৃ. ১২১)

৭৮. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ৭৭; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ. ২৬২-৩; ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ.২৭

৭৯. আস-সারাখসী,*আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৭৭; ইবনু মুফলিহ,*আল-ফুরূ'*,খ,৬, পৃ.৭০; আল-মরদাভী,*আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ.১৭৬

অবিবাহিত- সর্বাবস্থায় তাদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে।[৮০] শাফি'ঈগনের মতে, সমকামী কর্তার ওপর যিনার হদ্দ কার্যকর করা হবে আর অপরজনকে বেত্রাঘাত করা হবে এবং নির্বাসন দণ্ড দেয়া হবে, বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত ।[৮১]

খ. মহিলাদের সমকামিতার[৮২] শাস্তি

মহিলাদের সমকামিতাও একটি গর্হিত কাজ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, السحاق زنى النساء بينهن - "মহিলাদের সমকামিতাও যিনাবিশেষ।"[৮৩] ইবনু হাজর আল আসকালানী (রহ) এ কাজকে কবীরা গুনাহ হিসেবে গণ্য করেন। তবে এ বিষয়ে ইমামগণ একমত যে, এ কাজ যেহেতু যিনা নয়, তাই এ কাজের জন্য যিনার হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। তবে তা একটি গুনাহের কাজ হওয়ায় এর জন্য তা'যীর করা ওয়াজিব হবে।[৮৪]

গ. পশুর সাথে সঙ্গমের বিধান

যদি কেউ কোন পশুর সাথে[৮৫] ব্যভিচার করে, তাহলে অধিকাংশ ইমামের মতে

---

৮০. আল-বাজী, আল-মুন্তকা, খ.৭, পৃ.১৪১।
তাঁদের কথার দলীল হল, হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به. - "যদি তোমরা কাউকে হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের গর্হিত অপকর্ম করতে দেখ, তা হলে কর্তা ও যার সাথে এ কর্ম সম্পাদিত হয়- দুজনকেই হত্যা কর।" (আবূ দাউদ, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ৪৪৬২; আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হা.নং: ৮০৪৭, ৮০৪৮, ৮০৪৯) উল্লেখ্য যে, হাদীসটি সনদ অত্যন্ত দুর্বল হবার কারণে অনেকেই তা গ্রহণ করেন নি। আবার অনেকেই হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কঠোরতা ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য মৃত্যুদণ্ডের সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। অবশ্যই বিচারক অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান প্রয়োজনীয় মনে করলে তা করতে পারেন।

৮১. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৭, পৃ.১৯৩; আল-বুজায়রমী, *ফাতহুল হাবীব*, খ.৪, পৃ. ১৭৬

৮২. শরী'আতের পরিভাষায় একে 'সিহাক' বলা হয়। এর অর্থ হল, দুজন নারী মিলে পরস্পর নারী-পুরুষের মিলনের মতো আচরণ করা।

৮৩. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.২৪, পৃ.২৫২

৮৪. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ৫৮; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ.১৪২; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ. ১২৬

৮৫. সঙ্গমকৃত পশুটিকে মেরে ফেলার দরকার নেই। যদি জন্তুটি যবেহ করা হয়, তাহলে তার গোস্ত খেতে কোন অসুবিধা নেই, যদি তা খাবারযোগ্য প্রাণি হয়। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (রহ) ও মালিকী ইমামগণের অভিমত। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) প্রমুখ গোস্ত খেতে নিষেধ করেছেন। তাদের মতে, জন্তুটিকে যবেহ করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হবে, যাতে পরবর্তীতে কেউ এ জন্তু দেখে ঘটনাটিকে নতুনভাবে চাঙ্গা করতে না পারে। হাম্বলী ও শাফি'ঈগণের কারো কারো মতে, জন্তুটিকে যবেহ নয়; মেরে ফেলতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, من وقع على بهيمة فاقتلوه و اقتلوا البهيمة. - "যে কোন পশুর সাথে সঙ্গম করল, তাকে ও পশুটিকে হত্যা করো।" (আল বায়হাকী, আস-

তার ওপর যিনার হদ্দ আরোপ করা যাবে না; তবে তা'যীর করা যাবে। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ من أتى البهيمة فلا حد عليه - "যে কেউ কোন জানোয়ারের সাথে সঙ্গম করবে, তার ওপর কোন হদ্দ নেই।"[৮৬] তদুপরি রুচি বিকৃত লোক ছাড়া সুস্থ রুচিসম্পন্ন কেউ এ কাজ করতে পারে না। তাই হদ্দ প্রয়োগের মাধ্যমে এ কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখার প্রয়োজন পড়ে না।[৮৭]

১১. সন্দেহমুক্ত হওয়া

যিনার হদ্দ কার্যকর করার জন্য যৌন মিলনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারবে না। কেউ যদি কোন সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কারো সাথে সঙ্গম করে, তাহলে একে যিনা হিসেবে বিবেচনা করে তার ওপর হদ্দ কায়েম করা যাবে না; তবে ক্ষেত্রবিশেষে সন্দেহের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আদালত প্রয়োজন মনে করলে তাকে যথোপযুক্ত তা'যীরী শাস্তি দিতে পারবে।[৮৮] এ সন্দেহ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন-

ক. স্ত্রী মনে করে কারো সাথে সহবাস করা

যেমন- কেউ যদি বাসর রাতে নিজের শয্যায় শায়িত কোন মেয়েকে দেখতে পেল এবং বাড়ির লোকজনও তাকে বলল যে, সে তার স্ত্রী। এমতাবস্থায় সে নিজের স্ত্রী মনে করে যদি তার সাথে সহবাস করে, তার ওপর হদ্দ জারি করা যাবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে নিজের বিছানায় শায়িত কোন ঘুমন্ত মেয়ে দেখতে পেয়ে তাকে স্ত্রী মনে করেই

সুনান আল-কুবরা, হা.নং: ১৬৮১৪; দারুকুতনী, আস-সুনান, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ১৪৩) শাফি'ঈগণের অন্য একটি মতানুসারে, যদি পশুটি খাবারযোগ্য প্রাণি হয়, তাহলে যবেহ করতে হবে, তবে তার গোস্ত খাওয়া হারাম। উল্লেখ্য যে, পশুর সাথে সঙ্গম যিনা না হলেও তা একটি ঘৃণিত অপরাধ। তাই আদালত তা'যীরের আওতায় তাকে যে কোন উপযোগী শাস্তি দিতে পারবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর্যুক্ত হাদীসটিতে কঠোরভাবে সর্তক করার জন্য হত্যার কথা বলেছেন। (আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.১০২; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ. ২৬৫-৬; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ৫৯-৬০)

৮৬. আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হা.নং ৮০৫১

৮৭. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.১০২; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৩৪; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ৫৯। শাফি'ঈগণের এক মতানুযায়ী তার ওপর যিনা হদ্দ কার্যকর করা হবে। আর অন্য মতানুসারে তাকে হত্যা করা হবে। চাই সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত। (আল-হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯, পৃ.১০৬)

৮৮. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.১২; শায়খী যাদাহ, *মাজমা'*.., খ.১, পৃ, ৫৯২-৫৯৩

সহবাস করে, তাহলে তার ওপরও হদ্দ জারি করা যাবে না। তবে এরূপ অবস্থা ছাড়া অন্য অবস্থায় কেউ যদি কোন মহিলার সাথে ব্যভিচার করে দাবী করে যে, সে তাকে স্ত্রী মনে করেই সঙ্গম করেছে, তা হলে তার কথা ধর্তব্য হবে না।[৮৯]

খ. কোন মেয়েকে নিজের জন্য হালাল মনে করে সহবাস করা

যেমন-কেউ যদি নিজের তিন তালাকপ্রাপ্তা কিংবা খুলা'আ তালাকাপ্রাপ্তা বা এক তালাকে বায়িন প্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে ইদ্দত চলাকালীন সময়ের মধ্যে সঙ্গম করে এবং বলে যে, এ অবস্থায় সঙ্গম করা হারাম- তা তার জানা ছিল না, তাহলে উক্ত সঙ্গম যিনা হিসেবে ধর্তব্য হবে না এবং তার ওপর হদ্দ জারি করা যাবেনা; তবে আদালত বিবেচনা করলে তাকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দিতে পারে।

উল্লেখ্য যে, এ অবস্থায় কেউ সঙ্গম করা নিষিদ্ধ জেনে সঙ্গম করলে তা যিনা হিসেবে ধর্তব্য হবে এবং তার ওপর যিনার হদ্দ কার্যকর করতে হবে।

অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে আইনসিদ্ধভাবে তিন তালাক দেওয়ার পর ইদ্দত শেষে আইনসিদ্ধ পন্থা ব্যতীত তাকে স্ত্রীত্বে ফিরিয়ে নিলে, অতঃপর তার সাথে সঙ্গম করলে উক্ত সঙ্গমক্রিয়া যিনা হিসেবে গণ্য হবে এবং স্বামী-স্ত্রী দুজনের ওপরই যিনার হদ্দ কার্যকর হবে।[৯০]

গ. কোন মুহরামা আত্মীয়ার সাথে রীতিমত 'আকদ সম্পন্ন করে সহবাস করা

যে সব মহিলাকে বিয়ে করা হারাম, সে সব মহিলার সাথে যদি কেউ আকদ সুসম্পন্ন করে সহবাস করে, তাহলে তার ওপরও হদ্দ জারি করা যাবে না। তবে তাকে মাহর আদায় করতে হবে এবং তাকে কঠোরতর তা'যীরী শাস্তি দেয়া হবে, যদি সে হারাম জেনেই এ কাজ করে থাকে। যদি সে না জেনেই এ কাজ করে, তাহলে না তার ওপর হদ্দ জারি করা যাবে, না তা'যীর। এটা ইমাম আবূ হানীফা (রহ) অভিমত। তবে সাহেবাইনের মতে, যদি সে হারাম জানার পরে এ কাজ করে থাকে, তাহলে তার ওপর হদ্দ জারি করা

---

৮৯. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ৮৭; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৩৭

৯০. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ৮৮; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ. ১৭৬-৭; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ. ২৫০-২; ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ.২৪-৫ । অন্যান্য ইমামগণের মতে- সর্বাবস্থায় এ ধরনের ব্যক্তির ওপর হদ্দ কার্যকর করা বাধ্যতামূলক হবে। (ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ৫৪-৫)

হবে। যদি না জেনেই করে থাকে, তবেই তার ওপর হদ্দ জারি করা হবে না।[৯১]

ঘ. অবৈধভাবে কিংবা বিতর্কিত বিয়ে করে সহবাস করা

যে বিয়ে সুসম্পন্ন হয়নি (যেমন- সাক্ষ্য ছাড়া বিয়ে করা) কিংবা যে বিয়ের ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে (যেমন- অভিভাবক ছাড়া বিয়ে করা) কেউ যদি এ ধরনের বিয়ে করে সহবাস করে, তাহলেও তার ওপর হদ্দ কায়িম করা যাবে না। এ বিষয়ে ইমামগণের কারো দ্বিমত নেই।[৯২]

ঙ. নিজের স্ত্রীর সাথে অবৈধ অবস্থায় সহবাস করা

যে সব অবস্থায় নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম (যেমন- হায়য কিংবা রোযা বা ইহরামরত অবস্থা), কেউ যদি এ সব অবস্থায় তার সাথে সহবাস করে তার ওপরও হদ্দ জারি করা যাবে না।[৯৩]

যিনা প্রমাণের পদ্ধতি ঃ

নিম্নোক্ত তিনটি উপায়ের যে কোন একটি দ্বারা যিনা প্রমাণ করা যায়ঃ

১. মৌখিক স্বীকৃতি

যিনাকারী পুরুষ বা নারী যদি নিজেই মুখে স্বীকার করে যে, সে যিনা করেছে, তাহলে তা দ্বারা যিনা প্রমাণিত হবে। তবে এর জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। এগুলো হল -

ক. স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী

১. প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক কেউ যিনার স্বীকারোক্তি প্রদান করলেও হদ্দ কার্যকর করা হবে না।

২. সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। পাগল ও মাতাল ব্যক্তির স্বীকারোক্তি আমলে নেয়া হবে না।

৩. বাকসম্পন্ন হতে হবে। ইশারা ও লিখিতভাবে স্বীকার মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ার মতো। তবে বোবাদের স্বীকারোক্তি হানাফীগণের মতে আমলযোগ্য

---

৯১. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ৮৫-৬; আল-কাসানী, *বদাই*, খ.৭, পৃ.৩৫-৬; যায়লাঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ. ১৭৯-১৮০; ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ.২৪-৫

৯২. আল-কাসানী, *বদাই*, খ.৭, পৃ.৩৫; যায়লাঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ. ১৭৯-১৮০; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ৫৫

৯৩. আল-কাসানী, *বদাই*, খ.৭, পৃ.৩৫

নয়। অন্য তিন ইমামের মতে বোবার লিখিত ও ইশারায় স্বীকৃতি গ্রহণযোগ্য হবে, যদি ইশারা দ্বারা যিনা বোঝায়।[৯৪]

৪. পূর্ণ স্বাধীনতা ও এখতিয়ার থাকতে হবে। জোর-জবরদস্তি করে স্বীকারোক্তি আদায় করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

খ. স্বীকারোক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী

১. চার বার স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হবে। এটা হানাফী ও হাম্বলীগণের অভিমত। তাঁদের মতানুযায়ী চারবারের কম স্বীকারোক্তি করলে যিনার শাস্তি কার্যকর হবে না। বর্ণিত রয়েছে, হযরত মা'ইয (রা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে এসে যিনার স্বীকারোক্তি দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে তিনি চারবারই স্বীকারোক্তি দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথম তিন বারেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। চতুর্থবার তার কথা আমলে নিলেন।[৯৫] এ থেকে জানা যায় যে, যদি একবার স্বীকারোক্তিই হদ্দের জন্য যথেষ্ট হত, তা হলেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেনই বা চতুর্থবার স্বীকারোক্তি দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। মালিকী ও শাফি'ঈগণের মতে, চার চারবার স্বীকার করার প্রয়োজন নেই; বরং একবার স্বীকার করাই শাস্তি কার্যকর করার জন্য যথেষ্ট।[৯৬]

২. ভিন্ন ভিন্ন এজলাসে স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হবে

যে সব ইমামের দৃষ্টিতে, চার বার স্বীকৃতি দিতে হবে, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ হানাফীগণের মতে, এই চারবার স্বীকৃতি ভিন্ন ভিন্ন চারটি এজলাসে সম্পন্ন হতে হবে। তবে অন্যদের মতে, এক মজলিসে চারবার স্বীকৃতি দানও যথেষ্ট হবে।[৯৭]

---

৯৪. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৯৮; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ. ১৬৬; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ. ১৩১; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৬২-৬৩

৯৫. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ১৬৯১, ১৬৯২; আবূ দাউদ, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ৪৪১৯

৯৬. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৮৯-৯২; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৫০-১; মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ. ৪৭২; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৭, পৃ. ১৩২; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৬০

৯৭. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৮৯-৯২; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৫০-১; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৭, পৃ. ১৩২; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৬১

৩. বিচারকের এজলাসে স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হবে।[৯৮]

৪. স্বীকারোক্তি সুস্পষ্ট ও বিশদ বর্ণনাসম্বলিত হতে হবে।

অস্পষ্ট স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কখন, কার সাথে, কোন স্থানে, কোন অবস্থায় ও কিভাবে সঙ্গম করা হল তার বিশদ বিবরণ স্বীকারোক্তিতে থাকা প্রয়োজন।[৯৯]

৫. স্বীকারোক্তির ওপর অটল থাকতে হবে।

যদি স্বীকারোক্তি প্রদানকারী নারী-পুরুষ কোন পর্যায়ে নিজের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তাছাড়া হদ্দ কার্যকর করার সময়েও যদি কেউ নিজের স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসে, তাহলে বাকী হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। বর্ণিত রয়েছে, হযরত মা'ইয (রা) যখন পাথরের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করতে না পেরে পালাতে শুরু করলেন, তখন লোকেরা তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে ধরে ফেলে এবং প্রস্তারাঘাতে সে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘটনাটি জানতে পেরে বললেন, هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. - "তোমরা কেন তাকে ছেড়ে দিলে না? হয়ত সে তাওবা করত এবং আল্লাহও তার তাওবা কবুল করতেন।"[১০০] এ থেকে জানা যায় যে, স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নিলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং এ রূপ অবস্থায় হদ্দ প্রয়োগ করা যায় না।[১০১]

গ. অপরাধ সংঘটিত করার দীর্ঘ দিন পর স্বীকারোক্তি দান

অধিকাংশ ইমামের মতে, অপরাধ সংঘটিত করার দীর্ঘ দিন পরেও যদি কেউ যিনার স্বীকৃতি দেয়, তাহলে তা আমলে নিয়ে হদ্দ কার্যকর করা হবে। ইমাম মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যদি কেউ চল্লিশ বৎসর পরে এসেও স্বীকার করে, তাহলেও আমি তার ওপর হদ্দ কার্যকর করব।[১০২]

---

৯৮. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৭, পৃ. ১৩২; মুল্লা খসরু, *দুরারুল হুক্কাম*, খ.২, পৃ.৭৪

৯৯. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ. ১৬৬; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ.২৩৩; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৬১

১০০. আবূ দাউদ (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং : ৪৪১৯

১০১. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ.২২২-৩; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ. ১০; আল-বুজায়রমী, *আত-তাজরীদ*, খ.৪, পৃ.২১৩

১০২. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৯৭; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৫১

ঘ. স্বীকারোক্তি দানকারীকে বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ

অধিকাংশ ইমামের মতে, যদি কেউ স্বেচ্ছায় বিচারকের কাছে গিয়ে যিনার স্বীকৃতি দেয়, তাহলে বিচারক তাকে তার স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য ফিরিয়ে নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারবে। শাফি'ঈগণের মতে, এটা জায়িয। আর হানাফী ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, এটা বিচারকের জন্য মুস্তাহাব। তাঁদের বক্তব্য হল, বর্ণিত রয়েছে, হযরত মা'ইজ (রা) যিনার স্বীকৃতি দেবার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন, সম্ভবত তুমি তাকে চুমা দিয়েছ বা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছ কিংবা তার প্রতি নজর দিয়েছ।[১০৩] এ থেকে জানা যায়, বিচারকের জন্য স্বীকৃতি দানকারীকে নিজের বক্তব্য ফিরিয়ে নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা সমীচীন।[১০৪]

একজনের স্বীকারোক্তি এবং অন্যজনের অস্বীকার ঃ

একজন যেনার স্বীকারোক্তি করলে এবং অপরজন অস্বীকার করলে স্বীকারোক্তিকারীর ওপর হদ্দ কার্যকর হবে এবং অস্বীকারকারী রেহাই পাবে। যেমন একজন পুরুষ একজন মেয়ের সাথে যিনা করল। পুরুষটি অপরাধ স্বীকার করল; কিন্তু মেয়েটি অপরাধ অস্বীকার করল। এ অবস্থায় যে অপরাধ স্বীকার করেছে, তার ওপর হদ্দ কার্যকর হবে এবং যে অপরাধ অস্বীকার করেছে সে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে।[১০৫] হযরত সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে যিনার স্বীকারোক্তি করল এবং যে নারীর সাথে যিনা করেছে তার নামও বলল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে নারীকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সে অপরাধ অস্বীকার করল। তিনি স্বীকারোক্তিকারী পুরুষটির ওপর হদ্দ কার্যকর করলেন এবং মেয়েটিকে রেহাই দিলেন।[১০৬]

---

১০৩. আবূদাউদ(কিতাবুল হুদূদ), হা.নং : ৪৪১৯, ৪৪২৭

১০৪. যায়ল'ঈ, *আত-তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ.১৬৭; আল-বাবরতী, *আল-'ইনায়াহ*, খ.৫, পৃ.২২৩; বহুতী, *কশশাফ*, খ.৬, পৃ. ১০৩; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৭৪

১০৫. এটা সাহেবাইন ও অন্যান্য ইমামগণের অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতে, এ রূপ অবস্থায় স্বীকারোক্তিকারীর ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে। তবে মহিলাটি স্বীকারোক্তিকারী পুরুষের প্রতি যদি মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগ করে এবং সে যদি চার জন সাক্ষী পেশ করতে সমর্থ না হয় ,তাহলে তার ওপর যিনার নয়, কাযাফের হদ্দ কার্যকর করা হবে। (যায়ল'ঈ, *আত-তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ.১৮৪; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ. ২৯; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৬১)

১০৬. আবূ দাউদ, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং : ৪৪৩৭

অনুরূপভাবে সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হওয়া ছাড়া কেউ যিনা করে অস্বীকার করলে তার ওপরও হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। এমনকি এ অপরাধ প্রকাশিত হয়ে না পড়লে তা গোপন করে রাখাই শ্রেয়।

২. সাক্ষ্য-প্রমাণ

যিনা প্রমাণের দ্বিতীয় পদ্ধতি হল সাক্ষ্য-প্রমাণ। ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুসারে সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যাবে। তবে এ জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন-

ক. সাক্ষীদের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী

১. সাক্ষীদেরকে মুসলিম হতে হবে

অমুসলিমদের সাক্ষ্য যিনার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। সাক্ষীদের প্রত্যেককে মুসলিম হতে হবে। যদি কোন একজন সাক্ষীও অমুসলিম হয়, তাহলে সাক্ষ্যের নিসাব পূর্ণ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فاستشهدوا عليهن أربعة منكم.- "তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী দাঁড় করাও।"[১০৭] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা منكم (তোমাদের মধ্য থেকে) বলে কেবল মুসলিমগণকে বুঝিয়েছেন।

২. সাক্ষীদেরকে বয়ঃপ্রাপ্ত ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন হতে হবে

যিনার ক্ষেত্রে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ও পাগলের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য হবে না। অনুরূপভাবে নেশাগ্রস্ত ও মাতাল ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩. সাক্ষীদেরকে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে।

যিনার ক্ষেত্রে ফাসিকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। সাক্ষীদের প্রত্যেককে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, واشهدوا ذوي عدل منكم.- "তোমাদের মধ্য থেকে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদেরকেই সাক্ষী বানাবে।"[১০৮]

৩. সাক্ষীদেরকে পুরুষ হতে হবে।

চার মাযহাবের ইমামগণের মতে, যিনার চারজন সাক্ষীর প্রত্যেককেই পুরুষ হতে হবে। মহিলাদের সাক্ষ্য যিনার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।[১০৯] আল্লাহ

---

১০৭. আল-কুর'আন, ৪ (সূরা আন-নিসা) ঃ ১৫
১০৮. আল-কুর'আন, ৬৫ (সূরা আত-তালাক)ঃ ২
১০৯. যায়ল'ঈ, *আত-তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ.১৬৪; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.৪; ইবনু

তা'আলা বলেন, فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. - "তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী দাঁড় করাও।"[১১০] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পুরুষদেরকেই বিশেষভাবে সম্বোধন করেছেন। তা থেকে জানা যায় যে, যিনা প্রমাণের জন্য পুরুষদের সাক্ষ্যই কেবল গ্রহণযোগ্য হবে।

৪. সাক্ষীদের সংখ্যা চার হতে হবে।

যিনা প্রমাণের জন্য চার জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন। যদি সাক্ষীদের সংখ্যা একজনও কম হয়, তাহলে শরী'আতের দৃষ্টিতে যিনা প্রমাণিত হবে না। উপরন্তু, যারা সাক্ষ্য দেবে, তাদের ওপর অপবাদ রটানোর হদ্দ কার্যকর করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة "আর যারা অবিবাহিত সতী মহিলাদেরকে অপবাদ দেয়, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাহলে তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর।"[১১১]

৫. সাক্ষীদেরকে বাকশক্তিসম্পন্ন হতে হবে।

যিনা প্রমাণের জন্য বোবার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সে ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া সরাসরি সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে না।[১১২]

খ. সাক্ষ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী

১. চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য একই মজলিসে পেশ করতে হবে।

অধিকাংশ ইমামের মতে, সাক্ষীদের সাক্ষ্য একই মজলিসে হতে হবে। যদি সাক্ষীরা বিচ্ছিন্নভাবে এক এক জন করে কিংবা দুজন দুজন করে বা তিন জন এক সাথে আর অপর একজন পৃথকভাবে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। অধিকন্তু, তাদের সকলের ওপর যিনার অপবাদ দেয়ার শাস্তি কার্যকর করা হবে। তবে শাফি'ঈগণের মতে- এ শর্ত মেনে চলা প্রয়োজন নয়। যদি তারা সম্মিলিত কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে সাক্ষ্য দেয়, একই মজলিসে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন মজলিসে, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।[১১৩]

কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৬৪

১১০. আল-কুর'আন, ৪ (সূরা আন-নিসা) ঃ ১৫

১১১. আল-কুর'আন ২৪ (সূরা আন-নূর) ঃ ৪

১১২. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.১৬, পৃ.১৩০; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৬, পৃ.২৬৭; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.১০, পৃ.১৮৫-৬

১১৩. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৯০; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.২৬৭; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ৬৬, খ.১০, পৃ.২২০; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ. ১৪৪

২. সাক্ষীদের সাক্ষ্য সুস্পষ্ট ও বিশদ হতে হবে।

সাক্ষীদেরকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে যে, সুরমাদানীর মধ্যে সুরমা লাগানোর কাঠি যেমন ঢোকা অবস্থায় থাকে, তেমনি তারা পুরুষাঙ্গকে নারীর যোনীর মধ্যে ঢোকানো অবস্থায় দেখেছে। কেননা অনেক সময় সাক্ষীরা এমন অনেক আচরণকে যিনা মনে করে নিতে পারে যে, যা মূলত যিনা নয়। তাই এ ক্ষেত্রে যিনার বিবরণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তদুপরি এ কথাও সুনির্দিষ্ট ও বিশদভাবে বলতে হবে যে, কার সাথে, কি অবস্থায়, কখন ও কোথায় যিনা সংঘটিত হয়েছে।[১১৪] এ থেকে জানা যায়, তারা দুজনে যিনা করেছে- সাক্ষীদের এমন কথার ওপর ভিত্তি করে কারো ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।

৩. সাক্ষ্য মৌলিক হতে হবে।

অধিকাংশ ইমামের মতে, যিনার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য মৌলিক হতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যই একমাত্র গ্রহণযোগ্য হবে। সাক্ষীদের থেকে শুনে কেউ সাক্ষ্য দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।[১১৫]

৪. সাক্ষ্যের মধ্যে পূর্ণ মিল থাকতে হবে।

সাক্ষ্যে পূর্ণ মিল থাকতে হবে। যদি তাতে কোন রূপ পার্থক্য দেখা দেয়, তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন- যদি দুজন সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, তারা জুম'আবারে যিনা করেছে এবং অপর দুজন সাক্ষ্য দেয় যে, তারা শনিবারে যিনা করেছে, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। অনুরূপভাবে যদি তাদের দুজন দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে যিনার সাক্ষ্য দেয় আর অপর দুজন যদি দিনের অন্য সময়ে যিনার সাক্ষ্য দেয়, তাহলেও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে চারের অতিরিক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্যে গরমিল হলে তা ধর্তব্য হবে না। তদুপরি সাক্ষীদের মধ্যে কেউ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিলেও যিনা প্রমাণিত হবে না। তবে চারের অতিরিক্ত সাক্ষীগণের কেউ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে তা বিবেচ্য হবে না।[১১৬]

---

১১৪. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.২৬৭; বাবরতী, *আল-ইনায়াহ*, খ.৫, পৃ. ২১৫-৭; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৭, পৃ. ৪৬; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ৬৫

১১৫. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৬৬; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ.২৯১-২

১১৬. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৬১-৬; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ.২৮৪-৬; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.১০, পৃ. ২১৯-২২০; আর-রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ.৭, পৃ. ৪৩২

৫. সাক্ষ্য দানে বিলম্ব না করা

হানাফীগণের মতে, যিনার অপরাধ সংঘটিত হবার দীর্ঘ দিন পর যিনার সাক্ষ্য দেয়া হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা কাউকে কোন অপরাধে লিপ্ত হতে দেখার পর প্রত্যক্ষকারীর এ ইখতিয়ার রয়েছে যে, সে ইচ্ছে করলে সমাজের সার্বিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে নিরেট আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সাক্ষ্য পেশ করবে[১১৭] অথবা অপরাধটি গোপন করে রাখবে।[১১৮] অপরাধ দেখার পর দীর্ঘ দিন নীরব থাকার মানে হল সে দ্বিতীয় পথকেই বেছে নিয়েছে। আর দীর্ঘ দিন পর সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, সে কোন অসৎ উদ্দেশ্য কিংবা হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে এখন সাক্ষ্য প্রদান করছে। অধিকন্তু, যে সাক্ষ্য সম্পর্কে জানা যাবে যে, সাক্ষীদাতা কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছে, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[১১৯] হযরত 'উমার (রা) বলেন, أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن ضغن و لا شهادة لهم. - "যে সব লোক হদ্দের কোন অপরাধ সংঘটিত হবার সময় সাক্ষ্য না দিয়ে অন্য সময় সাক্ষ্য দেয়, তাহলে বোঝে নিতে হবে যে, তারা হিংসা-বিদ্বেষমূলকভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।"[১২০]

অন্যান্য ইমামগণের মতে, যিনার অপরাধ সংঘটিত হবার দীর্ঘ দিন পরেও যদি যিনার সাক্ষ্য দেয়া হয়, তাও গ্রহণযোগ্য হবে। তাঁদের কথা হল, যুক্তিসঙ্গত বিভিন্ন কারণেও[১২১] সাক্ষ্য প্রদানে বিলম্ব হতে পারে।[১২২]

গ. যাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী

১. যাদের বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে তাদেরকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে এবং যিনার উপযোগী হতে হবে। অতএব যে মেয়ের সাথে যিনার সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে যদি প্রমাণিত হয় যে, সে ছোট, সঙ্গমের উপযোগী নয়, তাহলে তার ওপর যিনার হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। মেয়েটি ছোট কি না- তা প্রমাণের জন্য

---

১১৭. আল্লাহ তা'আলা বলেন, و أقيموا الشهادة لله - "আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমরা সত্য সাক্ষ্য দাও।" –সূরা আত-তালাক ঃ ২

১১৮. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, من ستر مسلما ستره الله في الدنيا و الآخرة. - "যে কোন মুসলিমের দোষ গোপন করে রাখবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন করে রাখবে।" (ইবনু মাজাহ, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং : ২৫৪৪; আবদুর রযযাক, আল-মুছান্নাফ, হা.নং : ১৮৯৩৬)

১১৯. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৯৭, ১১৫; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৪৬

১২০. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.১০, পৃ.১৫১; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৪৬

১২১. যেমন অসুস্থ হয়ে যাওয়া বা জরুরী প্রয়োজনে দূরে কোথাও গমন করা প্রভৃতি।

১২২. আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ. ৪, পৃ. ১৩২; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৭১

হানাফী ও হাম্বলীগণের মতে, একজন মহিলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। শাফি'ঈগণের মতে, এ জন্য চার জন মহিলা কিংবা দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষ্যের প্রয়োজন।[১২৩]

ঘ. সাক্ষীদের জেরা করা

সাক্ষীরা যিনার সাক্ষ্য দেয়ার পর বিচারক তাদেরকে জেরা করবেন। তাদের কাছ থেকে জানতে চাইবেন, যিনা বলতে তারা কি বোঝাতে চাচ্ছে এবং কোন দিন, কোন সময়, কোন জায়গায় কারা যিনা করেছে। তাছাড়া যিনার অবস্থায় তারা কে কোন অবস্থায় ছিল তাও জানতে চাইবে। এ সব বিষয়ে যদি চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের মধ্যে গরমিল দেখা দেয় হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তবে চারের অতিরিক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্যে গরমিল হলে তা ধর্তব্য হবে না।[১২৪]

৩. লক্ষণ-প্রমাণ

ক. গর্ভধারণ

কুমারী বা স্বামীহীনা মেয়ের গর্ভবতী হওয়া যিনা প্রমাণ করে। তবে মেয়ে যদি যিনার কথা অস্বীকার করে, তাহলে এমতাবস্থায় হদ্দ কার্যকর করা যাবে কিনা তা নিয়ে ইসলামী আইনবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের মতে, হদ্দের উপযোগী শাস্তি প্রমাণের জন্য গর্ভধারণ যথেষ্ট নয়। যিনার হদ্দ কার্যকর করার জন্য এটা নিশ্চিত প্রমাণ অবশ্যই নয়; যিনার অপরাধে লিপ্ত হওয়ার সন্দেহ করা যেতে পারে মাত্র। হদ্দ কার্যকর করতে হলে তাকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করতে হবে কিংবা যথার্থ সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যেতে হবে। কেননা এ অবস্থায় এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, মহিলাটি ধর্ষণের সম্মুখীন হয়েছে কিংবা কোন সন্দেহে পতিত হয়ে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে।[১২৫] হযরত সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ স্বামীহীনা জনৈকা গর্ভবতী মহিলাকে হযরত 'উমার (রা)-এর দরবারে হাযির করা হল। মহিলাটি হযরত 'উমার (রা)-কে বলল, তার খুব গভীর ঘুম হত। একদিন এ অবস্থায় একজন লোক রাতে তার ঘরে প্রবেশ করে ঘুমন্ত

---

১২৩. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ. ১৯০-১; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ. ২৪; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ. ১৯২-৩; আল-আনসারী, *আল-গুরার..*, খ.৫, পৃ. ৮৩-৪

১২৪. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৬১-৬; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ.২৮৪-৬; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.১০, পৃ. ২১৯-২২০; আর-রমলী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ.৭, পৃ. ৪৩২

১২৫. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ. ৭, পৃ.৪৭; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ.৬, পৃ.৮১-২; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.১০, পৃ.৭২-৩;

অবস্থায় তার সাথে সঙ্গম শুরু করে। সে জেগে দেখতে পায় যে, লোকটি কাজ সেরে চলে গেছে। হযরত 'উমার (রা) মহিলাটির কথা গ্রহণ করে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।[১২৬] এ থেকে জানা যায়, হদ্দের অপরাধ প্রমাণের জন্য শুধু গর্ভধারণ যথেষ্ট নয়।

তবে মালিকীগণের মতে, স্বামীহীনা মহিলা গর্ভবতী হলে যিনা প্রমাণিত হবে এবং এজন্য তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে। তবে মহিলা যদি দাবী করে যে, তাকে জবরদস্তি করা হয়েছে বা ছিনতাই করা হয়েছে অথবা সে অবিবাহিতা বাকিরা ছিল, যিনার কারণে তার রক্তপাত ঘটেছে, তাহলে তাকে তার কথার আলামত স্বরূপ কোন প্রমাণ উপস্থিত করতে হবে। যদি সে তার কথা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়, তবেই তাকে হদ্দ থেকে মুক্তি দেয়া হবে। অন্যথায় তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে।[১২৭]

খ. লি'আন

মালিকী ও শাফি'ঈগণের মতে, লি'আনের দ্বারাও যিনা প্রমাণিত হবে এবং এ জন্য স্ত্রীর ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে, যদি স্বামী লি'আন করার পর স্ত্রী লি'আন করতে অস্বীকার করে। যদি স্ত্রী লি'আন করে, তাহলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তবে হানাফী ও হাম্বলীগণের মতে, যদি স্ত্রী লি'আন করতে অস্বীকারও করে, তাহলেও তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। কেননা হদ্দ কার্যকর করার জন্য যিনা প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন। আর লি'আনের ক্ষেত্রে স্ত্রীর কেবল লি'আন করতে অস্বীকার করলেই যিনা প্রমাণিত হয় না। এ জন্য দরকার সাক্ষ্য-প্রমাণ কিংবা স্বীকারোক্তি। তবে বিচারক স্ত্রীকে আটকে রাখবে, যতক্ষণ না সে লি'আন করে কিংবা স্বামীর কথা স্বীকার করে নেবে।[১২৮]

---

১২৬. ইবনু হাজর, *ফাতহুল বারী*, খ.১২, পৃ.১৫৪

১২৭. মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ.৪৭২; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ.১৪৬; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.১০, পৃ.৭৩

১২৮. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ. ৫, পৃ.৩১০; আল-বাবরতী, *আল-ইনায়াহ*, খ.৫, পৃ. ২৩৪-৫; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ.২৪৯; আল-খারাশী, *শারহ মুখতাছারি খলীল*, খ.৪, পৃ. ১৩৩

যিনার অপবাদের শাস্তি

কারো বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ তোলা একটি জঘন্য অপরাধ। মুসলিম সমাজে কোন চরিত্রবান পুরুষ বা নারীকে যিনার অপবাদ দেয়া মারাত্মক দুঃখজনক ব্যাপার। অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর এবং সাথে সাথে গোটা সমাজের ওপর এর প্রচণ্ড খারাপ প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়ে থাকে। অভিযুক্ত ব্যক্তির লজ্জা ও লাঞ্ছনার কোন সীমা থাকে না। জনগণের আস্থা থেকে সে চিরদিনের তরে বঞ্চিত হয়ে যায়। এই অবস্থা আরো মর্মান্তিক হয়ে দেখা দেয়, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন মেয়ে হয়। এ কলঙ্ক শুধু তাকেই ক্ষত-বিক্ষত করে না, তার পিতৃপুরুষ ও তার গর্ভজাতদের মুখকেও কালিমা লিপ্ত করে। আর অবিবাহিতা হলে তো তার পক্ষে বিবাহিতা হওয়ার আশা চিরতরে খতম হয়ে যায়। তদুপরি এ ধরনের অভিযোগের ফলে জনসমাজে জঘন্য ও কুৎসিত চরিত্রের কালো ছায়াপাত ঘটে। সন্দেহ-সংশয়, অবিশ্বাস-অনাস্থার মারাত্মক স্রোত গোটা সমাজমানসকে পঙ্কিল ও বিষাক্ত করে তোলে। স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং পিতা-মাতা ও ছেলে-মেয়ের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মমতা নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে ইসলাম এ ধরনের কাণ্ডজ্ঞানহীন কথাবার্তাকে কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করেছে।[১] শুধু তা-ই নয়, যে তা করে, তার ওপর অভিশাপও বর্ষণ করা হয়েছে। তাকে চিরদিনের জন্য আস্থার-অযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছে এবং তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিনতম শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إن الذين يرمون المحصنت الغفلت المؤمنت لعنوا في الدنيا و الآخرة و لهم عذاب عظيم. - "যে সব লোক সচ্চরিত্রা ও

১. তবে ক্ষেত্র বিশেষে যিনার অভিযোগ আরোপ করা ওয়াজিবে পরিণত হয়। যেমন কেউ যদি তার স্ত্রীকে এমন তুহরের (মাসের পবিত্র অবস্থায়) মধ্যে যিনা করতে দেখে, যে সময় সে তার সাথে সঙ্গম করেনি। এর পর সে তার নিকট থেকে দূরে সরে থাকল। যদি দেখা যায় যে, যিনার পর ছয়মাসের মধ্যে সন্তান প্রসব করেছে, তাহলে স্ত্রীর প্রতি যিনার অভিযোগ আরোপ করা এবং সন্তানকে অস্বীকার করা তার জন্য ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে ক্ষেত্র বিশেষে যিনার অভিযোগ আরোপ করা মুবাহে পরিণত হয়। যেমন কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে যিনা করতে দেখে কিংবা স্ত্রীর যিনার ব্যাপারটি তার নিকট সুপ্রমাণিত হয়, তবে বংশীয় সম্পর্ক সৃষ্টি করার মতো কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করেনি, তাহলে স্ত্রীর প্রতি যিনার অভিযোগ আরোপ করতে কোন দোষ নেই। (ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ. ৫৮-৯)

অসতর্ক মহিলাদের ওপর যিনার মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও পরকালে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে অতি বড় আযাব।"[২]

'কাযাফ' (যিনার অপবাদ)-এর সংজ্ঞাঃ

'কাযাফ'-এর আভিধানিক অর্থ হল নিক্ষেপ করা, সঞ্চার করা। কাউকে গালি দেয়া, দোষারোপ করার অর্থেও শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[৩] শরী'আতের পরিভাষায় কোন পুরুষ বা নারীর বিরুদ্ধে স্পষ্টাকারে কিংবা ইঙ্গিতে যিনার অপবাদ আরোপ করাকে 'কাযাফ' বলা হয়।[৪] অনুরূপভাবে কোন পুরুষের বিরুদ্ধে সমকামিতা বা পশুর সাথে সঙ্গম কিংবা কোন মহিলার সাথে পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে সঙ্গমক্রিয়ার অভিযোগ আরোপও 'কাযাফ'-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।[৫]

'কাযাফ'-এর বিভিন্ন ভাষা ও তার হুকম ঃ

যিনার অপবাদ আরোপ করার ভাষাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলঃ

১. ছরীহ (সুস্পষ্ট অপবাদ) ঃ 'ছরীহ' বলতে সে ভাষাকে বোঝানো হয়, যে ভাষা দ্বারা স্পষ্টরূপে যিনার কথা বোঝা যায়। (যেমন কেউ কোন পুরুষ বা নারীকে বলল, হে যিনাকার অথবা তুমি যিনা করেছ) অথবা যে ভাষা দ্বারা তার বংশ পরিচয়কে অস্বীকার করা হয় (যেমন কেউ কোন নারী বা পুরুষকে জারজ সন্তান বলে সম্বোধন করল অথবা বলল, তুমি তো তোমার পিতার সন্তান নও ইত্যাদি)।

সুস্পষ্ট অপবাদের ব্যাপারে ইমামগণের সর্বসম্মত মত হল, এতে হদ্দ কার্যকর করা ওয়াজিব হবে।[৬] তবে এর জন্য কিছু শর্ত রয়েছে, যা পরে আলোচনা করা হবে।

---

২. আল-কুর'আন, ২৪ (আন-নূর) ঃ ২৩

৩. ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, খ.৯, পৃ. ২৭৭

৪. আল-বাবরতী, *আল-ইনায়াহ*, খ.৫, পৃ. ৩১৭; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.৩২; মালিকীগণের মতে 'কাযাফ' হল- কোন বালিগ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি অপর কোন বালিগ ও বুদ্ধিমান মুসলমানকে যিনার অপবাদ দেয়া কিংবা কারো পিতৃ পরিচয় অস্বীকার করা। (আল-মাওয়াক, *আত-তাজ ওয়াল ইকলীল*, খ.৮, পৃ.৪০১-২; আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, খ.৮, পৃ.৮৬)

৫. মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ. ৪৮৬,৫০১; ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, খ.৬, পৃ. ৪৯৬, ৫৮১; আল-হায়তমী, *আয-যাওয়াযির..*, খ.২, পৃ.৮৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৭৯; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.৩৪

৬. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৫, পৃ.১৪১; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৪২-৩; আল-বাবরতী, *আল-'ইনায়াহ*, খ.৫, পৃ.৩১৭-৭; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ.৬, পৃ.৬৬

২. কিনায়া (অস্পষ্ট ভাষায় অপবাদ) ঃ 'কিনায়া' বলতে সে শব্দকে বোঝানো হয়, যা থেকে স্পষ্টরূপে যিনার কথা বোঝা যায় না; তবে তা ব্যুৎপত্তিগতভাবে যিনার অর্থ প্রদানের সম্ভাবনা রাখে। যেমন কেউ কোন পুরুষকে পাপিষ্ট বা নষ্ট অথবা লম্পট বলে সম্বোধন করল। অনুরূপভাবে কেউ কোন মহিলাকে পাপিষ্টা, নষ্টা মেয়ে বলে সম্বোধন করল অথবা বলল যে, তুমি তো কাউকে ফিরাওনা, তোমাকে তো নির্জনে খুব দেখা যায় ইত্যাদি।

এ প্রকারের ভাষা যেহেতু স্পষ্ট অপবাদ নয়; তাই এ প্রকারের অপবাদের হুকম কি হবে- তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফী ও হাম্বলী স্কুলের ইমামগণের মতে, এ প্রকারের অপবাদ হদ্দ যোগ্য অপরাধ নয়। তাঁদের কথা হলো, যেহেতু এ ধরনের ভাষায় যিনার সুস্পষ্ট অপবাদ নেই; তদুপরি যিনা ছাড়া অন্য কাজের জন্যও এ সব ভাষা ব্যবহার করা হয়, তাই এ সব কথা যিনার অপবাদ রূপে গণ্য হবে না। তবে এ সব কথা হদ্দযোগ্য অপরাধ না হলেও তা নিঃসন্দেহে একটি অশোভনীয় বাক্যবাণ। তাই তা'যীরের আওতায় আদালত অপরাধীর অবস্থা ও অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির মর্যাদা বিবেচনা করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবে।[৭] শাফি'ঈ ও মালিকীগণের মতে, এ প্রকারের কথার হুকম নিয়াতের ওপর নির্ভরশীল হবে। যদি অভিযোগ আরোপকারী শপথ করে বলে যে, এ কথা দ্বারা তার উদ্দেশ্য যিনার অপবাদ দেয়া নয়; বরং গালি দেয়া কিংবা মান হানি করাই উদ্দেশ্য, তাহলে তার কথা আমলে নেয়া হবে এবং তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না; তবে তা'যীরের আওতায় আদালতের সুবিবেচনা অনুযায়ী শাস্তি যোগ্য হবে।[৮]

৩. তা'রীদ (পরোক্ষ ভাষায় অপবাদ) ঃ 'তারীদ' বলতে এমন শব্দপ্রয়োগকে বোঝানো হয়, যার মধ্যে স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্টভাবে যিনার অর্থ নেই; কিন্তু পরোক্ষভাবে যিনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন ঝগড়া-বিবাদের সময় কেউ অপরকে লক্ষ্য করে বলল যে, আমি তো আর ব্যভিচারী নই। এতে ইঙ্গিত থাকে, যাকে লক্ষ্য করে কথাটি বলা হচ্ছে, তাকে যিনার অপবাদ দেয়া হলো। অনুরূপভাবে কেউ বলল যে, আমার মা তো আর ব্যভিচারিণী নয়। এতে ইঙ্গিত থাকে যে, তোমার মা ব্যভিচারিণী।[৯]

---

৭. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.১০, পৃ.১৮৮-৯; আল-কাসানী, *বদাই*, খ.৭, পৃ.৪২-৩; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ.২১৫-৭; আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.১০৯-১১২

৮. আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৩, পৃ. ৩৭১-২; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ.১৪৯-১৫০

৯. ইবনু 'আরাফাহ, *আল-হুদূদ*, পৃ. ৪৯৯; যারকশী, *আল-মানছূর..*,খ.১, পৃ.৩৬১

এ প্রকারের ভাষা যেহেতু সরাসরি অপবাদ নয়; তাই এ প্রকারের বাক্যবাণের হুকম কি হবে- তা নিয়েও ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

মালিকীগণের মতে, পরস্পরের বিবাদ-বিসম্বাদের সময় এ ধরনের পরোক্ষ ভাষার ব্যবহার হদ্দযোগ্য অপবাদের আওতায় পড়বে।[১০] তাঁর দলীল হল, হযরত 'উমরাহ্ বিনতে 'আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত 'উমার (রা)-এর আমলে দু ব্যক্তি ঝগড়া করতে গিয়ে একজন অপরজনকে বললো, আল্লাহর শপথ! আমার পিতা তো আর যিনাকারী নয় এবং আমার মাতাও যিনাকারিণী নয়। এ ধরনের উক্তি অপবাদের পর্যায়ে পড়বে কি না- এ নিয়ে হযরত উমার (রা) কয়েকজন সাহাবীর নিকট থেকে পরামর্শ চাইলেন। তাঁদের একজন বললেন, এ দ্বারা তো সে তার বাবা-মার প্রশংসাই করেছে। অন্যরা বললো, এতে তার বাবা-মার প্রশংসা থাকলেও তা দ্বারা উদ্দেশ্য অন্য একটা। তার পিতামাতা যিনাকারী নয় -এ কথা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তার প্রতিপক্ষের পিতামাতা যিনাকারী। হযরত 'উমার (রা) তাঁদের বক্তব্য গ্রহণ করে তার ওপর অপবাদের হদ্দ কার্যকর করলেন।[১১]

হানাফী ও শাফি'ঈ মতাবলম্বী ইমামগণের মতে, এ প্রকারের কথা হদ্দ যোগ্য অপরাধ নয়। তাঁদের বক্তব্য হলো, এ ধরনের কথার মধ্যে যেমন অপবাদ আরোপের সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি অন্য অর্থ নেবার অবকাশও থাকে। আর এ অবকাশ সন্দেহের নামান্তর। আর হদ্দযোগ্য অপরাধে কোন রূপ সন্দেহ সৃষ্টি হলে তাতে হদ্দ কার্যকর করা হয় না। তবে এ ধরনের পরোক্ষ বাক্যবাণ নিঃসন্দেহে অশোভনীয়। তাই তা'যীরের আওতায় আদালত অপরাধীর অবস্থা ও অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির মর্যাদা বিবেচনা করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবে।[১২]

এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ (রহ) থেকে দুটি মত বর্ণিত রয়েছে। একটি মত হল- পরোক্ষ ভাষায় অভিযোগ যেহেতু সরাসরি অপবাদ নয়, তাই এতে হদ্দ কার্যকর

---

১০. মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ,* খ.৪, পৃ.৪৯০. ৪৯৪; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা,* খ.৭, পৃ.১৪৯-১৫০
তবে কোন পিতা যদি তার ছেলের জন্য এ রূপ ভাষা ব্যবহার করে, তা অবশ্যই অপবাদের আওতায় পড়বে না। কারণ সাধারণত এ ধরনের কথা দ্বারা পিতার উদ্দেশ্য সন্তানকে অভিযুক্ত করা হয় না; তাকে শাসানোই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। (আল-মাওয়াক, *আত-তাজ ওয়াল ইকলীল,* খ.৮, পৃ.৪০১)

১১. বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা',* হা.নং: ১৬৯২৪

১২. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত,*খ.৯, পৃ.১২০; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন,* খ.৩, পৃ. ২০০; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম,* খ.৫, পৃ.১৪২; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব,* খ.৩, পৃ. ৩৭১-২

করা যাবে না। অপর মত হল, পরোক্ষ ভাষায় অভিযোগ বিবাদ-বিসম্বাদের সময় অপবাদ; কিন্তু সাধারণ অবস্থায় অপবাদ হিসেবে গণ্য হবে না।[১৩]

'কাযাফ'-এর শাস্তি ঃ

যে কোন ব্যক্তি অপর কোন পুরুষ বা নারীর বিরুদ্ধে যিনা বা সমকামিতার অভিযোগ উত্থাপন করে তা চারজন উপযুক্ত সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করতে না পারলে উক্ত অভিযোগ 'কাযাফ' হিসেবে গণ্য হবে এবং অভিযোগকারীকে আশিটি বেত্রাঘাতের দণ্ড দেয়া হবে এবং চিরদিনের জন্য তাদের কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, و الذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فإن الله غفور رحيم. - "যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি যিনার অভিযোগ আরোপ করে, পরে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কোড়া মার। উপরন্তু, তাদের সাক্ষ্য কখনোই গ্রহণ করবে না। তারা ফাসিক। তবে যারা এরপর তাওবা করবে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাদের জন্য) ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।"[১৪] এ আয়াতেও যদি মহিলাদের প্রতি যিনার অভিযোগের কথা বলা হয়েছে; তথাপি পুরুষদের প্রতি অভিযোগের বেলায়ও একই হুকম প্রযোজ্য হবে।

এ আয়াত থেকে দুনিয়াতে 'কাযাফ'-এর দু'প্রকারের শাস্তির কথা জানা যায়। একটি হল ৮০টি বেত্রাঘাত। অপর শাস্তি হল- সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান। চিরদিনের জন্য অপবাদদানকারীর কোন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান ঃ

ইমামগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, যদি অপবাদদানকারী তাওবা না করে, তবে তার কোন সাক্ষ্যই কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে সারা জীবন ফাসিক হিসেবেই পরিচিত থাকবে। যদি সে তাওবা করে, তাহলেও কি সে সারা জীবন ফাসিক হিসেবেই পরিচিত থাকবে এবং তার কোন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না- এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীগণের মতে, যদি সে তাওবা করে, তাহলে তার থেকে ফাসিকের কলঙ্ক মুছে যাবে; তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[১৫] তাঁদের বক্তব্য হলো- কুর'আনে أبدا (চিরদিনের জন্য)

---

১৩. ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ.৬, পৃ.৯০; আর-রুহায়বানী, *মাতালিব..*, খ.৬, পৃ.২০৪-৫

১৪. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা নূর) ঃ ৪-৫

১৫. জাসসাস, *আহকামুল কুর'আন*, খ.৩, পৃ.৩৯৯-৪০১; আল-বাবরতী, *আল-'ইনায়াহ*, খ.৫, পৃ.৩৩৮-৯

শব্দের ব্যবহার দ্বারা জানা যায় যে, তাদের সাক্ষ্য চিরদিনের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না, যদিও সে তাওবাহ করে। আর إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا এ ব্যতিক্রমী বাক্যটি পূর্বের নিকটবর্তী বাক্য و أولئك هم الفسقون -এর সাথে সম্পর্কিত। এ থেকে জানা যায়, তাওবা করলে ফাসিকীর কলঙ্ক মুছে যাবে। তদুপরি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف. - "অপবাদের দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া মুসলিমরা একে অপরের জন্য ন্যায়পরায়ণ।"[১৬] এ হাদীস থেকেও স্পষ্ট জানা যায় যে, অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

অন্যান্য ইমামগণের মতে, তাওবার পর ফাসিকের কলঙ্ক মুছে যাবার সাথে তাদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে। তাদের দলীল হল, তাওবাহ কারণে যাবতীয় পাপ মুছে যায়।[১৭] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, التائب من الذنب كمن لا ذنب له. - "পাপকর্ম থেকে তাওবাকারী এমন ব্যক্তির মতো হয়ে যায়, যার কোন পাপ নেই।"[১৮] এ হাদীসের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তাঁরা বলেন, কুফরী অপবাদ থেকেও বড় অপরাধ। কাফির তাওবা করে মুসলিম হলে যদি তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে মুসলিম তাওবা করলে তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে। তাঁদের মতে, إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا এ ব্যতিক্রমী বাক্যটি পূর্ববর্তী و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفسقون - দুটি বক্তব্যের সাথে সম্পর্কিত। এ থেকে জানা যায়, তাওবা করলে যেমন ফাসিকীর কলঙ্ক মুছে যাবে, তেমনি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণেও কোন আপত্তি থাকবে না।

কারো কারো মতে, স্বীকারোক্তি দ্বারা অপবাদের দোষ প্রমাণিত হলে এবং এরপর খালিস তাওবাহ করলে তবেই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যদি তাদের আচার-আচরণ দ্বারা তাদের তাওবার প্রমাণ মিলে। এটা ইমাম শা'বী ও দাহহাকের অভিমত।[১৯]

---

১৬. বাইহাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা'*, হা.নং : ১৬৯২৪; দারু কুতনী, *আস-সুনান*, (কিতাবুল আকদিয়্যাহ), হা.নং : ১৫, ১৬

১৭. ইবনুল 'আরবী, *আহকামুল কুর'আন*, খ.৩, পৃ.৩৪৫-৬; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.১০, পৃ.১৯২-৪

১৮. ইবনু মাজাহ, (বাব : যিকরুত তাওবাহ), হা.নং: ৪২৫০; বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা'*, হা.নং: ২০৩৪৮, ২০৩৪৯; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা.নং : ১০২৮১

১৯. ইবনুল 'আরবী, *আহকামুল কুর'আন*, খ.৩, পৃ.৩৪৫-৬; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.১০, পৃ.১৯২-৪

এ প্রসঙ্গে হানাফীগণের মতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কেননা খালিস তাওবার ব্যাপারটি আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষে নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়। যদি তারা খালিস তাওবাই করে থাকে তাহলে তারা পরকালে অবশ্যই নাজাত পাবে। তবে দুনিয়ার কাজে-কর্মে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। এমতাবস্থায় কুর'আনে ابدا (চিরদিনের জন্য) শব্দের অর্থও ঠিক থাকবে। তদুপরি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হবার ব্যাপারে যেখানে সরাসরি হাদীসের বক্তব্য রয়েছে, সে ক্ষেত্রে কিয়াস করা সমীচীন নয়।

'কাযাফ'-এর শর্তাবলীঃ

'কাযাফ'-এর কতিপয় শর্ত রয়েছে। হদ্দ কার্যকর করার জন্য এ সব শর্ত পাওয়া যেতে হবে। এ সব শর্তের কতিপয় অভিযোগ আরোপকারীর মধ্যে, আর কতিপয় অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে, আর কতিপয় অভিযোগের ভাষার মধ্যে পাওয়া যেতে হবে।

অভিযোগ আরোপকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী ঃ

১. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া

২. সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া

৩. স্বেচ্ছায় অভিযোগ আরোপ করা

কাকেও যদি হত্যার হুমকি দিয়ে যিনার অভিযোগ আরোপ করতে জোরপূর্বক বাধ্য করা হয়, তার ওপর কাযাফের হদ্দ কার্যকর হবে না, যদি হত্যার হুমকি প্রমাণিত হয়। হত্যা ছাড়া কারাদণ্ড কিংবা বেত্রাঘাত বা ইত্যাকার কোন শাস্তির হুমকির প্রেক্ষিতে যিনার মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা হলে তাতে হদ্দের বিধান রহিত হবে না।[২০]

৪. ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া

হদ্দ কার্যকর করতে হলে অভিযোগ আরোপকারীকে মুসলিম কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে। অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকের ওপর 'কাযাফ'-এর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তবে রাষ্ট্রীয় আইনে সে শাস্তিযোগ্য হবে।[২১]

---

২০. আল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাহ*, খ.২, পৃ. ২৫৫; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, ৪৬-৭; হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯, পৃ. ১২০-১

২১. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.৯, ৪৭; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৪০; হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯, পৃ. ১২০-১; আর-রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ.৭, পৃ.৪৩৫-৬

৫. বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া

হানাফীগণের মতে, অভিযোগ আরোপকারীকে বাকশক্তি সম্পন্ন হতে হবে। কোন বোবা লোকের ওপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[২২]

৬. নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা

শাফি'ঈগণের মতে, অভিযোগ আরোপকারীর 'কাযাফ'-এর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। নতুন মুসলিম হবার কারণে কিংবা মুসলিম সমাজ থেকে দূরে অবস্থানের কারণে কেউ যদি কাযাফের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞতার দাবী করে এবং তার সত্যতাও মিলে, তাহলে তার ওপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[২৩]

৭. অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুমতি না থাকা

শাফি'ঈগণের মতে, হদ্দ কার্যকর করার জন্য অভিযোগ আরোপের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুমতি না থাকা শর্ত। যদি কেউ অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুমতি নিয়েই তার বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ তোলে, তাহলে তার ওপরও হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[২৪]

৮. উর্ধ্বতন বা অধস্তন ব্যক্তি না হওয়া

অধিকাংশ ইমামের মতে, অভিযোগকারী অভিযুক্ত ব্যক্তির উর্ধ্বতন (যেমন পিতা, মাতা, দাদা) কিংবা অধস্তন (ছেলে, মেয়ে বা নাতি-নাতনি) না হওয়াও শর্ত।[২৫] তবে মালিকীগণের এক মতানুযায়ী কোন পিতা যদি তার ছেলের বিরুদ্ধে যিনার মিথ্যার অভিযোগ দেয়, তার ওপরও হদ্দ কার্যকর করা হবে।[২৬]

৯. অভিযোগের পক্ষে চারজন সাক্ষীর অভিন্ন সাক্ষ্য পেশ করা

অভিযোগ আরোপকারীকে চারজন সাক্ষী দ্বারা তার উত্থাপিত অভিযোগ প্রমাণিত করতে হবে। যদি সে চারজন সাক্ষী উপস্থাপন করতে না পারে, তবেই তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে। চারজন সাক্ষীর অপরাধের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করার পর হদ্দ কার্যকর করার আগেই যদি এক বা একাধিক সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে যিনা প্রমাণিত হবে না এবং সাক্ষীগণের সকলেই

---

২২. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, ৪৭; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, ৪৬-৭

২৩. আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.১৩৫;

২৪. হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯, পৃ. ১২০-১

২৫. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, ১২৩-৪; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৪২; হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯, পৃ. ১২০-১; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৮৯

২৬. আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ.১৪৭

কাযাফের দণ্ডে দণ্ডিত হবে।[২৭]

অনুরূপভাবে কোন সাক্ষী সাক্ষ্যদানের অযোগ্য সাব্যস্ত হলে[২৮] সকল সাক্ষীই কাযাফের দণ্ডে দণ্ডিত হবে, যদি যিনার শাস্তি কার্যকর করার আগেই এ অযোগ্যতা ধরা পড়ে। যদি অভিযুক্তের ওপর বেত্রাঘাতের দণ্ড কার্যকর করার পরেই অযোগ্যতা ধরা পড়ে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতে, সাক্ষীরা কাযাফের দণ্ড ভোগ করবে এবং সাহেবাইনের মতে, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে বায়তুল মাল থেকে 'আরশ' (ক্ষতিপূরণ) প্রদান করতে হবে। যদি রজমের পর অযোগ্যতা ধরা পড়ে তা হলে সাক্ষীদের ওপর হদ্দ কার্যকর হবে না; তবে বায়তুল মাল থেকে দিয়াত প্রদান করতে হবে।

ঘটনার স্থান ও সময়ের ব্যাপারে সাক্ষীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে তাদের ওপর কাযাফের শাস্তি কার্যকর করা যাবে না। কারণ, সাক্ষীর সংখ্যা চার তো পূর্ণ হয়েছে; তবে তাদের সাক্ষ্যের ত্রুটির কারণে অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। অনুরূপভাবে অপরাধীকে শনাক্ত করার ক্ষেত্রেও মতভেদ হলে সাক্ষীগণ শাস্তি ভোগ করবে না। অনুরূপভাবে দুজন সাক্ষ্য দিল যে, যিনা জোরপূর্বক সংঘটিত হয়েছে এবং অপর দুজন সাক্ষ্য দিল যে, স্বেচ্ছায় ও সম্মতিতে যিনা সংঘটিত হয়েছে, এ ক্ষেত্রেও সাক্ষীরা দণ্ডযোগ্য হবে না।[২৯]

অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী ঃ

অভিযোগ আরোপকারীর ওপর হদ্দ কার্যকর করতে হলে অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যেও কিছু শর্ত পাওয়া যেতে হবে। এ শর্তগুলো হল -

১. মুসলিম হওয়া

ইমামগণের সর্বসম্মত মত হল, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুসলিম হতে হবে। কোন কাফিরের বিরুদ্ধে যিনার মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা হলে তা হদ্দের আওতায় আসবে না। তবে তা তা'যীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ

---

২৭. ইমাম মুহাম্মদের মতে, শুধু সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারী কাযাফের দণ্ডে দণ্ডিত হবে; তবে বিচারকের রায় দেবার আগে প্রত্যাহার করা হলে সকলেকে কাযাফের দণ্ড ভোগ করতে হবে। হদ্দ কার্যকর করার পর কোন সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে সে কাযাফের দণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তাকে এক চতুর্থাংশ দিয়াত প্রদান করতে হবে।

২৮. যেমন কোন সাক্ষী সমাজে পাপাচারী বলে কুখ্যাত হলে কিংবা ইতিপূর্বে কাযাফের দণ্ড ভোগ করে থাকলে।

২৯. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, ৪৭; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৪০;যায়লা'ঈ, খ.৩, পৃ.১৮৯-১৯০

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, من أشرك بالله فليس بمحصن. -
"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে, সে পূত-পবিত্র নয়।"[৩০]

২. প্রাপ্ত বয়স্ক (বালিগ) হওয়া

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বালিগ অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। নাবালিগের প্রতি যিনার অভিযোগ আরোপ করা হলে তাও কাযাফের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে না। কেননা না বালিগের যিনা যদি সুপ্রমাণিতও হয়, তাতে হদ্দ ওয়াজিব হয় না। তাই তার প্রতি অপবাদ দানকারীর ওপরও হদ্দ কার্যকর না হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। তবে তা'যীরী শাস্তি দেয়া হবে। ইমাম মালিকের মতে, যদি না বালিগ মেয়ে সঙ্গমের উপযোগী হয়, বিশেষ করে যদি সাবালিকা হয়, তাহলে তাকে অপবাদ দিলে তা কাযাফের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে।

৩. সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হতে হবে। পাগল কিংবা মাতালের প্রতি যিনার অভিযোগ আরোপ করা হলে তাও কাযাফের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে না।

৪. পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হওয়া

অভিযোগ আরোপকারীর ওপর হদ্দ কার্যকর করতে হলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পবিত্র ও সৎ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। কোন ব্যক্তি যিনা করেছে তা যদি তার স্বীকারোক্তি কিংবা সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা সুপ্রমাণিত হয়, তাহলে এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেউ পরবর্তীকালে সুনির্দিষ্টভাবে কিংবা অনির্দিষ্টভাবে কোন যিনার অভিযোগ তুললে তা কাযাফের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি পিতৃ পরিচয়হীন সন্তান-সন্ততি বিশিষ্টা কোন মহিলার বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ তোলে তার ওপরও হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।

উল্লেখ্য যে, কেউ যদি কোন পবিত্র চরিত্রের লোকের বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ তোলে এবং অপবাদকারীর ওপর হদ্দ কার্যকর করার পূর্বেই যদি প্রমাণিত হয় যে, সে পরে যিনা করেছে, তাহলেও অভিযোগকারীর ওপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তবে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া যাবে।[৩১]

---

৩০. বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা'*, হা.নং : ১৬৭১৩; দারু কুতনী, *আস-সুনান*, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং : ১৯৮

৩১. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৪০-৪১; যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ.২০০; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৩, পৃ. ৩৭৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৭৬-৭৭

স্ত্রীর প্রতি যিনার অভিযোগ আরোপের বিধান ঃ

কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ উত্থাপন করে এবং তার কথার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাক্ষী উপস্থাপন করতে না পারে অথবা সে যদি স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান তার ঔরসজাত নয় বলে দাবী করে, তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান ও বক্তব্যের পক্ষে বিশেষ পন্থায় আদালতের সামনে শপথ করতে হবে। শরী'আতের পরিভাষায় একে লি'আন বলা হয়।

লি'আনের নিয়ম হল ঃ প্রথমে স্বামী এই বলে চারবার শপথ করবে- "আমি আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এ নারীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছি, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চয়ই সত্যবাদী।" পঞ্চমবারে অভিযুক্তার প্রতি ইঙ্গিত করে বলবে, 'আমি এ নারীর বিরুদ্ধে যিনার যে অভিযোগ উত্থাপন করেছি, সে ক্ষেত্রে আমি মিথ্যাবাদী হলে আমার ওপর আল্লাহর লা'নত পতিত হোক।" অতঃপর স্ত্রী এ বলে চারবার শপথ করবে- "আমি আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ ব্যক্তি আমার প্রতি যিনার যে অভিযোগ আরোপ করেছে সে ব্যাপারে সে নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।" পঞ্চমবারে বলবে, "এই ব্যক্তি আমার প্রতি যিনার যে অভিযোগ আরোপ করেছে সে ক্ষেত্রে সে সত্যবাদী হলে আমার ওপর আল্লাহর লা'নত পতিত হোক।" আল্লাহ তা'আলা বলেন, والذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا انفسهم فشهادة أحدهم أربع شهدت بالله إنه لمن الصدقين. و الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكذبين. و يدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهدت بالله إنه لمن الكذبين.و الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصدقين. - "যারা নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ আরোপ করে, অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবারে বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার নিজের ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড়বে। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবারে বলবে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড়বে।"[৩২]

যদি স্বামী শপথ করতে অস্বীকার করে তাকে কারাগারে আটক রাখা হবে, যতক্ষণ না সে শপথ করে অথবা তার উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যা বলে স্বীকার

---

৩২. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর) ঃ ৬-৯

করে। অভিযোগ মিথ্যা বলে স্বীকার করার ক্ষেত্রে তার ওপর কাযাফের হদ্দ কার্যকর করা হবে। স্ত্রী শপথ করতে অস্বীকার করলে তাকেও কারাগারে আটক করে রাখা হবে, যে যাবত না সে শপথ করে অথবা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য বলে স্বীকার করে। অভিযোগ সত্য বলে স্বীকার করলে তাকে যিনার শাস্তি স্বরূপ রজমের শাস্তি দেয়া হবে, যদি সে 'মুহসান' হয় আর 'মুহসান' না হলে একশত বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হবে। মালিকী, শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, লি'আন করতে অস্বীকার করলে অপরাধীকে বন্দী করার প্রয়োজন নেই। হদ্দ প্রয়োগের জন্য তাদের শপথ করতে অস্বীকার করাই যথেষ্ট।[৩৩]

প্রত্যেকে লি'আন করার পর তাদের বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তারা আর কখনো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। তবে স্বামী তার অভিযোগ মিথ্যা বলে স্বীকার করলে শাস্তি ভোগের পর তারা পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।[৩৪]

লি'আনের সন্তান মাতার সাথে যুক্ত হবে এবং মাতা ও সন্তান পরস্পরের ওয়ারিছ হবে।[৩৫]

উল্লেখ্য যে, লি'আনকারী মহিলার প্রতি যিনার অভিযোগ আরোপ করা এবং তার সন্তানকে জারজ সন্তান বলে অভিহিত করা জায়িয নয়। অধিকাংশ ইমামের মতে, যে এ রূপ করবে, তার ওপর কাযাফের হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।[৩৬] কেননা লি'আনের ফলে তার যিনা সাব্যস্ত হয়নি এবং তার পবিত্রতাও কোন রূপ কলঙ্ক লিপ্ত হয়নি। এ কারণেই তাকে যিনার দণ্ডের সম্মুখীনও হতে হয় নি। এ ধরনের মহিলা ও তার সন্তান প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

---

৩৩. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৩, পৃ.২৩৮-৯; ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৪, পৃ.১২৫; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৩, পৃ. ৩৭৯-৩৮০; আল-বহূতী, *কাশশাফ*, খ.৫, পৃ.৪০১; আল-জাযীরী, *কিতাবুল ফিকহ 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ*, খ.৫, পৃ.১০৮

৩৪. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৩, পৃ.২৪৫-৬; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৪, পৃ.২৮৬; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৫২-৫৩

৩৫. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৪, পৃ.২৮৯-২৯০; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৫৬

৩৬. শাফি'ঈ ও মালিকীগণের মতে, লি'আনকারী মহিলার প্রতি যদি স্বামীও তার অভিযুক্ত যিনা ছাড়া অন্য কোন যিনার মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে, তার ওপরও কাযাফের হদ্দ প্রযোজ্য হবে। তবে অভিযুক্ত যিনার ক্ষেত্রে সে শাস্তি যোগ্য হবে না। তবে শাফি'ঈগণের মতে, লি'আনের পরে যদি সে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে, তাকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া হবে। (*আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.৩৩, পৃ.১৯-২০)

বলেছেন,.لا ترمى و لا يرمى ولدها ' و من رماها أو رمى ولدها فعليه الحد - "তার ও তার সন্তানের প্রতি যিনার অভিযোগ উত্থাপন করা যাবে না। যে ব্যক্তি তার প্রতি কিংবা তার সন্তানের প্রতি যিনার অভিযোগ তুলবে, তার ওপর হদ্দের শাস্তি বর্তাবে।"[৩৭] তবে হানাফীগণের মতে, লি'আনকারী মহিলার যদি পিতৃপরিচয়হীন সন্তান না থাকে, তবেই এ হুকম প্রযোজ্য হবে। পিতৃপরিচয়হীন সন্তান থাকলে এবং তা যিনার একটি প্রমাণ হবার কারণে অভিযোগ আরোপকারীর জন্য কাযাফের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। তবে তা'যীরের আওতায় সে শাস্তিযোগ্য হবে।[৩৮]

'কাযাফ' প্রমাণের পদ্ধতিঃ

নিম্নের যে কোন একটি উপায়ে যিনার অভিযোগ উত্থাপনকারীর অভিযোগ আরোপ প্রমাণ করা যাবে।

১. স্বীকারোক্তি

অভিযোগকারী যদি নিজেই স্বীকার করে নেয় যে, সে যিনার অভিযোগ আরোপ করেছে, তাহলে 'কাযাফ' প্রমাণিত হবে। এ স্বীকারোক্তিতে চারবার স্বীকার করার শর্ত নেই; বরং বিচারকের এজলাসে একবার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। কেউ স্বীকার করার পরে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।[৩৯] ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যে সব ক্ষেত্রে বান্দাহর হক জড়িত রয়েছে, তাতে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেবার কোন সুযোগ নেই।

২. সাক্ষ্যপ্রমাণ

দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারাও কাযাফ প্রমাণিত হবে। অধিকাংশ ইমামের মতে, এ ক্ষেত্রে সাক্ষীদের সকলকেই পুরুষ হতে হবে। মহিলাদের সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে না।[৪০]

৩. শপথ করতে অস্বীকার করা

যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি "অভিযোগ উত্থাপন করেনি" মর্মে শপথ করতে অস্বীকার

---

৩৭. আবূ দাউদ, (বাব : আল-লি'আন), হা.নং : ২২৫৬

৩৮. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ.৩৩৪-৫; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.৪১-৪২

৩৯. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.২৩২; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ.৩২৮; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.৩২

৪০. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.৩২; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ.৪৪-৪৫

করে, তাহলে এটা এ কথার প্রমাণ বহন করবে যে, সে অভিযোগ তুলেছে।[৪১] এটা শাফি'ঈ ইমামগণের অভিমত।

'কাযাফ'-এর হদ্দ রহিত হবার অবস্থাসমূহ ঃ

১. ক্ষমা

অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অভিযোগ উত্থাপনকারীকে -আদালতে মামলা দায়েরের আগে হোক কিংবা পরে- ক্ষমা করে দেয়, তাহলে কাযাফের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। কেননা কাযাফের শাস্তি বান্দাহর অধিকারের সাথে জড়িত, যা দাবী ছাড়া কার্যকর করা হয় না। পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, বান্দাহর অধিকারের সাথে জড়িত শাস্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমা দ্বারা রহিত হয়ে যায়। এটা শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের অভিমত।[৪২] মালিকীগণের মতে, আদালতে মামলা দায়েরের আগে হলে ক্ষমা করে দেয়া জায়িয; কিন্তু মামলা দায়েরের পরে ক্ষমা করা জায়িয নয়।[৪৩] হানাফীগণের মতে, আদালতে মামলা দায়েরের আগে কিংবা পরে- কোন অবস্থায় কাযাফের দণ্ড ক্ষমা করে দেয়া জায়িয নয়। তাঁদের বক্তব্য হল, কাযাফের শাস্তি নিরেট বান্দাহর অধিকারের সাথে জড়িত নয়; এতে আল্লাহর অধিকারও রয়েছে। আর যে সব শাস্তিতে বান্দাহর অধিকারের সাথে আল্লাহর অধিকার জড়িত রয়েছে, তাতে বান্দাহর ক্ষমা করে দেয়ার অধিকার নেই।[৪৪]

২. লি'আন

যদি অভিযোগকারী স্বামী হয় এবং তার এমন কোন সাক্ষী নেই, যারা তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। এমতাবস্থায় সে লি'আন করলে কাযাফের হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

৩. সাক্ষ্য পেশ

যদি অভিযোগ উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ কিংবা অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাহলে অভিযোগকারী শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে।

৪. 'মুহসান'-এর চরিত্র হারিয়ে ফেলা

হানাফী ও মালিকীগণের মতে, অভিযোগ ওঠার পর যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির

---

৪১. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৫, পৃ.১৪৪-৬; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.৪০৫

৪২. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৫, পৃ.৩১৬; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৩, পৃ.৩৭৫; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ.৬, পৃ.৯৩; আর-রুহায়বানী, *মাতালিব..*, খ.৬, পৃ.১৯৫। হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ) থেকে এ ধরনের একটি মত বর্ণিত রয়েছে। (আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.১০৯)

৪৩. মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ.৪৮৮; আস-সাভী, *বুলগাতুস সালিক*, খ.৪, পৃ.৪৬৭

৪৪. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.১০৯; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ. ২০৩

'মুহসান' চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ অভিযোগ আরোপিত হবার পর কেউ যিনা করল, কিংবা ধর্মত্যাগ করল বা পাগল হয়ে গেল তাহলে অভিযোগকারী শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। কারণ হদ্দ প্রমাণের জন্য যেমন অভিযুক্ত ব্যক্তির মুহসান হওয়া দরকার, তেমনি হদ্দ কার্যকর করার জন্য তার মুহসান হিসেবে নিজেকে ধরে রাখাও প্রয়োজন। শাফি'ঈগণের মতে, হদ্দ কার্যকর করার আগে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন যিনায় লিপ্ত হলে অভিযোগকারী শাস্তি থেকে খালাস পেয়ে যাবে। তবে হাম্বলীদের মতে, অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির মুহসান চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে গেলেও হদ্দ রহিত হবে না। যেমন হদ্দ কার্যকর করার আগে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন যিনায় লিপ্ত হলে কিংবা পাগল হয়ে গেলে অভিযোগকারী হদ্দ থেকে রেহাই পাবে না।[৪৫]

৫. সাক্ষ্য প্রত্যাহার

মিথ্যা অভিযোগ আরোপের বিষয়টি সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হবার পর যদি হদ্দ কার্যকর করার আগেই সাক্ষীরা সকলেই কিংবা প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলেও হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

৬. অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি

যিনার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগটিকে সত্য হিসেবে মেনে নিলেও অভিযোগ আরোপের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে।

৭. অভিযুক্ত ব্যক্তির দাবী না থাকা

অধিকাংশ ইমামের মতে, যিনার অভিযোগ আরোপ যেহেতু বান্দাহর হকের সাথে জড়িত ব্যাপার, তাই অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিয়ম মাফিক বিচারের দাবী না করলে অভিযোগকারীর ওপর কাযাফের শাস্তি বর্তাবে না। তবে হানাফীগণের মতে, এ ধরনের অভিযোগ আরোপে যেহেতু বান্দাহর হকের সাথে আল্লাহর হকও জড়িত রয়েছে, তাই অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিচারের দাবী না থাকলেও অভিযোগকারী কাযাফের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না; প্রশাসন রাষ্ট্রের জনস্বার্থে তাকে শাস্তি দেবে।[৪৬]

---

৪৫. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.১২৭; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৩, পৃ.৩৭৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৫৬; আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, খ.৪, পৃ.১২৮

৪৬. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৫, পৃ.৩০৫, খ.৮, পৃ. ৩১২; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৮৩; আল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাহ*, খ.২, পৃ.১৫৮; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ.৫, পৃ.৫১৫

পুনঃ পুনঃ অপবাদ আরোপের শাস্তি ঃ

কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেউ বার বার যিনার অভিযোগ তুললে তার ওপর কাযাফের একটি হদ্দই কার্যকর করা হবে। চাই সে প্রতি বারেই একটি যিনা সম্পর্কেই অভিযোগ আরোপ করুক কিংবা প্রতিবারে নতুন নতুন যিনার অভিযোগ আরোপ করুক। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য এক জাতীয় দুটি হদ্দ কারো ওপর ওয়াজিব হলে সে ক্ষেত্রে একটি হদ্দই কার্যকর করার বিধান রয়েছে। যেমন কেউ যিনা করল, অতঃপর এর শাস্তি ভোগ করার আগেই যদি আর একবার যিনা করে, তাহলে তার ওপর একটি মাত্র হদ্দ কার্যকর করা যাবে।[৪৭]

কেউ কারো প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করল এবং এ জন্য তাকে শাস্তি দেয়া হল, অতঃপর ফিরেও যদি সে উক্ত যিনার অভিযোগ তোলে তাহলে হদ্দ পুনরাবৃত্তি করা যাবে না; তবে তা'যীরের আওতায় তাকে শাস্তি দিতে হবে। যদি অন্য দ্বিতীয় যিনার অভিযোগ আরোপ করে, তাহলে দেখতে হবে, সে যদি এ অভিযোগ প্রথম অভিযোগ আরোপের দীর্ঘ দিন পরেই উত্থাপন করে থাকে, তাহলে তাকে দ্বিতীয় হদ্দ প্রয়োগ করতে হবে। যদি প্রথম হদ্দ কার্যকর করার পরপরই দ্বিতীয় যিনার অভিযোগ উত্থাপন করে, তাহলে তার শাস্তি নিয়ে ইমামগণের মধ্যে দুটি মত দেখা যায়। একটি হল- দীর্ঘদিন পরে নতুন অভিযোগ তুললে যেমন অভিযোগকারীর ওপর দ্বিতীয় হদ্দ কার্যকর করা হয়, তেমনি প্রথম অভিযোগের শাস্তি ভোগের পর পর উত্থাপিত দ্বিতীয় অভিযোগের জন্যও দ্বিতীয়বার হদ্দ কার্যকর করা হবে। তদুপরি অন্যান্য হদ্দের অপরাধ যেমন চুরি ও যিনা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও একবার শাস্তি ভোগ করার পর দ্বিতীয়বার একই অপরাধে লিপ্ত হলে দ্বিতীয় অপরাধের জন্যও পুনরায় হদ্দ কার্যকর করা হবে। অপর মতটি হল- তাকে যেহেতু সবে মাত্র একই ধরনের অপরাধের জন্য হদ্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, তাই একই অপরাধের দ্বিতীয় বারের জন্য হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তবে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া যাবে।[৪৮]

---

৪৭. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৫, পৃ.৩১৪; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৩, পৃ.৩৮২; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৭১; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ.২০৭; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৮৯-৯০; মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ.২২৩-৪

৪৮. *তদেব*

দলের প্রতি যিনার অপবাদ আরোপের শাস্তি ঃ

একটি দলকেই যিনার অপবাদ দেয়া হলে তার শাস্তি কি হবে- তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফী ও মালিকীগণের মতে, অভিযোগকারীকে একটি বার শাস্তি দেয়া হবে। চাই সে এক বাক্যে সকলকে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে সকলকেই অভিযুক্ত করুক। চাই সকলে মিলে এক সাথে তার বিচার দাবী করুক কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে দাবী করুক। প্রথম জনের দাবীর প্রেক্ষিতে যদি তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হয়, তাহলে পরবর্তীদের দাবীর প্রেক্ষিতে আর তার ওপর দ্বিতীয় হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[৪৯] যেহেতু তার অপরাধ দলের বিরুদ্ধে, তাই দলের একজনের দাবী সকলের দাবী হিসেবে ধর্তব্য হবে। তবে দলের কারো বিরুদ্ধে নতুন কোন যিনার অভিযোগ তুললে, সে জন্য নতুন হদ্দ প্রযোজ্য হবে। তাঁদের বক্তব্য হল, হিলাল ইবন উমাইয়্যা (রা), যিনি এক সাথে তার স্ত্রী ও শুরায়ক ইবন সাহমাকে অপবাদ দিয়েছিলেন তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেবল একটি শাস্তিই দিয়েছিলেন। তদুপরি অন্যান্য হদ্দের অপরাধসমূহ যেমন- যিনা, চুরি, মদ্যপায়িতা যখন বারংবার করা হয়, তখন বারবার কৃত অপরাধের জন্য একাধিক শাস্তি না দিয়ে একবারই শাস্তি দেয়া হয়।[৫০]

শাফি'ঈ ও হাম্বলী মতাবলম্বী ইমামগণের মতে, বিভিন্ন বাক্য দ্বারা (যেমন প্রত্যেককে উদ্দেশ্য করে বলল, হে ব্যভিচারী) যদি একটি দলের সবাইকে অভিযুক্ত করা হয়, তাহলে দলের প্রতিটি ব্যক্তির অপবাদের জন্য পৃথক পৃথক

---

৪৯. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.১১১; আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, খ.৮, পৃ.৮৮; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৮৯

৫০. তবে এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে যে, একটি অপবাদের জন্য কাউকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এবং শাস্তি দেয়া শেষ না হওয়ার আগেই যদি সে অন্য এক জনের প্রতি যিনার অপবাদ দেয়, তাহলে হানাফীগণের মতে, তাকে নতুন করে দ্বিতীয় শাস্তি দেয়া যাবে না; তার ওপর একটি হদ্দই কার্যকর করা হবে। এমনকি, যদি প্রথম হদ্দের শাস্তি থেকে যদি কেবল একটি বেত্রাঘাতও অবশিষ্ট থাকে, তাহলে দ্বিতীয় অপবাদের জন্য অবশিষ্ট একটি বেত্রাঘাতই কার্যকর করা হবে। মালিকীগণের মতে, প্রথম অপবাদের জন্য বেত্রাঘাতের শাস্তি কার্যকর করার সময় যদি অপর কোন ব্যক্তির প্রতি অপবাদ দেয়, এমতাবস্থায় দেখতে হবে যে, বেত্রাঘাত যা কার্যকর করা হয়েছে তার পরিমাণ বেশি না অল্প। যদি পরিমাণ অল্পই হয়, তাহলে তা গণনা করা হবে না; নতুনভাবে বেত্রাঘাত গণনা শুরু করতে হবে। যদি দেখা যায়, অল্প পরিমাণ বেত্রাঘাত বাকী রয়েছে, তাহলে প্রথম হদ্দ পূর্ণভাবে কার্যকর করার পর দ্বিতীয় অপবাদের জন্য নতুনভাবে বেত্রাঘাত শুরু করতে হবে। (আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯,পৃ.১১১; আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, খ.৮,পৃ.৮৮)

শাস্তি দেয়া হবে।[৫১] কেননা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের মতে অপবাদের অপরাধ মানুষের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ ধরনের অপরাধসমূহের শাস্তি একটি অপরটির মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। তাই উপর্যুক্ত অবস্থায় অপবাদের সাথে বিভিন্ন মানুষের অধিকার জড়িত হবার কারণে তার হদ্দসমূহ পরস্পর প্রবিষ্ট হবে না। তবে যদি একটি বাক্য দ্বারা দলের সকলকেই অভিযুক্ত করা হয় (যেমন সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, হে ব্যভিচারীরা), তাহলে ইমাম শাফি'ঈ (রহ)-এর পুরাতন মতানুযায়ী তার ওপর একটি হদ্দ বর্তাবে। ইমাম আহমাদ (রহ) থেকেও এ ধরনের একটি মত বর্ণিত রয়েছে। ইমাম হাসান আল-বসরী ও ইমাম শাফি'ঈ (রহ)-এর নতুন মতানুযায়ী এমতাবস্থায়ও দলের প্রতিটি ব্যক্তির অপবাদের জন্য পৃথক পৃথক শাস্তি দেয়া হবে। কেননা তার এ অপবাদের ফলে দলের প্রত্যেকের মান-সম্মান ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাই প্রত্যেকের জন্যই পৃথক পৃথক শাস্তির বিধান কার্যকর করা হবে। যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি পৃথক পৃথকভাবে অভিযোগ আরোপ করার জন্য পৃথক পৃথক হদ্দ কার্যকর করা হয়।

উল্লেখ্য যে, শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, যদি কেউ এমন কোন বিরাট দলের প্রতি যিনার অভিযোগ উত্থাপন করে, স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাদের প্রত্যেকের ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার, তাহলে হদ্দ ওয়াজিব হবে না। তাঁদের বক্তব্য হল, কাযাফের হদ্দ অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি আরোপিত কলঙ্ক মোচনের একটি প্রয়াস মাত্র। কিন্তু উপর্যুক্ত অবস্থায় যেহেতু অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কলঙ্কিত হবার আশঙ্কা নেই, তাই অভিযোগকারীর মিথ্যাবাদী হবার ব্যাপারটি প্রচুর সম্ভাবনাময়। তবে তার মিথ্যাচারিতার জন্য তা'যীরের আওতায় তাকে শাস্তি দেয়া হবে।[৫২]

---

৫১. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৫, পৃ.৩১৪; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৩, পৃ.৩৭৯; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৮৯; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ.৬, পৃ.৯৬; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ.২২৩

৫২. রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ.৭, পৃ.১০৮; আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৬, পৃ.১১২-৩; আর-রুহায়বানী, *মাতালিব..*,খ.৬, পৃ.২০৬

৫. মদ্যপানের শাস্তি

মাদক ছোট-বড় বহু অপরাধের উৎস এবং নানা দৈহিক ও মানসিক মারাত্মক ক্ষতির কারণ। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুবাদে এর ক্ষতিকর দিকগুলো বর্তমানে সকলের কাছে সুবিদিত। মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠ নি'মত বিবেক-বুদ্ধি, যা দ্বারা সে পৃথিবীর অন্যান্য সকল প্রাণির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব লাভ করেছে, মাদক সেবনের ফলে তা হারিয়ে যায়। এর সাথে সে হারিয়ে ফেলে মনুষ্যত্ববোধ ও মানবিক চেতনা। ভাল-মন্দ জ্ঞানও সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। হারিয়ে ফেলে কর্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞান। এ অবস্থায় আকৃতিতে মানুষ হলেও সে পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়। তখন সে বড় বড় অপরাধ করে বসে। আপন-পরের পার্থক্য বোধও থাকে না। এ দিকে লক্ষ্য রেখেই হযরত 'উছমান (রা) বলেছিলেন,. اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث - "তোমরা মদ পরিহার কর। কেননা তা হচ্ছে সকল প্রকারের পাপকাজের উৎস।"[১] এ কারণেই ইসলাম পবিত্র ও সুন্দর মনের মানুষ তৈরি এবং সুস্থ সমাজ বিনির্মাণের মহৎ উদ্দেশ্যে সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবসা ও সেবন কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। শুধু তা-ই নয়; ইসলামের দৃষ্টিতে ঈমান ও মদ সেবন একত্রিত হতে পারে না।[২] অর্থাৎ কোন ঈমানদার মু'মিন অবস্থায় মদ্যপান করতে পারে না। হয় ঈমানদার হবে, না হয় শুধু মদ্যপায়ী হবে।

মাদকের সংজ্ঞা ঃ

মাদককে আরবীতে خمر বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ ঢেকে ফেলা, সমাচ্ছন্ন করা, মিশে যাওয়া। মদ সেবনের ফলে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি সমাচ্ছন্ন হয়ে যায় বলে তাকে خمر বলা হয়।[৩] শরী'আতের পরিভাষায় যে সকল বস্তু মাদকতা

---

১. আন্ নাসাঈ, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং : ৫১৭৬, ৫১৭৭; আল বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং : ১৭১১৬; 'আবদুর রযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং: ১৭০৬০

২. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. "কোন মদ্যপায়ী ঈমানদার অবস্থায় মদপান করতে পারে না।" (সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুল মাযালিম), হা.নং : ২৩৪৩; সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল ঈমান), হা.নং : ৫৭)

৩. ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, খ.৪, পৃ. ২৫৪-৫

সৃষ্টি করে এবং বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে অথবা বোধশক্তির ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তাকে خمر (মাদক) বলা হয়।[৪]

ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতে, আঙ্গুরের রস দ্বারা তৈরি মাদক পানীয়ই خمر (খামর)।[৫] তিনি خمر (খামর) ও নেশা উদ্রেককারী বস্তুসমূহের মধ্যে পার্থক্য করেন। তাঁর মতে, খামর সেবন শাস্তিযোগ্য অপরাধ, তাতে নেশার উদ্রেক হোক বা না হোক, কম হোক বা বেশি। কিন্তু নেশা উদ্রেককারী অন্যান্য বস্তুসমূহের ব্যবহার শাস্তিযোগ্য নয়, যে যাবত তা নেশা উদ্রেক না করে।[৬]

কিন্তু অধিকাংশ ইমামের মতে, আঙ্গুরের রস ও অন্যান্য বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নেই; বরং যে সকল বস্তু মাদকতা সৃষ্টি করে- তা যে বস্তুই হোক- তা 'খামার' (মাদক) রূপে গণ্য হবে এবং তা যে কোন পরিমাণে -অল্প হোক বা বেশি- গ্রহণ করা হারাম।[৭]

পর্যায়ক্রমে মদের নিষেধাজ্ঞা অবতরণ ঃ

মুসলিম উম্মাতের ওপর আল্লাহ্ তা'আলার একটি বড় অনুগ্রহ হচ্ছে, তিনি শরী'আতের সকল বিধান একযোগে নাযিল করেন নি; বরং ক্রমাগতভাবে শরী'আতের বিধানগুলো জারি করেছেন। তদুপরি অনেক বিষয়ের চূড়ান্ত বিধি-নিষেধ এক দিনেও কার্যকর করেন নি। ইসলামের আবির্ভাবের সময় মদ্যপান ছিল তৎকালীন আরবের তথা গোটা পৃথিবীর মানুষের সাধারণ অভ্যাস এবং তারা মদ্যপানকে কোনরূপ অপরাধযোগ্য কর্ম মনে করত না। কিন্তু ইসলামে

---

৪. প্রখ্যাত ভাষাবিদ আসমা'ঈ বলেন,. الخمر ما خمر العقل ' و هو المسكر من الشراب - "যা বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে (অর্থাৎ নেশার উদ্রেককারী পানীয়)তা-ই হল خمر। (ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, খ.৪, পৃ. ২৫৪-৫)

৫. তাঁর মতে, তিন প্রকারের পানীয় খামার বা মাদকের অন্তর্ভুক্ত। ক. তাজা আঙ্গুরের রস অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখার পর তা গাঁজিয়ে ফেনা ধারণ করলে। খ. আঙ্গুরের রস জ্বাল দেওয়ার পর তার দু-তৃতীয়াংশ শুকিয়ে গেলে। গ. কিসমিস ও শুষ্ক খেজুরের রস জ্বাল দিয়ে সিদ্ধ না করা সত্ত্বেও তাতে মাদকতা সৃষ্টি হলে। কিন্তু তাজা আঙ্গুরের রস কিংবা কিসমিস ও শুষ্ক খেজুরের রস আগুনে সিদ্ধ করার ফলে তার দু-তৃতীয়াংশ বাষ্প হয়ে ওড়ে না গেলে এবং বার্লি, গম, ভুট্টা ইত্যাদির রস তা আগুনে জ্বাল দেয়া হোক না হোক, নেশা উদ্রেককারী হলেও খামার বা মাদক নয়। এগুলো পান করে মাদকতা সৃষ্টি হলেই কেবল পানকারী শাস্তিযোগ্য হবে। অন্যথায় নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে হদ্দের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না; বরং তা'যীরের আওতায় শাস্তি হবে। (আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৪, পৃ.২-৪; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৫, পৃ.১১২; বাবরতী, *আল-'ইনায়াহ*, খ.১০, পৃ.৯০-৪)

৬. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৪, পৃ.২-৪; আল-কাসানী, *বদা'ই* খ.৫, পৃ.১১২

৭. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৩৬; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬,১৫৬, ১৯৩-৫; মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ.৫২৪

মদ্যপান একটি মারাত্মক দণ্ডনীয় অপরাধ। তবে মানুষের এই চিরাচরিত অভ্যাস পরিবর্তন সাধনে ইসলাম ধীর পদক্ষেপে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হয়েছে। কেননা এ বস্তুটিকে যদি হঠাৎ করে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হতো তাহলে তা মেনে চলা তখনকার লোকদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ত। অনেকেই হয়ত তা গ্রাহ্যই করত না। এ প্রসঙ্গে হযরত 'আয়িশা (রা) বলেছেন, و لو نزل أول شيئ لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. - "প্রথম অবতীর্ণ আয়াতেই যদি বলা হতো যে, তোমরা মদ পান করো না, তা হলে তারা অবশ্যই বলতো যে, আমরা কখনোই মদ্যপান ত্যাগ করবো না।"[৮]

মদপানের চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা জারী করার জন্য আল্লাহ তা'আলা চার পর্যায়ে চারটি আয়াত নাযিল করেছেন। মক্কা শরীফে প্রথম যে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তা হল ঃ و من ثمرات النخيل و الأعناب تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا. - "এমনিভাবে খেজুরের গাছ ও আঙ্গুরের ছড়া থেকেও আমরা একটি জিনিস তোমাদের পান করাই, যাকে তোমরা মাদকেও পরিণত কর এবং উত্তম পানীয়ও তাতে রয়েছে।"[৯] এ আয়াতটিতে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, ফলের এই রসে উপাদেয় খাদ্যের উপকরণ যেমন রয়েছে, তেমনি তাতে রয়েছে মাদকে পরিণত হবার যোগ্যতা। তাই এ হালাল ফল থেকে মানুষ উপাদেয় খাদ্য গ্রহণ করবে, না তাকে বিবেক-বুদ্ধি বিনষ্টকারী মাদকে পরিণত করবে, তা লোকদের রুচির ব্যাপার। প্রসঙ্গত এ কথাও ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, মদ পবিত্র রিযকরূপে গণ্য হতে পারে না। তাই তা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

মদের প্রতি ঘৃণার বীজ লোকদের মনে বপন করাই ছিল এই প্রথমবারে অবতীর্ণ আয়াতটির মূল উদ্দেশ্য। এরপর মদীনা জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছে ঃ يسألونك عن الخمر و الميسر قل فيهما إثم كبير و منافع للناس و إثمهما أكبر من نفعهما. - "(হে রাসূল,) আপনাকে তারা মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, এ দুটিতে রয়েছে বড় পাপ, লোকদের উপকারও রয়েছে বটে। তবে উপকারের চাইতে পাপ অনেক বড়।"[১০] এ আয়াতে মদে যে কিছু উপকার আছে তা অস্বীকার করা হচ্ছে না; কিন্তু তাতে যে ক্ষতিকর দিকগুলো রয়েছে, তা উপকারের তুলনায় অনেক বেশি মারাত্মক। এ আয়াতের সাহায্যে

---

৮. সহীহ আল বুখারী, (কিতাবু ফাদা'ইলিল কুর'আন), হা.নং : ৪৭০৭; নাসাঈ, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং : ৭৯৮৭, ১১৫৫৮; 'আবদুর রযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং : ৫৯৪৩

৯. আল-কুর'আন, ১৬ (সূরা নাহল) ঃ ৬৭

১০. আল-কুর'আন, ২ (আল-বাকারা) ঃ ২১৯

ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, মদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। কেননা যে বস্তু বেশি মারাত্মক, তা অবশ্যই পরিহার যোগ্য, যদিও তা এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ হারাম করা হচ্ছে না।

এ আয়াতদুটি নাযিলের পর মুসলিমদের মধ্যে শুভ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। অনেক মদ্যপাগল লোক তা স্বতঃস্ফুর্তভাবে সম্পূর্ণ পরিহার করেছিল; কিন্তু তখনো তা সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়নি। এ কারণে কেউ কেউ তা পান করে মাতাল অবস্থায় নামাযেও দাঁড়িয়ে যেত। ফলে তারা ঠিকভাবে নামায আদায় করতে পারত না। হয় ঢলে পড়ে যেত, না হয় নামাযে কুর'আনের আয়াত ও দু'আসমূহ ভুল পড়ত। এ সব কারণে তৃতীয় পর্যায়ে অবতীর্ণ হয় ঃ يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة و أنتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون. "হে ঈমানদারগণ, তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের নিকটেও যাবে না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল বোঝতে পার।"[১১] এ আয়াতে নামায আদায়ের সময় মদপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। কিন্তু নামাযের বাইরে অন্যান্য সময় লোকেরা মদ পান করতে থাকে। এভাবে কিছুদিন চলল। ইত্যবসরে হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) নিজের ঘরে একটি যিয়াফতের ব্যবস্থা করেন। তাতে কয়েকজন আনসারী সাহাবী যোগদান করেন। তাদের সামনে উটের মস্তক ভূণা করে পেশ করা হয়। তাঁরা খাওয়া সেরে মদ্যপানে রত হলেন। মদের মাদকতায় মত্ত হয়ে তাঁদের কেউ কেউ হযরত সা'দ (রা)কেই আঘাত করেন। ফলে তাঁর নাকটি ভেঙ্গে যায়। আর এ সময়ই নাযিল হয় মদ্যপান চিরতরে হারাম হবার কুর'আনী ঘোষণা ঃ يأيها الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلوة فهل أنتم منتهون. - "হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, বলিদানের স্থান ও ভাগ্য পরীক্ষার কাজ নিঃসন্দেহে শয়তানী কদর্য কর্মকাণ্ড। অতএব তোমরা তা পরিত্যাগ কর। তাহলেই তোমরা সফলতা লাভ করবে। মনে রেখো, শয়তান এই মদ্যপান ও জুয়া খেলার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরে চরম শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করতে সদা সচেষ্ট। সে তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে ইচ্ছুক। তাহলে তোমরা কি এ কাজ থেকে বিরত থাকবে? "[১২] এ আয়াতগুলোর শেষে فهل أنتم منتهون (অর্থাৎ তোমরা কি বিরত

১১. আল-কুর'আন, ৪ (আন-নিসা) ঃ ৪৩
১২. আল-কুর'আন, ৫ (আল-মা'ইদাহ) ঃ ৯০-৯১

থাকবে ?)-এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার যে জিজ্ঞাসা রয়েছে, তা নাযিল হবার সাথে সাথে সাহাবা কিরাম উত্তরে বলে ওঠলেন, 'আমরা বিরত হলাম, আমরা বিরত হলাম।"[১৩] এ আয়াত নাযিল হবার মাত্র কিছুদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন, "মদ্যপান আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ। তা হারাম হওয়ার নির্দেশ নাযিল হওয়াও অসম্ভব নয়।" তিনি আরো বলেন,. كل مسكر خمر و كل مسكر حرام - "প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী জিনিসই মদ। আর প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী জিনিসই হারাম।"[১৪]

উল্লেখ্য যে, ইসলাম শুধু যে মদ্যপান হারাম করেছে, তা নয়; বরং মদ্য উৎপাদন, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়, পরিবেশন ও উপঢৌকন তথা মদকে কেন্দ্র করে যা কিছু করা হয় বা করার প্রয়োজন হয়, তার সবকিছুকেই সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, إن الذي حرم شربها حرم بيعها و أكل ثمنها. - "যে মহান সত্তা মদ্যপান নিষিদ্ধ করেছেন, তিনিই তার ব্যবসা এবং তা থেকে প্রাপ্ত মূল্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন।"[১৫] তিনি আরো বলেছেন, لعن الله الخمر و شاربها و ساقيها و مبتاعها و بائعها و عاصرها و معتصرها و حاملها و المحمولة إليه. - "আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ বর্ষণ করেছেন মদের ওপর, মদ্যপায়ীর ওপর, মদ্য পরিবেশনকারীর ওপর, তার ক্রয়-বিক্রয়কারীর ওপর, তার উৎপাদনকারী ও যে উৎপাদন করায় তাদের ওপর, তার বহনকারী ও যার নিকট বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তার ওপর।"[১৬]

উপরন্তু, অধিকাংশ ইমামের মতে যে বস্তু অধিক পরিমাণ গ্রহণে নেশার উদ্রেক হয় তার সামান্য পরিমাণ গ্রহণ করাও হারাম- চাই তাতে নেশার উদ্রেক হোক বা না হোক- এবং তা সেবন করা হদ্দযোগ্য অপরাধ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,. ما أسكر كثيره فقليله حرام - "যে জিনিস

---

১৩. সহীহ মুসলিম, হা.নং : ১৭৪৮, ১৭৮৪; ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*, খ.২, পৃ.৯৬

১৪. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল আশরিবাহ), হা.নং : ২০০২, ২০০৩; আবূ দাউদ, (কিতাবুল আশরিবাহ), হা.নং : ৩৬৭৯

১৫. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল মুসাকাত), হা.নং : ১৫৭৯; ইবনু হিব্বান, *আস-সহীহ*, হা.নং : ৪৯৪২; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৪, পৃ.৩

১৬. আবূ দাউদ, (কিতাবুল আশরিবাহ), হা.নং : ৩৬৭৪; বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং : ১০৫৫৯

অধিক পরিমাণ পান করলে নেশা সৃষ্টি করে, তার স্বল্প পরিমাণও হারাম।"[১৭] অন্য হাদীসে তিনি বলেন, كل مسكر حرام ' و ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. - "প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী জিনিসই হারাম। আর যে জিনিস এক পাত্র পান করলে নেশা সৃষ্টি করে তার এক অঞ্জলি পরিমাণও হারাম।"[১৮]

মদ সেবনের শাস্তি ঃ

মাদক সেবন ইসলামী আইনে একটি ফৌজদারী অপরাধরূপে গণ্য। এ জন্য শরী'আত অনুযায়ী শাস্তি দেয়া একান্তই কর্তব্য। তবে পবিত্র কুর'আনে এর কোন শাস্তির কথা উল্লেখ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা)ও সুনির্দিষ্টভাবে এর শাস্তি নির্ধারণ করে যান নি। বিভিন্ন হাদীসে মদ্যপায়ীদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শাস্তি দানের কথা বর্ণিত রয়েছে।[১৯]

সকল ইমামই এ ব্যাপারে একমত যে, মদ্যপায়ীর শাস্তি হল বেত্রাঘাত।[২০] তবে বেত্রাঘাতের সংখ্যা নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। হানাফী ও মালিকীগণের মতে, মদ্যপানের শাস্তি হল আশিটি বেত্রাঘাত।[২১] তাঁদের দলীল

---

১৭. আত্ তিরমিযী, (কিতাবুল আশরিবাহ), হা.নং : ১৮৬৫; ইবনু মাজাহ, (কিতাবুল আশরিবাহ), হা.নং : ৩৩৯১

১৮. আবূ দাউদ, (কিতাবুল আশরিবাহ), হা.নং : ৩৬৮৭; তিরমিযী, (কিতাবুল আশরিবাহ), হা.নং : ১৮৬৬

১৯. এ কারণে ইমাম শাওকানী, ইবনু মুনযির ও আত্ তাবারী প্রমুখ ইমামগণ মনে করেন, মদ্যপানের শাস্তি হদ্দের পর্যায়ভুক্ত নয়; বরং তা'যীরী শাস্তির আওতাভুক্ত। আদালত সুবিবেচনা অনুযায়ী যে কোন শাস্তি দিতে পারবে। ইমাম যুরকানীর মতে, চল্লিশ বেত্রাঘাত সুনির্ধারিত শাস্তি অর্থাৎ হদ্দ। আর এর অতিরিক্ত আশিটি বেত্রাঘাত হল তা'যীরের আওতাভুক্ত, যা বিচারকের রায়ের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু চার মাযহাবের ইমামগণের মতে, মদ্যপানের শাস্তি হদ্দের পর্যায়ভুক্ত। কেননা বহু বর্ণনায় বড় বড় অনেক সাহাবীকেই মদ্যপায়িতার শাস্তির জন্য হদ্দ শব্দটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একসময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এক মদ্যপায়ীকে উপস্থিত করা হল, তখন তিনি লোকদেরকে তাকে মারপিট করতে নির্দেশ দিলেন। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, তখন আমাদের কেউ তাকে হাত দ্বারা আবার কেউ জুতা দ্বারা আবার কেউ পাকানো কাপড় দ্বারা তাকে প্রহার করেছিল। (আবূ দাউদ, (কিতাবুল হুদূদ), হা,নং : ৪৪৭৭) কাতাদাহ বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লাঠি ও জুতা দ্বারা চল্লিশবার প্রহার করেছেন।" (আবূ দাউদ, (কিতাবুল হুদূদ), হা,নং : ৪৪৮৯) আনাস (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুটি লাঠি একত্র করে চল্লিশবার প্রহার করেছেন।" (সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা,নং : ১৭০৬) হযরত আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদ্যপায়িতায় একজোড়া জুতা দ্বারা চল্লিশবার মারেন।"

২০. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৩৭

২১. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৩৭; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৪, পৃ.৩০; আল-কাসানী, *বদা'ই* খ.৫,পৃ.১১৩; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৩, পৃ. ১৪২-৪

হল, সাহাবা কিরামের ইজমা'। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, " রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদক দ্রব্য সেবনের অপরাধে খেজুরের দুটি ডালি দিয়ে চল্লিশটি আঘাত দিতেন। আবূ বাকর (রা)ও তাই করেছেন এবং উমার (রা) মদ্যপায়ীদের শাস্তি নির্ধারণের জন্য সাহাবীগণের নিকট থেকে পরামর্শ চাইলেন। তখন হযরত 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা)বললেন,. اجعله كأخف الحدود ثمانين - "তার শাস্তি হালকাতম হদ্দ-আশিটি বেত্রাঘাতই নির্ধারণ করুন।" তখন হযরত 'উমার (রা) এ দণ্ডই কার্যকর করতে নির্দেশ দিলেন এবং সিরিয়ায় হযরত খালিদ ও আবূ 'উবায়দাহ (রা)কে লিখে এ নির্দেশ দিলেন।[২২] অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত 'আলী (রা) পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, ' نرى أن نضربه ثمانين ' فإنه إذا شرب أسكر ' و إذا أسكر هذى ' و إذا هذى افترى ' و على المفترين ثمانون. - "আমাদের মত হল, আমরা তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করব। কেননা যখন সে মদ সেবন করে তখন মাতাল হয়ে যায়। আর যখন মাতাল হয়, তখন অপলাপ করে। আর যখন সে অপলাপ করে তখন সে অপবাদ দেয়। আর অপবাদদানকারীর শাস্তি হল আশিটি বেত্রাঘাত।"[২৩] এ থেকে জানা যায় যে, আশিটি বেত্রাঘাতের ওপর সাহাবীগণের ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, মদ্যপানের নির্ধারিত শাস্তি হল চল্লিশটি বেত্রাঘাত। তবে বিচারকের ইখতিয়ার রয়েছে, অপরাধীর অবস্থা ও অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে ৮০টি পর্যন্ত বেত্রাঘাত করতে পারবেন। তবে চল্লিশের অতিরিক্ত বেত্রাঘাতসমূহ হদ্দ নয়; তা'যীরের আওতাভুক্ত। তদুপরি কাপড়, খেজুরের ডাল ও জুতা দ্বারাও যদি মারা হয়, তা হলে সেটাও শুদ্ধ হবে।[২৪] তাঁদের দলীল হল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন এবং হযরত আবূ বাকর (রা)ও তা-ই কার্যকর করেছেন। হযরত সা'ইব ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), হযরত আবূ বাকর ও উমার (রা)-এর খিলাফাতের শুরুতে মদ্যপায়ীকে আমরা ধরে আনতাম। আমরা তাকে আমাদের

---

২২. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা,নং : ১৭০৬; বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা,* হা.নং : ১৭৩১০

২৩. আল-কাসানী, *বদা'ই* খ.৫, পৃ.১১৩; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা,* খ.৩, পৃ. ১৪৩

২৪. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী,* খ.৯, পৃ.১৩৭; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম,* খ.৮, পৃ. ৩৭৩; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব,* খ.৪, পৃ.১৬০; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ',* খ.৬, পৃ.১০১; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ,* খ.১০, পৃ.২২৯-২৩০

হাত দিয়ে, আমাদের জুতা দিয়ে ও আমাদের চাদর দিয়ে মারতাম। হযরত উমার (রা)-এর খিলাফাতের শেষ দিকেও চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা হত। তবে যদি সীমালঙ্ঘন বেড়ে যেত, তাহলে আশিটি বেত্রাঘাত করা হত।[২৫] এ থেকে জানা যায়, হযরত 'উমার (রা) সাধারণত চল্লিশটি বেত্রাঘাতই করতেন। তবে অপরাধীর অবস্থা ও অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে কখনো আশিটি বেত্রাঘাতও করেছেন। হযরত 'উসমান (রা)-এর খিলাফাতের সময় জনৈক ব্যক্তি ওয়ালীদ ইবন ওকবার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল যে, সে তাকে মদপান করতে দেখেছে এবং আরেক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, সে তাকে বমন করতে দেখেছে। হযরত 'উসমান (রা) আলী (রা)কে নির্দেশ দিলেন, তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। তাকে চল্লিশটা বেত্রাঘাত করার পর আলী (রা) প্রহারকারীকে থামতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন, আবূ বাকর (রা)ও চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন এবং 'উমার (রা) আশিটি বেত্রাঘাত করেছেন। সবগুলোই সঠিক সুন্নাত এবং এটাই আমার পছন্দনীয়।[২৬]

হযরত মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,.إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم - "মদ্যপানকারীদেরক প্রথম তৃতীয়বার পর্যন্ত শুধু বেত্রাঘাতই কর। চতুর্থবার পান করলে তাদের হত্যা কর।"[২৭]

আমি মনে করি, মদ্যপানের হদ্দ অপরাধীর অবস্থা ও অপরাধের প্রকৃতি অনুযায়ী আদালতের সুবিবেচনায় শাস্তির পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে। তবে ৪০-এর কম এবং ৮০-এর অধিক বর্ধিত করা যাবে না। চতুর্থবার মাদক সেবনের অপরাধের মৃত্যুদণ্ডের যে কথা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে তা নিরেট ভীতিপ্রদর্শন ও সতর্কীকরণের জন্য। বর্ণিত রয়েছে যে, মদ্যপানে অভ্যস্ত নয় এবং দৈহিকভাবে ক্ষীণ ব্যক্তিকে হযরত 'উমার (রা) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করতেন। আর হযরত 'উসমান (রা) অপরাধীর অবস্থা ও অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে কখনো ৪০, আবার কখনো ৮০টি বেত্রাঘাতের শাস্তি কার্যকর করতেন।

---

২৫. সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুল হুদূদ), হা,নং : ৬৩৯৩, ৬৩৯৭

২৬. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা,নং : ১৭০৭

২৭. আবূ দাউদ, (কিতাবুল আশরিবাহ), হা.নং : ৪৪৮২; ইবনু মাজাহ, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ২৫৮৩; তিরমিযী, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং : ১৪৪৪। ইমাম আত্ তিরমিযী বলেন, এ আইনটি প্রথম দিকে কার্যকর ছিল। পরে তা রহিত হয়ে যায়।)

মদ্য উৎপাদন, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়, পরিবেশন, উপঢৌকন এবং আমদানী-রপ্তানিও দণ্ডনীয় অপরাধ। তা'যীরের আওতায় আদালত এ সব কাজের শাস্তি নির্ধারণ করবে।[২৮]

উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে যে কোনভাবে মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে মাতাল অবস্থায় কোন অপরাধ করলে সে শাস্তিযোগ্য হবে, কাজটি চাই সে ইচ্ছায় করুক কিংবা ভুলবশতই করুক। কারণ সে নিজেই তার বিবেক নষ্ট করেছে এবং তা এমন জিনিস দ্বারা করেছে যা গ্রহণ স্বয়ং একটি দণ্ডযোগ্য অপরাধ। অতএব, সতর্ক করার জন্য তাকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করা একান্ত জরুরী। এরূপ অবস্থায় তাকে রেহাই দেয়া হলে দুষ্কৃতিকারীরা মদ্যপান করে অপরাধ কর্ম করতে দুঃসাহসী হয়ে ওঠবে।[২৯]

মদ্যপায়ীর শর্তাবলী ঃ

মদ্যপায়ীদের ওপর শাস্তি কার্যকর করার জন্য তাদের মধ্যে কতিপয় শর্ত পাওয়া যেতে হবে। এগুলো হল-

১. মুসলমান হতে হবে।

কোন অমুসলিমের ওপর মদ্যপানের হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[৩০] তবে দেশীয় আইনে তাদের শাস্তি বিধান করা যাবে।

২. প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থবিবেক সম্পন্ন হতে হবে

কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগলকে মদ্যপানের জন্য হদ্দের আওতায় শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ককে তা'যীরের আওতায় আদালতের সুবিবেচনা অনুযায়ী সংশোধনীমূলক শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

৩. বাকসম্পন্ন হতে হবে

হানাফীগণের মতে মদ্যপায়ীর ওপর হদ্দ কার্যকর করতে হলে তাকে বাকসম্পন্ন হতে হবে। বোবার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। কেননা মদ সেবনের পেছনে তার যথার্থ কারণ কি?- সন্দেহাতীতভাবে তা

---

২৮. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.১৩, পৃ.১৩৭; *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, খ.১, পৃ.৩৩১

২৯. আওদাহ, *আত-তাশরী'উল জিনা'ঈ*,খ.১, পৃ.৫৮৩

৩০. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৪, পৃ.৩১; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৫, পৃ.১১৩। ইমাম হাসান ইবনু যিয়াদ (রহ)-এর মতে, অমুসলিমদের ওপরও হদ্দ কার্যকর করা হবে, যদি তারা মাদক সেবন করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কেননা নেশা করা প্রত্যেক ধর্মেই নিষিদ্ধ। (আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৫, পৃ.১১৩)

জানাটা অসম্ভব। হতে পারে, সে একান্ত চাপে পড়ে কিংবা অনন্যোপায় হয়ে মদ পান করেছে।[৩১]

৪. নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে

কোন সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী কিংবা অমুসলিম দেশের কোন মুসলিম যদি দাবী করে যে, মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা তার জানা ছিল না, তাহলে তার কথা আমলে নেয়া হবে এবং তাকে মদ্যপানের জন্য শাস্তি দেয়া যাবে না। কিন্তু মুসলিম দেশের কোন মুসলিমের এ রূপ দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না।[৩২]

৫. মাদক জেনেই সেবন করা

যদি কেউ এ মনে করে মাদক সেবন করে যে, তা মদ নয়; অন্য বস্তু, তা হলে তার ওপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তদুপরি কেউ মদের সাথে পানি মিশিয়ে সেবন করলে এবং সেখানে পানির অংশ বেশি হলে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না, যদি তাতে নেশার উদ্রেক না হয়। তবে মদের অংশ বেশি হলে হদ্দ কার্যকর করা হবে।[৩৩]

৬. ইচ্ছাকৃতভাবে মদ সেবন করতে হবে

যদি কেউ অনন্যোপায় হয়ে তৃষ্ণা বা ক্ষুধা নিবারণের উদ্দেশ্যে মদ সেবন করে, তার জন্যও হদ্দ প্রযোজ্য হবে না।[৩৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন, فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. - "তবে যে ব্যক্তি অনন্যোপায়; কিন্তু বিদ্রোহী বা অবাধ্যাচারী নয় তার হারাম দ্রব্য গ্রহণে কোন পাপ হবে না। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"[৩৫] অনুরূপভাবে যদি কেউ একান্ত চাপে পড়ে বাধ্য হয়েই মাদক সেবন করে, তার ওপরও হদ্দ কার্যকর করা যাবে না, তবে চাপ প্রয়োগের বিষয়টি প্রমাণিত হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إلا من أكره - "কিন্তু যাকে বল প্রয়োগে বাধ্য করা হয় (সে শাস্তিযোগ্য নয়)।"[৩৬]

---

৩১. ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ.৩৮

৩২. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৪, পৃ.৩২;ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ.৩৮; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১৩৮

৩৩. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৪, পৃ.২৯

৩৪. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৪, পৃ.৩২; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ১৭৮; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৩৮

৩৫. আল-কুর'আন, ২ (আল-বাকারাহ) ঃ ১৭৩; ১৬ (আন-নাহল) ঃ ১১৫

৩৬. আল-কুর'আন, ১৬ (আন-নাহল) ঃ ১০৬

মদ সেবনের প্রমাণ ঃ

নিম্নের যে কোন উপায়ে মদসেবন প্রমাণিত হতে পারে।

১. দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য

দুজন ন্যায়-পরায়ণ মুসলিম পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা মদ সেবন প্রমাণিত হবে। নারীর সাক্ষ্য বা নারী-পুরুষের একত্র সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্যে মতভেদ হলে হদ্দ কার্যকর হবে না। মাতলামী অবস্থায় একজনের সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে। মুখের গন্ধ থাকলে দুজন সাক্ষীই লাগবে।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ) ও আবূ ইউসূফ (রহ) প্রমুখের মতে সাক্ষ্য প্রদানকালে মুখে মদের গন্ধ পাওয়া যাওয়া শর্ত। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (রহ)-এর মতে, তা শর্ত নয়।

উল্লেখ্য যে, অপরাধ সংঘটনের দীর্ঘ দিন পরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তদুপরি সাক্ষ্য মৌলিক হতে হবে। কারো সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে সাক্ষ্য দিলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইবনু 'আবিদীন বলেন, বিচারক সাক্ষীদেরকে জেরা করে জেনে নেবেন যে, অপরাধী কোথায়, কখন ও কোন অবস্থায় মদ সেবন করেছে? 'খামার' বলতে কি বোঝায়, তারা জানে কি না? কারণ এমনও তো হতে পারে, সে একান্ত চাপে পড়ে কিংবা অনন্যোপায় হয়ে মদ সেবন করেছে। এও সম্ভাবনা রয়েছে, সাক্ষীরা দীর্ঘদিন পর সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ ধরনের সম্ভাবনাও রয়েছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি সিরকা পান করেছে, আর সাক্ষীরা মনে করেছে, মদ পান করেছে।[৩৭]

২. মদসেবনকারীর স্বীকারোক্তি

অপরাধী আদালতের সামনে মাদক গ্রহণের একবার স্বীকারোক্তি করলেই অপরাধ প্রমাণিত হবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ)-এর মতে দুবার স্বীকারোক্তি আবশ্যক। অপরাধী তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তি মাতাল অবস্থায় যা কিছু বলে তা নির্ভরযোগ্য নয়। অতএব ঐ অবস্থায় সে মাদক গ্রহণের স্বীকারোক্তি করলে ঐ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[৩৮]

---

৩৭. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৪, পৃ.৩২; আল-বাবরতী, *আল-'ইনায়াহ*, খ.৫, পৃ.৩০২; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ.৪০; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৩৮

৩৮. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৪, পৃ.৩২; আল-বাবরতী, *আল-'ইনায়াহ*, খ.৫, পৃ.৩১৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৩৮-৯

৩. মুখে মদের গন্ধ

হানাফী ও শাফি'ঈগণের মতে, কারো মুখ থেকে মাদকের ঘ্রাণ পাওয়া গেলে তা দ্বারা হদ্দযোগ্য মাদক গ্রহণ প্রমাণিত হবে না।[৩৯] কেননা মুখের গন্ধ মদ্যপান ছাড়া আরো বিভিন্ন কারণেও হতে পারে। যেমন ঢেকুর কিংবা হাঁচির কারণেও মুখ থেকে মাদকের মত দুর্গন্ধ বের হতে পারে। অথবা হতে পারে যে, সে একান্ত চাপে পড়ে কিংবা অনন্যোপায় হয়ে মদ সেবন করেছে অথবা মদ ব্যতীত সে অন্য কোন পানীয় গ্রহণ করেছে; কিন্তু তা থেকে মদের দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। তাই শুধু গন্ধের কারণে হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তবে মালিকীগণের মতে, শাস্তি প্রদানের জন্য গন্ধই যথেষ্ট। মদের মাদকতা চাই থাকুক বা না থাকুক।[৪০] তাঁদের বক্তব্য হল, মাদকের দুর্গন্ধই মদ্য পানের প্রমাণ বিশেষ। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত 'উমার, 'উসমান ও 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) প্রমুখ মুখে মাদকের গন্ধ পেয়েই বিভিন্ন মদ্যপায়ীকে বেত্রাঘাত করেছিলেন।[৪১] এ থেকেও বোঝা যায়, মুখে মাদকের দুর্গন্ধই হদ্দ প্রয়োগের জন্য যথেষ্ট।

৪. মাতলামি

কারো কারো মতে, মাতলামিও[৪২] মদ্যপায়িতার একটি প্রমাণ। তবে অধিকাংশের মতে, তা দ্বারা হদ্দযোগ্য মাদক গ্রহণ প্রমাণিত হবে না, যতক্ষণ না সাক্ষ্যপ্রমাণ কিংবা অপরাধীর স্বীকারোক্তি দ্বারা তা সুপ্রমাণিত হবে। কেননা মাতলামি মাদক গ্রহণ ছাড়া আরো বিভিন্ন কারণে হতে পারে। তাই শুধু মাতলামির কারণে হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[৪৩]

৫. বমি

মালিকীগণের নিকট মাদক বমিও মদ্যপায়িতার একটি প্রমাণ।[৪৪] তাঁদের দলীল

---

৩৯. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ. ১৯৪; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৪, পৃ.৩১; যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ. ১৯৬; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৩৮-৯; আল-হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯. পৃ. ১৭৩

৪০. মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ. ৫২৩; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৩, পৃ. ১৪১-২; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৩৮-৯

৪১. আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৩, পৃ. ১৪১-২; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৩৮-৯

৪২. মাতলামি বলতে ব্যক্তির কথাবার্তার বুঝবার এবং নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলাকে বোঝানো হয়। এটি ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর অভিমত। তবে অন্যান্য ইমামের মতে, আবোল-তাবোল বকাবকি করা, পর-আপন ও ভাল-মন্দ পার্থক্য করতে না পারাকেই মাতলামি বলা হয়। (ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৪০-১)

৪৩. আল-বাবরতী, *আল-ইনায়াহ*, খ.৫, পৃ. ৩০৯-৩১০; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৩৯; আল-হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯. পৃ. ১৭৩

৪৪. আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৩, পৃ. ১৪২; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৩৯

হল, বর্ণিত আছে যে, হযরত 'আলকামা (রা) সাক্ষ্য দেন যে, তিনি হযরত মিকদাদ (রা)কে মদ বমি করতে দেখেছেন। হযরত উমার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি মদ বমি করবে, সে মদ পান করেছে। আর তিনি এ ধরনের বমিকারীকে বেত্রাঘাত করেছেন।[৪৫] ইতঃপূর্বে ওয়ালীদ ইবন 'উকবা সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে যে, তার ব্যাপারে হুমরান সাক্ষ্য দেন যে, সে মদ পান করেছে। অপরজন সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি মদ বমি করতে দেখেছেন। তখন হযরত উসমান (রা) বলেছেন, সে মদ না খেয়ে বমি করতে পারে না।[৪৬] এ বর্ণনাগুলো থেকে জানা যায় যে, বমিও মদ্যপায়িতার একটি প্রমাণ।

তবে হানাফী ও শাফি'ঈগণের মতে, কেউ মাদক বমি করলে তার দ্বারা হদ্দযোগ্য মাদক গ্রহণ প্রমাণিত হবে না। কেননা তা কেবল মাদক গ্রহণের সন্দেহ সৃষ্টি করে মাত্র। আর সন্দেহের ওপর ভিত্তি করেই হদ্দ কার্যকর করার বিধান নেই। তাছাড়া এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, সে একান্ত চাপে পড়ে কিংবা অনন্যোপায় হয়ে মাদক সেবন করেছে অথবা সে জানতো না যে, তা নেশার উদ্রেক করবে।[৪৭]

শাস্তি কার্যকর করার সময় ঃ

রুগ্ন ও মাতাল অবস্থায় হদ্দ কার্যকর করা বিধেয় নয়। মাদকের নেশা কেটে যাওয়ার পর এবং মাদক সেবনকারীর সুস্থ হবার পর হদ্দ কার্যকর করতে হবে। অন্যথায় শাস্তির উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। তদুপরি মাতাল অবস্থায় বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলার কারণে শাস্তির ব্যথাও তার কাছে কম অনুভূত হবে। অধিকাংশ ইমামের মতে, জ্ঞান ফিরে আসার আগে হদ্দ প্রয়োগ করা হলে জ্ঞান ফিরে আসার পর পুনরায় হদ্দ কার্যকর করতে হবে। তবে কারো কারো মতে, পুনরায় হদ্দ প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই।[৪৮] তবে বিশুদ্ধতম অভিমত হল, যদি মনে করা হয় যে, বেত্রাঘাতের ফলে সে যথার্থ শিক্ষাই পেয়েছে, তাহলে পুনরায় হদ্দ প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় পুনরায় হদ্দ প্রয়োগ করতে হবে।[৪৯]

---

৪৫. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৩৯

৪৬. মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং : ১৭০৭

৪৭. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ. ১৯৬; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ. ২৯-৩০; আল-হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯. পৃ. ১৭৩

৪৮. এটা ইমাম শাফি'ঈ ও আহমাদ (রহ) প্রমুখের এক একটি মত হিসেবে বর্ণিত।

৪৯. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৪, পৃ.১৩; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৪০; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ. ১৬০; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.১০, পৃ.১৭

৬. ইসলাম ধর্ম ত্যাগের শাস্তি

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে স্বাধীন বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও চিন্তা শক্তি দান করেছেন, যাতে সে জেনে-বুঝে সত্য ও ন্যায়কে গ্রহণ করতে পারে এবং মিথ্যা ও অন্যায় থেকে বেঁচে থাকতে পারে। পৃথিবীতে বহু ধর্ম রয়েছে। মানুষ নিজ বিচার-বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করে যে কোন ধর্ম গ্রহণ করতে পারে। এ ব্যাপারে ইসলাম কারো স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করে না। তবে একবার ইসলামকে নিজের জীবনের জন্য একমাত্র পবিত্র ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করার পর তাকে কোন রূপ অমর্যাদা করার, এর বিরুদ্ধে বিষোদগার করার কোন অবকাশ ইসলাম দেয় না। ইসলামের দৃষ্টিতে তা জঘন্যতম অপরাধ। অনেক স্বার্থান্বেষী লোক ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্যে আকৃষ্ট না হয়ে কিংবা না জেনে-বুঝে সুনির্দিষ্ট স্বার্থ হাসিলের জন্য ইসলামে অনুপ্রবেশ করতে পারে আর স্বার্থ সিদ্ধির পর কুফরীতে ফিরে যেতে পারে। অনুরূপভাবে কপট ধর্মব্যবসায়ীরা ধর্মের নামে নানা অধর্ম ইসলামে প্রবেশ করিয়ে ইসলামের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে পারে, তার সৌন্দর্যগুলোকে ম্লান করে দিতে পারে। এ কারণে সত্যিকার দীনকে রক্ষা এবং তার গতিশীলতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে ইসলাম ধর্মান্তরের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে।

ধর্মান্তরের সংজ্ঞা ঃ

ধর্মান্তর বা ধর্মত্যাগকে আরবীতে ردة বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ যে কোন অবস্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় বালিগ ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন মুসলিমের স্বেচ্ছায় ইসলাম থেকে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে রিদ্দা বলা হয়।[১] উল্লেখ্য যে, এ প্রত্যাবর্তন সুস্পষ্ট ঘোষণাও দিয়ে হতে পারে, কোন কুফরী বক্তব্য উচ্চারণ করেও হতে পারে এবং কোন কুফরী কাজ সম্পাদন করেও হতে পারে।

ধর্মান্তরের শর্তাবলী

১. ধর্মান্তরকারীকে মুকাল্লাফ (প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন) হতে হবে।

ধর্মান্তরকারীকে প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হতে হবে। কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক

---

১. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ১৩৪; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ. ১২৯; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৬

বালক কিংবা পাগল[২] কোন সুস্পষ্ট কুফরী বাক্য উচ্চারণ করলে বা কাজ করলে তাকে ধর্মত্যাগী বলা যাবে না। অনুরূপভাবে ঘুমের নেশায় আচ্ছন্ন ও বেহুঁশ লোকদেরকে তাদের কোন কথা বা কাজের জন্যও ধর্মত্যাগী বলা যাবে না।[৩]

তবে মাতাল ও সাবালকের ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীগণের মতে, মাতালের কুফরী বাক্য বা কাজ ধর্মত্যাগ রূপে গণ্য হবে না। এ জন্য তার ওপর ধর্মত্যাগের শাস্তি বর্তাবে না। কেননা ধর্মত্যাগ মূলত বিশ্বাসের সাথে জড়িত। মাতাল ব্যক্তি অনেক সময় এমন কথা বলে থাকে, যে কথার ওপর তার বিশ্বাস নেই।[৪] তবে অন্যান্য ইমামগণের মতে, মাতালের কুফরী বাক্য বা কাজ ধর্মত্যাগ রূপে গণ্য হবে। কেননা ইসলামী আইনে মাতাল ব্যক্তিকেও শরী'আতের আদেশাবলী পালনে বাধ্য মনে করা হয়। এ কারণে সে কারো ওপর যিনার অপবাদ দিলে তার ওপর মিথ্যা অপবাদ দানের হদ্দ কার্যকর করা হয় এবং সে স্ত্রীকে তালাক দিলে তাও গৃহীত হয়। এ কারণেই তার কুফরীকেও ধর্মত্যাগ রূপে গণ্য করা হবে।[৫]

অধিকাংশ ইমামের মতে, অপ্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিমান বালককেও তার কুফরীর জন্য ধর্মত্যাগী আখ্যা দেয়া যাবে। তবে শাফি'ঈগণের মতে, যেহেতু তারা আজো শরী'আতের নির্দেশাদি পালনে বাধ্য নয়, তাই কোন কুফরীর জন্য তাদেরকে ধর্মত্যাগী আখ্যা দেয়া সমীচীন নয়। তবে সকল ইমামই এ বিষয়ে এক মত যে, তাদের কুফরীর জন্য তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না; বরং মারধর কিংবা ধমক বা বন্দী করে তাদেরকে ইসলামী জীবন ধারায় ফিরে আসতে বাধ্য করা হবে। হাম্বলীগণের মতে, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। এর পর তাকে তাওবা করতে বলা হবে। যদি সে তাওবা না করে কুফরীতে অটল থাকে, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।[৬]

---

২. তবে যে ব্যক্তি কখনো পাগল হয়, আবার কখনো সুস্থ হয়ে ওঠে, তাহলে হুঁশ অবস্থায় তার কুফরীকে ধর্মত্যাগ রূপে গণ্য করা হবে আর পাগল অবস্থায় কুফরীকে ধর্মত্যাগ রূপ গণ্য করা হবে না। (আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ১৩৪)

৩. আল-বহুতী, *কশশাফ*, খ.৬, পৃ. ১৭৫; আর-রুহায়বানী, *মতালিব..*, খ.৬, পৃ.২৮৯

৪. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.১০, পৃ.১২৩; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ১৩৪

৫. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ.১৭২, খ.৮, পৃ.৩৬৭; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৩১-২; আল-বহুতী, *কশশাফ*, খ.৬, পৃ. ১৭৬; আল-আনসারী, *আসনাল মতালিব..*, খ.৪, পৃ.১২০

৬. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.১০, পৃ.১২০; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ.১৭২; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.২৪; আর-রুহায়বানী, *মতালিব..*, খ.৬, পৃ.২৯০

২. স্বেচ্ছায় কুফরী করা

কারো প্রবল চাপ ছাড়াই স্বেচ্ছায় সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হলেই তা ধর্মত্যাগ বলে ধর্তব্য হবে। অতএব কেউ প্রবল চাপের মুখে একান্ত বাধ্য হয়ে কোন কুফরী বাক্য উচ্চারণ করলে কিংবা কুফরী কাজ করলেই ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে না, যে যাবত তার অন্তঃকরণে পূর্ণ ঈমান বিদ্যমান থাকবে।[৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন, إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان. - "তবে সে ব্যক্তি ছাড়া যাকে জোর প্রয়োগ করা হয়েছে; কিন্তু তার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ থাকে।"[৮]

৩. সত্যিকার অর্থে মুসলিম থাকার প্রমাণ থাকা

ধর্মান্তরের জন্য সত্যিকার অর্থে ইসলাম থেকে কুফরীতে ফিরে যাবার প্রমাণ পাওয়া যেতে হবে। অতএব ভয়ে বা একান্তে চাপে পড়ে কিংবা আর্থিক সংকটে পড়ে কেউ মুসলিম হয়ে পরবর্তীতে ইসলাম ত্যাগ করে কুফরীতে চলে গেলে তাকে ধর্মত্যাগ করেছে বলে আখ্যা দেয়া যাবে না এবং এ জন্য শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করা যাবে না, যদি তার কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৯]

অনুরূপভাবে যে বংশীয় কিংবা দেশীয় সূত্র ধরে মুসলিম নামে পরিচিতি লাভ করেছে, সে যদি বালিগ হওয়ার পর প্রকৃত অর্থেই ইসলামের বিধি-বিধান মেনে নিয়েছে- তার প্রমাণ পাওয়া না যায়, তা হলেও তাকে কুফরীর জন্য হত্যা করা যাবে না; বরং বন্দী করে রাখা হবে, যে যাবত না সে প্রকৃত ইসলামে ফিরে আসে।[১০]

ধর্মান্তরের রুকন (মূল উপাদান) ঃ

ঈমান ও ইসলামের পর স্পষ্ট কুফরী বাক্য উচ্চারণ করা কিংবা এমন কথা বলা বা কাজ করা যা স্পষ্টরূপে কুফরী বোঝায়।[১১]

---

৭. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.১০, পৃ.১২৩, খ.২৪, পৃ.৪৫-৬,১২৯-৩০; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৩০

৮. আল-কুর'আন, ১৬ (সূরা আন-নাহল) ঃ ১০৬

৯. আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৫, পৃ.২৮৩
তবে মালিকী স্কুলের আশহব ও ইবনু হাবীব (রহ) প্রমুখ ইমামের দৃষ্টিতে- এ ধরনের ব্যক্তির জন্যও ধর্মত্যাগের বিধান প্রযোজ্য হবে। তবে ইমাম আসবগ আল-মালিকীর মতে, তাকে পুনরায় ইসলামে ফিরে আসতে বলা হবে। এজন্য তাকে একটি যৌক্তিক সময় পর্যন্ত কয়েদ করে রাখা হবে এবং প্রহার করা হবে। যদি সে ফিরে আসে তা হলে ভাল। অন্যথায় তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। (আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৫, পৃ.২৮৩)

১০. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.১০, পৃ.১২৩

১১. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.১৩৪; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.১২৯; আল-বুজায়রমী, *আত-তাজরীদ*, খ.৪, পৃ. ২০৫-৬

ধর্মান্তরের প্রমাণ ঃ

ধর্মান্তর দু'ভাবে প্রমাণ করা যাবে।

১. স্বীকারোক্তি

ধর্মান্তরকারীর নিজের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ধর্মান্তর প্রমাণ করা যাবে। যদি সে স্বীকার করে যে, সে কুফরী করেছে, তা হলেই তার ওপর ধর্মান্তরের বিধান কার্যকর করা হবে।

২. সাক্ষ্য-প্রমাণ

দুজন ন্যায়পরায়ণ[১২] ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারাও ধর্মান্তর প্রমাণ করা যাবে। সাক্ষীদেরকে অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা বা কাজের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে হবে, যাতে সন্দেহজনক কোন কথা বা কাজের জন্য শাস্তি দেয়া না হয়।

স্বীকারোক্তি বা সাক্ষ্য দ্বারা ধর্মান্তর প্রমাণিত হবার পর তাকে তাওবা করতে বলা হবে। যদি সে তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসে, তা হলে তো ভালই। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষীদের বক্তব্য অস্বীকার করে, তা হলে তার এ অস্বীকার তাওবা হিসেবে এবং নিজের অবস্থান থেকে প্রত্যাবর্তন রূপে গণ্য করা হবে। আর এ জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। এটা হানাফীগণের অভিমত।[১৩] তবে অন্যান্য অধিকাংশ ইমামের মতে, এ ক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ফায়সালা করা হবে। তার অস্বীকার আমলে নেয়া যাবে না; বরং তাওবা করে একজন সত্যিকার মুসলিমরূপে জীবনাচার শুরু করলেই সে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেতে পারে।[১৪]

মুরতাদের শাস্তি ঃ

ধর্মান্তর প্রমাণিত হবার পর যদি ধর্মান্তরকারী- পুরষ হোক বা নারী- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাওবাহ করে ঈমানের পথে ফিরে না আসে, তাহলে তার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড।[১৫] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, من بدل

---

১২. ইমাম হাসান ইবন যিয়াদের মতে, চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন। (ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৬, পৃ.৯৮; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.১৩৬)

১৩. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৬, পৃ.৯৮; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.১৩৬

১৪. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.২৭-৮; আর-রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ.৯, পৃ.৯৪-৫

১৫. বর্তমানে অনেক অমুসলিম পণ্ডিত ও তাদের ভাবশিষ্য মুসলিম বুদ্ধিজীবীরাও ধর্মান্তরের এ শাস্তিকে মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য হুমকি

دينه فاقتلوه. - "যে তার ধর্মকে পরিবর্তন করল, তাকে তোমরা হত্যা কর।"[১৬] তবে হানাফীগণের মতে, কোন মহিলাকে ধর্মত্যাগ করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না; বরং কারাগারে বন্দী করে রাখা হবে, যে যাবত না সে তাওবা করে ঈমানের পথে ফিরে আসে।[১৭]

মুরতাদকে হত্যা করার পর তাকে গোসল দেয়া যাবে না, তার নামাযে জানাযাও পড়া হবে না এবং মুসলিমদের কবরস্থানে দাফনও করা যাবে না।[১৮]

বারংবার ধর্মত্যাগের শাস্তি ঃ

বারংবার ধর্মত্যাগ করে পুনঃ পুনঃ তাওবা করলেও শাফি'ঈ ও হানাফীগণের মতে তা গ্রহণযোগ্য হবে। তাঁদের দৃষ্টিতে তাওবা পাওয়া গেলে ধর্মত্যাগের জন্য- যতবারই হোক- মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,.قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف - "কাফিরদেরকে বলুন, তারা যদি (শির্ক থেকে) বিরত থাকে, তাহলে তাদের অতীতের সকল পাপই মোচন করে দেয়া হবে।"[১৯] তাঁরা এ কথাও বলেছেন, দ্বিতীয়বার ধর্মত্যাগের পর তাওবা করলে তাকে তা'যীরের আওতায় প্রহার কিংবা কারাদণ্ড দেয়া হবে, হত্যা করা হবে না।[২০] ইবনু 'আবিদীন বলেন, দ্বিতীয়বার ধর্মান্তর করার পর তাওবা করলে প্রহারের পর তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। যদি ফিরে তৃতীয়বারও ধর্মত্যাগ করে তা হলে এবারে তাকে ভীষণ বেদনাদায়ক প্রহার করা

মনে করে। তাদের মতে, বর্তমান সভ্য, সংস্কৃতিমনস্ক ও রুচিশীল সমাজে এ আইন চালু হতে পারে না। তাদের কথার উত্তরে সংক্ষেপে এতটুকু বলতে চাই যে, বর্তমানে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, হংকং, বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স প্রভৃতি উন্নত দেশেই তাদের নিজ নিজ ধর্মের সুরক্ষার জন্য সংবিধানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবস্থা রয়েছে। যদি ধর্মান্তরের কিংবা ধর্মকে কটাক্ষ করার শাস্তি সভ্যতা বিরোধী হত, তা হলে তারা কেনই বা তাদের সংবিধানে এ আইন রচনা করেছে। বর্তমান সভ্য জগতে তারাই হল সভ্যতার ধ্বজাধারী। অধিকন্তু, এ শাস্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিরোধী নয়; বরং সভ্যতাকে মহিমান্বিত করণ, মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ পূরণ এবং সুস্থ ও পবিত্র সমাজ বিনির্মাণের জন্য এর প্রয়োজন অপরিসীম।

১৬. সহীহ্ বুখারী, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ২৮৫৪, (কিতাবু ইস্তিতাবাতিল মুরতাদ্দীন), হা.নং : ৬৫২৪

১৭. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.১০, পৃ.১০৯; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ১৩৪-৫; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.১,পৃ. ২৯৪; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৬

১৮. আল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাহ*, খ.২,পৃ.২৭৬; আল-বুজায়রমী, *তুহফাতুল হাবীব*, খ.৪, পৃ.২৪২; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ২২, পৃ. ১৯৫

১৯. আল-কুর'আন, ৮ (সূরা আল-আনফাল) : ৩৮

২০. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.১০, পৃ.৯৯-১০০; যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩. পৃ. ২৭৪; আল-আনসারী, *আল-গুরার..*,খ.৫, পৃ.৭৮

হবে এবং বন্দী করে রাখা হবে, যে যাবত না তার খাঁটি তাওবার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এভাবে যতবারই সে ধর্মত্যাগ করবে, ততবারই এ রূপ আচরণ করা হবে।[২১]

হাম্বলীগণের মতে, বারংবার ধর্মত্যাগকারীদের তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। হানাফীগণেরও এ ধরনের একটি মত রয়েছে। তাছাড়া ইমাম মালিক (রহ)-এর দিকেও এ মতের নিসবত করা হয়।[২২] তাঁদের দলীল হল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم و لا ليهديهم سبيلا. - "নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, অতঃপর কুফরী করেছে, অতঃপর ঈমান এনেছে, অতঃপর কুফরীর মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমাও করবেন না এবং তাদেরকে পথও দেখাবেন না।"[২৩] তিনি আরো বলেছেন, إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. - "নিশ্চয় যারা ঈমান আনয়নের পর কুফরী করেছে, অতঃপর কুফরী আরো বাড়িয়ে দিয়েছে, তাদের তাওবা কখনোই গ্রহণ করা হবে না।"[২৪] বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা)-এর কাছে জনৈক মুরতাদকে আনার পর তিনি বললেন, তোমাকে আরো এক বার আনা হয়েছিল। আমি তো মনে করেছিলাম, তুমি সত্যি সত্যিই তাওবা করেছিলে। এখন তো দেখি, তুমি ফিরে আবারো ধর্মত্যাগ করলে। এ বলে তিনি তাকে হত্যা করলেন।[২৫] তদুপরি বারংবার ধর্মত্যাগ থেকে বোঝা যায় যে, তার আকীদা নষ্ট হয়ে গেছে এবং ইসলামের প্রতি তার কোন শ্রদ্ধা নেই। অতএব, তাকে হত্যাই করতে হবে।

স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঃ

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ ধর্মান্তর করলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,.لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن - "তারা (কাফির মহিলারা) তাদের (মুসলিম পুরুষদের) জন্য হালাল নয় এবং তারা (মুসলিম

---

২১. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ. ২২৫-৬

২২. আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৬, পৃ.১৭৭; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩. পৃ. ২৭৪; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৮

২৩. আল-কুর'আন, ৪ (সূরা আন-নিসা) : ১৩৭

২৪. আল-কুর'আন, ৩ (সূরা আল-'ইমরান) : ৯০

২৫. ইবনু মুফলিহ, *আল-মুবদি'*, খ.৯, পৃ.১৭৯; আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৬, পৃ.১৭৭

পুরুষরা) তাদের (কাফির মহিলাদের) জন্য হালাল নয়।"[২৬] হানাফী ও মালিকীগণের মতে, এ সম্পর্ক তাৎক্ষণিক ছিন্ন হয়ে যাবে। কেননা মুসলিম বিবাহ আইনে ধর্মান্তর বিয়ে-আকদের পরিপন্থী। তাই ধর্মত্যাগের সাথে সাথে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে।[২৭] যদি মুরতাদ স্ত্রীর 'ইদ্দত পালন অবস্থায় তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসে, তাহলে তাদের বৈবাহিক জীবন শুরু করতে হলে নতুন করে আকদ সম্পন্ন করা ও মাহর নির্ধারণ করা জরুরী।[২৮]

পক্ষান্তরে শাফি'ঈ ও হাম্বলীমতাবলম্বী ইমামগণের মতে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক তাৎক্ষণিক ছিন্ন হবে না; বরং স্ত্রীর 'ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদের সম্পর্ক বহাল থাকবে। অতএব, তাঁদের দৃষ্টিতে যদি মুরতাদ তাওবা করে স্ত্রীর 'ইদ্দত পালন অবস্থায় ইসলামে ফিরে আসে, তাহলে তাদের পূর্বের বৈবাহিক জীবনই বহাল থাকবে। যদি তাওবা করে ইসলামে ফিরে না আসে, তা হলেই বৈবাহিক সম্পর্ক 'ইদ্দত শেষ হওয়ার পর থেকে ছিন্ন হয়ে যাবে। 'ইদ্দত গণনা ধর্মান্তরের পর থেকে শুরু হবে।[২৯]

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্ত্রী ধর্মত্যাগ করলে তাকে নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ এবং আকদ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা যেতে পারে, যদি স্বামী তা চায়। যদি সে তাওবা করে ফিরে আসে তা হলে স্বামীকে বাদ দিয়ে অন্যকে বিয়ে করা তার জন্য জায়িয হবে না এবং কাযী যৎসামান্য মাহর নির্ধারণ করে নতুনভাবে আকদ করিয়ে দেবেন।[৩০]

উত্তরাধিকার স্বত্ব থেকে বঞ্চিতকরণ ঃ

ইসলামী উত্তরাধিকারের নিয়ম মতে, মৃত ব্যক্তি ও তার আত্মীয়-স্বজনরা একই ধর্মাবলম্বী হলে তারা তার ওয়ারিছ হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

২৬. আল-কুর'আন, ৬০ (সূরা আল-মুমতাহিনা) ঃ ১০

২৭. এর জন্য না তালাকের প্রয়োজন হবে, না কাযীর ফায়সালার। এটা হানাফীগণের অভিমত। কতিপয় মালিকী ইমাম ধর্মান্তরের কারণে সংঘটিত বিচ্ছেদকে এক তালিকে বা'ইন রূপে গণ্য করেন। হানাফীগণের মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদও এ মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, 'ইদ্দত অবস্থায় তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসলে নতুন করে আকদ করার প্রয়োজন নেই। (মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.২, পৃ. ২২৬-৭; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.২. পৃ. ৩৩৭-৮; খ.৭, পৃ. ১৩৬)

২৮. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৫,পৃ.৪৮-৫১;আল-কাসানী,*বদা'ই*, খ.২.পৃ. ৩৩৭-৮; খ.৭, পৃ.১৩৬

২৯. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ.১৭৩; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.৮, পৃ.২১৫-৬; ইবনু কুদামাহ,*আল-মুগনী*, খ.৬, পৃ.৪২৯, খ.৭, পৃ.১৩৩

৩০. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৩, পৃ.৪২৮-৩০

সাল্লাম) বলেছেন,.. لا يرث الكافر المسلم ' و لا يرث المسلم الكافر - "কাফির মুসলিমের ওয়ারিছ হবে না এবং মুসলিমও কাফিরের ওয়ারিছ হবে না।"[৩১] অতএব ধর্মত্যাগী যেহেতু মুসলিম নয়, তাই সে তার মুসলিম নিকটাত্মীয়ের ওয়ারিছ হতে পারবে না। অনুরূপভাবে তার নতুন ধর্মের কিংবা অন্য ধর্মাবলম্বী কোন আত্মীয়েরও সে ওয়ারিছ হবে না। কারণ মুরতাদের কোন ধর্ম নেই।[৩২]

সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ ঃ

অধিকাংশ ইমামের মতে, ধর্মত্যাগের ফলে ধন-সম্পদের ওপর মুরতাদের মালিকানা স্বত্ব নষ্ট হবে না বটে; তবে যেহেতু সে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য হয়েছে, তাই তার কোন অর্থনৈতিক চুক্তি ও লেনদেন বিশুদ্ধ হবে না। রাষ্ট্র তার যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করবে। যদি সে তাওবাহ্ করে ইসলামে ফিরে আসে, তা হলে তার সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। যদি সে মুরতাদ অবস্থায় কোন অর্থনৈতিক লেনদেন করে, তা হলে তা মুলতবী হয়ে থাকবে। যদি সে ইসলামে ফিরে আসে তাহলে তার কৃত লেনদেন কার্যকর করা হবে আর যদি হত্যা করা হয় কিংবা মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার কৃত লেনদেন বাতিল বলে গণ্য হবে।[৩৩] তবে হানাফীগণের মতে, মহিলার ধর্মান্তরের শাস্তি যেহেতু মৃত্যুদণ্ড নয়; তাই সম্পদের ওপর তার মালিকানা স্বত্বও অটুট থাকবে এবং তার যে কোন অর্থনৈতিক লেনদেনও বিশুদ্ধ হবে।[৩৪]

মুরতাদের হত্যা বা মারা যাওয়ার পর তার পরিত্যক্ত ধন-সম্পদের স্বত্বাধিকারী কে হবে- তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে তিন ধরনের মত পরিলক্ষিত হয়।

১. তার পরিত্যক্ত সমস্ত ধন-সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে শত্রুসম্পদ হিসেবে জমা হবে। এটি মালিকী, শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের অভিমত।[৩৫]

---

৩১. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং : ২১৮১৪; বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং : ১২০০৪, ১২০০৫

৩২. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৬, পৃ.২৪৮; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.৩, পৃ.২৫

৩৩. ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ)-এর মতে, ধর্মত্যাগের ফলে যেহেতু ধন-সম্পদের ওপর মুরতাদের মালিকানা স্বত্ব নষ্ট হয় না, তাই মুরতাদ অবস্থায় তার অর্থনৈতিক লেনদেন বিশুদ্ধ হবে। আবূ বাকর আল-হাম্বলীর মতে, ধর্মত্যাগের ফলে ধন-সম্পদের ওপর মুরতাদের মালিকানা স্বত্ব নষ্ট হয়ে যায়। অতএব তার ধন-সম্পদের ওপর যেহেতু তার কোন মালিকানা স্বত্ব নেই, তাই তার সম্পদের ওপর তার কোন অধিকার চর্চা বৈধ হবে না। (আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.১৩৬-৭; আল-বাবরতী, *আল-'ইনায়াহ*, খ.৬, পৃ.৭৪; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৯-২০; আর-রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ.৭, পৃ.৪২০-১)

৩৪. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.১৩৭

৩৫. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৬, পৃ.২৫০, খ.৯, পৃ.১৯; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০,

২. তার যাবতীয় পরিত্যক্ত সম্পদ তার মুসলিম ওয়ারিছদেরদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। এটি ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) প্রমুখের অভিমত। কেননা মীরাছের আইনে ধর্মত্যাগ করার পর থেকে তাকে মৃত ব্যক্তির ন্যায় গণ্য করা হয়।

৩. মুসলিম থাকাকালে তার উপার্জিত যাবতীয় সম্পদ তার মুসলিম ওয়ারিছদের মধ্যে বন্টন করা হবে এবং মুরতাদ অবস্থায় উপার্জিত যাবতীয় সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর অভিমত।[৩৬]

অভিভাবকত্বের যোগ্যতা হরণঃ

মুরতাদের অন্যের ওপর অভিভাবকত্বের অধিকার থাকবে না। সুতরাং সে তার কন্যাদের ও ছোট ছেলেদের বিবাহের 'আকদের অভিভাবক হতে পারবে না। যদি সে আকদ করায়, তা হলে সে 'আকদ বাতিল বলে গণ্য হবে।[৩৭]

ধর্মান্তরের শাস্তি কার্যকর করার শর্তাবলী ঃ

ধর্মান্তরের শাস্তি কার্যকর করার জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো পাওয়া যেতে হবে।

১. পুরুষ হওয়া

হানাফীগণের মতে, ধর্মান্তরের শাস্তি- মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য ধর্মান্তরকারীকে পুরুষ হতে হবে। ধর্মান্তরের জন্য নারীকে হত্যা করা যাবে না; বরং তাকে বন্দী করে রাখা হবে, যে যাবত না সে তাওবা করে। তবে অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের মতে, পুরুষদের মত ধর্মত্যাগী নারীদের জন্যও একই বিধান প্রযোজ্য হবে।[৩৮] তাঁদের দলীল হল ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, من بدل دينه فاقتلوه. - "যে তার ধর্মকে পরিবর্তন করল, তাকে তোমরা হত্যা কর।"[৩৯] এ হাদীসে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নি। অতএব, ধর্মত্যাগ করার ক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য যে বিধান

পৃ.৩৩৯; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৬, পৃ.২৫০

৩৬. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৩০, পৃ.৩৭; আল-কাসানী,*বদা'ই*, খ.৭, পৃ.১৩৬-৭; ইবনুল হুমাম. *ফাতহুল কাদীর*, খ.৬, পৃ.৭৫-৬

৩৭. আল-কাসানী,*বদা'ই*, খ.২, পৃ.২৩৯

৩৮. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.১০, পৃ.১০৯; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭,পৃ. ১৩৪-৫; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.১, পৃ. ২৯৪; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.১৬

৩৯. সহীহ বুখারী, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং : ২৮৫৪, (কিতাবু ইস্‌তিতাবাতিল মুরতাদ্দীন), হা.নং : ৬৫২৪

প্রযোজ্য হবে, নারীদের জন্যও সে একই বিধান প্রযোজ্য হবে। হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ উম্মু রুমান (বা মারওয়ান) নাম্নী জনৈকা মহিলার ইসলাম ধর্মত্যাগ করার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দান করেন, প্রথমে তাকে ইসলামের প্রতি পুনরায় আহ্বান জানাতে হবে। যদি সে তাওবা করে ফিরে আসে, তা হলে তো ভালই। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে।"[৪০] তবে মহিলা যদি যোদ্ধা কিংবা বুদ্ধিজীবী হয়, তা হলে ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুসারে তাকে হত্যা করা যাবে। তবে হানাফীগণের মতে, এ হত্যা তার ধর্মত্যাগের কারণে নয়; বরং বিপর্যয় সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালানোর কারণেই।[৪১]

২. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া

ধর্মান্তরের শাস্তি কার্যকর করার জন্য ধর্মান্তরকারীকে প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। যে সব ইমাম অপ্রাপ্ত বয়স্কের ধর্মান্তরকে হদ্দযোগ্য ধর্মত্যাগ রূপে গণ্য করেন, তাঁদের দৃষ্টিতেও এ শাস্তি কার্যকর করা যাবে না, যে যাবত না সে বালিগ হবে।[৪২] ইমাম শাফি'ঈ (রহ) বলেন, বালিগ হবার আগে কেউ ঈমান এনে আবার বালিগ হবার আগেই কিংবা বালিগ হবার পর ধর্মত্যাগ করল, অতঃপর বালিগ হবার পর তাওবাও করল না, তাকে হত্যা করা যাবে না। কারণ, সে বালিগ অবস্থায় ঈমানদার ছিল না। তবে তাকে পুনরায় ঈমানের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করা হবে।[৪৩]

৩. সুস্থ বিবেকসম্পন্ন হওয়া

ধর্মান্তরের শাস্তি কার্যকর করার জন্য ধর্মান্তরকারীকে সুস্থ বিবেকসম্পন্ন হতে হবে।

৪. স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর করা

ধর্মান্তরের শাস্তি কার্যকর করার জন্য ধর্মান্তরকারীকে কারো কোন জবরদস্তি ছাড়া স্বেচ্ছায় ধর্মত্যাগ করতে হবে।

---

৪০. আল বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, হা.নং : ১৬৬৪৩; দারুকুতনী, আস-সুনান, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং : ১২২; ইবনু হাজর, তালখীছ, (কিতাবুর রিদ্দাহ), হা.নং :১৭৪

৪১. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.১০, পৃ.১০৯-১০

৪২. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.২৪; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.১০, পৃ.১২৩; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ.২৯২-৩

৪৩. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ.১৭২

৫. তাওবার সুযোগ দান করা

ধর্মান্তরের শাস্তি কার্যকর করার জন্য ধর্মান্তরকারীকে তাওবার জন্য তিন দিন[৪৪] সুযোগ দিতে হবে। এটা মালিকী ও হাম্বলীগণের মতে ওয়াজিব। তাঁদের বক্তব্য হল ঃ হয়ত তার কাছে ইসলামের কোন বিষয়ে সন্দেহ ছিল। তাই তা নিরসন করা প্রয়োজন। হানাফীগণের মতে, এটা মুস্তাহাব। কেননা ইসলামের দা'ওয়াত তো তার কাছে আগেই পৌঁছে গেছে এবং সে বুঝে শুনেই ইসলাম গ্রহণ করেছে কিংবা মেনে নিয়েছে।[৪৫] বর্ণিত আছে, জনৈক ধর্মত্যাগীকে তাওবার সুযোগ না দিয়ে হত্যা করার খবর শুনে হযরত 'উমার (রা) ভীষণ দুঃখিত হলেন এবং বললেন, لأستتبته ثلثة أيام فإن تاب و إلا قتلته. - "আমি অবশ্যই তাকে তাওবার জন্য তিন দিনের সুযোগ দিতাম। যদি সে তাওবা করত তা তো ভালই হত। তা না হলেই আমি তাকে হত্যা করতাম।"[৪৬] তাছাড়া ইতঃপূর্বে বর্ণিত হযরত জাবির (রা)-এর হাদীস থেকেও জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মু রুমান নাম্নী জনৈকা ধর্মত্যাগকারিণী মহিলাকে তাওবার সুযোগ দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে, তাওবার সুযোগ না দিয়ে ধর্মত্যাগীকে হত্যা করা হলে হত্যাকারী অপরাধী সাব্যস্ত হবে। এ জন্য হত্যাকারীকে তা'যীরের আওতায় সাধারণ শাস্তি দেয়া যাবে; কিসাস বা বড় ধরনের শাস্তি দেয়া যাবে না।[৪৭]

৬. ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়ার সম্ভাবনা না থাকা

ধর্মান্তরের শাস্তি কার্যকর করার জন্য ধর্মান্তরকারীর বক্তব্য বা কাজ এমন হতে হবে, যা সুস্পষ্ট রূপে কুফরী বোঝায়। যদি তার বক্তব্যে কিংবা কাজে ভিন্ন কোন ব্যাখার সম্ভাবনা থাকে এবং সে নিজেও যদি তা বলে, তা হলে তাকে এ কথা বা কাজের জন্য ধর্মত্যাগ করেছে- বলা যাবে না এবং এর জন্য শাস্তিও দেয়া যাবে না। অনুরূপভাবে আবেগের আতিশয্যে কারো মুখ দিয়ে ভুলক্রমে বা অসতর্কতামূলকভাবে হঠাৎ কোন কুফরী বাক্য উচ্চারিত হলে তাও ধর্মত্যাগ

---

৪৪. শাফি'ঈগণের মতে, তাওবার জন্য তাৎক্ষণিক সুযোগ দেয়া হবে। তিন দিনের ফুরসত দেয়া যাবে না। (আল-জুমাল, ফুতুহাত.., খ.৫, পৃ. ১২৬; আর-রামালী, নিহায়াতুল মুহতাজ, খ.৭, পৃ.৪১৯)

৪৫. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.১০, পৃ.৯৮-৯; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.১৩৪-৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*,খ.৯, পৃ.১৭-৮

৪৬. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.১০, পৃ.৯৯

৪৭. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*,খ.৩, পৃ.২৮৪

রূপে গণ্য হবে না। যেমন- কেউ আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাইল, "হে আল্লাহ! তুমি আমার রব, আর আমি তোমার গোলাম"; কিন্তু তার মুখ দিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে বের হয়ে গেল- "তুমি আমার গোলাম, আর আমি তোমার রব।"[৪৮]

মুরতাদ ও কাফির ফাতওয়া দেবার ব্যাপারে সতকর্তা অবলম্বন ঃ

কোন মুসলিমকে কাফির ফাতওয়া দেয়ার ব্যাপারে যথাসম্ভব বিরত থাকা প্রয়োজন। সাধারণভাবে কুফরী বোঝায় এ ধরনের মুসলিমের যে কোন কথা বা কাজের কোন রূপ একটি সঠিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানো গেলে অথবা তা কুফরী হবার ব্যাপারে সামান্যতম মতভেদ থাকলে সেটিই গ্রহণ করতে হবে। কেননা প্রত্যেক মুসলিম সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করাই হল ইসলামের বিধান। তদুপরি ধর্মান্তরের শাস্তি যেহেতু চরম, তাই তার অপরাধও চরম হতে হবে এবং তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে। অতএব, যে কথা বা কাজে কুফরী হবার ব্যাপারে সামান্যটুকুন সন্দেহ থাকবে, তার জন্য ধর্মান্তরের চরম শাস্তি প্রযোজ্য হতে পারে না। হানাফীগণের মতে, কোন বিষয়ে যদি কাফির বলার মত অনেক উপলক্ষ পাওয়া যায়; কিন্তু কাফির না বলার মত তাতে যদি একটি উপলক্ষও থাকে, তা হলে এর জন্য কাউকে কাফির রূপে ফাতওয়া দেয়া সমীচীন নয়।

তবে কেউ স্বেচ্ছায় স্পষ্টভাবে কোন কুফরী বাক্য উচ্চারণ করলে বা কোন কুফরী কাজ করলে তাকে রক্ষা করার মানসে তার কথা বা কাজের অযাচিত ব্যাখ্যা করাও সমীচীন নয়।[৪৯]

যে সব বিষয় ধর্মান্তর রূপে গণ্য ঃ

একজন কাফির যে সব বিষয় স্বীকার করে নিলে মুসলিম হয়, কোন মুসলিম ঐ সব বিষয় অস্বীকার করলে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইসলামের সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে কোন আকীদা-বিশ্বাস পরিপন্থী ধ্যান-ধারণা পোষণ করবে, কুফরী বাক্য উচ্চারণ করবে ও কুফরী কাজ সম্পাদন করবে, সেও কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। কাফির ও মুরতাদ হবার বিষয়গুলোকে চারশ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ক. ধর্মান্তরের ই'তিকাদী বিষয়সমূহ, খ. ধর্মান্তরের বাচনিক বিষয়সমূহ, গ. ধর্মান্তরের কর্মজাতীয় বিষয়সমূহ ও ঘ.

---

৪৮. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ.২২৯-৩০

৪৯. *তদেব*

ধর্মান্তরের বর্জনজাতীয় বিষয়সমূহ। উল্লেখ্য যে, এ প্রকারগুলো পরস্পর প্রবিষ্ট অবস্থায় অর্থাৎ একটি অপরটির মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। কেননা কোন ব্যক্তি যখন কোন বিশ্বাস পোষণ করে, তখন তা-ই তার কথার মাধ্যমে, কাজের মাধ্যমে বা বর্জনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে- এটাই স্বাভাবিক।

ক. ই'তিকাদী (বিশ্বাসগত) বিষয়সমূহ ঃ

১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অথবা তাঁকে বা তাঁর কোন সিফাতকে অস্বীকার করা

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে অথবা তাঁকে অস্বীকার করবে অথবা তাঁর কোন সিফতকে অস্বীকার করবে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে আল্লাহকে বিশ্বাস না করলে কিংবা কেউ এ জগতকে সনাতন ও স্থায়ী বলে বিশ্বাস করলে অথবা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করলে সেও কাফির ও মুরতাদ হবে।[৫০] আল্লাহ তা'আলা বলেন, كل شيئ هالك إلا وجهه. - "আল্লাহ তা'আলা ছাড়া প্রত্যেকেই ধ্বংসশীল।"[৫১]

২. আল্লাহর স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততি অথবা মনুষ্যরূপ আছে বলে বিশ্বাস করা

আল্লাহর স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততি আছে বলে কেউ বিশ্বাস করলে সেও কাফির হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ তাঁর শানের পরিপন্থী কোন বিষয়ের ওপর বিশ্বাস পোষণ করলে যেমন মনুষ্যাকৃতিতে পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা অবতরণ করেন বলে বিশ্বাস করলে অথবা প্রতিটি স্থানে প্রত্যেক বস্তুর সাথে আল্লাহ তা'আলার সত্তা মিশে রয়েছে বলে বিশ্বাস করলে কিংবা স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে এক বলে বিশ্বাস করলে এবং স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টির অস্তিত্বকে অস্বীকার করলে সেও কাফির হয়ে যাবে।[৫২]

৩. কুর'আনকে অবিশ্বাস করা

পবিত্র কুর'আন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ। এটি

---

৫০. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.১২৯-৩০; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ. ১১৭; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ.৩২৬; আর-রুহায়বানী, *মাতালিব..*, খ.৬, পৃ.২৮২; আল-মওয়াক, *আত-তাজ..*,খ.৮, পৃ. ৩৭২

৫১. আল-কুর'আন, ২৮ (সূরা আল-কাসাস) ঃ ৮৮

৫২. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুও রা'ইক*, খ.৫, পৃ.১২৯-৩০; আর-রুহায়বানী, *মাতালিব..*, খ.৬, পৃ.২৮২; আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৬, পৃ.১৭০-১

সবধরনের পরিবর্তন থেকে সুরক্ষিত রয়েছে এবং কিয়ামাত পর্যন্ত পূর্ণ সংরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। অতএব, সম্পূর্ণ কুর'আনকে কিংবা তার অংশবিশেষকে এমন কি কুর'আনের একটি শব্দ বা একটি অক্ষরকেও কেউ অবিশ্বাস করলে, মিথ্যা বলে ধারণা করলে, সে কাফির হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কুর'আনের কোন বক্তব্যকে বিশ্বাস না করলে বা প্রত্যাখ্যান করলে অথবা তার কোন বিধি-বিধানে সন্দেহ পোষণ করলে সেও কাফির হয়ে যাবে। তদুপরি কেউ কুর'আনের অলৌকিকত্বে বিশ্বাস না করলে, কুর'আনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভব মনে করলে এবং কুর'আনে সংযোজন-বিয়োজন যুক্তিযুক্ত মনে করলে সেও কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে।[৫৩]

৪. দীনের স্পষ্ট ও সুপরিচিত কোন বিষয়কে অস্বীকার করা

দীনের যে কোন অকাট্য ও সর্বজন পরিচিত বিধানকে (যেমন নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ও জিহাদ প্রভৃতি) কেউ মেনে না নিলে অথবা অস্বীকার করলে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে।[৫৪]

৫. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শানের পরিপন্থী কোন বিষয়ের ওপর বিশ্বাস রাখা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে কেউ ভণ্ড, প্রতারক, সন্ত্রাসী, মূর্খ ও মিথ্যাবাদী মনে করলে সেও কাফির হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শানের পরিপন্থী কোন দোষ বা গুণ (যেমন- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে আল্লাহর মনুষ্যরূপ মনে করা, তাঁকেও আল্লাহ তা'আলার জন্য সুনির্দিষ্ট গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহের ধারক মনে করা এবং গুণে ও বৈশিষ্ট্যে সাধারণ মানুষ মনে করা) বিশ্বাস করলে সেও কাফির হয়ে যাবে।[৫৫]

৬. সর্বজন বিদিত ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হারাম বিষয়কে হালাল বলে বিশ্বাস করাঃসর্বজন বিদিত ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হারাম (যেমন- যিনা, মদ্যপান, যাদু ও সুদ প্রভৃতি) কোন বিষয়কে কেউ হালাল বলে বিশ্বাস করলে সেও কাফির হয়ে যাবে।[৫৬]

---

৫৩. শায়খী যাদাহ, *মাজমা'..*, খ.১, পৃ.৬৯৩; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.১৩১

৫৪. আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ. ১১৭; আল-মওয়াক, *আত-তাজ..*,খ.৮, পৃ. ৩৭১

৫৫. আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৬, পৃ.১৭১; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ. ১১৭; আর-রামালী,.*নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ.৭, পৃ.৪১৫

৫৬. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ২১-২; ইবনু তাইমিয়্যাহ, *আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা*, খ.৩, পৃ.৪৩৫

৭. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিংবা তাঁর প্রদর্শিত কোন বিধানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা

কেউ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিংবা তাঁর প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থা বা কোন সর্বসম্মত বিধানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলে সেও কাফির হয়ে যাবে।[৫৭]

৮. সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা

সাহাবীগণের প্রতিও বিদ্বেষ পোষণ করা ঈমানের পরিপন্থী। কেউ যদি দীনের কারণে (অর্থাৎ তাদের মাধ্যমে দীনের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল, দীন বিজয় লাভ করেছিল) তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তা হলে সে কাফির হয়ে যাবে। আর নিছক ব্যক্তিগত কারণেও তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা সমীচীন নয়। এর জন্য গুনাহগার হতে হবে।[৫৮]

৯. কুফরীর ওপর সন্তুষ্ট থাকা

নিজের বা অপরের কুফরী অবস্থানের ওপর সন্তুষ্ট থাকাও ঈমানের পরিপন্থী। অতএব কেউ নিজের বা অপরের কুফরী কর্মের ওপর সন্তুষ্ট থাকলে কিংবা কেউ অপর কারো কুফরীর ওপর অটল থাকা কামনা করলে সে কাফির হয়ে যাবে।[৫৯]

খ. বাচনিক বিষয়সমূহ ঃ

১. নিজেকে কাফির রূপে ঘোষণা দেয়া

কেউ নিজেকে কাফির রূপে ঘোষণা দিলে কিংবা জেনে বুঝে, এমন কি উপহাস কিংবা রসিকতা করে হলেও কোন কুফরী বাক্য উচ্চারণ করলে সে কাফির হয়ে যাবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে কেউ যদি স্বেচ্ছায় না জেনে কোন কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে, সেও সর্বসাধারণ আলিমের মতানুযায়ী কাফির হয়ে যাবে। তার জ্ঞান না থাকা ওযর হিসেবে বিবেচিত হবে না। কিন্তু অনেকের মতে- এ ধরনের ব্যক্তিকে কাফির বলা যাবে না। তার জ্ঞান না থাকা ওযর রূপে গণ্য হবে। এ মতটি অধিকতর অগ্রগণ্য।[৬০] কেননা ইমামগণের দৃষ্টিতে, কুফরীর

---

৫৭. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৬, পৃ.১৩৬; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ.১৬৪

৫৮. আস-সুবকী, *আল-ফাতাওয়া*, খ.২, পৃ.৫৭৫-৬

৫৯. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.১৩১; ইবনু ফারহুন, *তাবছিরাতুল হুক্কাম*, খ.২, পৃ.২৭৭; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, খ.২, পৃ.২৫৭

৬০. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ.২২৪; শায়খী যাদাহ, *আল-মাজমা'*, খ.১, পৃ. ৬৮৮; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.৬, পৃ.৪৫২;

ফাতওয়া দেয়ার বেলায় যথা সম্ভব সতর্ক হওয়া উচিত। যদি উচ্চারিত কুফরী বাক্যের অন্য কোন ব্যাখ্যা দেয়া যায়, তা হলে সে ব্যাখ্যাটিই গ্রহণ করতে হবে। তদুপরি অজ্ঞতা যদি ওযর হিসেবে ধর্তব্য না হয়, তা হলে তো সকল মূর্খকেই কাফির বলতে হবে। তারা তো কোন্টি কুফরী বাক্য, কোন্টি কুফরী বাক্য নয়- তা জানে না। বর্ণিত আছে যে, ইমাম মুহাম্মাদ (রহ)-এর সময়ে জনৈকা মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলা হল, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদেরকে শাস্তি দেবেন। এটা শুনে মহিলাটি বলল, আল্লাহ তা'আলা এই রূপ করবেন না। কারণ, তারা তো আল্লাহর বান্দাহ। পরে ইমাম মুহাম্মাদ (রহ)কে মহিলাটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, "সে কাফির হবে না। কারণ সে তো একজন মুর্খ। তোমরা তাকে শিক্ষা দাও।"[৬১]

২. আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল ও দীনকে নিয়ে উপহাস করা কিংবা গালমন্দ বলা

আল্লাহকে গালমন্দ বলা বা তাঁর কোন নাম বা গুণ নিয়ে উপহাস করা চরম কুফরী। কেউ এ রূপ করলে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ তাঁর কোন নির্দেশ বা কোন প্রতিশ্রুতি কিংবা কোন সর্তকবাণীকে নিয়ে উপহাস করলেও কাফির হয়ে যাবে।[৬২]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোন কথা বা কাজ সম্পর্কে অযাচিত মন্তব্য করা, তাঁকে গালমন্দ বলা এবং তাঁর প্রদর্শিত দীন বা তাঁর কোন বাণী নিয়ে উপহাস করা প্রভৃতি কুফরী কাজ।[৬৩]

---

৬১. আল-হামাভী, *গামযু 'উয়ূনিল বছা'ইর*, খ.৩, পৃ.৩০৪

৬২. আল্লাহকে গালমন্দ বা উপহাসকারীর তাওবা কবুল হবে কি না- তা নিয়েও ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশের মতে, তার তাওবা কবুল হবে। কিন্তু ইমাম আহমাদ (রহ)-এর মতে, তার তাওবা কবুল হবে না। তাকে সর্বাবস্থায় হত্যা করতে হবে। কেননা সে আল্লাহকে গালি দিয়ে কিংবা উপহাস করে চরম মারাত্মক অপরাধ করেছে, যা অমার্জনীয়। (মুল্লা খসরু, *দুরারুল হুক্কাম*, খ.১, পৃ.৩০০; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ. ২৩২; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ৩৩; আর-রুহায়বানী, *মাতালিব..*,খ.৬, পৃ.২৯৩)

৬৩. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে গালমন্দ বা উপহাসকারীর তাওবা কবুল হবে কি না- তা নিয়েও ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশের মতে, তার তাওবা কবুল হবে। ইমাম আবূ বাকর আল-ফারিসী (রহ)-এর মতে তাকে হদ্দের আওতায় হত্যা করা হবে; তাওবার কারণে হদ্দ রহিত হবে না। ইমাম সায়দলানীর মতে, তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। মালিকীগণের মতে, কোন নবীকে কেউ গালি দিলে তাকে হত্যা করা হবে। তার তাওবা কবুল হবে না। যদি সে তাওবা করে তাহলে হদ্দের আওতায় তাকে হত্যা করা হবে। ইমাম আহমাদ (রহ) থেকেও এ ধরনের একটি মত বর্ণিত রয়েছে। (ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*,

আল্লাহ তা'আলা বলেন, و لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض و نلعب قل أ بالله و آيته و رسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم - "যদি তোমরা তাদের জিজ্ঞেস কর, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে যে, আমরা তো কেবল হাসি-ঠাট্টা ও খেল-তামাশাই করেছি। আপনি তাদের বলুন, তাহলে তোমরা কি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ও আয়াতগুলোকে নিয়েই উপহাস করেছ? ছলনা কর না। এ কাজের মাধ্যমে তোমরা নিঃসন্দেহে ঈমান আনয়নের পর কুফরী করেছ।"[৬৪]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি যে ব্যক্তি কোন মিথ্যা কথা বা কাজের নিসবত করে, যদিও সে তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে করে- সে বড় ধরনের অপরাধে লিপ্ত।[৬৫] তাকে প্রকাশ্যে প্রহার করা হবে এবং বন্দী করে রাখা হবে, যে যাবত না সে তাওবা করে। কেননা তাঁর প্রতি মিথ্যা কোন কিছু নিসবত করা তাঁর শান ও মর্যাদাকে ঘায়েল করার শামিল।[৬৬] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,.من كذب علي متعمدا فليتبؤا مقعده من النار - "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি কোন মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন জাহান্নামেই তার ঠিকানা গড়ে নেয়।"[৬৭]

৩. নবীগণ (আ)-কে গালি দেয়া

কেউ কোন নবীকে গালি দিলে কিংবা কোন খারাপ উপাধি (যেমন- যাদুকর, মিথ্যুক, প্রতারক, ভণ্ড ও সন্ত্রাসী প্রভৃতি) দিয়ে অভিহিত করলে অথবা কোন কাজের জন্য দোষারোপ করলে বা ছোট করার মানসে তাঁর কোন রূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করলে অথবা তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কোন তুলনা দিলে বা ছবি তৈরি করলে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ কোন নবীকে

খ.৪, পৃ. ২৩২; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ৮৭-৮৮; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ. ১৩৫-৬; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.২২, পৃ. ১৯৩)

৬৪. আল-কুর'আন, ৯ (সূরা আত-তাওবাহ) ঃ ৬৫-৬

৬৫. শায়খ আবূ মুহাম্মদ আল-জুয়াইনী (রহ) বলেন : "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ কুফরীর নামান্তর।" আল-হায়তমী বলেন, "অনেকের দৃষ্টিতে আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা চরম কুফরী, যার ফলে মিথ্যাচারী ব্যক্তি মিল্লাত থেকে বেরিয় যাবে।" (আল-হায়তমী, *আয-যাওয়াজির*, খ.১, পৃ. ১৬২)

৬৬. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.১৬, পৃ. ৩০২

৬৭. সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুল জানা'ইয), হা.নং : ১২২৯; মুসলিম, (বাব : তাগলীযুল কিযব..), হা.নং : ৩, ৪

লা'নত করলে বা বদ দু'আ করলে অথবা তাঁর ক্ষতি কামনা করলে বা শানের পরিপন্থী কোন কিছু তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করলে কিংবা কোন কথা বা কাজের সাহায্যে তাঁকে নিয়ে উপহাস করলে কাফির হয়ে যাবে।[৬৮]

নবীকে গালমন্দকারী মুসলিম হলে সে সর্বসম্মতভাবে মুরতাদ হবে এবং তাকে এ জন্য হত্যা করা হবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে অমুসলিম হলে অধিকাংশ ইমামের মতে যেহেতু সে নাগরিক চুক্তি ভঙ্গ করেছে, তাই তাকে হত্যা করা হবে। তবে হানাফীগণের মতে, তাকে হত্যা করা হবে না; তবে আদালত সুবিবেচনা অনুযায়ী তাকে যে কোন উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবে।[৬৯]

উল্লেখ্য যে, নবী-রাসূলগণকে ইশারা-ইঙ্গিতে গালি দিলেও স্পষ্টভাষায় গালি দেয়ার মতই একই বিধান প্রযোজ্য হবে। কাদী 'ইয়াদ (রহ) বলেন, সাহাবা কিরাম থেকে আজ পর্যন্ত সকল ইমামই এ বিষয়ে এক মত যে, التلويح كالتصريح - "ইশারা-ইঙ্গিত স্পষ্ট বক্তব্যের মতই।"[৭০]

৪. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহধর্মিনীগণকে গালি দেয়া:

হযরত 'আয়িশা (রা)-এর পবিত্রতা যেহেতু পবিত্র কুর'আন দ্বারা প্রমাণিত, তাই তাঁর প্রতি কেউ ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করলে বা এ কারণে কেউ তাঁকে গালমন্দ করলে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। ইমাম মালিক (রহ) বলেছেন, "যে আবূ বাকর (রা)-কে গালি দেবে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে। আর যে হযরত 'আয়িশা (রা)কে গালি দেবে তাকে হত্যা করা হবে।" এ কথা বলার পর তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দিলেনঃ " তাঁকে যে অপবাদ দেবে বস্তুত সে কুর'আনের বক্তব্যকেই অস্বীকার করল।"[৭১] তদুপরি তাঁকে কেউ অন্য কোন কারণে গালি দিলে কিংবা তাঁকে ছোট বা হেয় করে কথা বললে তাকে দীর্ঘ কারাবাস দণ্ড দিতে হবে এবং কঠোরভাবে প্রহার করতে হবে।[৭২]

---

৬৮. আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ. ১১৮, ১২২; শায়খী যাদাহ, *মাজমা'*, খ.১, পৃ.৬৯২

৬৯. আল-বাবরতী, *আল-'ইনায়াহ*, খ.৬, পৃ.৬২-৩; মুল্লা খসরু, *দুরারুল হুক্কাম*, খ.১, পৃ.২৯৯

৭০. আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, খ.৮, পৃ.৭০; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.২৪, পৃ. ১৩৭

৭১. আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৬, পৃ.২০৬

৭২. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ.৪৪; আর-রু'আয়নী, *মাওয়াহিবুল জলীল*, খ.৬, পৃ.২৮৬; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ.৬, পৃ.৯৪-৫

তবে অন্য নবী পত্নীদেরকে অপবাদ কিংবা গালি দেয়ার বেলায়ও হযরত 'আয়িশা (রা)-এর অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে কি না- তা নিয়ে ইমামগণের দুটি মত পাওয়া যায়। ক. তাঁদের কাউকে গালি দেয়ার জন্য অন্য সাধারণ সাহাবীকে গালি দেয়ার অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে। এটা হানাফী ও শাফি'ঈগণের অভিমত। ইমাম আহমাদ (রহ) থেকেও এ ধরনের একটি মত বর্ণিত রয়েছে। খ. যে কোন নবী পত্নীকে অপবাদ বা গালি দেয়ার জন্য হযরত 'আয়িশা (রা)-এর অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে। কারণ, যে কোন নবীপত্নীকে অপবাদ দেয়া কিংবা গালি দেয়া প্রকারান্তরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শান ও ব্যক্তিত্বের প্রতি কলঙ্ক লেপনেরই নামান্তর। অধিকাংশ হাম্বলী ইমাম দ্বিতীয় মতটিই গ্রহণ করেছেন।[৭৩] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إن الذين يرمون المحصنت الغفلت المؤمنت لعنوا في الدنيا و الآخرة و لهم عذاب عظيم. - "যারা সতী ও গাফিল ঈমানদার মহিলাদেরকে অপবাদ দেবে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি।" হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, "উপর্যুক্ত আয়াতটি বিশেষভাবে হযরত 'আয়িশা ও অন্যান্য নবীপত্নিদের জন্য প্রযোজ্য। যে কেউ তাদেরকে অপবাদ দিলে তাদের তাওবাও কবুল হবে না।"[৭৪] অধিকাংশ ইমামের মতে, নবী পত্নীদের প্রতি অপবাদ আরোপকারীকে বন্দী করে তাওবা করার সুযোগ দেয়া হবে। যদি সে তাওবা করে ফিরে না আসে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।[৭৫]

কেউ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিবারের অন্য কাউকে গালি দিলে সে কাফির হবে না; তবে তাকে তা'যীরের আওতায় প্রকাশ্যে জোরে প্রহার করা হবে এবং কারাদণ্ড দিতে হবে। কেননা নবী পরিবারের কাউকে গালি দেয়া নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শান ও মর্যাদায় আঘাত করার শামিল।[৭৬]

---

৭৩. এটা হাম্বলীগণের অভিমত। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহও এমতটি গ্রহণ করেছেন। (ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ.৪৪; আল-বহুতী, *কশশাফ*, খ.৬, পৃ.১৭২; আর-রু'আয়নী, *মাওয়াহিবুল জলীল*, খ.৬, পৃ.২৮৬; ইবনু তাইমিয়্যাহ, *আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা*, খ.৩, পৃ,১৫২)

৭৪. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর) ঃ ২৩

৭৫. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ.২৩৬

৭৬. আল-মওয়াক, *আত-তাজ..*, খ.৮, পৃ.৩৮৫

৫. কুর'আনকে গালি দেয়া

কেউ কুর'আনকে তুচ্ছ করে কথা বললে বা তাকে নিয়ে উপহাস করলে কাফির হয়ে যাবে।[৭৭]

৬. ফেরেশতাগণকে গালমন্দ বলা

ফেরেশতাগণ হলেন আল্লাহ তা'আলার অতি সম্মানিত ও নিষ্পাপ একটি সৃষ্টি। তাই অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে কোন ফেরেশতাকে (যেমন হযরত জিব্রাইল, মালাকুল মাওত ও জাহান্নামের রক্ষী মালিক (আ) প্রমুখ) কিংবা সামগ্রিকভাবে সকলকে কেউ লা'নত করলে, গালি দিলে কিংবা উপহাস করলে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। তবে যাঁদের ফেরেশতা হবার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে (যেমন হারূত ও মারূত), তাঁদেরকে কেউ গালি দিলে কাফির হবে না; তবে তাও শাস্তিযোগ্য। বিচারক সুবিবেচনা অনুযায়ী তাকে যে কোন রূপ শাস্তি দিতে পারবেন। তবে ইমাম কারাফীর মতে, সেও কাফির হবে এবং তাকে এজন্য হত্যা করা হবে।[৭৮]

৭. দীন ইসলামকে গালি দেয়া

কেউ দীন ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতকে গালি দিলে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। তবে কেউ ব্যক্তি বিশেষের দীনকে গালি দিলে হানাফীগণের মতে সেও কাফির রূপে গণ্য হবার উপযোগী। তবে তার গালির এ রূপ ব্যাখা দেয়াও সম্ভব যে, গালিদাতার উদ্দেশ্য প্রকৃত দীন ও মিল্লাত নয়; বরং ব্যক্তি বিশেষের খারাপ চরিত্র ও মন্দ আচার-আচরণ। যদি গালিদাতার উদ্দেশ্য তা-ই হয়ে থাকে, তা হলে তাকে তার গালির জন্য কাফির বলা যাবে না। আমাদের সমাজে অনেক মূর্খই এ ভাবে গালিগালাজ করে থাকে।

ইসলামী রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম নাগরিক যদি দীন ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতকে উদ্দেশ্য করে প্রকাশ্য গালি দেয় অধিকাংশ ইমামের মতে যেহেতু সে নাগরিক চুক্তি ভঙ্গ করেছে, তাই তাকে হত্যা করা হবে। তবে হানাফীগণের মতে, তাকে হত্যা করা হবে না; তবে আদালত সুবিবেচনা অনুযায়ী তাকে যে কোন উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবে।[৭৯] বর্ণিত আছে যে, 'আছমা' বিনত মারওয়ান নাম্নী জনৈকা

---

৭৭. শায়খী যাদাহ, *মাজমা'..*, খ.১, পৃ.৬৯৩

৭৮. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.১৩১; আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, খ.৪, পৃ.৩৫, খ.৮, পৃ.৭০; আদ-দাসূকী, *আল-হাশিয়াতু..*,খ.৪, পৃ.৩০৯; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.২৪, পৃ.১৩৮

৭৯. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.২৪, পৃ.১৩৯

ইয়াহুদী মহিলা ইসলামের দুর্নাম করত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে কষ্ট দিত এবং লোকদেরকেও তা করার জন্য অণুপ্রেরণা যোগাত। এ কারণে 'আমর ইবন 'আদী আল-খিতমী (রা) তাঁকে হত্যা করেছিলেন।[৮০] এ হাদীস প্রসঙ্গে হানাফীগণ বলেন, তাকে হত্যা করার কারণ কেবল ইসলামের দুর্নাম করা নয়; বরং কয়েকটি গুরুতর অপরাধ একত্রে পাওয়া যাবার কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।

৮. সাহাবীগণকে গালি দেয়া

কোন ব্যক্তি সকল সাহাবীকে গালমন্দ করলে বা কাফির বললে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। কেননা সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাহাবা কিরামের সততা ও নিষ্ঠা কুর'আন ও হাদীসের বহু অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। তাঁরা হলেন উম্মাতের শ্রেষ্ঠতম অংশ। অতএব তাঁদের সকলকে কাফির বলা বা গালমন্দ করার মানে হল ইসলামের একটি অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করার নামান্তর। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, الله الله في أصحابي ، لا تتخذوهم غرضا من بعدي. - "তোমরা আমরা সাহাবীগণের ব্যাপারে সতর্ক হও, আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা আমার পরে তাঁদেরকে সমালোচনার পাত্রে পরিণত কর না।"[৮১]

তবে সকলকে নয়; বিশেষ একজন কিংবা কয়েকজন সাহাবীকে কেউ গালমন্দ করলে বা কাফির বললে হানাফী ও মালিকীগণের মতে, তাকে কাফির ও মুরতাদ বলা যাবে না; তবে সে শাস্তিযোগ্য হবে। তাকে এ জন্য সশ্রম বা বিনা শ্রমে কঠোর কারাদণ্ড দেয়া যাবে।[৮২] তবে শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, সে কাফির হয়ে যাবে এবং তার জন্য মুরতাদের শাস্তি প্রযোজ্য হবে। আবার অনেকেই ব্যক্তিগত কারণে গালমন্দ করা এবং সাহাবী হবার কারণে গালমন্দ করার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যদি গালমন্দের কারণ একান্ত ব্যক্তিগত হয়, তা হলে গালমন্দকারী কাফির হবে না। যদি সাহাবী হবার কারণেই গালি দেয়া হয়, তা হলেই কাফির হবে।[৮৩]

---

৮০. আল-কাদা'ঈ, *মুসনাদুশ শিহাব*, খ.২, পৃ.৪৮

৮১. আত্ তিরমিযী, (আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নং : ৩৮৬২; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং: ২০৫৬৭, ২০৫৬৮, ২০৫৯৭

৮২. এটা ইমাম আহমাদ (রহ)-এরও একটি অভিমত।

৮৩. আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ.২১১; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.১১৯; আল-বহুতী, *কাশশাফ* ,খ.৬, পৃ.১৭০-৭১; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ.৩২৩

হযরত আবূ বাকর (রা)-এর সুহবত যেহেতু কুর'আন দ্বারা প্রমাণিত, তাই কেউ তা অস্বীকার করলে কিংবা তাকে কেউ গালি দিলে বা কাফির বললে সে কাফির হয়ে যাবে। হানাফীগণের মতে, হযরত আবূ বাকর ও উমার (রা) দুজনকেই বা তাঁদের কোন একজনকেও কেউ গালি দিলে কাফির হয়ে যাবে। আবার কারো মতে, খুলাফা রাশিদূনের কাউকেও কাফির বললে সে কাফির হয়ে যাবে। তবে ইমাম মালিক ও অন্য কতিপয় ইমামের মতানুযায়ী তাঁদেরকে গালি দিলে কাফির হবে না; তবে তা'যীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে। ইমাম আহমাদ (রহ) থেকে এ রূপ ব্যক্তির কাফির হবার ব্যাপার সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না। তবে তিনি এ রূপ ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করার এবং আজীবন কারাদণ্ড দেয়ার কথা বলেছেন, যদি সে তাওবা করে ফিরে না আসে।[৮৪]

আরবদেরকে কিংবা বনূ হাশিমকে কেউ গালি দিলে কিংবা লা'নত করলে তাকেও কারাদণ্ড দেয়া হবে এবং প্রহার করা হবে।[৮৫]

৯. নবুওয়াতের দাবী করা

হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পরে আর কোন নবী বা রাসূল আসবেন না। তাই কেউ যদি তা বিশ্বাস না করে নিজেকে নবী বলে দাবী করে কিংবা তাঁর পরে অন্য কাউকে কেউ নবী বলে বিশ্বাস করে, সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে।[৮৬]

১০. কোন মুসলিমকে কাফির বলে সম্বোধন করা

কোন মুসলিমকে কেউ কাফির বলে সম্বোধন করলে হানাফীগণের মতে সে ফাসিক হবে, যদি সে বাস্তবিকই কাফির না হয়। এ জন্য বিচারক তাকে উপযুক্ত তা'যীরী শাস্তি দেবেন।[৮৭] হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, : إنما امرئ قال لأخيه - يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال ' و إلا رجعت عليه. "যে ব্যক্তি তার ভাইকে 'হে কাফির' বলে ডাকল, তাহলে তাদের যে কোন একজন তার

---

৮৪. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.১৩৬; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ. ২৩৬-৭; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ.২০৬; আর-রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ.৭, পৃ.৪১৬; আর-রুহায়বানী, *মাতালিব..*,খ.৬, পৃ.২৮৭

৮৫. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.১৬, পৃ.৩০২

৮৬. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৩৩; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.১১৮

৮৭. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪,পৃ.৬৯-৭০

উপযোগিতা অর্জন করবে। যাকে কাফির ডাকা হল যে যদি বাস্তবিকই কাফির হয়, তাহলে তো অসুবিধা নেই। যদি সে বাস্তবিকই কাফির না হয়, তা হলে কাফির সম্বোধনকারীর ওপর এর পরিণাম বর্তাবে।"[৮৮] শাফি'ঈগণের মতে, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে কাফির বলে অভিহিত করবে- চাই তা কোন পাপের কারণেও যদি হয় -সে নিজেই কাফির হয়ে যাবে, যদি সে নি'মতের কুফরী বা ইত্যাকার কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই তা বলে থাকে। তবে এ ধরনের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া গেলে এ জন্য তাকে কাফির বলা যাবে না।[৮৯] তাঁদের দলীল হল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ' من دعا رجلا بالكفر أو قال : عدو الله ' و ليس كذلك إلا حار عليه. - "যে ব্যক্তি কাউকে কাফির কিংবা আল্লাহর দুশমন বলে ডাকল, সে যদি বাস্তবিকই তা না হয়, তা হলে তার এ কথা উল্টো তার দিকে ফিরে আসবে।"[৯০]

গ. কর্মজাতীয় বিষয়সমূহ ঃ

১. আল্লাহ ও তাঁর দীনের প্রতি তাচ্ছিল্য জ্ঞাপনকারী কোন কাজ

আল্লাহ ও তাঁর দীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন বা অস্বীকার বোঝা যায়- এ ধরনের যে কোন কাজ কুফরী। যেমন- আল্লাহ তা'আলার কোন চিত্র আঁকা বা তাঁর মূর্তি তৈরি করা, চাঁদ-সুরুজের পূজা করা, তাচ্ছিল্যের সাথে ডাস্টবিন বা অন্য কোথাও পুরো মুসহাফ কিংবা অংশবিশেষ[৯১] ছুঁড়ে মারা। কোন ব্যক্তি এ রূপ কোন কাজ করলে সে কাফির হয়ে যাবে, যদিও সে আল্লাহ কিংবা কুর'আনের প্রতি বিশ্বাসী বলে নিজেকে দাবী করে। কারণ, তার এ অযাচিত কাজ আল্লাহ ও তাঁর কুর'আনকে মিথ্যাপ্রতিপন্নকরণ রূপে বিবেচিত হবে। অধিকন্তু, তা তাঁর প্রতি প্রকাশ্য তাচ্ছিল্য প্রদর্শন, যা সুস্পষ্ট কুফরী।[৯২]

---

৮৮. সহীহ আল বুখারী, হা. নং: ৫৭৫৩; মুসলিম, (কিতাবুল ঈমান), হা.নং: ৬০

৮৯. আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪,পৃ.১১৮

৯০. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল ঈমান), হা.নং: ৬০

৯১. মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামগণের মতে হাদীসগ্রন্থ ছুঁড়ে মারার জন্যও এ বিধান প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ কিংবা কোন নবী-রাসূল বা ফেরেশতার নাম লিখিত অথবা কোন শার'ঈ বক্তব্য সম্বলিত কোন কাগজ কেউ যদি অবমাননা করার মানসে ও তাচ্ছিল্যের সাথে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে মারে কিংবা ময়লার সাথে মিশিয় ফেলে সেও কাফির হয়ে যাবে। (আদ-দাসূকী, *আল-হাশিয়াতু..*, খ.৪,পৃ.৩০১; আর-রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ.৭,পৃ. ৪১৬-৭)

৯২. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ.২২২; নববী, *আল-মাজমূ'*, খ.২, পৃ.১৯৬; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.১১৭

২. আল্লাহ ছাড়া কারো উদ্দেশ্যে মাথানত করা, সিজদা করা

আল্লাহ ছাড়া কোন মূর্তিকে উদ্দেশ্য করে সিজদা করা- ইচ্ছাকৃতভাবে হোক কিংবা তামাসাচ্ছলে হোক- চরম কুফরী। কেউ এ রূপ করলে সে কাফির হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কোন 'আলিম বা বুজর্গ কিংবা কোন প্রতাপশালী রাজা বাদশাহের সামনে মাটিতে সিজদা করা বা নুইয়ে পড়াও হারাম। যে তা করবে এবং যে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে- দুজনেই বড় গুনাহগার হবে। কেননা মূর্তিপুজার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ বলে এ রূপ অবস্থাকে ইসলাম চরমভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তবে এ রূপ ব্যক্তি কাফির হবে কি না- তা কিছুটা ব্যাখ্যার দাবী রাখে। কেউ যদি কারো সামনে তার 'ইবাদাত এবং বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য প্রকাশের নিমিত্তে এ রূপ করে থাকে, তা হলে সে নিঃসন্দেহে কাফির হয়ে যাবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। যদি তা কেবল সম্মান প্রদর্শনের জন্যই করে থাকে, তা হলে সে কাফির হবে না বটে; তবে বড় গুনাহগার হবে।[৯৩] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ما ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ' و لو صح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. - "একজন মানুষের অন্য মানুষকে উদ্দেশ্য করে সিজদা করা উচিত নয়। যদি তা রীতি সিদ্ধই হত, তা হলে আমি অবশ্যই স্বামীর অধিকারের গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে উদ্দেশ্য করে সিজদা করার জন্য স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম।"[৯৪]

তবে পরস্পর একে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে সচরাচর লোকেরা যে সামান্য পরিমাণে ঝুঁকে মাথা নত করে থাকে, যা কোনভাবেই রুকু'র পর্যায়ে পৌঁছে না, তা কুফরীও নয় এবং হারামও নয়। তবে তা নিঃসন্দেহে মাকরূহ। এ রূপ অবস্থাও পরিহার করে চলা উচিত। বর্ণিত রয়েছে, জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমাদের কারো একভাইয়ের সাথে অপর ভাইয়ের বা বন্ধুর সাক্ষাত হয়, তখন কি একজন অপরের উদ্দেশ্যে ঝুঁকে পড়বে? তিনি বললেন, না। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তাকে ধরে কি চুমো খাবে? তিনি বললেন, না। লোকটি ফিরে আবার জিজ্ঞেস

---

৯৩. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.১, পৃ.২০২; শায়খী যাদাহ, *মাজমা'..*, খ.২, পৃ.৫৪২; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.১, পৃ.৬০। এটা অধিকাংশ হানাফী ইমামের অভিমত। তবে হানাফীগণের মধ্যে শামসুল আইয়িম্মাহ আস-সারাখসী (রা) ও আরো অনেকের মতে, এ রূপ অবস্থায়ও সে কাফির হয়ে যাবে। কেননা সিজদার মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন কেবল আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট। কোন বান্দাহর জন্য প্রযোজ্য নয়। (শায়খী যাদাহ, *মাজমা'..*, খ.২, পৃ.৫৪২)

৯৪. আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুন নিকাহ), হা.নং : ২৭৬৮; নাসাঈ, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং : ৯১৪৭; বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং : ১৩২৬৩

করলেন, তাহলে কি তার হাত ধরে মুসাফাহা করবে? তিনি বললেন: হ্যাঁ।"[৯৫]

তবে ঝুঁকতে গিয়ে রুকু'র পর্যায়ে চলে গেলে অনেকের মতে- এ রূপ অবস্থায় যদি ব্যক্তিবিশেষকে আল্লাহর মত সম্মান প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য না হয়, তা হলে তা কুফরী এবং হারাম হবে না। তবে এটিও ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত আচরণ (মাকরূহ তাহরীমী)। আবার অনেক আলিমের মতে, ব্যক্তিবিশেষকে আল্লাহর মত সম্মান প্রদর্শন করার উদ্দেশ্য না থাকলেও এভাবে পরস্পর একে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করা হারাম। কেননা রুকু'র আকৃতিতে সম্মান প্রদর্শনের নিয়মটি কেবল আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট; কোন বান্দাহর জন্য এটা প্রযোজ্য নয়।[৯৬] ইবনু 'আল্লান সিদ্দীকী বলেন, "সাক্ষাতের সময় রুকুর মত করে ঝুঁকে যাওয়া একটি চরম ভ্রান্তিমূলক বিদ'আত। যদি কেউ আল্লাহকে যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, সেভাবে কাউকে সম্মান করার উদ্দেশ্যে ঝুঁকে যায়, তাহলে সে নিঃসন্দেহে মুরতাদ ও কাফির হয়ে যাবে।"[৯৭]

৩. অমুসলিমদের পরিচয়সূচক পোশাক বা বেশভূষা ধারণ করা

কোন মুসলিম অমুসলিমদের পরিচয়সূচক কোন পোশাক বা বেশভূষা (যেমন- ব্রাহ্মণদের পৈতা, বৌদ্ধদের গেরুয়া বর্ণের কাপড় ও খ্রিস্টানদের ক্রস প্রভৃতি) ধারণ করলে সে কাফির হয়ে যাবে, যদি সে তা কোন রূপ অনুরাগ বা আগ্রহ নিয়ে পরে থাকে। যদি সে তা খেলাচ্ছলে পরে থাকে, তা হলে এর জন্য তাকে কাফির বলা যাবে না; তবে এ রূপ করাও হারাম।[৯৮]

৪. দীনের কোন বিধানকে অস্বীকার করে আমল করা ছেড়ে দেয়া

দীনের যে কোন অকাট্য ও সর্বজনপরিচিত বিধানকে (যেমন নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ও জিহাদ প্রভৃতি) কেউ অস্বীকার করে কিংবা উপহাস করে আমল করা ছেড়ে দিলে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। তবে গাফলতি বা ইত্যাকার অন্য কোন কারণে তা কেউ আদায় না করলে সে কাফির হবে না বটে; তবে সে শাস্তিযোগ্য হবে।[৯৯]

---

৯৫. আত্ তিরমিযী, (কিতাবুল ইস্তি'যান), হা.নং : ২৭২৮

৯৬. শায়খী যাদাহ, *মাজমা'..*, খ.২, পৃ.৫৪২; রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ.৭, পৃ.৪১৭; কালয়ূবী ও 'উমায়রাহ, *আল-হাশিয়াতু..*, খ.১, পৃ.৩৯

৯৭. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.২৩, পৃ.১৩৫

৯৮. এটা মালিকী ও হাম্বলীগণের অভিমত। (ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ.৬, পৃ.১৬৮; ইবনু গুনায়ম, *আল-ফাওয়াকিহ..*, খ.২, পৃ.২৮১)

৯৯. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.২২; নববী, *আল-মাজমূ'*, খ.৫, পৃ.৩০৭

৫. যাদু করা

ইসলামী শরী'আতে যাদু[১০০] একটি মারাত্মক ঘৃণিত কাজ। এর শিক্ষা দান ও গ্রহণ দুটিই হারাম।[১০১] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভাষায়- এটি ইসলামের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর সাতটি বিষয়ের মধ্যে অন্যতম।[১০২]

হানাফীগণের মতে, দু'অবস্থায় যাদুকরকে শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা হবে।

ক. যদি যাদুতে কোন কুফরী বা শিরকী বাক্য বা কাজের আশ্রয় নেয়া হয়।

খ. অথবা কুফরীর আশ্রয় নেয়া ছাড়াই যাদুর সাহায্যে সচরাচর মানুষের ক্ষতি সাধন করার কাজে পরিচিতি লাভ করে। এ অবস্থায় তাকে হত্যার কারণ কুফরী নয়; মানুষের ক্ষতি সাধনের চেষ্টায় রত থাকাই হল এর মূল কারণ। ইসলামী শাস্তি আইনে কুফরী ছাড়া অন্য যে কোন মারাত্মক অপরাধের কারণেও কাউকে হত্যা করা যেতে পারে। অতএব যাদুকর যেহেতু তার কাজের মাধ্যমে গোপনে মানুষের ক্ষতি সাধন করে এবং তা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয় অথবা সে নিজে স্বীকারোক্তি দেয়, তাহলে মানুষদেরকে তার ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য তাকে হত্যাই করতে হবে। উপরন্তু তাকে তাওবা করতে বলা যাবে না এবং সে তাওবা করলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ বিষয়ে মুসলিম ও অমুসলিম সকলের জন্য একই বিধান প্রযোজ্য হবে।[১০৩] তবে মালিকী, হাম্বলী ও কতিপয় হানাফী ইমামের মতে, অমুসলিম যাদুকরকে হত্যা করা যাবে না; বরং তা'যীরের আওতায় অন্য যে কোন উপযুক্ত শাস্তি দেয়া যাবে।[১০৪] যাদুকরের তাওবা কবুল না হবার দলীল হল ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, حد

---

১০০. যাদু বলতে বিভিন্ন গোপন কৌশলের সাহায্যে নানা অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ঘটানোর প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়। যাদুতে প্রায়শ কুফরী ও শিরকী উক্তির সাহায্যে শয়তান ও জিনের সাহায্য চাওয়া হয়। বিভিন্ন খারাপ মতলব ও উদ্দেশ্য (যেমন কাউকে ক্ষতি করা, মেরে ফেলা বা দুর্বল করা, পরস্পরের সম্পর্ক নষ্ট করা ও অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রভৃতি) নিয়ে যাদু করা হয়।

১০১. অধিকাংশ ইমামের মতে, যাদু শিক্ষা ও চর্চা কুফরী নয়, যদি তা মুবাহ হিসেবে বিশ্বাস করা না হয় কিংবা তাতে কোন কুফরী বাক্য বা কাজের আশ্রয় না নেয়া হয়। তবে মালিকী ও হাম্বলীগণের মতে, যাদু কেউ হারাম বলে বিশ্বাস করুক কিংবা মুবাহ বলে বিশ্বাস করুক - সর্বাবস্থায় যাদু শিক্ষা ও চর্চা দুটিই কুফরী। (ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৩৪; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.৬,পৃ.৯৮; আল-হায়তমী, তুহফাতুল মুহতাজ, খ.৯, পৃ.৬২)

১০২. বুখারী, হা.নং : ২৬১৫; মুসলিম, (কিতাবুল ঈমান), হা.নং : ৮৯

১০৩. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ. ২৪০; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৬, পৃ.৯৮

১০৪. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৩৭; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ.১১৭; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ.৩৫৩; আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৬, পৃ.১৮৭

الساحر ضربة بالسيف. - "যাদুকরের হদ্দ হল তরবারির আঘাতে হত্যা করা।"[১০৫] এ হাদীসে যাদুকরের শাস্তিকে হদ্দ নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হদ্দযোগ্য অপরাধ প্রমাণিত হবার পর তাওবার কারণে হদ্দ রহিত হবে না। হযরত 'আয়িশা (রা) থেকেও বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা যাদুকর কয়েকজন সাহাবীর নিকট জানতে চেয়েছিলেন, তার তাওবার কোন সুযোগ আছে কি (অর্থাৎ তাওবার মাধ্যমে দুনিয়ার শাস্তি থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় আছে কি)? তাঁদের কেউ এ ব্যাপারে ফাতওয়া দেন নি।[১০৬] তদুপরি যাদুকর যেহেতু গোপনে কর্মকাণ্ড চালায়, তাই সে খাঁটি তাওবা করছে কি না- তাও জানা মুশকিল।

শাফি'ঈগণের মতে, যাদুতে যদি কোন কুফরী বাক্য বা কাজের আশ্রয় না নেয়া হয়, তাহলে তা কুফরী বলে গণ্য হবে না। আর এ জন্য যাদুকরকে হত্যা করা যাবে না, যে যাবত সে কাউকে স্বেচ্ছায় হত্যা করেছে বলে স্বীকার করবে না। তবে হাম্বলীগণের মতে, যাদুকর যাদুর সাহায্যে হত্যা করেছে- তা প্রমাণিত না হলেও যাদুকরকে হদ্দের আওতায় হত্যা করা হবে, যদি সে যাদুকে মুবাহ বলে বিশ্বাস করে।[১০৭]

মালিকীগণের মতে, যদি যাদুকর প্রকাশ্যই কুফরী যাদুর কাজ করে এবং তা প্রমাণিত হয়, তাহলে কুফরীর কারণে তাকে হত্যা করা হবে। তবে সে তাওবা করলে তার তাওবা কবুল করা হবে। যদি সে গোপনেই যাদুর কাজ করে, তাহলে তাকে যিন্দীকের মতই গণনা করা হবে এবং এ জন্য তাকে হত্যা করা হবে এবং তার তাওবাও গ্রহণযোগ্য হবে না।[১০৮]

শাফি'ঈগণের মতে, যদি কেউ যাদুকে হারাম বিশ্বাস করেই শিক্ষা দেয় বা শিক্ষা নেয়, তা হলে তাকে কাফির বলা যাবে না। এ জন্য তা'যীরের আওতায় আদালত সুবিবেচনা অনুযায়ী তাকে যে কোন রূপ শাস্তি দিতে পারবে। তবে কেউ হারাম জানার পরও যদি তাকে মুবাহ বলে বিশ্বাস করে, তাহলে তাকে কাফির বলা হবে। কেননা হারাম জেনেও তাকে মুবাহ বলে বিশ্বাস করা

---

১০৫. আত্ তিরমিযী, (আবওয়াবুল হুদূদ), হা.নং: ১৪৬০; বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং : ১৬২৭৭

১০৬. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৩৬

১০৭. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.১, পৃ. ২৯৩; আশ-শারবীনী, *মুগনিউল মুহতাজ*, খ.৫, পৃ...; আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৬, পৃ.১৮৬

১০৮. আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ.১১৭; ইবনু গুনায়ম, *আল-ফাওয়াকিহ..*, খ.২, পৃ.১০০

আল্লাহর বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শামিল। এ কারণে তার ওপর মুরতাদের বিধান কার্যকর করা হবে। মুরতাদকে যেমন হত্যা করা হয়, তেমনি তাকেও হত্যা করা হবে। তাঁদের এ বক্তব্য থেকে জানা যায়, মুরতাদের তাওবার মত যাদুকর তাওবা করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং তাকে হত্যা করা যাবে না।[১০৯]

যাদুতে কুফরীর আশ্রয় নেয়নি কিংবা যাদুর সাহায্যে কাউকে হত্যা করেনি-এ ধরনের যাদুকরকেও তা'যীরের আওতায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, যাতে সে আর কখনোই এবং তার মত আর কেউ এ পেশায় এগিয়ে আসতে সাহস না পায়।[১১০]

যাদুর মত হস্তরেখা গণনা এবং রাশির ওপর ভিত্তি করে বা জিনকে বশ করে অনুমানভিত্তিক গায়েবের কথা বলাও হারাম। কোন মুসলিম এগুলোকে মুবাহ বলে বিশ্বাস করলে সে কাফির হবে এবং এ ধরনের পেশা অবলম্বনকারী মুসলিম হত্যার যোগ্য হবে। হযরত 'উমার (রা) বলেছেন, اقتلوا كل ساحر و كاهن. - "প্রত্যেক যাদুকর ও জ্যোতিষীকে হত্যা কর।"[১১১] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,. ليس منا من تكهن ' و تكهن له - "যে গণনা করে এবং যার জন্য গণনা করা হয় উভয়ে আমার দলের অর্ন্তভুক্ত নয়।"[১১২] তিনি আরো বলেন, و من آتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد (ص). - "যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসল এবং তার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করল, বস্তুত পক্ষে সে আমার ওপর অবতীর্ণ বাণীকেই অস্বীকার করল।"[১১৩] তবে যদি কেউ এগুলোকে মুবাহ কিংবা বাস্তবসম্মত ব্যাপার মনে না করে খেয়ালী বিষয় ধরে নিয়েই চর্চা করে, শিক্ষা দেয় বা শিক্ষা গ্রহণ করে, তা হলে তা অবশ্যই কুফরী হবে না বটে; তবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। এ পথে

---

১০৯. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.১, পৃ. ২৯৩; আশ-শারবীনী, *মুগনিউল মুহতাজ*, খ.৫, পৃ... । ইমাম আহমদ (রহ) থেকেও এ ধরনের একটি মত বর্ণিত রয়েছে। (ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৩৫)

১১০. এটা শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের অভিমত। (শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.১, পৃ. ২৯৩; আশ-শারবীনী, *মুগনিউল মুহতাজ*, খ.৫, আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৬, পৃ.১৮৬)

১১১. আবূ দাউদ, (কিতাবুল খারাজ), হা.নং : ৩০৪৩; ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং : ৩২৬৫৪

১১২. আত্ তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, হা.নং : ৪২৬২, ৪৮৪৪, *আল-মু'জামুল কবীর*, হা.নং : ৩৫৫

১১৩. আবূ দাউদ, (কিতাবুত তিব), হা.নং : ৩৯০৪; ইবনু মাজাহ, (কিতাবুত তাহারাত), হা.নং : ৬৩৯

তার সমস্ত উপার্জন হারাম হবে। উপরন্তু তা'যীরের আওতায় তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।[১১৪]

ঘ. বর্জন জাতীয় বিষয়সমূহ ঃ

ইসলামের যে কোন অকাট্য ও সুস্পষ্ট বিধান, যা 'আমল করা সর্বসম্মতভাবে ফরয (যেমন নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ প্রভৃতি) কেউ অস্বীকার করে তা আমল করা ছেড়ে দিলে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দশনগুলোকে- চাই তা ফরয হোক বা সুন্নাত- জিইয়ে রাখা মুসলিমদের একান্ত কর্তব্য। তাই কোন এলাকা কিংবা কোন জনপদ বা কোন দেশের লোকজন যদি সম্মিলিতভাবে ইসলামের কোন প্রকাশ্য নিদর্শনের (যেমন নামাযের জামা'আত, আযান, ইকামত ও ঈদের নামায প্রভৃতি) বিরোধিতা করে এবং তা বর্জন করে, তা হলে তাদেরকে তা পালন করতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজন হলে তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। কেননা সম্মিলিতভাবে ইসলামের কোন নির্দশন ত্যাগ করা তাকে অবজ্ঞা করার নামান্তর। এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ)-এর মতে, তাদের সাথে সশস্ত্র লড়াই করা যাবে না। তবে তাদেরকে বন্দী করা হবে এবং প্রহার করা হবে।[১১৫]

যিন্দীকের শাস্তি ঃ

যিন্দীক বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যে মনের ভেতর কুফরী লুকিয়ে রাখে এবং বাইরে নিজেকে একজন প্রকৃত মুসলিম হিসেবে প্রকাশ করে।[১১৬] এ রূপ ব্যক্তির কোন কোন আমলের মাধ্যমে তার অন্তরের কুটিলতা ধরা পড়ে যায়। দীন ও মিল্লাতের জন্য এ ধরনের ব্যক্তি ভীষণ ক্ষতিকর। তারা মিল্লাতের

---

১১৪. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ. ২৪২; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৩৭

১১৫. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.১, পৃ.২৬৯; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.২৬, পৃ. ৯৮-৯

১১৬. 'আল্লামা দসূকী বলেন, ইসলামের প্রাথমিক কালে এ ধরনের লোকেরাই মুনাফিক নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে ফকীহগণ (ইসলামী আইনতত্ত্ববিদ) তাদেরকেই যিন্দীক নামে অভিহিত করেন। তবে কেউ কেউ মুনাফিক ও যিন্দীকের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য করেছেন। মুনাফিক হল যার অন্তরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি কোন বিশ্বাসই নেই। আর যিন্দীক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে। হানাফী ও কতিপয় শাফি'ঈ ইমামের মতে, যার কোন দীন-ধর্ম নেই সে যিন্দীক। শরী'আতের নিষিদ্ধ ঘোষিত বিষয়গুলোকে মুবাহ বলে বিশ্বাস করাও যিন্দীকের একটি বিশেষ পরিচয়।

বন্ধু সেজে ভেতরে ভেতরে মিল্লাতের ধ্বংস ডেকে আনে। তাদের শাস্তি ও তাওবা কবুল হবার ব্যাপারে ইমামগণের দুটি মত রয়েছে।[১১৭]

১. যথার্থ সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা কেউ যিন্দীক বলে সাব্যস্ত হলে তাকে হত্যা করা হবে। তাকে তাওবা করতে বলা হবে না। অধিকন্তু সে তাওবার দাবী করলেও তা গ্রহণ করা হবে না। তবে যদি সে তার মামলা আদালতে পেশ হবার আগেই তাওবা করে স্বতস্ফূর্তভাবে বিচারকের দরবারে হাজির হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নেয়, তাহলেই তার তাওবা কবুল করা হবে। এটা মালিকী ইমামগণের অভিমত। হানাফী, শাফি'ঈ ও হাম্বলী প্রভৃতি স্কুলের মধ্যেও এর অনুরূপ একটি অভিমতও পাওয়া যায়। তাঁদের বক্তব্য হলঃ যিন্দীকের তাওবা থেকে এ কথা বোঝতে পারা সম্ভব নয় যে, সে তার পূর্বের কপট ও কুটিল আচরণ থেকে ফিরে এসেছে। কারণ তার বাহ্যিক রূপ তো সর্বদা একজন প্রকৃত মুসলিমের মতোই। তাই তার তাওবা নতুন কোন ফায়দা দেবে না।

২. যিন্দীকের বিধান মুরতাদের বিধানের মতোই। তাকে প্রথমে বন্দী করে তাওবা করতে বলা হবে। যদি সে তাওবা করে এবং সে প্রকৃত অর্থেই তাওবা করেছে তার প্রমাণও যদি মিলে, তা হলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। এটি হানাফী, শাফি'ঈ ও হাম্বলী প্রভৃতি স্কুলের ইমামগণের দুটি অভিমতের মধ্যে একটি। হযরত 'আলী (রা) ও ইবন মাস'উদ (রা) থেকেও এ ধরনের মত বর্ণিত রয়েছে। তাঁদের বক্তব্য হল ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুনাফিকদেরকে চেনার পরও হত্যা করেন নি। সুতরাং তাঁর কর্মনীতি থেকে বোঝা যায়, যে যাবত না তাদের কুটিলতা ধরা পড়বে, ততক্ষণ তাদের কোন রূপ শাস্তি দেয়া যাবে না। আর কোন রূপ কুটিলতা ধরা পড়লে তাদেরকে মুরতাদের মত প্রথমে তাওবার সুযোগ দিতে হবে।

ইবাদাত আদায় না করার শাস্তি ঃ

ক. বাধ্যতামূলক 'ইবাদাত তরক করার শাস্তি ঃ

শরী'আতের কোন বাধ্যতামূলক (ফরয) 'ইবাদাত (যেমন নামায, যাকাত, রোযা

---

১১৭. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ. ১৮-৯; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৬, পৃ.৯৮; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ. ১৬৯-৭০; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৫, পৃ. ২৮২; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ.৬, পৃ.১৬৬

ও হজ্জ প্রভৃতি) কেউ গাফলতি বা ইত্যাকার অন্য কোন কারণে আদায় না করলে সে ফাসিক হবে এবং এ ধরনের কোন কোন ইবাদাতের জন্য সে শাস্তিযোগ্য হবে।

সালাত ছেড়ে দেয়ার শাস্তি ঃ

কেউ গাফলতি করে নামায ছেড়ে দিলে তাকে প্রথম তা'যীরের আওতায় সংশোধনমূলক শাস্তি দেয়া হবে। যদি দেখা যায়, এরপরও সে দীর্ঘ সময় ধরে নামায পড়ছে না, তাহলে তাকে হদ্দের আওতায় হত্যা করা হবে; কাফির ও মুরতাদ হবার কারণে নয়। এটা মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামগণের অভিমত। ইমাম আহমাদ (রহ) থেকেও এ ধরনের একটি মত বর্ণিত রয়েছে। কারো কারো মতে, ইচ্ছাকৃতভাবে নামায তরককারী কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে এবং এ কারণে তাকে হত্যা করা হবে। এটা সা'ঈদ ইবন যুবায়র, ইব্রাহীম নাখ'ঈ, আওযা'ঈ, আবদুল্লাহ ইবন মুবারক ও ইসহাক ইবনু রাহ্ওয়াইহ (রহ) প্রমুখের অভিমত। ইমাম আহমাদ (রহ) থেকেও এ ধরনের একটি মত বর্ণিত রয়েছে। তাঁদের দলীল হল: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, من ترك الصلوة متعمدا فقد كفر. "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দিল, সে কুফরী করল।"[১১৮] হানাফীগণের মতে, তাকে বন্দী করে রাখা হবে, যে যাবত না সে তাওবা করে নামায পড়া শুরু করে। তাকে হত্যা করা জায়িয নয়।[১১৯]

যাকাত আদায় না করার শাস্তি ঃ

কেউ কার্পণ্য করে যাকাত আদায় না করলে তার নিকট থেকে জোর করে যাকাত আদায় করে নেয়া হবে। এ জন্য প্রয়োজন হলে তার সাথে লড়াই করতে হবে, যদি সে সরকারের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গিয়ে অস্ত্র ধারণ করে। বর্ণিত রয়েছে, হযরত আবূ বাকর (রা) যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে লড়াই করেছিলেন। হানাফীগণের মতে, তা'যীরের আওতায় তাকে বন্দী করে রাখতে হবে, যে যাবত না সে যাকাত আদায় করে। শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে,

---

১১৮. আত্ তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, হা.নং : ৩৩৪৮; আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুল ঈমান), হা.নং : ১১

১১৯. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.২, পৃ.৩৩৯, খ.১৬, পৃ.৩০২-৩, খ.২২, পৃ.১৮৭, খ.২৭, পৃ.৫৩-৪; নববী, *আল-মাজমূ'*, খ.৩, পৃ.১৮-৯; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.২, পৃ.১৫৬-৮; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৬৪; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.৪৯; আশ-শাওকানী, *নায়লুল আওতার*, খ.১, পৃ.২৪৮

বলপ্রয়োগ করে কঠোরতার সাথে যাকাত আদায় করা হবে এবং সরকার সুবিবেচনা অনুযায়ী তাকে যে কোন রূপ শাস্তি দিতে পারবে।[১২০]

রোযা না রাখার শাস্তি ঃ

কোন ব্যক্তি কোন শার'ঈ ওযর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের রোযা না রাখলে সে শাস্তিযোগ্য হবে। হানাফীগণের মতে, তাকে তা'যীরের আওতায় বন্দী করে রাখা হবে, যে যাবত না সে তাওবা করে রোযা রাখা শুরু করে। কারো কারো মতে, তাকে বন্দী অবস্থায় প্রহারও করা হবে। 'আল্লামা শারানবিলালীর মতে, যদি কেউ রমযান মাসে প্রকাশ্যে কোন ওযর ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা রাখা ছেড়ে দেয়, তাকে হত্যা করা হবে। কেননা তার এ কাজ থেকে বোঝা যায়, সে হয়ত রোযাকে উপহাস করছে অথবা তার ফারযিয়্যাতকে অস্বীকার করছে। কারো মতে, এ রূপ ব্যক্তিকে বিচারক সুবিবেচনা অনুযায়ী বেত্রাঘাত, কিংবা কারাদণ্ড অথবা উভয়বিধ শাস্তি দিতে পারবেন। শাফি'ঈগণের মতে, এ রূপ ব্যক্তিকে আটকে রাখা হবে এবং দিনে পানাহার থেকে বারণ করা হবে। মাওয়ার্দীর মতে, তাকে পুরো রমযান মাস আটক করে রাখা হবে।[১২১]

যে ব্যক্তি রমযান মাসে মদ্যপান করবে, তাকে মদ্যপানের হদ্দ হিসেবে আশিটি বেত্রাঘাত করার পর রমযানের পবিত্রতা নষ্ট করার কারণে তাকে বন্দী করা হবে এবং আরো অতিরিক্ত বিশটি বেত্রাঘাত করা হবে। হযরত 'আলী (রা) থেকে এ ধরনের মত বর্ণিত রয়েছে।[১২২]

হজ্জ পালন না করার শাস্তি ঃ

হজ্জ ফরয হবার পরেও কেউ হজ্জ না করলে তাকে হজ্জ আদায় করতে বাধ্য করা যাবে না। কারণ, হজ্জের ফরযের ক্ষেত্রে সার্বিক সামর্থ্যের একটি ব্যাপার জড়িত রয়েছে। তাই হজ্জ না করার ক্ষেত্রে কারো এমন অভ্যন্তরীন সমস্যাও

---

১২০. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.২, পৃ.৩৩৯, খ.৪, পৃ.২৬৯; আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, পৃ.৭২-৩; আল-জসসাস, *আহকামুল কুর'আন*, খ.৩, পৃ.১২৩; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.২, পৃ. ৩১৮; ইবনু রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, খ.১, পৃ. ২৫০;

১২১. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.১৬, পৃ.৩০৩; আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, পৃ.৭২-৩; আল-জসসাস, *আহকামুল কুর'আন*, খ.৩, পৃ.১২৩; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.২, পৃ. ৩১৮; ইবনু রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, খ.১, পৃ. ২৫০

১২২. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৪, পৃ. ৩৩; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ. ৩৪৯

থাকতে পারে, যা বাইরের লোকদের জানার সুযোগ নেই। তদুপরি কেউ জীবদ্দশায় হজ্জ করে যেতে সমর্থ না হলে মৃত্যুর পরে তার নায়িবী হজ্জ করানোরও সুযোগ রয়েছে।[১২৩]

খ. বাধ্যতামূলক নয় এমন 'ইবাদাত তরক করার শাস্তি ঃ

শরী'আতের বাধ্যতামূলক নয় এমন কোন ইবাদাত (ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ও নফল) সাধারণত কেউ পালন না করলে তাকে ফাসিক বলা যাবে না এবং এজন্য সে শাস্তিযোগ্যও হবে না। তবে এ ধরনের যে সব ইবাদাত ইসলামের নির্দশন রূপে বিবেচিত (যেমন নামাযের জামা'আত, আযান, ইকামত ও দু ঈদের নামায প্রভৃতি) তন্মধ্যে কোন ইবাদাতকে যদি কোন এলাকার লোকজন সম্মিলিতভাবে পরিহার করে, তাহলে প্রথমত তাদেরকে তা করার জন্য বাধ্য করা হবে। প্রয়োজনে তাদের সকলর সাথে লড়াই করা ওয়াজিব হবে।[১২৪]

---

১২৩. নববী, *আল-মাজমূ'*, খ.৭. পৃ.৩; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৪, পৃ. ২-৪; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.২, পৃ.১০৭৮

১২৪. এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ)-এর মতে, তাদের সাথে সশস্ত্র লড়াই করা যাবে না; তবে তাদেরকে বন্দী করা হবে এবং প্রহার করা হবে। (ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.১. পৃ.২৬৯; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.২, পৃ.৩৩৯, খ.২৬, পৃ. ৯৮-৯, খ.৩২, পৃ.৩২০)

৭. সরকারদ্রোহিতার শাস্তি

ইসলামী রাষ্ট্র একটি জনকল্যাণমূলক আদর্শ রাষ্ট্র। জনগণের কল্যাণ সাধনই এর প্রকৃত লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে কার্যত পৌঁছতে হলে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক গোলযোগ এবং আঞ্চলিক বিদ্রোহ একটি কল্যাণকর উন্নত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে একটি বড় অন্তরায়। তাই ইসলাম এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে সরকারদ্রোহিতার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে।

সরকারদ্রোহিতার সংজ্ঞা ঃ

সরকারদ্রোহিতাকে আরবীতে بغي বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ অন্যায় করা, সীমা লঙ্ঘন করা।[১] ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় সাধারণত بغي বলতে সরকারের আনুগত্য থেকে অন্যায়ভাবে বেরিয়ে পড়াকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে কতিপয় মুসলিম দলবদ্ধভাবে কোন একটি খোঁড়া অজুহাত তৈরি করে সরকারের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে বিকল্প নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং সরকার উৎখাতের জন্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করাকে بغي বলা হয়। আর যে মুসলিম এভাবে সরকারের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে প্রকাশ্যে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাকে باغي (সরকারদ্রোহী) বলা হয়।[২]

উপর্যুক্ত সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায়, সরকারদ্রোহিতার জন্য নিম্নের ছয়টি শর্ত পাওয়া গেলেই সরকারের বিরোধিতাকে সরকারদ্রোহিতা রূপে গণ্য করা হবে।

১. বিদ্রোহকারীদের মুসলিম হওয়া
২. সরকারের আনুগত্য অস্বীকার করা
৩. অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী হওয়া

---

১. যেমন বলা হয়-بغى عليه - "সে অমুকের প্রতি অন্যায় করল কিংবা সীমালঙ্ঘন করল।" (আর-রাযী, *মুখতারুস সিহাহ*, খ.১, পৃ.২৪; ইবনু মানযুর বলেন, এর মূল অর্থ হল : হিংসা। তবে এটি অন্যায়-অবিচার অর্থেই বহুল ব্যবহৃত। কেননা হিংসুটে ব্যক্তি প্রায়শ হিংসাকৃত ব্যক্তির সাথে অন্যায় আচরণ করে থাকে। তাছাড়া শব্দটি খোঁজ করা, অনুসন্ধান করা অর্থেও ব্যবহার করা হয়। (ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, খ.১৪, পৃ.৭৯)

২. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ. ১৫১; যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ.২৯৪; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.১১১-২

৪. সরকারের বিরোধিতার পক্ষে কোন যুক্তি থাকা, যদিও তা সঠিক নয়
৫. সরকারের বিরুদ্ধে বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তোলা
৬. সরকার পতনের জন্য প্রকাশ্যে হত্যা ও বিভিন্ন অপরাধ সৃষ্টি করা

অতএব, অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের আনুগত্য অস্বীকার করে বিদ্রোহ করলে তারা সরকারদ্রোহী হবে না; তারা হবে হারাবী (রাষ্ট্রদ্রোহী)। তাদের জন্য হারাবীদের শাস্তি প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে মুসলিমদের কোন দল যদি কোন যৌক্তিক কারণ প্রদর্শন করা ছাড়া এবং সরকারের ক্ষমতা দখল করার অভিপ্রায় ব্যতীত সরকারের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে পড়ে তারাও সরকারদ্রোহী হবে না। তারা হবে সন্ত্রাসী। তাদের জন্য মুহারিব (সন্ত্রাসী)দের শাস্তি প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে কেউ কোন অজুহাতে নিয়মানুগ সরকারের আনুগত্য অস্বীকার করলে কিংবা সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করলে (যেমন - সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো) সে সরকারদ্রোহী রূপে গণ্য হবে না; যে যাবত না সে সরকার উৎখাতের জন্য দলীয় প্রচেষ্টায় কোন রূপ অপরাধ সংঘটিত করবে বা লড়াই করবে। কেননা ব্যক্তিগত কিংবা দলীয়ভাবে নিছক সরকারের বিরোধিতার কারণে কেউ বা কোন দল শাস্তিযোগ্য হতে পারে না।[৩] ‘আল্লামা সান‘আনী বলেন, “কেউ যদি জমা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়; কিন্তু সমাজে কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে এবং লড়াইয়ে অবতীর্ণ না হয়, তা হলে তার পথকে বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। কেননা নিছক সরকারের বিরোধিতার কারণে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা সমীচীন নয়।”[৪] শাফি‘ঈগণের মতে, সরকারের বিরোধিতা করা অন্যায় কিছু নয়; কেননা বিরোধিতাকারীরা তাদের ধারণা অনুযায়ী কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নিয়েই বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে, যদিও তারা তাদের ব্যাখ্যায় হয় তো সঠিক নয়। তাই তাদেরকে এ ক্ষেত্রে সমস্যাগ্রস্ত মনে করতে হবে।”[৫]

উপরন্তু, ইসলামের দৃষ্টিতে সরকারের অন্যায় কাজের সমালোচনা করা শুধু জায়িযই নয়; বরং সর্বোত্তম জিহাদ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, -“افضل الجهاد كلمة حق / عدل عند سلطان جائر.”

---

৩. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ. ১৫১; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ.২৯৪; আল-জুমাল, *ফুতুহাত..*, খ.৫, পৃ.১১৭-৮; আল-বুজায়রমী, *তুহফাতুল হাবীব*, খ.৪, পৃ. ২৩৩
৪. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.৮, পৃ.১৩১
৫. হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯, পৃ.৬৬; আর-রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*,খ.৭, পৃ.৪০৬

অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য/ন্যায় কথা বলাই সর্বোত্তম জিহাদ।"[৬] উপরন্তু, যে সমাজে ইসলামী শরী'আত প্রতিষ্ঠিত নেই এবং অত্যাচারী শাসকের স্বৈরশাসনে যেখানে জনজীবন বিপন্ন, সেখানে সুশৃঙ্খল উপায়ে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করা এবং আল্লাহদ্রোহী যালিমদের আনুগত্য অস্বীকার করে বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তোলা সরকারদ্রোহিতা তো নয়; বরং ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ, যা মুসলিমের জন্য একটি বড় ফরয। সকল মুসলিমের কর্তব্য হল, তাদেরকে জান-মাল দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করা। যদি তারা তাদের সাহায্য করা ছেড়ে দিয়ে যালিম ও আল্লাহদ্রোহী সরকারের আনুগত্য করে- তাহলে এটা হবে হারাম। কেননা আল্লাহর নাফরমানী করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা হারাম। তবে জিহাদের নামে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করা, নিরীহ লোকদের হত্যা করা, পথে-ঘাটে লোকদের ভয়প্রদর্শন করা এবং জাতীয় ও মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ ধ্বংস ও লুটপাট করা কেবল হারামই নয়; বরং ইসলামকে কলঙ্কিত করার শামিল।

সরকারদ্রোহিতা দমনের পদ্ধতি ঃ

ক. লড়াই পূর্ববর্তী পদক্ষেপ ঃ

সরকারদ্রোহীকে প্রথমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাঁয়তারা পরিহার করে সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়ার জন্য আহবান জানাতে হবে এবং তাদের বিদ্রোহের কারণ জানার চেষ্টা করতে হবে। যদি তাদের বিদ্রোহের কারণ সরকারের পক্ষ থেকে কোন অন্যায়-অবিচারের শিকার হবার কারণে হয়ে থাকে, তা হলে তা নিরসন করতে হবে। যদি তারা এমন কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখ করে, যা মেনে নেওয়া সম্ভব, তা হলে তা মেনে নিতে হবে। যদি কোন বিষয়ে তাদের কোন অস্পষ্টতা কিংবা সন্দেহ থাকে, তা দূরিভূত করতে হবে। উপরন্তু, তাদেরকে ভয়ভীতিও দেখাবে এবং প্রয়োজনীয় উপদেশও দেবে। কেননা পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবার আগে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, و أن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. - "যদি মু'মিনদের দুটি দল লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, তা হলে তোমরা তাদের মধ্যে সমঝোতা করে দাও।"[৭] তদুপরি এ

---

৬. আবূ দাউদ, (বাব : আল-আমর ওয়ান নাহ্ই), হা.নং : ৪৩৪৪; তিরমিযী, (কিতাবুল ফিতান), হা.নং : ২১৭৪; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, হা.নং : ৮০৮১

৭. আল-কুর'আন, ৪৯ (আল-হুজরাত) : ৯

ক্ষেত্রে একমাত্র উদ্দেশ্য হল তাদেরকে দমন করা এবং তাদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পায়তারা বন্ধ করা। যুদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। তাই কথার সাহায্যে যে ক্ষেত্রে তাদেরকে দমন করা সম্ভব হবে, সে ক্ষেত্রে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া সঙ্গত নয়। কারণ তাতে দু'দলেরই ক্ষতি হবার আশঙ্কা রয়েছে। অতএব, সমঝোতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করার আগে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া জায়িয হবে না, যদি না তাদের পক্ষ থেকে কোন অরাজকতার সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে।

যদি তারা অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণের জন্য কিছু দিন সময় কামনা করে আর যদি প্রকাশ্যত বোঝা যায় যে, তাদের এ আবেদনের উদ্দেশ্য সরকারের আনুগত্যে ফিরে আসা, তা হলে তাদেরকে একটি যৌক্তিক সময় পর্যন্ত নিজেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সুযোগ দিতে হবে। এর পরও যদি তারা হঠকারী ভূমিকা গ্রহণ করে, তাহলে তাদেরকে লড়াই করতে আহবান জানাবে। যদি সরকার জানতে পারে যে, বিদ্রোহীরা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তা হলে সরকারের উচিত তাদেরকে গ্রেফতার করা, যে যাবত না তাওবা করে তারা আনুগত্যের পথে ফিরে আসে। যদি সরকারের অগোচরেই তারা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়েই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, তা হলে প্রথমত সরকার তাদেরকে বিদ্রোহ ত্যাগ করে আনুগত্যে ফিরে আসার জন্য দাওয়াত জানাতে পারে।[৮] তবে এমতাবস্থায় লড়াইয়ের প্রতি আহবান জানানো ছাড়াই তাদের সাথে লড়াই করতে কোন অসুবিধা নেই।[৯] হানাফীগণের মতে, বিদ্রোহীদেরকে আনুগত্যের প্রতি আহবান এবং তাদের সন্দেহ দূরিভূতকরণ ওয়াজিব নয়; তবে মুস্তাহাব। তদুপরি লড়াইয়ের প্রতি বিনা আহবানেও তাদের সাথে লড়াই করা যাবে।[১০] মালিকীগণের মতে, যদি তারা তাড়াহুড়া না করে, তা হলে তাদেরকে প্রথমে

---

৮. বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা) উষ্ট্র যুদ্ধের পূর্বে বসরাবাসীদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন এবং তাঁর সাথীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে তাঁরা নিজেরা লড়াই শুরু না করে। (বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা'*, হা.নং : ৪৫৭১; ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং : ৩৭৭৮৪) অনুরূপভাবে হারুরাবাসীরা যখন হযরত 'আলী (রা)-এর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে বিদ্রোহের ঘোষণা দিল, তখন তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা)কে তাদের কাছে ইনসাফের বার্তা নিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে আরো নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা যদি তোমাদের কথার সায় দেয়, তাহলে তাদের ওপর তোমরা আক্রমণ করবে না। আর যদি তারা তোমাদের কথা মেনে না নেয়, তাহলে তোমরা তাদের সাথে লড়াই করবে। (ইবনু হাজর আল 'আসকালানী, *আদ-দিরায়াহ*, খ.২, পৃ. ১৩৮; ইবনুল হুমাম, *ফাতহিল কাদীর*, খ.৬, পৃ. ১৩১-২)

৯. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৭, পৃ. ১৪০; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.১০, পৃ. ১২৮; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ.২৯৪; ইবনুল হুমাম, *ফাতুহুল কাদীর*, খ.৬, পৃ.১০০-১; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.১১৪; হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯, পৃ.৭০-১; 'উলায়স, *মিনহুল জলীল*, খ.৯, পৃ.২০১; আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.১৬২

১০. ইবনুল হুমাম, *ফাতুহুল কাদীর* , খ.৬, পৃ.১০০-১

ভীতিপ্রদর্শন করতে হবে এবং তাদেরকে আনুগত্যে ফিরে আসার জন্য আহবান জানাতে হবে।[১১]

খ. লড়াই

যদি বিদ্রোহীরা সরকারের শান্তি-আহবানে সাড়া না দেয়, উপরন্তু তারা দলবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে, তাহলে তাদের সাথে লড়াই করা জায়িয হবে। তবে সরকারই কি তাদের সাথে লড়াইয়ের সূত্রপাত করবে না কি সরকার তাদের প্রকাশ্যে সশস্ত্র মহড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে- তা নিয়ে দুটি মত রয়েছে।

১. সরকারের জন্য লড়াইয়ের সূত্রপাত করা জায়িয হবে। কেননা সরকার যদি তাদের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে, তা হলে তারা শক্তি সঞ্চয় ও বৃদ্ধি করার সুযোগ পেয়ে যাবে। ফলে তাদের দমন করা দুরূহ হয়ে পড়বে। তদুপরি সরকারের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাবার কারণে তারা তো অপরাধীই বনে গেছে।[১২] পবিত্র কুর'আনে তাদের লড়াইয়ের সূত্রপাত করা পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فإن بغت أحدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله. - "যদি একদল অন্য দলের প্রতি বিদ্রোহ করে, তাহলে তোমরা বিদ্রোহকারী দলের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যে যাবত সে আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।"[১৩] হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও বলেছেন, يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرأون القرآن لا يجاوزون مراقيهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية ' فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. - "শেষ যুগে এমন কিছু অল্পবয়স্ক নির্বোধ লোক বের হবে, যারা মুখে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির বাণী উচ্চারণ করবে এবং কুর'আন শরীফ পড়বে; কিন্তু তা তাদের গলদেশ পার হবে না। তারা দীন থেকে দূরে সরে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে ছুটে যায়। যখন তোমরা তাদের সাক্ষাৎ পাবে তাদেরকে হত্যা করবে। কেননা কিয়ামাতের দিন তাদের হত্যাকারীর জন্য পুরস্কার রয়েছে।"[১৪]

---

১১. 'উলায়স, *মিনহুল জলীল*, খ.৯, পৃ.২০১

১২. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ.২৯৪; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.১৫২; আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.১৬১; আর-রুহায়বানী, *মাতালিব..*, খ.৬, পৃ. ২৭৩

১৩. আল-কুর'আন, ৪৯ (আল-হুজরাত) : ৯

১৪. সহীহ আল বুখারী, (কিতাবু ইসতিতাবাতুল মুরতাদ্দীন), হা.নং : ৬৫৩১; মুসলিম, (বাব :

তাদের লড়াইয়ের প্রস্তুতির পরও যদি তাদেরকে বন্দী করে তাদের অরাজকতা বন্ধ করা সম্ভবপর হয়, তাহলে লড়াই.না করে তাদেরকে বন্দীই করতে হবে। কেননা লড়াইয়ের চাইতে সহজতর উপায়ে যেহেতু তাদেরকে দমন করা সম্ভব হচ্ছে, তাই এর চাইতে কঠোরতর পথ অবলম্বন করা সমীচীন হবে না। এটা হানাফী ও অধিকাংশ হাম্বলী ইমামের অভিমত।

২. বিদ্রোহীরা লড়াইয়ের সূচনা করার আগে সরকার তাদের সাথে লড়াই শুরু করবে না। কেননা তাদের সাথে লড়াই করার উদ্দেশ্য হল তাদের অরাজকতা বন্ধ করা। অতএব তাদের সাথে লড়াই করা জায়িয হবে না, যে যাবত তারা কোন অরাজকতা সৃষ্টি করবে না। কারণ, আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া কোন মুসলিমের সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া জায়িয নয়। এটা শাফি'ঈগণের এবং হানাফী ইমামগণের মধ্যে কুদূরীর অভিমত।[১৫]

বিদ্রোহীদেরকে দমনের জন্য সরকার যদি জনগণের সহযোগিতা কামনা করে, তাহলে রাষ্ট্রের প্রত্যেক সামর্থ্যবান লোকের ওপর সরকারকে সাহায্য-সহযোগিতা করা ওয়াজিব হয়ে দাঁড়াবে, যদি সরকার অত্যাচারী ও আল্লাহদ্রোহী না হয়। কেননা অন্যায় নয়- এমন সকল কাজে সরকারের আনুগত্য করা সকলের জন্য ফরয। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, من بايع إماما فأعطاه صفقة يده و ثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. - "যে ব্যক্তি কোন ইমামের (সরকার প্রধান) হাতে বায়'আত করল এবং তাকে সমর্থন জানাল, তার উচিত যথাসাধ্য তার আনুগত্য করা। যদি অপর কোন ব্যক্তি তার বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়, তাহলে তোমরা তার গর্দান উড়িয়ে দাও।"[১৬] ইবনু কুদামাহ বলেন, মুসলিম উম্মাহ যে ব্যক্তির নেতৃত্ব ও বায়'আতের ওপর ঐকমত্য পোষণ করবে, তার নেতৃত্ব কার্যকর হবে এবং তাকে সহযোগিতা করা সকলের জন্য ওয়াজিব। উপরন্তু তার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া হারাম। কেননা তার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া প্রকারান্তরে গোটা উম্মাতের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করার নামান্তর। এ রূপ ব্যক্তিকে হত্যা করা জায়িয হবে।[১৭] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

আত-তাহরীদ 'আলা কাতলিল খাওয়ারিজ), হা.নং : ১০৬৬

১৫. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ.২৯৪; আল-হাদ্দাদী, *জাওহারাহ*, খ.২, পৃ.২৭৯-২৮০; হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯, পৃ.৬৬; আল-জুমাল, *ফুতুহাত..*, খ.৫, পৃ.১১৪

১৬. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল ইমারত), হা.নং : ১৮৪৪; আবূ দাউদ, (কিতাবুল ফিতান..), হা.নং : ৪২৪৮

১৭. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৩-৫

বলেছেন, من خرج على أمتي و هم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. - "যে ব্যক্তি আমার সুসংহত উম্মাতের আনুগত্য ত্যাগ করে বেরিয়ে যাবে, তোমরা তরবারি দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দাও, সে যে কেউ হোক না কেন।"[১৮]

প্রায় সকল ইমামের মতে, বিদ্রোহী মহিলা হলে তাকে আটক করে রাখা হবে, যদি সে লড়াই করে। তাকে লড়াইরত অবস্থা ছাড়া অন্য সময় হত্যা করা যাবে না। তাকে বন্দী করে রাখা হবে তার অপরাধের কারণে এবং বিপর্যয় ও ফিতনার সৃষ্টির পাঁয়তারা করার কারণে।[১৯] মালিকীগণের মতে, তাদের লড়াইয়ের প্রকৃতি যদি কেবল উৎসাহ যোগানো কিংবা পাথর ও ঢিল নিক্ষেপ হয়ে থাকে, তা হলে যুদ্ধাবস্থায়ও তাদেরকে হত্যা করা যাবে না।[২০]

লড়াই করার শর্তাবলী ঃ

যদি বিদ্রোহীরা সমঝোতায় না আসে তাহলে তাদের সাথে লড়াই করা জায়িয হবে, যদি তারা ১. নিরীহ ও নিরাপরাধ লোকদের অধিকারসমূহ নষ্ট করে ২. তাদের কারণে অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে ব্যাঘাত ঘটে। ৩. রাষ্ট্রীয় সম্পদ অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেয় ৪. আবশ্যকীয় পাওনা (যেমন- যাকাত, উশর ও রাজস্ব প্রভৃতি) পরিশোধ করা থেকে বিরত থাকে, ৫. প্রকাশ্যে ইমামের আনুগত্য ত্যাগ করে বিরোধিতার ঘোষণা দেয়।[২১] ৫. লড়াই ছাড়া অন্য কোন সহজ উপায়ে তাদেরকে দমন করা সম্ভব না হয় এবং ৬. তাওবা করে সরকারের আনুগত্যে ফিরে না আসে।[২২]

তবে বিশিষ্ট ইসলামী আইনতত্ত্ববিদ রামালীর মতে, বিদ্রোহীরা সমঝোতায় না আসলে যে কোন অবস্থায় তাদের সাথে লড়াই করা ওয়াজিব হবে। কেননা সশস্ত্র অবস্থায় বিদ্রোহকে জিইয়ে রাখা হলে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে এবং নিত্যনতুন এমন বিপর্যয় সৃষ্টি হতে থাকবে, যা প্রতিরোধ করা কঠিন হয়ে পড়বে।[২৩]

---

১৮. আত্ তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, হা.নং : ৩৫৪; 'আবদুর রযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং : ২০৭১৪; আবূ 'আওয়ানাহ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং : ৭১৪৫

১৯. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৭, পৃ. ১৩০; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৬, পৃ. ১০৪

২০. আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, খ.৮, পৃ.৬১-২; দাসূকী, *হাশিয়াতু 'আলাশ শারহিল কাবীর*, খ.৪, পৃ.৩০০

২১. এটা 'আল্লামা মাওয়ার্দীর অভিমত। (আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, পৃ.৭৪)

২২. আল-বুজায়রমী, *তুহফাতুল হাবীব*, খ.৪,পৃ.২২৮; আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, পৃ.৭৪; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.৮, পৃ.১৪০

২৩. আর-রামালী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ.৯, পৃ. ৭১

বিদ্রোহীদের সাথে লড়াইয়ে অনুসৃত বিধি-নিষেধঃ

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকারকে কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে, যা অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ থেকে ভিন্ন হবে। এ ধরনের বিধি-নিষেধগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

১. বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্য তাদেরকে দমন করা; তাদেরকে হত্যা করা উদ্দেশ্য নয়।[২৪]

২. তাদের পশ্চাদপসরনকারীকে পিছু ধাওয়া করা যাবে না।

৩. তাদের আহত ব্যক্তিকে ধ্বংস করা যাবে না।

৪. তাদের বন্দীদেরকে হত্যা করা যাবে না।

যখন লড়াইয়ে বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় এবং তাদের পক্ষ থেকে কোন ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকলে কিংবা দুর্বল হবার কারণে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে লড়াই করা ছেড়ে দেয় তাদের পিছু ধাওয়া করা, তাদের আহতদের ধ্বংস করা ও বন্দীদের হত্যা করা জায়িয হবে না।[২৫] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে ইবন মাস'উদ! তুমি কি জান, এ উম্মাতের বিদ্রোহীদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ কি? ইবনু মাস'উদ উত্তর দিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর নিদের্শ হলঃ لا يتبع مدبرهم ' و لا يقتل أسيرهم ' و لا يذفف على جريحهم. - "তাদের পশ্চাদ্গামীকে পিছু ধাওয়া করা যাবে না, তাদের বন্দীদেরকে হত্যা করা যাবে না এবং তাদের

---

২৪. আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.১১৪; আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, পৃ.৭৫

২৫. এটাই অধিকাংশ ইমামের অভিমত। হানাফীগণের মতে, যুদ্ধবন্দীদের মিলিত হবার মত কোন দল থাকলে সরকারের সুবিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ইখতিয়ার থাকবে। সরকার চাইলে তাদেরকে হত্যাও করতে পারে। আবার ভাল মনে করলে কারাদণ্ডও দিতে পারবে। মালিকীগণের মধ্যে কারো মত হল, যুদ্ধ শেষে কেউ বন্দী হলে তাকে হত্যা করা যাবে না। তবে যুদ্ধাবস্থায় কেউ বন্দী হলে যদি সরকার প্রধান বা তাঁর প্রতিনিধি উক্ত বন্দীর পক্ষ থেকে কোন রূপ ক্ষতির আশঙ্কা করেন, তাহলে তাকে হত্যাও করতে পারেন। আবার কারো মতে, যুদ্ধশেষে আটককৃত বন্দীকে তাওবা করতে বলা হবে। যদি সে তাওবা করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে। (আল-কাসানী, *বদাই*, খ.৭, পৃ.১৪০-১; আল-বুজায়রমী, *তুহফাতুল হাবীব*, খ.৪, পৃ.২৩৩; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ.৬, পৃ.১৫৫; আর-রুহায়বানী, *মাতালিব..*, খ.৬, পৃ.২৬৯; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৯-১০; আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, খ.৮, পৃ.৬০)

আহত ব্যক্তিকে ধ্বংস করা যাবে না।"[২৬] উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত 'আলী (রা) তাঁর অনুসারীদেরকে বলেছিলেন, لا تتبعوا مدبرا ' و لا تجهزوا على جريح ' و لا تقتلوا أسيرا. - "তোমরা কোন পলায়নকারীর পিছু নেবে না, কোন আহত ব্যক্তিকে ধ্বংস করবে না এবং কোন বন্দীকে হত্যা করবে না।"[২৭]

৫. তাদের সম্পত্তি গনীমাতের মাল হিসেবে গণ্য হবে না।

তাদের ধন-সম্পদ গনীমাতের মাল হিসেবে জব্দ করে জাতীয় সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না এবং যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টনও করে দেয়া যাবে না। তদুপরি তা ধ্বংস করাও যাবে না। তবে সাময়িকভাবে তাদের যাবতীয় ধন-সম্পদ ক্রোক করা যাবে, যাতে তাদের শক্তি খর্ব হয়ে যায় এবং তারা তাওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসে। যদি তাদের সম্পদের মধ্যে এ ধরনের কোন সম্পদ থাকে, যা সংরক্ষণ করতে গেলে অর্থকড়ি ব্যয় হবে, তা হলে তা বিক্রি করে দিয়ে তার মূল্য জমা রাখাই শ্রেয় হবে। পরবর্তীকালে তারা তাওবা করে সরকারের আনুগত্যের পথে ফিরে আসলে তাদের সম্পদ তাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।[২৮]

৬. তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে বন্দী করা যাবে না।[২৯]

৭. তাদেরকে দমন করার জন্য অমুসলিমের সাহায্য নেয়া যাবে না।

অধিকাংশ ইমামের মতে, মুসলিম বিদ্রোহীদেরকে দমন করার জন্য অমুসলিমদের সাহায্য নেয়া জায়িয নয়। কেননা বিদ্রোহীদের সাথে লড়াইয়ের উদ্দেশ্য হল তাদেরকে দমন করা মাত্র; তাদেরকে হত্যা করা উদ্দেশ্য নয়। তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অমুসলিমদেরকে নিয়োজিত করা হলে বিদ্রোহীদের নিহত হবার আশংকা বেশি। তবে অমুসলিমদের সাহায্য নেবার মত কোন রূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তাদেরকে বিদ্রোহীদের দমনে নিয়োজিত করা না জায়িয হবে না, যদি তাদের আচরণ সংযত রাখা সম্ভব হয়। আর যদি তাদের আচরণ

---

২৬. আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু কিতালি আহলিল বাগ্ই), হা.নং : ২৬৬২; বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা'*, হা.নং : ১৬৫৩২

২৭. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং : ৩৭৭৭৮; বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা'*, হা.নং : ১৬৫২৪, ১৬৫২৫

২৮. আল-কাসানী, *বদা'ই*,খ.৭, পৃ.১৪১; আর-রুহায়বানী, *মাতালিব*, খ.৬, পৃ.২৬৯; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৯; আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, খ.৮, পৃ.৬০

২৯. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.১৪১; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.১৫২; আর-রুহায়বানী, *মাতালিব*, খ.৬, পৃ.২৬৯; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৯; আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, খ.৮, পৃ.৬০

সংযত রাখা সম্ভব না হয়, তা হলে কোনভাবে তাদের সাহায্য নেয়া জায়িয হবে না।[৩০]

৮. মালের বিনিময়ে চুক্তি করা যাবে না।[৩১]

৯. তাদের ওপর প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক ভারী অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে না।

১০. তাদেরকে অবরোধ করে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

১১. তাদেরকে জ্বালিয়ে বা ডুবিয়ে মারা যাবে না।

হানাফী ও মালিকীগণের মতে, যদি বিদ্রোহীরা অস্ত্রশস্ত্রে সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে, তাহলে তাদের সাথে লড়াইয়ে সে সব অস্ত্র ও কলাকৌশল ব্যবহার করা যাবে, যে সব অস্ত্র ও কলাকৌশল শত্রু পক্ষের সাথে লড়াইয়ে ব্যবহার করা হয় । যেমন - তরবারি, তীর, বর্শা, প্রস্তর নিক্ষেপন যন্ত্র, ট্যাংক, কামান ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার, ডুবিয়ে মারা এবং খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া প্রভৃতি। তদুপরি বিদ্রোহীরা যখন কোন ভারী ও মারণাস্ত্র ব্যবহার করবে, তখন তার মুকাবিলায়ও সরকারকে তার ব্যবহার করতে হবে। কেননা লড়াইয়ের উদ্দেশ্য হল তাদের বিশৃঙ্খলা বন্ধ করা ও তাদের শৌর্যবীর্য খতম করে দেয়া। তাই যে সব কলা-কৌশল ও অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে তা অর্জন করা সম্ভবপর হবে, তা-ই ব্যবহার করতে হবে। তবে মালিকীগণের মতে, যদি বিদ্রোহীদের সাথে তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিরা থাকে তাহলে তাদের দিকে আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করা সমীচীন নয়।[৩২]

শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, বিদ্রোহীদের সাথে লড়াইয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ও প্রস্তর নিক্ষেপণ যন্ত্র ব্যবহার করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে ডুবিয়ে কিংবা বন্যার পানি ছেড়ে দিয়ে ধ্বংস সাধন প্রভৃতি সর্বপ্লাবি শাস্তি দেয়াও জায়িয নয়। তাছাড়া তাদের অবরোধ করে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে দেয়াও সমীচীন নয়। তবে একান্ত প্রয়োজন হলে (যেমন এ সব অস্ত্র ও কলা-কৌশল ব্যবহার

---

৩০. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.১৫২; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ.৬, পৃ.১৫৫; আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, খ.৮, পৃ.৬০; আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, পৃ.৭৫

৩১. আল-কাসানী, *বদা'ই*,খ.৭, পৃ.১৪১; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.১৫২; শায়খী যাদাহ, *মাজমা'উল আনহুর*, খ.১, পৃ.৬৩৮; আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, পৃ.৭৫

৩২. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.১৪১; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.১৫২; আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, খ.৮, পৃ.৬০; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৯

করা ছাড়া যদি তাদেরকে দমন করা সম্ভবই না হয়) তা ভিন্ন কথা। কেননা লড়াইয়ে এ সবের ব্যবহারের উদ্দেশ্য তো তাদেরকে হত্যা করা বা নির্মূল করা নয়; বরং তাদেরকে পরাভূত করা, তাদের শৌর্যবীর্য ধ্বংস করে দেয়া। তদুপরি যারা লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করবে না, তাদেরকে যেহেতু হত্যা করা জায়িয নেই, তাই যে সব অস্ত্র বা কলা কৌশল অবলম্বনের কারণে যুদ্ধরত বিদ্রোহী ছাড়া অন্যদের মারা যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে তা ব্যবহার করা জায়িয হবে না।[৩৩]

১২. তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালানো যাবে না ও সম্পদ নষ্ট করা যাবে না

১৩. তাদের বৃক্ষসমূহ কাটা যাবে না।

সাধারণত বিদ্রোহীদের সম্পদ নষ্ট করা কিংবা বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে ফেলা জায়িয নয়। যুদ্ধ কিংবা কোন প্রয়োজন ছাড়া এ রূপ করা হলে এ জন্য তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তবে যদি লড়াইয়ের সময় যুদ্ধের প্রয়োজনে তাদের কোন ধন-সম্পদ নষ্ট করা হয়, তা হলে এর জন্য তাদেরকে কোন রূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।[৩৪] মাওয়ার্দী বলেন, যুদ্ধের বাইরে নিছক আত্মতৃপ্তি কিংবা প্রতিশোধস্পৃহার পূরণের নিমিত্তেই যদি সম্পদ নষ্ট করা হয়, তবেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি তাদেরকে দুর্বল করা কিংবা পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে সম্পদ নষ্ট করা হয়, তাহলে কোন রূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।[৩৫] বিশিষ্ট ইসলামী আইনতত্ত্ববিদ যায়ল'ঈ ও ইবনু নুজায়মের মতে, যদি লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে তাদের দলবদ্ধভাবে বের হবার আগে কিংবা তাদের শৌর্যবীর্য খর্ব হয়ে যাওয়ার পরেই যদি সম্পদ নষ্ট করা হয়, তা হলেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[৩৬]

সন্ত্রাসী ও বিদ্রোহীদের মধ্যে শাস্তিগত পার্থক্য ঃ

সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যে লড়াই করা হয় তার সাথে বিদ্রোহীদের লড়াইয়ের মধ্যেও কয়েকটি দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। যেমন-

১. সন্ত্রাসীদেরকে লড়াইয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা বৈধ।

২. পলায়নকারী সন্ত্রাসীদের পিছু ধাওয়া করে তাদের সাথে লড়াই করা জায়িয।

---

৩৩. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৯; আল-জুমাল, *ফুতুহাত..*,খ.৫, পৃ. ১১৭-৮; আল-বুজায়রমী, *আত-তাজরীদ..*,খ.৪, পৃ.২০২-৩; রুহায়বানী, *মাতালিব*,খ.৬, পৃ.২৬৮

৩৪. *মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.৮, পৃ.১৪৩

৩৫. আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, পৃ.৭৭

৩৬. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ.২৯৬; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.১৫৩-৪;

৩. লড়াইয়ের সময় সন্ত্রাসীরা জান-মালের যে ক্ষতি সাধন করবে, তাদের সে সবের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পক্ষান্তরে বিদ্রোহীদের বেলায় তা প্রযোজ্য নয়।

যদি বিদ্রোহীরা লড়াইরত অবস্থায় নিরপরাধ কোন লোকের সম্পদ নষ্ট করে তা হলে বিদ্রোহীদেরকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।[৩৭] কেননা তারা তো তা নিজেদের ধারণা ও ব্যাখ্যা অনুযায়ী তা নিজেদের জন্য হালাল জেনেই ধ্বংস করেছে। উপরন্তু, তাদের ওপর ক্ষতিপূরণ দানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হলে তারা সরকারের আনুগত্যে ফিরে আসতে চাইবে না; বরং আমরণ অপরাধ প্রবণতায় লিপ্ত থাকবে। তবে শাফি'ঈগণের একটি মত অনুসারে, তাদেরকে ধ্বংসকৃত মালের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা তারা যেহেতু অন্যায়ভাবেই অপরের সম্পদ নষ্ট করেছে তাই তাদেরকে তার ক্ষতি পূরণ দিতে হবে। যেমন- যুদ্ধাবস্থা ছাড়া অন্য সময় ধ্বংস করলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।[৩৮]

যদি বিদ্রোহকারীরা তাওবা করে সরকারের আনুগত্যে ফিরে আসে, তা হলে লোকদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া সম্পদ তাদের হাতে মজুদ থাকলে তা ফিরিয়ে নেয়া হবে। তবে যা তারা নষ্ট কিংবা খরচ করে ফেলেছে, তার জন্য তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, যদিও তারা ধনী হয়।[৩৯]

অনুরূপভাবে যদি বিদ্রোহীরা লড়াইরত অবস্থায় নিরপরাধ কোন লোককে হত্যা করে, এর জন্য তাকে হত্যা করা যাবে না। তবে যুদ্ধাবস্থা ছাড়া অন্য সময় কোন বিদ্রোহী যদি কোন নিরপরাধ লোককে হত্যা করে, তাহলে তাকে কিসাসের আওতায় হত্যা করা হবে। কেননা এ রূপ অবস্থায় প্রকাশ্য অস্ত্র প্রদর্শন করে বিপর্যয় সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তার উদাহরণ ডাকাতের মতোই।[৪০] তবে কারো কারো মতে, এ রূপ অবস্থায়ও তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হবে না। ইবনু কুদামার মতে এটিই বিশুদ্ধ অভিমত।[৪১] হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি

---

৩৭. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ. ১৮১; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ৮০, ১৪১; আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, পৃ.৭৭; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.১১৩; আর-রুহায়বানী, *মাতালিব..*, খ.৬, পৃ.২৭০

৩৮. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত* খ.১০, পৃ. ১২৮

৩৯. আল-জুমাল, *ফুতুহাত..*,খ. ৫,পৃ.১১৭; আল-বুজায়রমী,*তুহফাতুল হাবীব*, খ.৪, পৃ.২৩৫; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.১১৩

৪০. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত* খ.১০, পৃ. ১৩১; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ.২৯৫-৬; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৯

৪১. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৯

বলেন ঃ .إن شئت أن أعفو ' و إن شئت استقدت - "আমি চাইলে তাদেরকে হত্যা করতে পারি, চাইলে তাদের থেকে কিসাসও গ্রহণ করতে পারি।"[৪২]

৪. সন্ত্রাসী বন্দীদেরকে পবিত্র ও সংশোধন করার উদ্দেশ্যে একটি যৌক্তিক সময় পর্যন্ত কারারুদ্ধ করে রাখা জায়িয। পক্ষান্তরে সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে নিলে বিদ্রোহীদেরকে ছেড়ে দিতে হয়।[৪৩]

৫. সন্ত্রাসীরা জনগণ থেকে রাজস্ব ও সাদকাহর অর্থকড়ি সংগ্রহ করলে তা হবে লুটের সম্পদের মত। এগুলোর ক্ষতিপূরণ তাদের দিতে হবে। পক্ষান্তরে বিদ্রোহীরা তাদের কর্তৃত্বাধীন এলাকা থেকে যে রাজস্ব, যাকাত ও সাদকাহ সংগ্রহ করবে তা ন্যায়সঙ্গত বিবেচিত হবে। বিদ্রোহীদের ওপর বিজয় লাভের পর সরকার তাদের সংগৃহীত সে সব সম্পদের ক্ষতিপূরণ চাইতে পারবে না এবং দাতাদের কাছ থেকে পুনরায় তা আদায় করতে পারবে না।[৪৪]

---

৪২. বাইহাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা'*, হা.নং : ১৫৮৩৮, ১৬৫৩৬; শাফি'ঈ, *আল-মুসনাদ*, খ.১, পৃ.২১২

৪৩. আল-বুজায়রমী, *তুহফাতুল হাবীব*, খ.৪, পৃ.২৩৫; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.১১৬

৪৪. যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.১, পৃ.২৭৩-৪; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.২, পৃ.২৩৯-৪০; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৬, পৃ.১০৫

[খ] কিসাস

কিসাসের সংজ্ঞা ঃ

কিসাস শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ হল পদাঙ্ক অনুকরণ করা, সমান বদলা গ্রহণ করা ও সাদৃশ্য বজায় রাখা। তবে শব্দটি হত্যার বদলায় হত্যাকারীকে হত্যা করার, যখমের বদলায় যখমকারীকে যখম করার এবং অঙ্গকর্তনের বদলায় অঙ্গকর্তনকারীর অঙ্গকর্তন করার অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় অপরাধীকে তার অপরাধ সদৃশ শাস্তি প্রদানকে কিসাস বলা হয়। যেমন হত্যার বদলায় হত্যা করা এবং যখমের বদলায় যখম করা।[১]

কিসাসের হুকম ঃ

কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে, তা যদি যথাযথরূপে প্রমাণিত হয়, তা হলে সরকারের দায়িত্ব হল হত্যাকারীকেও হত্যার বদলায় হত্যা করা, যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা তা-ই দাবী করে। তবে অভিভাবকদের এ ইখতিয়ারও রয়েছে যে, তারা ইচ্ছে করলে হত্যাকারীকে ক্ষমাও করে দিতে পারে, ইচ্ছে করলে দিয়াতের বিনিময়ে সমঝোতাও করতে পারে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে যখম করলে কিংবা দেহের কোন অঙ্গ বা তার অংশবিশেষ বিচ্ছিন্ন করে ফেললে উপর্যুক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। এটাই সর্বসম্মত অভিমত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, يا آيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيئ فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان. ذلك تخفيف من ربكم و رحمة. - "হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী। তার

---

১. ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব, খ.৮, পৃ. ৩৪১; আর-রুকবান, আল-কিসাস ফিন নাফস, পৃ.১৩; আল-জাযীরী, কিতাবুল ফিকহ 'আলাল মাযাহিবিল 'আরবা'আহ, খ.৫, পৃ. ২৪৪

ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছু ক্ষমা করে দেয়া হলে ন্যায়নীতির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় করা বিধেয়। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সহজীকরণ ও রহমত বিশেষ।"[২] তিনি আরো বলেন, و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. - "তাদের জন্য আমরা তাতে বিধান নির্ধারণ করেছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমসমূহের বদলে অনুরূপ যখম। আর যে ক্ষমা করে দেয়, তা তার পাপের জন্য কাফফারা হবে।"[৩] কুর'আনের অন্য জায়গায় রয়েছে, و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. - "কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি তার প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে। সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে।"[৪] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يودى ' و إما أن يقاد. - "যার কোন ব্যক্তি নিহত হবে, তার দুটি ইখতিয়ার রয়েছে। সে ইচ্ছে করলে রক্তমূল্যও নিতে পারবে, ইচ্ছে করলে কিসাসও গ্রহণ করতে পারবে।"[৫] হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে, হযরত রুবাই'ই বিন্‌ত নাদর ইব্‌ন আনাস (রা) জনৈকা দাসীর সামনের একটি দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। সাহাবীগণ এর জন্য রক্তমূল্য দিতে চাইলেন; কিন্তু দাসীর অভিভাবকরা তা অস্বীকার করে কিসাস দাবী করল। এরপর সকলেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলেন। তিনিও কিসাস গ্রহণের নিদের্শ দিলেন। ইত্যবসরে রুবাই'ইর ভাই আনাস ইব্‌ন নাদর (রা) এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বললেন, আপনি কি রুবাই'ইর দাঁত ভেঙ্গে ফেলবেন? সে যাতের শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন, আপনি তার দাঁত ভেঙ্গে ফেলবেন না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হে আনাস! আল্লাহর কিতাবে

---

২. আল-কুর'আন, ২ (সূরা আল-বাকারাহ) ঃ ১৭৮
৩. আল-কুর'আন, ৫ (আল-মা'ইদা) ঃ ৩৪
৪. আল-কুর'আন, ১৭ (বনী ইসরাইল) ঃ ৩৩
৫. সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ৬৪৮৬; আবূ দাউদ (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ৪৫০৫

কিসাসের বিধান রয়েছে। রাবী বলেন, এতদশ্রবণে দাসীর অভিভাবকরা ক্ষমা করে দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহ তা'আলার এমন কিছু বান্দাহ রয়েছে, যারা আল্লাহর নামে শপথ করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের শপথকে পূর্ণ করে দেন।"[৬]

হত্যার অপরাধ ঃ

হত্যা (القتل) বলতে কোন কিছুর আঘাতে, অস্ত্রের সাহায্যে, পাথর নিক্ষেপে, বিষ প্রয়োগে বা অন্য কোন উপায়ে মানুষের প্রাণনাশ করাকে বোঝানো হয়। মানব হত্যা একটি মানবতা বিধ্বংসী জঘন্যতম অপরাধ। যখন কেউ তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে এ অপরাধ করে, তখন সে গোটা মানবতার সাথে শত্রুতা করে। একজন মানুষের জীবন বাঁচানো যেমন গোটা মানব জাতির জীবন বাঁচানোর সমতুল্য, তেমনি একজন মানুষের জীবন সংহার গোটা মানব জাতির জীবন সংহারের সমতুল্য।[৭] ইসলামের দৃষ্টিতে শিরকের অমার্জনীয় অপরাধের পর মানব হত্যাই সবচাইতে বড় ও মারাত্মক অপরাধ। এ কারণেই ইসলামী শরী'আতে এ অপরাধের বীভৎসতা প্রকট করে তোলা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে মানব মনে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগাতে চেষ্টা করা হয়েছে আর সেই সাথে ইসলামী আইনে এর জন্য ন্যায়-বিচারভিত্তিক কঠিন শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, و من يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه و أعد له عذابا عظيما. - "যে কোন লোক কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার প্রতিফল হচ্ছে জাহান্নাম। সে চিরকালই সেখানে থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং তার প্রতি অভিশাপ করেন। উপরন্তু তিনি তার জন্য কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।"[৮] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. - "কোন মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চাইতে দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যাওয়াই আল্লাহর নিকট অধিকতর সহজ।"[৯]

---

৬. সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুস সুলহ), হা.নং : ২৫৫৬; মুসলিম (কিতাবুল কাসামাহ..), হা.নং : ১৬৭৫
৭. আল-কুর'আন, ৫ (সূরা আল-মা'ইদা) ঃ ৩২
৮. আল-কুর'আন, ৪ (সূরা আন-নিসা) ঃ ৯৩
৯. আত্ তিরমিযী, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ১৩৯৫; ইবনু মাজাহ, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ২৬১৯

হত্যার প্রকারভেদ ঃ

উদ্দেশ্য ও ধরন বিচারে হত্যাকে নিম্নোক্ত পাঁচভাগে বিভক্ত করা হয়।[১০]

১. ইচ্ছাকৃত হত্যা (قتل عمد)
২. প্রায় ইচ্ছামূলকহত্যা (قتل شبه عمد)
৩. ভুলবশত হত্যা (قتل خطأ)
৪. প্রায় ভুলবশত হত্যা (قتل شبه خطأ)
৫. কারণবশত হত্যা (قتل بالتسبب)

ইচ্ছাকৃত হত্যা (قتل عمد) ঃ

কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে যখন এমন কাজ করে যার দ্বারা অন্য ব্যক্তির প্রাণ নাশ হয়, তখন তার সে কাজকে 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' (قتل عمد) বলা হয় এবং এর জন্য কিসাসের বিধান প্রযোজ্য হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতে 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' সাব্যস্ত করার জন্য লৌহাস্ত্র বা এ জাতীয় কিছুর ব্যবহার প্রয়োজন। পক্ষান্তরে হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ) ও মুহাম্মাদ (রহ) এবং অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের মতে লৌহাস্ত্র বা এ জাতীয় কিছুর ব্যবহার শর্ত নয়। তাঁদের মতে অস্ত্রের সাহায্য ছাড়াও 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' সংঘটিত হতে পারে। যেমন পানিতে ডুবিয়ে, শ্বাসরুদ্ধ করে, বিষ পান করিয়ে বা উঁচু স্থান থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হলে তাও 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' রূপে গণ্য হবে।[১১]

প্রায় ইচ্ছামূলক হত্যা (قتل شبه عمد) ঃ

যে ধরনের বস্তু দ্বারা সাধারণত হত্যা সংঘটিত হয় না- সেই ধরনের কোন বস্তু দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলে সে হত্যাকে 'প্রায় ইচ্ছামূলক হত্যা ' বলা হয় এবং এর জন্য দিয়াতের বিধান প্রযোজ্য হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতে, দেহ কাটে না বা দেহে বিদ্ধ হয় না- এ

---

১০. এটা ইমাম আবূ বাকর আর-রাযীর অভিমত। অধিকাংশ হানাফী ইমাম এ প্রকারভেদটিই গ্রহণ করেছেন। নাফি' গ্রন্থপ্রণেতা হত্যাকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন। তিনি 'প্রায়ভুলবশত হত্যা'র কথা উল্লেখ করেননি। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে হত্যা তিন প্রকার। এগুলো হল- ইচ্ছাকৃত হত্যা, প্রায় ইচ্ছামূলক হত্যা ও ভুলবশত হত্যা। শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণও এ মত পোষণ করেন। ইমাম মালিক (রহ)-এর মতে হত্যা দু প্রকার- ইচ্ছাকৃত হত্যা ও ভুলবশত হত্যা। (আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৬, পৃ.৫৯-৬৯; যায়ল'ঈ, তাবয়ীন, খ.৬, পৃ.৯৮; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.১০, পৃ.২০৩-২১৫)

১১. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.২৩৩; আল-বাবরতী, আল-'ইনায়াহ,খ.১০ পৃ.২১০-২১৫

ধরনের কোন বস্তু দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা সংঘটিত হলে তাকে 'প্রায় ইচ্ছামূলক হত্যা' বলে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ) ও মুহাম্মদ (রহ)-এর মতে, যে সব বস্তু দ্বারা সাধারণত হত্যা করা যায় না- এ ধরনের বস্তু (যেমন- ক্ষুদ্র পাথর, ক্ষুদ্র লাঠি, চাবুক, কলম ইত্যাদি) দ্বারা হত্যা সংঘটিত হলে তাকে 'প্রায় ইচ্ছামূলক হত্যা' বলে। এ প্রকারের হত্যার ক্ষেত্রে যেহেতু হত্যাকারীর হত্যা করার ইচ্ছা ছিল কি না- এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে, তাই এ ধরনের হত্যার বেলায় কিসাসের বিধান প্রযোজ্য হবে না; কিন্তু দিয়াতের কঠোর বিধান (دية مغلظة) প্রযোজ্য হবে। এ ক্ষেত্রে দিয়াত বাধ্যতামূলক হবার ব্যাপারে সাহাবা কিরামের ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে কাফফারা বাধ্যতামূলক হবে কি না- তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু অগ্রগণ্য মত হল- কাফফারা ওয়াজিব হবে।[১২]

ভুলবশত হত্যা (قتل خطا) ঃ

নিষিদ্ধ নয়- এমন কোন কাজ করার সময় প্রয়োজনীয় সতকর্তা অবলম্বন না করার কারণে ভুলবশত হত্যা সংঘটিত হলে তাকে 'ভুলবশত হত্যা' বলা হয় এবং এর জন্য দিয়াত ও কাফফারা ওয়াজিব হবে।

এ ভুল কর্তার ধারণার মধ্যেও হতে পারে, কাজের মধ্যেও হতে পারে এবং ধারণা ও কাজ উভয়ের মধ্যেও হতে পারে।[১৩]

১. কর্তার ধারণায় ভুল যেমন- শিকারী কোন মানুষকে শিকারের পশু মনে করে তার প্রতি তীর বা গুলি নিক্ষেপ করল, পরে দেখা গেল যে, সে মানুষ, শিকারের প্রাণি নয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তিকে শত্রু সৈন্য মনে করে তীর নিক্ষেপ করল, পরে দেখা গেল যে, সে শত্রু সৈন্য নয়। এ ক্ষেত্রে অপরাধীর কাজের মধ্যে ভুল হয়নি; কারণ সে যা মারতে চেয়েছে তা-ই মেরেছে; বরং ভুল হয়েছে তার ধারণা বা অনুমানের মধ্যে।

২. কর্তার কাজে ভুল যেমন এক শিকারী একটি হরিণের প্রতি গুলি ছুঁড়ল; কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তা ঝোপের মধ্যে কোন কাজে রত কোন মানুষের দেহে বিদ্ধ হল এবং এর ফলে সে মারা গেল। অনুরূপভাবে শত্রুসৈন্যকে টার্গেট করে তীর নিক্ষেপ করল বা গুলি ছুঁড়ল; কিন্তু তীর বা গুলিটি লক্ষ্যচ্যুত হয়ে অপর ব্যক্তির ওপর আঘাত করল এবং এর ফলে সে মারা গেল।

---

১২. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.২৩৩; যায়ল'ঈ, তাবয়ীন, খ.৬, পৃ.১০০
১৩. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.২৩৪; যায়ল'ঈ, তাবয়ীন, খ.৬, পৃ.১০০-১

৩. ধারণা ও কাজ- উভয়ে ভুল যেমন- শিকারী কোন মানুষকে শিকারের পশু মনে করে তার প্রতি তীর বা গুলি নিক্ষেপ করল; কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অপর ব্যক্তির দেহে বিদ্ধ হল এবং এর ফলে সে মারা গেল। এ ক্ষেত্রে সে মানুষকে শিকারের পশু মনে করে নিজের অনুমানে ভুল করেছে এবং যার প্রতি তীর বা গুলি নিক্ষেপ করেছে তা তার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির শরীরে গিয়ে লাগায় সে কাজেও ভুল করেছে।

প্রায় ভুলবশত হত্যা (قتل شبه خطأ) ঃ

কোন ব্যক্তির কোন কাজের দ্বারা হত্যা সংঘটিত হলে তাকে 'প্রায় ভুলবশত হত্যা' বলা হয়। এ ক্ষেত্রে অপরাধীর কোন ধরনের সংকল্প ছাড়াই হত্যা সংঘটিত হয় বলে একে ' প্রায় ভুলবশত হত্যা' নামে অভিহিত করা হয়। যেমন- কোন ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্তন করার সময় অপর কোন ব্যক্তির ওপর উল্টে পড়ল এবং এর ফলে অপর ব্যক্তিটি মারা গেল। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি ঘটনাক্রমে কোন উচ্চ স্থান থেকে গড়িয়ে অপর কোন ব্যক্তির ওপর পড়ল এবং এর ফলে অপর ব্যক্তিটি মারা গেল। এ প্রকারের হত্যা একদিকে যেহেতু অপরাধীর অসতর্কতার কারণেই সংঘটিত হয়েছে, তাই এটা ভুলবশত হত্যার মধ্যে গণ্য হবে এবং এ জন্য দিয়াত ওয়াজিব হবে। অপরদিকে যেহেতু অপরাধীর কর্ম ও হত্যার মধ্যে সরাসরি 'কারণ'-এর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে, তাই এ জন্য কাফফারাও ওয়াজিব হবে।[১৪]

কারণবশত হত্যা (قتل بالتسبب) ঃ

কোন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় সতর্কতার অভাবজনিত কাজের ফলে অন্য ব্যক্তির প্রাণনাশ হলে তাকে 'কারণজনিত হত্যা' বলা হয়। যেমন- কোন ব্যক্তি যাতায়াতের রাস্তার পার্শ্বে গর্ত খনন করল এবং তাতে কোন পথচারী পড়ে গিয়ে মারা গেল অথবা কেউ পথের পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড পাথর রাখল এবং তার সাথে পথচারী ধাক্কা খেয়ে মারা গেল। এ প্রকারের হত্যায় অপরাধী সরাসরি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে না; বরং তার কোন সম্পাদিত কাজই হত্যার কারণ হয়। এখানে অপরাধী যে কাজটি করে তা তার জন্য বৈধ; তবে সে কর্ম সম্পাদনে সীমা লঙ্ঘন করেছে, যার ফলে তার কর্মটি হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রকারের হত্যায় মৃত্যুদণ্ড হবে না এবং কাফফারাও ওয়াজিব হবে না। তবে দিয়াত ওয়াজিব হবে।

---

১৪. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৬, পৃ.৬৬, ১০৪

এ প্রকারের হত্যা যদিও একদিক থেকে 'ভুলবশত হত্যা'র মতোই; কিন্তু অন্য দিক থেকে তা 'ভুলবশত হত্যা'র আওতায় পড়ে না। যেমন- অপরাধীর খননকার্যের দ্বারা কাউকেও হত্যা করার ইচ্ছা তার ছিল না; বরং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে। এ দিক থেকে তা 'ভুলবশত হত্যা'র সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অন্যদিকে 'ভুলবশত হত্যা'র ক্ষেত্রে অপরাধীর কাজের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে হত্যা সংঘটিত হয়, আর এ ক্ষেত্রে তার কোন সম্পাদিত কাজের কারণেই হত্যা সংঘটিত হয়।[১৫]

ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি ঃ

'ইচ্ছাকৃত হত্যা'র শাস্তিস্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, . يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى - "হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তেমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে।"[১৬] তিনি আরো বলেন, و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس - "তাদের জন্য আমরা তাতে বিধান নির্ধারণ করেছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ...।"[১৭] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,.من قتل عمدا فهو قود - "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।"[১৮]

হত্যার বদলা হিসেবে মৃত্যুদণ্ড ওয়াজিব হবার শর্তাবলীঃ

হত্যার বদলা হিসেবে মৃত্যুদণ্ড ওয়াজিব হবার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। এগুলো পাওয়া গেলেই হত্যার কিসাসস্বরূপ মৃত্যুদণ্ডদান বাধ্যতামূলক হবে। এ সব শর্তের মধ্যে কয়েকটি হত্যাকারীর সাথে, আর কয়েকটি নিহত ব্যক্তির সাথে, আর কয়েকটি মৃত্যুদণ্ড দাবীকারীদের সাথে, আর কতিপয় হত্যাকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ সব শর্তের মধ্যে কতিপয় শর্তের ক্ষেত্রে সকল ইমামই ঐকমত্য পোষণ করেছেন আবার কোন কোন শর্তের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

---

১৫. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৬, পৃ.৬৬; আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.২৩৯; যায়লা'ঈ, তাবয়ীন, খ.৬, পৃ.১০২

১৬. আল-কুর'আন, ২ (সূরা আল-বাকারাহ) ঃ ১৭৮

১৭. আল-কুর'আন, ৫ (সূরা আল-মা'ইদা) ঃ ৩৪

১৮. আবূ দাউদ, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ৪৫৩৯; নাসাঈ, আস-সুনান আল-কুবরা, (কিতাবুল কাসামাহ), হা.নং : ৬৯৯৩

হত্যাকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী :

১. হত্যাকারী মুকাল্লাফ (বালিগ ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন) হওয়া

কিসাস বাধ্যতামূলক হবার জন্য হত্যাকারীকে বালিগ ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। অতএব হত্যাকারী না বালিগ হলে তার ওপর কিসাস কার্যকর করা যাবে না।[১৯] তবে তার মাল থেকে দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। অনুরূপভাবে কোন পাগল কাউকে হত্যা করলে তার ওপর কিসাস কার্যকর করা যাবে না, যদি সে পুরো পাগল হয়। যদি সে মাঝে মাঝে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, তা হলে এরূপ অবস্থায় হত্যা করলে তার ওপর কিসাস কার্যকর করা হবে। হত্যা করার সময় কেউ সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ছিল; কিন্তু হত্যা করার পর যদি সে পাগল হয়ে যায়, তাহলে হানাফী ইমামগণের মতে- যদি বিচারক হত্যার বদলা গ্রহণের জন্য নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের কাছে তাকে সুস্থ অবস্থায় সঁপে দেয় এবং এর পরেই সে পাগল হয়ে যায়, তাহলে তার ওপর কিসাস কার্যকর করা হবে। আর যদি তাকে সুস্থ অবস্থায় সঁপে দেয়ার আগেই সে পাগল হয়ে যায়, তা হলে তার ওপর কিসাস কার্যকর করা যাবে না। তবে তার মাল থেকে দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। অনুরূপভাবে বিচারকের মৃত্যুদণ্ডের ফায়সালার দেবার আগে কিংবা কেউ হত্যা করার পর পরই স্থায়ীভাবে পুরো পাগল হয়ে গেলে তার ওপরও কিসাস কার্যকর যাবে না। মালিকীগণের মতে- হত্যা করার পর হত্যাকারী পাগল হয়ে গেলে তার সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এরপর কিসাস গ্রহণ করা হবে। তবে শাফি'ঈগণের মতে- সুস্থাবস্থায় হত্যা করার পর হত্যাকারী পাগল হয়ে গেলে কিসাস বাধ্যতামূলক হবে এবং পাগল অবস্থায় তা কার্যকর করা হবে। হাম্বলীগণের মতে- এ রূপ অবস্থায় যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা হত্যা প্রমাণিত হয়, তা হলে পাগল অবস্থায় কিসাস কার্যকর করা হবে। আর যদি হত্যাকারীর নিজের স্বীকারোক্তি দ্বারা হত্যা প্রমাণিত হয়, এমতাবস্থায় যেহেতু স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের একটি সুযোগ তার রয়েছে, তাই তার সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং এরপরেই কিসাস কার্যকর করা হবে, যদি সে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে না নেয়।[২০]

---

১৯. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.২৩৪; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.১০, পৃ.২০৪

২০. ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.৬, পৃ.৫৩২; আল-বহুতী, কাশশাফ, খ.৫, পৃ.৫২১; আর-রুহায়বানী, মাতালিব..,খ.৬, পৃ.১৬; আল-আনসারী, আসনাল মাতালিব, খ.৪, পৃ.১৩; আল-মাওয়াক, আত-তাজ..,খ.৮, পৃ.২৮৯

কোন মাতাল ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে যে কোন মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে মাতাল অবস্থায় কাউকে হত্যা করলে তার ওপর কিসাস কার্যকর করা হবে। কারণ সে নিজেই তার মতি বা বোধশক্তি নষ্ট করেছে এবং তা এমন জিনিস দ্বারা করেছে যা গ্রহণ করা স্বয়ং একটি দণ্ডযোগ্য অপরাধ।[২১]

২. হত্যাকারী মুসলিম বা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক হওয়া

হত্যাকারীকে ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম কিংবা স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক হতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের কোন মুসলিম অমুসলিমকে এবং কোন অমুসলিম মুসলিমকে হত্যা করলে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।[২২] ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জীবন নিরাপদ। বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক অমুসলিমকে হত্যার অপরাধে হত্যাকারী মুসলিমকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।[২৩]

অনুরূপভাবে কোন অমুসলিম অপর অমুসলিমকে হত্যা করলেও হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।[২৪]

তবে ইসলামী রাষ্ট্রে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী কোন অমুসলিমকে (হারাবী) কেউ হত্যা করলে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। অনুরূপভাবে সেও যদি ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম বা অমুসলিম-কাউকে হত্যা করে, তাহলে তার ওপরও কিসাস কার্যকর করা যাবে না, এমন কি সে যদি পরে মুসলিমও হয়ে যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও খুলাফা রাশিদূনের কেউ কোন হারাবী (যেমন-হামযা (রা)-এর হত্যাকারী ওয়াহশী) থেকে ইসলাম গ্রহণ করার পর হত্যার কিসাস গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণ নেই। তদুপরি সে যেহেতু ইসলামের বিধি-নিষেধের অনুসরণ নিজের জন্য আবশ্যক করে নেয় নি, তাই তার জন্য কিসাসের বিধান প্রযোজ্য হবে না। তবে অবৈধভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ এবং হত্যাকাণ্ডের কারণে সে নিজেই নিজের রক্তের নিরাপত্তা নষ্ট করেছে, তাই তাকে হত্যা করা যাবে। এ কারণে কোন হারাবী কোন মুসলিমকে হত্যা করলে তাকে হয়ত কিসাসের আওতায় হত্যা করা যাবে না; তবে অবৈধ

---

২১. ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.৬, পৃ.৫৮৭; আল-বাজী, আল-মুন্তকা, খ.৭, পৃ.১২০

২২. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৬, পৃ.১৩১-২; ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৮, পৃ.৩৩৭

২৩. আল বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, হা.নং : ১৫৬৯৮, ১৫৬৯৯; দারুকুতনী, আস-সুনান, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ১৬৬, ১৬৭

২৪. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ, খ.৬, পৃ.৩; আল-মারগীনানী, আল-হিদায়াহ, খ.৪, পৃ.৫৪৬

অনুপ্রবেশ এবং হত্যাকাণ্ডের কারণে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে। যদি সে মুসলিম হয়ে যায়, তাহলে তার ওপর কিসাস কিংবা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যাবে না।[২৫]

৩. হত্যাকারীর সন্দেহমুক্ত হত্যার অভিপ্রায় থাকা

কিসাস বাধ্যতামূলক হবার জন্য হত্যার সন্দেহমুক্ত অভিপ্রায় সহকারে হত্যা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, . العمد قود - "ইচ্ছাকৃত হত্যাতেই কেবল মৃত্যুদণ্ড প্রযোজ্য হবে।"[২৬] অতএব ভুলবশত কিংবা অসতর্কতাবশত অথবা কারণবশত হত্যার জন্য কিসাসের বিধান কার্যকর করা যাবে না। তাই দু'একটি কিল-ঘুষি মারার কারণে কেউ মারা গেলে তাতে কিসাস বাধ্যতামূলক হবে না। কেননা সচরাচর দু'একটি কিল-ঘুষি মারার উদ্দেশ্য কাউকে হত্যা করা হয় না; বরং শিক্ষা দান করা এবং সংশোধন করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।[২৭] তবে লাগাতার কিল-ঘুষি মারার কারণে কেউ মারা গেলে অধিকাংশ ইমামের দৃষ্টিতে কিসাস বাধ্যতামূলক হবে। কেননা অনবরত কিল-ঘুষি মারতে থাকা অপরাধীর মধ্যে হত্যার উদ্দেশ্য থাকার প্রমাণ বহন করে। তবে হানাফীগণের দৃষ্টিতে- এরূপ অবস্থা যেহেতু বেশি জোর ইচ্ছাকৃত হত্যার সন্দেহ জন্ম দেয়, পূর্ণ সন্দেহমুক্ত ইচ্ছাকৃত হত্যা নয়, তাই এ ধরনের হত্যাকারীর ওপর কিসাস কার্যকর করা যাবে না।[২৮]

ইচ্ছাকৃত হত্যার বিভিন্ন ধরন ঃ

ক. ধারালো অস্ত্রযোগে হত্যা করা

ধারালো অস্ত্র বলতে বোঝানো হয় যা দেহ কাটে বা দেহে বিদ্ধ হয় যেমন- লোহার তৈরি তরবারী, ছুরি, বর্শা প্রভৃতি। অনুরূপভাবে লৌহ সদৃশ তামা, দস্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য, কাঁচ, পাথর, বাঁশ, লাকড়ি প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত ধারালো বস্তুও এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেউ যদি এ রূপ কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে অপর কাউকে আঘাত করে এবং এ আঘাতের ফলে সে মারা যায়, তা হলে এরূপ হত্যাকাণ্ড 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' বলে সাব্যস্ত হবে। এতে কারো দ্বিমত নেই।[২৯]

---

২৫. আল-আনসারী, আসনাল মাতালিব, খ.৪, পৃ.১২; আদ-দাসূকী, আল-হাশিয়াতু..,খ.৪, পৃ.২৩৮
২৬. দারাকুতনী, আস-সুনান, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ৪৫
২৭. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.২৩৪
২৮. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৬, পৃ.১৩৪; আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.২৩৪
২৯. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ. ২৩৩; আল-আনসারী, আসনাল মাতালিব, খ.৪, পৃ.৩; আল-হাদ্দাদী, আল-জাওহারাহ, খ.২, পৃ. ১১৯; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ. ২০৮

খ. ধারালো নয়- এ ধরনের যে কোন অস্ত্র বা উপকরণ দিয়ে হত্যা করা

ধারালো নয়-এ ধরনের যে কোন ভারী অস্ত্র বা উপকরণ যেমন বড় পাথর, হাতুড়ী, নেহাই ও বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতির সাহায্যে হত্যা করা হলে তা 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' রূপে গণ্য হবে। এটাই অধিকাংশ ইমামের অভিমত। হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ) ও মুহাম্মাদ (রহ) প্রমুখও এ মত পোষণ করেন। বর্ণিত আছে যে, জনৈক ইয়াহুদী এক মহিলার মাথা পাথর দিয়ে গুড়িয়ে দিয়েছিল। এ অপরাধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও ঐ ইয়াহুদীর মাথা দু'পাথরের মধ্যে গুড়িয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।"[৩০] এ হাদীস থেকে জানা যায়, যে কোন ভারী অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হলেও কিসাসের আওতায় হত্যাকারীর ওপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতে যে কোন ভারী অস্ত্র বা উপকরণ দিয়ে হত্যা করা হলে হত্যাকারীর ওপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যাবে না; তবে দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। তাঁর দলীল হল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ألا إن في قتيل عمد الخطأ ، قتيل السوط والعصا و الحجر مائة من الإبل. - "অসতর্কতামূলক ইচ্ছাকৃত হত্যায় নিহত তথা বেত, লাঠি ও পাথরের আঘাতে নিহত ব্যক্তির ক্ষেত্রে একশতটি উষ্ট্র দিতে হবে।"[৩১] এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেত, লাঠি ও পাথর প্রভৃতি দ্বারা হত্যাকে 'অসতর্কতামূলক ইচ্ছাকৃত হত্যা' নামে অভিহিত করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে কিসাস নয়; দিয়াত বাধ্যতামূলক হবার কথাই বলেছেন। অতএব এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, ধারালো নয়- এ ধরনের যে কোন অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হলে তাতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যাবে না; তবে দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে।[৩২] আমাদের বর্তমান সময়ে যেহেতু হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হত্যার নিত্য নতুন কৌশলও উদ্ভাবিত হয়েছে, তাই এ ক্ষেত্রে আমি ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতের চাইতে জামহুরের মতকেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করি।[৩৩]

---

৩০. সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং: ৬৪৮৩, ৬৪৮৫; মুসলিম, (কিতাবুল কাসামাহ.), হা.নং : ১৬৭২

৩১. আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং : ১৫৪২৫, ১৪৪২৬

৩২. শাফি'ঈ, আল-উম্ম, খ.৬, পৃ. ৬; আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৬, পৃ. ১২২; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ. ২০৯

৩৩. ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর বর্ণিত দলীলে বেত ও লাঠির সাথে পাথরের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এখানে পাথর দ্বারা ক্ষুদ্র পাথরই উদ্দেশ্য; বড় পাথর নয়।

তবে ধারালো নয়-এ ধরনের যে কোন হালকা বা ক্ষুদ্র অস্ত্র বা উপকরণ যেমন ছোট লাঠি বা বেত কিংবা ছোট পাথর দ্বারা আঘাত করে কিংবা শরীরের নাজুক স্থানে প্রচণ্ড কিল-ঘুষি মেরে বা জোরে অণ্ডকোষ মোচড়িয়ে কাউকে হত্যা করা হলে তাও অধিকাংশ ইমামের মতে 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' রূপে গণ্য করা হবে। কিন্তু হানাফীগণের মতে, তা 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' নয়; 'প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা' রূপে গণ্য করা হবে।[৩৪]

গ. গুলি বা বোমা মেরে হত্যা করা

বন্দুকের গুলির সাহায্যে কিংবা বোমা মেরেও কাউকে হত্যা করা হলে তা 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' রূপে গণ্য করা হবে। কেননা গুলি নিক্ষেপ কিংবা বোমা মারার পেছনে উদ্দেশ্য হত্যাই হয়ে থাকে; শিক্ষা দান উদ্দেশ্য হয় না।[৩৫]

ঘ. শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা

গলায় ফাঁস লাগিয়ে কিংবা কোন কিছুর (যেমন- হাত, রুমাল ও বালিশ প্রভৃতি) সাহায্যে মুখ ও নাক চেপে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হলে তাও 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' রূপে গণ্য হবে। এটাও অধিকাংশ ইমামের অভিমত। হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ) ও মুহাম্মাদ (রহ) প্রমুখও এ মত পোষণ করেন।[৩৬]

ধ্বংসের পথে ফেলে হত্যা করা

ধ্বংসের পথে ফেলে কাউকে হত্যা করা হলে তাও 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' রূপে গণ্য হবে। এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। এ ধরনের হত্যার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হল-

- আগুনে নিক্ষেপ করে হত্যা

কেউ কোন ব্যক্তিকে আগুনে নিক্ষেপ করে হত্যা করলে, যা থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব নয়, তা হলে নিক্ষেপকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে। তাকে আগুন থেকে আহত অবস্থায় উদ্ধারের পর বিছানায় শায়িতাবস্থায় মারা গেলেও নিক্ষেপকারীর

তদুপরি ভারী অস্ত্র বা বস্তু দ্বারা যেহেতু সচরাচর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, তাই এ রূপ অস্ত্র বা বস্তু দ্বারা হত্যা করাকে ধারালো বস্তু দ্বারা হত্যা করার মতোই গণ্য করা হবে-এটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

৩৪. শাফি'ঈ, আল-উম্ম, খ.৬, পৃ. ৬; আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ. ২৩৩; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ. ২১০

৩৫. ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.৫, পৃ.৪৬৬-৮; 'আল-আয়নী, আল-বিনায়াহ, খ.১০, পৃ.১২

৩৬. শাফি'ঈ, আল-উম্ম, খ.৬, পৃ.৭; যায়লা'ঈ,তাবয়ীন, খ.৬, পৃ.১০৯; আল-হাদ্দাদী, আল-জাওহারাহ, খ.২, পৃ.১১৯; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ. ২১০

মৃত্যুদণ্ড হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, من حرق حرقناه. - "যে ব্যক্তি আগুনে জ্বালিয়ে মারবে, আমরাও তাকে জ্বালিয়ে মারব।"[৩৭] অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তিকে উত্তপ্ত গরম পানিতে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হলেও হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে।[৩৮]

- পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা

কোন ব্যক্তিকে হাত-পা বেঁধে পুকুর, নদী বা সমুদ্রের গভীর পানিতে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হলে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, من غرق غرقناه. - "যে ব্যক্তি ডুবিয়ে মারবে, আমরাও তাকে ডুবিয়ে মারব।"[৩৯] তবে যে পরিমাণ পানিতে পতিত হলে সাধারণত মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে না এবং সাঁতার কেটে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব (যদি সে সাঁতার জানে), সে পরিমাণ পানিতে কোন ব্যক্তিকে নিক্ষেপ করা হলে এবং তার মৃত্যু হলে নিক্ষেপকারীর ওপর দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে।[৪০]

- উচ্চ স্থান থেকে নিক্ষেপ করে হত্যা করা

উচ্চ স্থান (যেমন পাহাড়ের চূড়া বা ছাদ বা উঁচু দেয়াল), যা থেকে নিক্ষিপ্ত হলে সচরাচর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, সেখান থেকে কেউ কোন ব্যক্তিকে নিক্ষেপ করে হত্যা করলে নিক্ষেপকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে।[৪১]

- মাটিতে জীবন্ত পুঁতে হত্যা করা

মাটিতে জীবন্ত পুঁতে হত্যা করা হলে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে।[৪২]

- বন্দী করে অনাহারে কিংবা প্রচণ্ড শীত বা তাপের মধ্যে ফেলে রেখে হত্যা করা

কোন ব্যক্তিকে বন্দী করে অনাহারে রাখা হল কিংবা পানি পান থেকে বারণ করা হল অথবা প্রচণ্ড শীত বা উত্তাপের মধ্যে ফেলে রাখা হল। ফলে অনাহারে বা পিপাসায় কিংবা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বা তাপে তার মৃত্যু হল। এ ক্ষেত্রে হানাফীগণের

---

৩৭. আল বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, হা.নং : ১৫৭৭১
৩৮. শাফি'ঈ,আল-উম্ম, খ.৬, পৃ.৭; যায়লা'ঈ,তাবয়ীন, খ.৬, পৃ.১০৯; আল-হাদ্দাদী, আল-জাওহারাহ, খ.২, পৃ.১১৯; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ. ২১০
৩৯. বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, হা.নং : ১৫৭৭১
৪০. শাফি'ঈ, আল-উম্ম, খ.৬, পৃ.৭; আল-হাদ্দাদী, আল-জাওহারাহ, খ.২, পৃ. ১২০; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ. ২১১
৪১. তদেব
৪২. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ, খ.৬, পৃ.৬

মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ) ও মুহাম্মাদ (রহ) প্রমুখের মতে অপরাধীর ওপর দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে এবং মালিকী ইমামগণের মতে তার মৃত্যুদণ্ড হবে। শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে যে পরিমাণ সময় অভুক্ত রাখলে বা পিপাসার্ত থাকলে অথবা বিবস্ত্র অবস্থায় শীত বা সূর্যের তাপের মধ্যে ফেলে রাখলে সাধারণত মারা যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, সে পরিমাণ সময় অতিবাহিত হবার পর মারা গেলে অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড হবে।[৪৩]

- **শ্বাপদ বা সর্পসঙ্কুল স্থানে নিক্ষেপ করে হত্যা করা**

কোন ব্যক্তিকে শ্বাপদ বা সর্পসঙ্কুল স্থানে বেঁধে ফেলা রাখা হল। এরপর কোন হিংস্র প্রাণি এসে তাকে হত্যা করে ফেলল বা কোন সাপ এসে তাকে দংশন করল এবং এর ফলে সে মারা গেল। এরূপ অবস্থায় অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড হবে।[৪৪]

ঙ. বিষপান করিয়ে হত্যা করা

বিষ পান করানোর মাধ্যমে হত্যা করা হলেও হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে।[৪৫] বর্ণিত রয়েছে যে, খাইবার অভিযান কালে এক ইয়াহুদী নারী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বিষমিশ্রিত বকরী আহার করতে দিয়েছিল। বিষক্রিয়া থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রক্ষা পেলেও তাঁর সাহাবী বিশর ইবন বারা' (রা) নিহত হন। হত্যার অপরাধে উক্ত নারীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়।[৪৬] অনুরূপভাবে ধ্বংসাত্মক কোন বস্তু পান করানো বা খাওয়ানোর মাধ্যমে অথবা এ জাতীয় কোন উপাদানের ঘ্রাণ ছড়িয়ে হত্যা করা হলেও হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে, যদি এ সব বস্তুতে সচরাচর মৃত্যু ঘটে থাকে।

চ. যাদু করে হত্যা করা

যাদু করে হত্যা করলেও হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে, যদি উক্ত যাদুতে সচরাচর লোকজন মারা যায়। আর যে যাদুতে সচরাচর লোকজন মারা যায় না- এ ধরনের যাদুতে কেউ মারা গেলে হত্যাকারীর ওপর দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে।[৪৭]

৪. স্বেচ্ছায় ও বিনা চাপে হত্যা করা

কিসাস বাধ্যতামূলক হবার জন্য হত্যাকারীকে স্বেচ্ছায় ও বিনা চাপে হত্যা

---

৪৩. শাফি'ঈ, আল-উম্ম, খ.৬, পৃ.৭; আল-হাদ্দাদী, আল-জাওহারাহ, খ.২, পৃ. ১২০; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ. ২১১

৪৪. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.৩২, পৃ.৩৪১; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ. ২১২

৪৫. আল-হাদ্দাদী, আল-জাওহারাহ, খ.২, পৃ. ১২০; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ. ২১২

৪৬. আবূ দাউদ, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ৪৫১২

৪৭. ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ. ২১২-৩

করতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি কারো প্রবল চাপের মুখে একান্ত বাধ্য হয়েই কাউকে হত্যা করে, তাহলে তার ওপর কিসাস কার্যকর হবে না; হত্যাকারীকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া হবে। তবে চাপ প্রয়োগকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে।[৪৮] এটা ইমাম আবূ হানীফা (রহ) ও মুহাম্মাদ (রহ) প্রমুখের অভিমত। পক্ষান্তরে হানাফী স্কুলের ইমাম যুফার (রহ) ও অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের মতে- চাপ ও বল প্রয়োগের কারণে কিসাসের বিধান রহিত হবে না। অতএব চাপের মুখে একান্ত বাধ্য হয়েও কোন ব্যক্তি অপরকে হত্যা করলে হত্যাকারী[৪৯] ও বল প্রয়োগকারী দুজনেরই মৃত্যুদণ্ড হবে।[৫০]

অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি অপরকে বলল, তুমি আমাকে অথবা অমুককে হত্যা কর এবং তার ওপর ঐ আদেশ পালন বাধ্যতামূলক নয় জেনেও সে আদেশদাতাকে বা অপর ব্যক্তিকে হত্যা করল। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ হানাফী ইমামের মতে হত্যাকারীর ওপর দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। পক্ষান্তরে হানাফী স্কুলের ইমাম যুফার (রহ) ও অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের মতে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে এবং আদেশদাতা তা'যীরের আওতায় দণ্ড প্রাপ্ত হবে।[৫১]

৫. হত্যাকাণ্ডে কিসাসের পাত্র নয়-এমন কেউ হত্যাকারীর সাথে শরীক না থাকা

কিসাসের বিধান প্রযোজ্য নয়-এমন ব্যক্তি কিসাসের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়ে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে কিসাস রহিত হয়ে যাবে। অতএব, যদি এমন দু'ব্যক্তি[৫২] মিলিতভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, যাদের একজন একা হত্যা করলে কিসাস বাধ্যতামূলক হয় না; কিন্তু অপরজন একা হত্যা করলে কিসাস বাধ্যতামূলক হয়, তা হলে এ ক্ষেত্রে দু'জনের কারো কিসাস হবে না। তবে দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। তাঁদের বক্তব্য হল- এখানে যেহেতু

---

৪৮. এ হুকম প্রযোজ্য হবে যদি বলপ্রয়োগকারী হত্যাকারীকে তার প্রাণ নাশ কিংবা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নেয়ার ধমক দিয়ে চাপ প্রয়োগ করে। অতএব, বন্দী করে রাখবে কিংবা প্রহার করবে- এ জাতীয় ধমকের মুখে কাউকে হত্যা করলে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে। এতে কারো দ্বিমত নেই।

৪৯. হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড প্রসঙ্গে ইমাম শাফি'ঈ (রহ) থেকে দুটি মত বর্ণিত রয়েছে। এক. হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে। দুই. হত্যাকারীর ওপর অর্ধেক দিয়াত ও কাফফারা বাধ্যতামূলক হবে। (শাফি'ঈ, আল-উম্ম, খ.৬, পৃ.৪৪)

৫০. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৪, পৃ.৭২-৬; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ.২১৩; আল-মাওয়াক,আত-তাজ.., খ.৮, পৃ.৩০৭

৫১. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ. ১৮০; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ. ২৮৮; আল-মরদাভী, আল-ইনসাফ, খ.৯, পৃ.৪৫৪

৫২. যেমন- নাবালিগ ও বালিগ বা সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ও পাগল কিংবা পিতা ও অন্য ব্যক্তি অথবা একজন ইচ্ছাকৃতভাবে এবং অপরজন ভুলবশত হত্যাকারী।

হত্যাকর্ম একটিই, তাই হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণকারী সকল লোকের শাস্তিও একই ধরনের হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক একজনকে এক এক ধরনের শাস্তি দেয়া হলে তা হবে অযৌক্তিক। কিন্তু ইমাম শাফি'ঈ (রহ)-এর মতে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে অংশীদার এবং পিতার সাথে অংশীদার ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড হবে; তবে দু'জনের একজন ইচ্ছাকৃতভাবে এবং অপরজন ভুলবশত হত্যা করলে ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর ওপর দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে।[৫৩]

নিহত ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী ঃ

১. নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীর সন্তান বা অধঃস্তন ব্যক্তি না হওয়া

কিসাস বাধ্যতামূলক হবার জন্য নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীর পুত্র বা কন্যা অথবা নাতি বা নাতনি হতে পারবে না। অতএব, হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির পিতা, দাদা বা মাতা হলে কিসাস রহিত হয়ে যাবে; কিন্তু দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে।[৫৪] তবে কোন ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী (যত উর্ধ্বগামী হোক)- তাদের কাউকেও হত্যা করলে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে। হযরত সুরাকা ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ حضرت رسول الله (صلى الله عليه و سلم) يقيد الأب من ابنه ' ولا يقيد الإبن من ابنه. - "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত থেকে দেখেছি, তিনি পিতৃহত্যার অপরাধে পুত্রের ওপর কিসাসের বিধান কার্যকর করেছেন এবং পুত্রহত্যার অপরাধে পিতার ওপর কিসাস কার্যকর করেন নি।"[৫৫] হযরত 'উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি যে, لا يقاد الوالد بالولد. - "পুত্রহত্যার অপরাধে পিতার ওপর কিসাস কার্যকর হবে না।"[৫৬]

২. নিহত ব্যক্তি 'মা'সূমুদ দ্দাম' হওয়া

কিসাস বাধ্যতামূলক হবার জন্য নিহত ব্যক্তির জীবনের নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকতে হবে। অর্থাৎ সে যদি অন্য কোন অপরাধে (যেমন হত্যা, ধর্মত্যাগ ও

---

৫৩. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.২৩৫; যায়লা'ঈ, তাবয়ীন, খ.৬, পৃ. ১০৫

৫৪. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৬, পৃ.৯০; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ. ২২৭
ইমাম মালিকের মতে, পিতার আক্রমণ থেকে সন্তানের প্রাণ বধ করার উদ্দেশ্য যদি স্পষ্ট বোঝা যায় যেমন- ছেলেকে ধরে নিয়ে যবেহ করল, তাহলে কিসাস বাধ্যতামূলক হবে। আর যদি প্রকাশ্য প্রাণ বধ করার উদ্দেশ্য বোঝা না যায় যেমন- সন্তানকে উদ্দেশ্য করে তরবারী বা ছুরি নিক্ষেপ করল এবং এর আঘাতে সে মারা গেল, তা হলে কিসাস বাধ্যতামূলক হবে না। (মালিক, আল-মুদাওয়ানাহ, খ.৪, পৃ.৪৯৮)

৫৫. আত্ তিরমিযী, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ১৩৯৯

৫৬. আত্ তিরমিযী, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ১৪০০

ব্যভিচার প্রভৃতি) হত্যাদণ্ডে দণ্ডিত হয় কিংবা রাষ্ট্রে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী অমুসলিম (হারাবী) হয়, তাহলে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে না।

- যদি নিহত ব্যক্তি হারাবী হয় তা হলে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। কেননা হারাবীর জীবনের নিরাপত্তা রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব নয়। অধিকন্তু, সে অবৈধভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করে নিজের জীবনের নিরাপত্তা নিজেই বিঘ্নিত করেছে।[৫৭]
- যদি নিহত ব্যক্তি মুরতাদ হয়, তাহলেও হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে না। কেননা ধর্মান্তরের কারণে সে তার জীবনের নিরাপত্তা হারিয়ে ফেলেছে। তাই তার প্রাণের ওপর যে কোন ধরনের আক্রমণের জন্য মৃত্যুদণ্ড হবে না।[৫৮] তবে যে কোন অপরাধীর ওপর শাস্তি কার্যকর করার দায়িত্ব যেহেতু সরকারের, তাই কোন ব্যক্তি মুরতাদকে হত্যা করলে সে সরকারের কর্তৃত্বের অবমাননা করল। এজন্য সে তা'যীরের আওতায় দণ্ডযোগ্য হবে।
- যদি নিহত ব্যক্তি কোন হত্যাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহলে তার রক্তের বৈধ দাবীদাররা তাকে হত্যা করলে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে না। তবে সরকারের কর্তৃত্বের অবমাননা করার কারণে তা'যীরের আওতায় তার শাস্তি হবে। নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছরা ছাড়া অন্য কেউ তাকে হত্যা করলে হত্যাকারীর ওপর মৃত্যুদণ্ড বাধ্যতামূলক হবে।[৫৯]
- যদি নিহত ব্যক্তি ব্যভিচারের অপরাধে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার দণ্ডপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তার হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড কিংবা অন্য কোন রূপ শাস্তি হবে না। তবে বিচারকের ফায়সালার আগে তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে আর ভুলবশত হত্যার জন্য দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে।[৬০]

৩. নিহত ব্যক্তি ও হত্যাকারীর মধ্যে শ্রেণী ও অবস্থাগত পার্থক্য না থাকা

কিসাসের আওতায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য ইসলাম ও স্বাধীনতা প্রভৃতি দিক থেকে নিহত ব্যক্তি ও হত্যাকারীর মধ্যে মিল থাকা প্রয়োজন। এ সব বিষয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে নিম্ন মর্যাদার ব্যক্তির বদলায় মৃত্যুদণ্ড দেয়া

---

৫৭. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.১০, পৃ.৯৫
৫৮. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.১০, পৃ.১০৭; আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ. ২৩৬
৫৯. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.৩৩, পৃ.২৬৩
৬০. ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৫, পৃ.৯; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ. ২২১

যাবে না। তবে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কোন ব্যক্তির বদলায় নিম্ন মর্যাদার ব্যক্তিকে এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে পরস্পরের বদলায় মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে। এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তাঁদের মতানুসারে কোন হত্যাকাণ্ডে কাফিরের বদলায় হত্যাকারী মুসলিমকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। তবে মুসলিমের বদলায় কাফির হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে। অনুরূপভাবে গোলামের বদলায় হত্যাকারী স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না, যদি দুজনেই মুসলিম বা কাফির হয়। যদি গোলাম মুসলিম হয় এবং স্বাধীন ব্যক্তিটি কাফির হয়, তাহলে কাফিরের বদলায় গোলামকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। পক্ষান্তরে যদি গোলাম কাফির হয় এবং স্বাধীন ব্যক্তি মুসলিম হয়, তাহলে মুসলিমের বদলায় গোলামের মৃত্যুদণ্ড হবে।[৬১]

তবে হানাফীগণের মতে- কিসাসের আওতায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য নিহত ব্যক্তি ও হত্যাকারীর মধ্যে শ্রেণী ও অবস্থাগত মিল থাকার প্রয়োজন নেই। স্বাধীন গোলামকে, গোলাম স্বাধীনকে, কাফির মুসলিমকে, মুসলিম কাফিরকে, পুরুষ নারীকে, নারী-পুরুষকে, এবং বালিগ না বালিগকে এবং সুস্থ অসুস্থকে হত্যা করলে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে। কেননা কিসাসের বিধানটি সাধারণ অর্থজ্ঞাপক। তাতে কারো রক্তের বা মর্যাদার পার্থক্য করা হয় নি। তাই হত্যাকারী যে-ই হোক 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' প্রমাণিত হলেই তার মৃত্যুদণ্ড হবে।[৬২] মর্যাদার পার্থক্য করা হলে কিসাসই বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং পারস্পরিক শত্রুতা আরো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে। কোন ব্যক্তি মৃত্যু শয্যাগত, তার বেঁচে থাকার আশা নেই বা কোন লক্ষণ নেই- এ অবস্থায় সে নিহত হলে হত্যাকারীকে কিসাসস্বরূপ হত্যা করা হবে।[৬৩]

দলের হত্যাকাণ্ড ঃ

হত্যার অপরাধে কিসাস কার্যকর করার জন্য হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে সংখ্যার সমতা বিদ্যমান থাকার শর্ত নেই। অতএব কয়েক ব্যক্তি একত্রিত হয়ে এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে কিসাসস্বরূপ হত্যাকারী দলের সকলের মৃত্যুদণ্ড হবে,

---

৬১. মালিক, আল-মুদাওয়ানাহ, খ.৪, পৃ.৬০৫,৬৫১; শাফি'ঈ,আল-উম্ম, খ.৬, পৃ.২৭, ৪০; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ.২১৮, ২২১

৬২. ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ.২১৫; ইবনু নুজায়ম,আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৮, পৃ.৩৩৮; আয-যুহায়লী, আল-ফিকহুল ইসলামী.., খ.৬, পৃ.২৫৫-৬

৬৩. আল-মারগীনানী, আল-হিদায়াহ, খ.৪, পৃ.৫৪৭, ৫৫২; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ, খ.৬, পৃ.৩-৪

যদি প্রত্যেকেই সরাসরি হত্যাকাণ্ডে শরীক থাকে।[৬৪] হযরত সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ পাঁচ কিংবা সাতজন লোক মিলে জনৈক ব্যক্তিকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করেছিল। হযরত 'উমার (রা) তাদের সকলকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। উপরন্তু, তিনি বললেন, لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. "সান'আবাসী সকলে মিলে তাকে হত্যা করলে তার প্রতিশোধস্বরূপ আমি অবশ্যই তাদের সকলকে হত্যা করতাম।"[৬৫]

তবে কয়েকজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে কোন ব্যক্তিকে একের পর এক আঘাত করল (যেমন- কেউ এক ব্যক্তির পায়ে আঘাত করল, কেউ পেটে আঘাত করল এবং কেউ কণ্ঠনালীতে আঘাত করল আর কেউ ঘাড়ে আঘাত করল) এবং এর ফলে আহত ব্যক্তি মারা গেল। এ ক্ষেত্রে যার বা যাদের আঘাতে সে নিহত হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে তার বা তাদের মৃত্যুদণ্ড হবে এবং অন্যদের ওপর দিয়াত আরোপিত হবে।[৬৬]

অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি একাই একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করলে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে। এ ক্ষেত্রে কিসাস বাধ্যতামূলক হবার জন্য নিহত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের ওয়ারিছদের সম্মিলিতভাবে কিসাস দাবি করার প্রয়োজন নেই। যে কোন একজন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছরা কিসাসের দাবি করলেই তা কার্যকর হবে এবং অবশিষ্ট নিহত ব্যক্তিদের ওয়ারিছগণের অধিকার রহিত হয়ে যাবে। এটা হানাফীগণের অভিমত। ইমাম শাফি'ঈ (রহ)-এর মতে- তাদের মধ্যে প্রথম নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছদের দাবী অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে আর অবশিষ্ট নিহত ব্যক্তিদের জন্য দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। আর যদি প্রত্যেক নিহত ব্যক্তির সকল ওয়ারিছ মিলে এক সাথে কিসাস দাবী করে এবং প্রথম নিহত ব্যক্তির দাবীদার চিহ্নিত করা না যায়, তা হলে সকলের পক্ষ থেকে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে এবং দিয়াতের অর্থ সকলের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করে

---

৬৪. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৬, পৃ.১২৬; আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ. ২৩৯; যায়লা'ঈ, তাবয়ীন, খ.৬, পৃ.১১৪; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ. ২৩০-২

৬৫. মালিক, আল-মু'আত্তা, (কিতাবুল 'উকূল), হা.নং: ১৫৬১; শাফি'ঈ, আল-মুসনাদ, খ.১, পৃ.২০০
আরো বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত 'আলী (রা) এক ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধে তিন জনকে এবং ইবনু 'আব্বাস (রা) এক জনকে হত্যার অপরাধে একটি দলকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। সাহাবা কিরামের মধ্যে কেউ তাঁদের এ ফায়সালার বিরোধিতা করেছেন মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাই বলা যেতে পারে, এ বিষয়ের ওপর সাহাবা কিরামের ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ. ২৩০-১)

৬৬. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ. ২৪৩-৫; শায়খী যাদাহ, মাজমা'উল আনহুর, খ.২, পৃ. ৬২৮

দেয়া হবে। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে লটারীর ভিত্তিতে কিসাস ও দিয়াতের হকদারদের অগ্রগণ্যতা নিরূপণ করা হবে। যাহিরী স্কুলের ইমামগণের মতেও- লটারীর ভিত্তিতে কিসাস ও দিয়াতের হকদার নির্ধারণ করা হবে।[৬৭]

কিসাসের দাবীদারদের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী ঃ

১. কিসাসের দাবীদার বিদ্যমান থাকা

কিসাস কার্যকর করার জন্য নিহত ব্যক্তির রক্তের দাবীদার বিদ্যমান থাকতে হবে। যদি রক্তের কোন দাবীদারই খুঁজে পাওয়া না যায়, তাহলে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে না।[৬৮] উল্লেখ্য যে, ওয়ারিছরাই একমাত্র কিসাসের আওতায় মৃত্যুদণ্ড দাবী করার বৈধ অধিকারী। তারা ছাড়া অন্য কেউ কিসাস দাবী করলে তা কার্যকর করা যাবে না।

তবে নিহত ব্যক্তি লাওয়ারিছ হলে অর্থাৎ তার কোন ওয়ারিছ না থাকলে অধিকাংশ ইমামের মতে সরকারই কিসাসের দাবীদার হবে।[৬৯] সরকার ইচ্ছে করলে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে এবং ইচ্ছে করলে ক্ষমাও করতে পারে। হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,.السلطان ولي من لا ولي له - "যার অভিভাবক নেই শাসকই তার অভিভাবক।"[৭০]

২. রক্তের দাবীদারদের শারীরিক ও মানসিক পূর্ণ উপযুক্ততা থাকা

নিহত ব্যক্তির রক্তের দাবীদারদের প্রত্যেককে পূর্ণ উপযুক্ত হতে হবে অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক ও বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। যদি রক্তের দাবীদাররা সকলেই উপযুক্ত না হয় বা তাদের মধ্যে কয়েকজন উপযুক্ত, অপর কয়েকজন উপযুক্ত না হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতে- তাদের মধ্যকার উপযুক্তরা

---

৬৭. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ. ২৩৯; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.১০, পৃ. ২৪৫; আল-আনসারী, আল-গুরার.., খ.৫, পৃ.৪৬

৬৮. নিহত ব্যক্তির প্রত্যেক ওয়ারিছই- যূল ফুরূদ হোক বা 'আসাবাহ, পুরুষ হোক বা নারী, ছোট হোক বা বড়- কিসাস দাবি করার বেলায় পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। কিসাসের দাবী পেশ করার জন্য সকলের একত্রিত হবার প্রয়োজন নেই। তাদের যে কোন একজনের দাবিও ন্যায্য বলে গণ্য হবে।

৬৯. ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর মতে- ইসলামী রাষ্ট্রে নিহত ব্যক্তির জন্য সরকারের কিসাস দাবী করার অধিকার নেই। মালিকীগণের মতে, সরকারের কিসাস দাবী করার অধিকার রয়েছে; তবে তার ক্ষমা করার অধিকার নেই। (আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.৩৩, পৃ. ২৭২)

৭০. আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা.নং : ২৫৩৬৫; ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ, হা.নং : ৩৬১১৭

অনুপযুক্তদের অভিভাবক বলে গণ্য হবে এবং তারা কিসাস দাবী করতে পারবে। কেননা তাঁর মতে- ওয়ারিছদের প্রত্যেকেরই কিসাসের দাবী করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। শাফি'ঈ ও হাম্বলী মতাবলম্বী ইমামগণ এবং হানাফী ইমামগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ) ও মুহাম্মাদ (রহ) প্রমুখের মতে, রক্তের দাবীদাররা সকলেই অনুপযুক্ত হলে কিংবা কেউ উপযুক্ত আর কেউ অনুপযুক্ত হলে যেহেতু এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, তাদের কেউ হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেবে এবং এর ফলে মৃত্যুদণ্ড রহিত হবে, তাই কিসাস কার্যকর করার জন্য ছোটদের বড় হওয়া পর্যন্ত এবং পাগলদের বিবেক-বুদ্ধি ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।[৭১]

৩. নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছদের পক্ষ থেকে কিসাসের দাবী থাকা

কিসাস বাধ্যতামূলক হবার জন্য নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছদের পক্ষ থেকে কিসাসের দাবী থাকতে হবে। অতএব, তাদের পক্ষ থেকে কিসাসের দাবী করা না হলে কিসাস রহিত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,. العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول - "ইচ্ছাকৃত হত্যা অবশ্যই সদৃশ বদলা গ্রহণযোগ্য। তবে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছরা ক্ষমা করে দিলে ভিন্ন কথা।"[৭২] তদুপরি কিসাস কার্যকর করার জন্য কিসাসের দাবিতে সকল ওয়ারিছের একমত হতে হবে। যদি তাদের একজনও হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয় বা দিয়াত বা মালের বিনিময়ে সমঝোতা করতে চায়, তাহলে কিসাস রহিত হয়ে যাবে; দিয়াত ওয়াজিব হবে।

৪. নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছদের সকলেই উপস্থিত থাকা

কিসাস কার্যকর করার জন্য সকল ওয়ারিছের উপস্থিত থাকা জরুরী। ওয়ারিছদের কেউ অনুপস্থিত থাকলে তার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে কিংবা নিশ্চিতভাবে তার মতামত জানার চেষ্টা করতে হবে।[৭৩] কারণ অনুপস্থিত ওয়ারিছ হত্যাকারীকে হয়ত বা ক্ষমা করে দিতে পারে বা অর্থের বিনিময়ে হত্যাকারীর সাথে সমঝোতা করতে পারে। এ অবস্থায় কিসাস কার্যকর করা হলে তা অনুপস্থিত ওয়ারিছের অধিকারে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপরূপে গণ্য হবে।

---

৭১. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.২৪১-৫; ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৮, পৃ.৩৪২; শাফি'ঈ, আল-উম্ম, খ.৬, পৃ.১০; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.৩৩, পৃ. ২৭৩-৪

৭২. দারাকুতনী, আস-সুনান, (কিতাবুল হুদূদ..), হা.নং : ৪৫; ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ, হা.নং : ২৭৭৬৬

৭৩. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.২৪৩

৫. কিসাসের দাবীদার হত্যাকারীর সন্তান কিংবা তার অধঃস্তন ব্যক্তি না হওয়া

কিসাসের দাবীদাররা হত্যাকারীর সন্তান কিংবা অধঃস্তন ব্যক্তি হলে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে না। কেননা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সন্তান-হত্যার বদলায় পিতার মৃত্যুদণ্ড হবে না। অনুরূপভাবে সন্তান-হত্যায় অন্যদের সাথে পিতা শরীক থাকলেও কোন হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে না।[৭৪]

হত্যাকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী ঃ

১. হত্যাকাণ্ড সরাসরি হওয়া

হত্যাকারী সরাসরি হত্যা করলে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা বাধ্যতামূলক হবে। কোন কারণবশত হত্যাকাণ্ডের জন্য কিসাসস্বরূপ হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে না। যেমন- কোন ব্যক্তি যাতায়াতের রাস্তার পার্শ্বে গর্ত খনন করল এবং তাতে কোন পথচারী পড়ে গিয়ে মারা গেল। এ ক্ষেত্রে খননকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে না। অনুরূপভাবে কারো সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কাউকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হল। পরবর্তীতে সে যদি নিজের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় কিংবা কোনভাবে তার মিথ্যাচারিতা প্রমাণিত হয়, তাহলেও সাক্ষীকে কিসাসস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। এটা হানাফীগণের অভিমত। তবে অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের মতে- কারণবশত হত্যাকাণ্ডের জন্যও হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে, যদি কিসাস কার্যকর করার অন্যান্য শর্ত পাওয়া যায়।[৭৫]

২. হত্যা সীমা লঙ্ঘনমূলক হওয়া

যদি অন্যায়ভাবে বা সীমালঙ্ঘন করে কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়, তবেই কিসাস বাধ্যতামূলক হবে।[৭৬] যদি কেউ আইনসিদ্ধ পন্থায় কিংবা কাউকে তার অনুমতিক্রমে হত্যা করে, তাহলে হত্যাকারীর ওপর কিসাস কার্যকর করা যাবে না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি নিজের জান, ধন-সম্পদ বা নিজের স্ত্রী-কন্যার সতীত্ব রক্ষার প্রয়োজনে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে গিয়ে হত্যা করলে তার ওপরও কিসাস কার্যকর করা যাবে না।

শিক্ষক, পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের শিক্ষাদানমূলক শাস্তিতে কোন ছাত্র বা সন্তানের মৃত্যু ঘটলে তার জন্যও কিসাস কার্যকর করা যাবে না।[৭৭]

---

৭৪. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.৩৩, পৃ.২৬৯

৭৫. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.২৩৯; আর-রামালী, নিহায়াতুল মুহতাজ, খ.৭, পৃ.২৫৩; আস-সাভী, বুলগাতুস সালিক, খ.৪, পৃ.৩৪২

৭৬. আস-সাভী, বুলগাতুস সালিক, খ.৪, পৃ.৩২৮

৭৭. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.৩০৫; গানিম, মাজমাউদ্ দিমানাত, পৃ. ১৬৬

৩. হত্যা ইসলামী রাষ্ট্রে সংঘটিত হওয়া

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য হত্যাকাণ্ড ইসলামী রাষ্ট্রে সংঘটিত হতে হবে। অতএব কোন হারাবী ইসলাম গ্রহণ করল; কিন্তু হিজরাত করে ইসলামী রাষ্ট্রে চলে আসল না। এ রূপ অবস্থায় দারুল হারবের মধ্যে কোন মুসলিম তাকে হত্যা করলে এর জন্য হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে না। কেননা সে মুসলিম হলেও দারুল হারবের বাসিন্দা হবার কারণে তার জীবনের নিরাপত্তা রক্ষা করার দায়িত্ব যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের নেই, তাই তার হত্যার জন্য হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে না। অনুরূপভাবে দারুল হারবে সফররত দুজন মুসলিম ব্যবসায়ী একে অপরকে হত্যা করলেও হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে না; তবে দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। এটা হানাফীগণের অভিমত।[৭৮] শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে- যে কোন ব্যক্তি দারুল হারবে কোন মুসলিমকে হত্যা করলে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে। তাঁদের বক্তব্য হল- কিসাসের বিধানটি সাধারণ অর্থজ্ঞাপক। তাতে দারুল হারব ও দারুল ইসলামের মধ্যে পার্থক্য করা হয় নি। তাই হত্যাকারী যে দেশের-ই হোক তার মৃত্যুদণ্ড হবে।[৭৯]

হত্যার প্রমাণ ঃ

ক. স্বীকারোক্তি

হত্যাকারী স্বেচ্ছায় হত্যার স্বীকারোক্তি প্রদান করলে হত্যা প্রমাণিত হবে। তবে কারো চাপের মুখে একান্ত বাধ্য হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নিলে তা দ্বারা হত্যা প্রমাণিত হবে না।[৮০]

খ. সাক্ষ্যপ্রমাণ

দুজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা হত্যা প্রমাণিত হবে। একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষ্য কিসাসযোগ্য হত্যা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। তবে ভুলবশত হত্যা এবং কিসাসযোগ্য নয়- এমন সকল হত্যার ক্ষেত্রে একজন পুরুষের সাথে দুজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।[৮১]

উল্লেখ্য যে, সাক্ষীদের সাক্ষ্যে পূর্ণ মিল থাকতে হবে। যদি হত্যার স্থান, সময় ও উপকরণ প্রভৃতি ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাক্ষীর সাক্ষ্যের মধ্যে কোন রূপ

---

৭৮. ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.১০, পৃ.৪০৩; ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.৬, পৃ.৬৫৪
৭৯. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.৩৩, পৃ.২৬৮
৮০. ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৫, পৃ.৮৭
৮১. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৬, পৃ.১০৫

পার্থক্য দেখা দেয়, তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্যে গরমিল হলে তা ধর্তব্য হবে না।[৮২]

গ. শপথ (কসামাহ)[৮৩]

শপথ দ্বারাও হত্যা প্রমাণ করা করা যেতে পারে। শাফি'ঈগণের মতে- শপথ দ্বারা প্রমাণিত ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য কিসাস এবং ভুলবশত হত্যার জন্য দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। হানাফী ও হাম্বলীগণের মতে- শপথ দ্বারা প্রমাণিত কোন হত্যার জন্য কিসাস কার্যকর করা যাবে না; কেবল দিয়াতই বাধ্যতামূলক হবে।[৮৪]

এর নিয়ম হল - কোন ব্যক্তিকে নিহত অবস্থায় কোন জনপদে পাওয়া গেলে এবং তার হত্যাকারী জানা না গেলে অথবা কোন ঘরে কিংবা কারো কোন খোলা জায়গায় একদল লোক একত্রিত হয়ে কোন হত্যাকাণ্ড ঘটাল এবং এরপর তারা সকলে সটকে পড়ল, তাহলে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছরা সে জনপদের বা সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চাশজন লোককে বেছে নেবে, যাদের মধ্যে হত্যাকারী থাকার সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে অথবা যাদের সাথে নিহত ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে বলে জানা যাবে। তারা প্রত্যেকেই আল্লাহর নামে এ মর্মে শপথ করবে যে, তারা তাকে হত্যা করে নি। উপরন্তু, তারা জানে না যে, হত্যাকারী কে?[৮৫] যদি তারা শপথ করে, তাহলে তারা দিয়াত প্রদান করা থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। আর যদি সবাই শপথ করতে অস্বীকার করে, তাহলে সবার ওপরই দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে।[৮৬] যদি সাধারণ্যের চলাচল বা প্রবেশের জায়গায় (যেমন- বড় মসজিদ ও হাইওয়ে প্রভৃতি) কোন ব্যক্তিকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহলে শপথের এ বিধান প্রযোজ্য হবে না। বায়তুল মাল থেকে তার সম্পূর্ণ দিয়াত পরিশোধ করতে হবে।[৮৭]

---

৮২. যায়ল'ঈ, তাবয়ীন, খ.৬, পৃ.১২৩; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.১০, পৃ. ২৬৪

৮৩. হত্যা প্রমাণের উদ্দেশ্য নির্ধারিত নিয়মে শপথ করাকে ইসলামী শাস্তি আইনের পরিভাষায় 'কাসামাহ' বলা হয়।

৮৪. ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ.৩৮৪

৮৫. এটা হানাফীগণের অভিমত। অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের মতে শপথের নিয়ম হল- নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছরা প্রথমে পঞ্চাশ বার এ বলে শপথ করবে যে, এ ব্যক্তিই হত্যা করেছে। যদি তারা শপথ করতে অস্বীকার করে, তাহলে অভিযুক্তদেরকে শপথ করতে বলা হবে। (ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ.৩৮২)

৮৬. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৬, পৃ.১০৬-৭; আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.২৯১-২

৮৭. যায়ল'ঈ, তাবয়ীন, খ.৬, পৃ.১৭৪

যদি শহরের কোন এলাকায় বা রাস্তায় কিংবা শহরের কোন নিকটবর্তী এলাকায় কোন ব্যক্তিকে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়, তাহলে শহরের সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল লোককেই শপথ করতে হবে। যদি দুটি শহরের মধ্যবর্তী এলাকায় কোন ব্যক্তিকে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়, তাহলে দুরত্বের দিক থেকে যে শহরের নিকটবর্তী এলাকায় লাশ পাওয়া যাবে, সে শহরের বাসিন্দাদেরকে শপথ করতে হবে।[৮৮]

ঘ. লক্ষণপ্রমাণ

ইবনুল কাইয়িম (রহ) ও ইবনু ফারহুন (রহ) প্রমুখের মতে বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারাও হত্যা প্রমাণ করা যাবে, যদি তাতে সুস্পষ্টভাবে হত্যার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- কোন ব্যক্তিকে নিহত ব্যক্তির পাশে তরবারী কিংবা অস্ত্রসহ অথবা রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেলে অথবা কাউকে তার পরিচিত শক্রর ঘরে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে কিংবা নিহত ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় 'অমুক আমাকে হত্যা করেছে'- এ মর্মে ঘোষণা দিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি হত্যাকারীরূপে ধর্তব্য হবে। তাদের মতে- লক্ষণপ্রমাণকে যদি প্রামাণিক দলীল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া না হয়, তা হলে বহু অধিকারই ক্ষুণ্ন হবে। যুলম ও বিশৃঙ্খলা বেড়ে যাবে।[৮৯] তবে অধিকাংশ ইমামের মতে- সাক্ষ্য-প্রমাণ কিংবা স্বীকারোক্তি ছাড়া অন্য কোনভাবেই কিসাস বা দিয়াতযোগ্য হত্যা প্রমাণ করা যাবে না। তবে শক্তিশালী কোন লক্ষণ পাওয়া গেলে শপথের উপর্যুক্ত নিয়ম অনুযায়ী অপরাধ প্রমাণ করা যাবে।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার উপায় ঃ

তরবারি দ্বারাই হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لا قود إلا بالسيف- "কেবল তরবারি দ্বারাই কিসাস কার্যকর করতে হবে।"[৯০] তদুপরি তরবারি খুবই তীক্ষ্ণ ও শাণিত হতে হবে, যাতে যার ওপর তা চালানো হবে তাকে খুব দ্রুত ঠাণ্ডা করে দেয়। সে অন্যভাবে কষ্ট পাবে না। তাছাড়া লোকেরা তরবারিকে খুব বেশি ভয় পায়।

---

৮৮. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৬, পৃ.১১৯-১২০; আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.২৯২
৮৯. ইবনুল কাইয়িম, আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, পৃ.৩-৪, ৮৪; ইবনু ফারহুন, তাবছিরাতুল হুক্কাম ..,খ.১, পৃ.১১৮, ১৪৭
৯০. ইবনু মাজাহ, (কিতাবুদ দিয়াত),হা.নং : ২৬৬৭; আল-বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, হা.নং : ১৫৮৬৮, ১৫৮৭০

ফলে তা জীবিত লোকদের জন্য একটা ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছদের ক্রোধাগ্নিও নির্বাপিত করে।

তরবারি ছাড়া অন্য কিছুর সাহায্যে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা বৈধ নয়। এমনকি হত্যাকারী কোন ব্যক্তিকে নির্যাতন করে হত্যা করলেও তাকে নির্যাতন করে হত্যা করা যাবে না। এটা হানাফী ইমামগণের অভিমত। অধিকাংশ হাম্বলী ইমামও এ মত পোষণ করেন। তাদের মতানুযায়ী কিসাসের বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এ কারণে কিসাস কার্যকর করার পূর্বে তাকে কোনরূপ মারধর করা, তার ওপর নির্যাতন চালানো, কারাগারের মধ্যে কষ্ট দেয়া বা ক্ষুৎ-পিপাসায় ছটফট করতে বাধ্য করা এবং কিসাস কার্যকর করার পর তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরা টুকরা করা ও দেহ বিকৃত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনকি হাদীসে ভোঁতা তরবারি দ্বারা হত্যা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, إن الله كتب الإحسان على كل شيئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة- "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। অতএব যখন তোমরা (কিসাসস্বরূপ) হত্যা করবে, তখন উত্তমভাবে হত্যাকার্য সম্পন্ন করবে।"[৯১]

মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামগণের মতে, হত্যার কিসাসস্বরূপ যে হত্যাকার্য হবে, তা ঠিক সেভাবেই হতে হবে যেভাবে প্রথম হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به - "তোমরা যখন প্রতিশোধস্বরূপ শাস্তি দেবে, তখন তোমরা তা ঠিক সেভাবেই করবে, যেভাবে তোমরা নিজেরা শাস্তি পেয়েছ।"[৯২] বর্ণিত রয়েছে, জনৈক ইয়াহূদী দুটি পাথরের মাঝখানে রেখে এক মুসলিম মেয়ের মস্তক চূর্ণ করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও কিসাসস্বরূপ ঐ ইয়াহূদীটির মস্তক দুটি প্রস্তরের মাঝে রেখে ছেচে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৯৩]

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অধিকারী ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا - "কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার অভিভাবককে

---

৯১. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুস সায়দ ওয়ায যাবা'ইহ), হা.নং : ১৯৫৫; তিরমিযী, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ১৪০৯

৯২. আল-কুর'আন, (সূরা আন-নাহাল) ঃ ১২৬

৯৩. ইবনু মাজাহ, (কিতাবুদ দিয়াত),হা.নং : ২৬৬৫; আহমদ, আল-মুসনাদ, হা.নং : ১২৯১৮

তো আমি তার প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে। সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে।"[৯৪] এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তির রক্তের কিসাস গ্রহণের অধিকার তার অভিভাবকের রয়েছে। বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক নিহত ব্যক্তির ভাইয়ের কাছে হত্যাকারীকে সঁপে দিয়ে বললেন, دونك صاحبك. - "নাও তোমার অপরাধী ভাইকে!"[৯৫] কিন্তু এ অধিকার ব্যক্তিগতভাবে কাউকে দেয়া হলে যেহেতু বাড়াবাড়ির আশংকা থাকে, তাই সরকার বা তার অধীনে পরিচালিত ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ওপরই এ দায়িত্ব অর্পিত হবে। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজস্বভাবে হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকারী নয়। অতএব কিসাস দাবি করার অধিকার অভিভাবকের হলেও তার বাস্তবায়নের জন্য তাকে ইসলামী সরকারের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে এবং ইসলামী সরকার নিহতের দাবি অনুযায়ী কিসাস কার্যকর করবে।

তবে নিহতের অভিভাবক নিজ হাতে কিসাস কার্যকর করার কাজটি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করতে সক্ষম হলে এবং সরকার বা তার প্রতিনিধি তাকে এ কাজের উপযুক্ত মনে করলে তাকে নিজ হাতেই হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অনুমতি দিতে পারে। তবে এ কাজটি করতে হবে সরকার কর্তৃপক্ষীয় লোকের উপস্থিতিতে, যাতে সে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার বেলায় কোন রূপ বাড়াবাড়ি করতে না পারে। নিহতের অভিভাবক সরকারের অনুমতি ছাড়াই হত্যাকারীকে মেরে ফেললে সরকারের কর্তৃত্বের অবমাননা করার কারণে তাকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া হবে।[৯৬]

হত্যার আনুষঙ্গিক শাস্তি ঃ

ক. কাফফারা

'ভুলবশত হত্যা' ও 'প্রায় ভুলবশত হত্যা'র ক্ষেত্রে কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে। কাফফারার উদ্দেশ্য হল পাপের ক্ষমা পাওয়া। তবে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড যেহেতু অত্যন্ত বড় ও কঠিন এবং এ কাজের প্রতিফল খুবই ভয়াবহ, তাই এরূপ হত্যাকাণ্ডে কাফফারার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু 'প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা'র ক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হবে। এটা হানাফী ও মালিকীগণের

---

৯৪. আল-কুর'আন, ১৭ (বনী ইসরাইল) ঃ ৩৩

৯৫. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল কাসামাহ), হা.নং : ১৭৮০; নাসাঈ, আস-সুনান আল- কুবরা, হা.নং : ৬৯২৯

৯৬. ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ. ২৪৩-৪

অভিমত।[৯৭] শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে- সব ধরনের হত্যায় কাফফারা ওয়াজিব হবে। তাঁদের কথা হল- ইচ্ছাকৃত হত্যায় যেহেতু পাপের স্খলন অধিকতর প্রয়োজন, তাই ভুলবশত হত্যার চাইতে এরূপ হত্যাকাণ্ডে কাফফারা আরো অধিক কঠোরভাবে ওয়াজিব হওয়াই যুক্তিযুক্ত।[৯৮]

হত্যার কাফফারা হচ্ছে একজন ঈমানদার দাস বা দাসী মুক্ত করা। তা পাওয়া না গেলে একাধারে দু মাস রোযা রাখা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة و إن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و كان الله عليما حكيما. - "এবং কেউ কোন মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে একজন ঈমানদার দাস বা দাসী মুক্ত করা এবং নিহতের পরিবারকে দিয়াত প্রদান করা বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং মু'মিন হয় তবে একজন ঈমানদার দাস মুক্ত করা বিধেয়। নিহত ব্যক্তি যদি তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ (অমুসলিম) সম্প্রদায়ের লোক হয় তবে তার পরিবারকে দিয়াত প্রদান এবং একজন ঈমানদার দাস মুক্ত করা বিধেয়। যে তা পারবে না তাকে একাধারে দুমাস রোযা রাখতে হবে।"[৯৯]

কোন মুসলিম অপর কোন মুসলিম বা ইসলামী রাষ্ট্রের কোন অমুলিম নাগরিককে হত্যা করলে হত্যাকারীকে উক্ত কাফফারা আদায় করতে হবে।

খ. উত্তরাধিকারস্বত্ব থেকে বঞ্চিত করা

হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির মীরাছ থেকে বঞ্চিত হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, من قتل قتيلا فإنه لا يرثه و إن لم يكن له وارث غيره' و إن كان والده و ولده فليس لقاتل ميراث. - "যে ব্যক্তি অপর কোন লোককে হত্যা করল, সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না, যদিও তার অন্য কোন ওয়ারিছ না থাকে কিংবা সে তার পিতা বা পুত্র হয়। অতএব

---

৯৭. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৭, পৃ.৮৪; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.১০, পৃ. ২৭১-৫

৯৮. ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ. ৪০২; ইবনু মুফলিহ, ফুরূ', খ.৬, পৃ.৪৪

৯৯. আল-কুর'আন, ৪ (সূরা আন-নিসা) ঃ ৯২

হত্যাকারীর জন্য কোন উত্তরাধিকারস্বত্ব নেই।"[১০০] 'ইচ্ছাকৃত হত্যা'য় হত্যাকারী মীরাছ থেকে বঞ্চিত হবে- এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। তবে অন্যান্য প্রকারের হত্যার ক্ষেত্রে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

হানাফীগণের মতে- সর্বপ্রকারের হত্যায় হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির মীরাছ থেকে বঞ্চিত হবে, যদি সে গায়র মুকাল্লাফ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগল) না হয়। তবে 'কারণবশত হত্যা' এবং 'অধিকারজনিত হত্যা'র জন্য এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

মালিকীগণের মতে- কেবল 'ইচ্ছাকৃত হত্যা'র ক্ষেত্রেই হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির মীরাছ থেকে বঞ্চিত হবে। 'ভুলবশত হত্যা' ও অন্যান্য হত্যার জন্য এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে- কিসাস বা দিয়াতযোগ্য যে কোন ধরনের হত্যার ক্ষেত্রেই হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির মীরাছ থেকে বঞ্চিত হবে, এমন কি যদি সে গায়র মুকাল্লাফ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগল)ও হয়।[১০১]

গ. অসিয়্যাত থেকে বঞ্চিত করা

হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির অসিয়্যাত থেকে বঞ্চিত হবে। হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (রহ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) প্রমুখের মতে হত্যাকারী - ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করুক কিংবা ভুলবশত হত্যা করুক- সে অসিয়্যাত থেকে বঞ্চিত হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لا وصية لقاتل . - "হত্যাকারীর জন্য অসিয়্যাত নেই।"[১০২] মালিকীগণের মতে- অসিয়্যাতের পর পরই অসিয়্যাতকারী মৃত্যুবরণ করলে হত্যাকারী অসিয়্যাত থেকে বঞ্চিত হবে, যদি সে সরাসরি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটায়। পক্ষান্তরে অসিয়্যাতকারী আক্রান্ত হবার দীর্ঘ দিন পর মারা গেলে অসিয়্যাত বাতিল হবে না, যদি সে আঘাতকারীকে চেনার পরও অসিয়্যাত করে। তবে আঘাতকারীকে না জেনে অসিয়্যাত করলে অসিয়্যাত বাতিল হবে কি না- এ বিষয়ে তাঁদের দুটি মত রয়েছে।

হাম্বলীগণের মতে- কিসাস কিংবা কাফফারাযোগ্য যে কোন হত্যা হত্যাকারীকে অসিয়্যাত থেকে বঞ্চিত করবে। অসিয়্যাত চাই ঘটনা ঘটার আগে হোক কিংবা

---

১০০. আল-বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, হা.নং : ১২০২২; 'আবদুর রযযাক, আল-মুছান্নাফ, হা.নং : ১৭৭৮৭, ১৭৭৯৮

১০১. যায়ল'ঈ, তাবয়ীন, খ.৬, পৃ.২৪০; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৬, পৃ. ২৪৪-৫

১০২. ইবনু হাজর আল আসকালানী, আদ-দিরায়াহ.., হা.নং : ১০৫৬

পরে। তাঁদের অপর একটি বক্তব্য অনুযায়ী অসিয়্যাতের পরে হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকলে অসিয়্যাত থেকে বঞ্চিত হবে আর পূর্বে ঘটে থাকলে বঞ্চিত হবে না। তাঁদের তৃতীয় অন্য একটি মতও রয়েছে। তা হল কোন অবস্থাতেই হত্যাকারী অসিয়্যাত থেকে বঞ্চিত হবে না। এটা শাফি'ঈগণের দুটি মতের মধ্যে স্পষ্টতম অভিমত। তাঁদের অপর মতটি হল- হত্যাকারী অসিয়্যাত থেকে বঞ্চিত থাকবে।[১০৩]

মানবদেহের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধ ঃ

মানবদেহের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. অঙ্গহানি করা (إتلاف عضو)

অর্থাৎ কারো কোন অঙ্গ কেটে ফেলা বা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যেমন- হাত, পা, হাত-পায়ের আঙ্গুল, নখ, জিহ্বা, গুপ্তাঙ্গ, অণ্ডকোষ, কান, ঠোঁট ইত্যাদি কেটে ফেলা, দাঁত উপড়িয়ে ফেলা, চোখের ভ্রূ, দাড়ি ও মাথার চুল উপড়িয়ে ফেলা ইত্যাদি।

২. যখম করা (الجرح)

মাথা বা মুখমণ্ডল ছাড়া শরীরের যে কোন জায়গায় আঘাত করে স্থায়ী বা অস্থায়ী যে কোন প্রকার ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি করা হলে তা 'যখম' রূপে গণ্য হবে।

৩. মুখমণ্ডলে আঘাত করা বা মাথা ফাটানো (الشجاج)

কোন ব্যক্তি কারো মুখে বা মাথায় অঙ্গহানি কিংবা অঙ্গের কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়ার পর্যায়ে পড়ে না- এ ধরনের কোন আঘাত করলে তা এ পর্যায়ের অপরাধ রূপে গণ্য হবে।

৪. অঙ্গের কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া (إزالة معاني الأعضاء)

যেমন শ্রবণশক্তি, দর্শন শক্তি, বাকশক্তি, স্বাদ আস্বাদন শক্তি, ঘ্রাণশক্তি, চলৎশক্তি ও ধারণশক্তি ইত্যাদি নষ্ট করে দেয়া।

উল্লেখ্য যে, উল্লেখিত অপরাধসমূহের সবকটিতে সর্বাবস্থায় যে কিসাস ওয়াজিব হবে, তা নয়; বরং কোনটির ক্ষেত্রে কখনো কিসাস, কোনটির

---

১০৩. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৭, পৃ.১৭৬-৮; আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.৩৩৯-৩৪০; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৬, পৃ.১২৬; আল-মরদাভী, আল-ইনসাফ, খ.৭, পৃ.২৩৩-৪; মালিক, আল-মুদাওয়ানাহ, খ.৪, পৃ.৩৪৭-৮

ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়াত, কোন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জরিমানা এবং কোন ক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট জরিমানা, এমন কি তা'যীরের আওতায় কারাদণ্ডও নির্ধারিত হবে। নিম্নে এ সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

মানবদেহের বিরুদ্ধে অপরাধসমূহে কিসাস বাধ্যতামূলক হবার শর্তাবলী ঃ

মানব দেহের বিরুদ্ধে অপরাধসমূহে নিম্নোক্ত শর্তগুলো পাওয়া গেলে মানবদেহের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধসমূহে কিসাস বাধ্যতামূলক হবে।

১. ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধ করা

মানবদেহের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হলেই কিসাস ওয়াজিব হবে। ভুলবশত কিংবা অসতর্কতার কারণে সংঘটিত অপরাধের জন্য কিসাস বাধ্যতামূলক হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে 'প্রায় ইচ্ছাকৃত অপরাধ'ও 'ইচ্ছাকৃত অপরাধ'রূপে গণ্য হবে। যেমন- কেউ কারো শরীরের কোন অংশে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত হানল বা এমন কোন ছোট পাথর বা কঙ্কর নিক্ষেপ করল, যাতে সাধারণত আক্রান্ত স্থান ফেটে বা ভেঙ্গে যাবার অথবা বিচ্ছিন্ন হবার কথা নয়; কিন্তু ঘটনাক্রমে আক্রান্ত স্থান ফেটে গেল কিংবা ভেঙ্গে গেল অথবা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তাহলে কিসাস বাধ্যতামূলক হবে। এটা হানাফী মতাবলম্বী ইমামগণের অভিমত।[১০৪] হাম্বলী স্কুলের ইমাম আবূ বকর (রহ) ও ইব্‌নু আবী মূসা (রহ)প্রমুখও এ ধরনের মত পোষণ করেন। তবে শাফি'ঈ মতাবলম্বী ও অধিকাংশ হাম্বলী ইমামের মতে- মানব দেহের বিরুদ্ধে কৃত প্রায় ইচ্ছাকৃত অপরাধে কিসাস বাধ্যতামূলক হবে না। মালিকীগণের মতে- শত্রুতামূলক আঘাতে দেহে কোন ক্ষত সৃষ্টি হলেই কিসাস ওয়াজিব হবে। খেলাধুলার সময় কিংবা শিক্ষা দানমূলক শাস্তিতে দেহের কোন ক্ষতি হলে তার জন্য কিসাস ওয়াজিব হবে না।[১০৫]

২. অপরাধ সীমালঙ্ঘন মূলক হওয়া

মানবদেহের বিরুদ্ধে অন্যায় বা সীমালঙ্ঘন মূলক অপরাধের জন্য কিসাস বাধ্যতামূলক হবে। যদি কেউ আইনসিদ্ধ পন্থায় কিংবা কাউকে তার অনুমতিক্রমে আঘাত করে এবং এর ফলে তার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি সাধিত হয়, তাহলে অপরাধীর ওপর কিসাস কার্যকর করা যাবে না।

---

১০৪. ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.১০, পৃ. ২৩৫

১০৫. ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ.২৫১; আদ-দাসূকী, আল-হাশিয়াতু 'আলাশ শারহিল কাবীর, খ.৪, পৃ.২৫২

অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি নিজের জান, ধন-সম্পদ বা নিজের স্ত্রী-কন্যার সতীত্ব রক্ষার প্রয়োজনে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে গিয়ে তার শরীরের কোন রূপ ক্ষতি সাধন করলেও তার ওপর কিসাস কার্যকর করা যাবে না।

শিক্ষক, পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের শিক্ষাদানমূলক শাস্তিতে কোন ছাত্র বা সন্তানের শরীরের কোন রূপ ক্ষতি সাধিত হলে তার জন্যও কিসাস কার্যকর করা যাবে না।

উল্লেখ্য যে, অপরাধী মুকাল্লাফ (প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন) না হলে তাকে তার অপরাধের জন্য সীমালঙ্ঘনকারীরূপে বিবেচনা করা যাবে না। এ কারণে মানবদেহের বিরুদ্ধে তার যে কোন অপরাধ কিসাসযোগ্য হবে না। তবে তা'যীরের আওতায় তার অপরাধের জন্য যে কোন উপযুক্ত শাস্তি দেয়া যাবে।[১০৬]

৩. ধর্মগত মিল থাকা

মানবদেহের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য কিসাস বাধ্যতামূলক হবার জন্য অপরাধী ও আহত ব্যক্তির মধ্যে ধর্মগত মিল থাকা শর্ত কি না - তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। হানাফীগণের দৃষ্টিতে- মুসলিম ও অমুসলিমের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের ক্ষতিপূরণ দানের পরিমাণের মধ্যে যেহেতু কোন ধরনের তারতম্য করা হয় না, তাই মানবদেহের বিরুদ্ধে অপরাধের কিসাস গ্রহণের ক্ষেত্রেও কোনরূপ তারতম্য বিধেয় নয়। অতএব, মুসলিম ও অমুসলিম পরস্পরের মধ্যে কিসাসের বিধান কার্যকর হবে। মালিকীগণের প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী মুসলিমের জন্য অমুসলিম থেকে তার কোন অপরাধের কিসাস গ্রহণ করা যাবে না। শাফি'ঈ ইমামগণের মতে- কোন মুসলিমের হাত-পা কর্তনের অপরাধে অমুসলিম থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে। তবে কোন অমুসলিমের হাত-পা কর্তনের অপরাধে মুসলিম থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে না। হাম্বলী ইমামগণও এ মত পোষণ করেন।[১০৭]

৪. লিঙ্গের মিল থাকা

অধিকাংশ ইমামের দৃষ্টিতে মানবদেহের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য কিসাস

---

১০৬. আদ-দাসূকী, আল-হাশিয়াতু 'আলাশ শারহিল কাবীর, খ.৪, পৃ.২৫২

১০৭. যায়লা'ঈ, তাবয়ীন, খ.৬, পৃ.১১২; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.১০, পৃ.২৩৫; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ.৬৬; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ.২৫২

বাধ্যতামূলক হবার জন্য অপরাধী ও আহত ব্যক্তির মধ্যে লিঙ্গের মিল থাকা শর্ত নয়। অতএব নারী ও পুরুষ পরস্পরের মধ্যে কিসাস জারি হবে।

তবে হানাফীগণের প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী মানবদেহের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য কিসাস বাধ্যতামূলক হবার জন্য অপরাধী ও আহত ব্যক্তির মধ্যে লিঙ্গের মিল থাকা শর্ত। যদি দুজনেই পুরুষ কিংবা নারী হয়, তা হলে কিসাস ওয়াজিব হবে। যদি এক জন পুরুষ, অপর জন নারী হয়, তা হল কিসাস বাধ্যতামূলক হবে না। তাঁদের বক্তব্য হল- কিসাসের জন্য শর্ত হল দুজনের সংশ্লিষ্ট অঙ্গের মধ্যে পূর্ণ সমতা বিদ্যমান থাকা দরকার। নারী ও পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিয়ে যেহেতু তারতম্য রয়েছে, তাই একজনের অঙ্গের পরিবর্তে অন্যজনের সংশ্লিষ্ট অঙ্গ বদলারূপে নেয়া যাবে না। তবে কোন মহিলা যদি কোন পুরুষের হাত বা অন্য কোন অঙ্গ কেটে ফেলে, তা হলে ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে কিসাস গ্রহণের অধিকার পুরুষের রয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) বলেন, " শিজাজ (মুখমণ্ডলে আঘাত বা মাথা ফাটানো)-এর যে সব অবস্থায় কিসাস জারি হয়, সে সব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ পরস্পরের মধ্যেও কিসাস কার্যকর হবে। তাঁর কথা হল, শিজাজের শাস্তির উদ্দেশ্য কোন অঙ্গের কার্যক্ষমতা নষ্ট করা নয়; কেবল সামাজিকভাবে অপদস্থ করাই উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। পক্ষান্তরে হাত-পা কর্তনের কিসাসের মধ্যে অঙ্গের কার্যক্ষমতা নষ্ট করা হয়। আর উভয়ের হাত-পায়ের কার্যক্ষমতার মধ্যে যেহেতু তারতম্য রয়েছে, তাই উভয়ের এ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতিপূরণের পরিমাণের মধ্যেও পার্থক্য হবে।"[১০৮]

৫. সংখ্যাগত মিল থাকা

মানবদেহের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে কিসাস বাধ্যতামূলক হবার জন্য অপরাধী ও আহত ব্যক্তির মধ্যে সংখ্যাগত মিল থাকাও শর্ত। একটি অঙ্গের পরিবর্তে কয়েকটি অঙ্গ কিসাসস্বরূপ কর্তন করা যাবে না। এ রূপ অবস্থায় দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। অতএব, যদি দুই বা ততোধিক লোক একত্রিত হয়ে কারো হাত বা পা কেটে ফেলে কিংবা কারো চোখ বা কোন দাঁত উপড়িয়ে ফেলে, তা হলে কোন অপরারীর ওপরই কিসাস বাধ্যতামূলক হবে না; বরং প্রত্যেকর ওপর তাদের সংখ্যানুপাতে দিয়াতের অংশ প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। কেননা মানব

---

১০৮. যায়ল'ঈ, তাবয়ীন, খ.৬, পৃ.১১২; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.১০, পৃ.২৩৫-৬; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ.৬৬

দেহের বিরুদ্ধে অপরাধে কিসাস ওয়াজিব হবার জন্য অপরাধী ও আহত ব্যক্তির মধ্যে পূর্ণ সমতা থাকা দরকার। বলাই বাহুল্য যে, একটি মাত্র হাত বা পায়ের সাথে একাধিক হাত বা পায়ের মধ্যে কোন রূপ সমতা নেই। তাই এ ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব হবে না। এটা হানাফীগণের অভিমত।[১০৯]

তবে অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের মতে পৃথকভাবে একজনে করলে কিসাস বাধ্যতামূলক হয়- এ ধরনের এক বা একাধিক যখম যদি এক দল লোক একত্রিত হয়ে করে এবং দলের মধ্যে কার কি ভূমিকা রয়েছে- তা যদি সুনির্দিষ্টভাবে নিরূপণ করা সম্ভব না হয়, তা হলে সকলের ওপর কিসাস বাধ্যতামূলক হবে। বর্ণিত রয়েছে, একবার হযরত 'আলী (রা)-এর নিকট দুজন লোক জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে চুরির সাক্ষ্য দেয়। হযরত 'আলী (রা) তাঁদের সাক্ষ্যের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিটির হাত কেটে দেন। পরে তারা অন্য একজন ব্যক্তিকে নিয়ে এসে বলল, এই হল মূল চোর। আমরা ভুলক্রমে আগের ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছি। হযরত 'আলী (রা) দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য তো গ্রহণ করলেনই না; বরং প্রথমে অভিযুক্ত ব্যক্তির হাতের বদলায় তাদের উভয়ের ওপর দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক করলেন আর বললেন, لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. - "যদি আমি জানতে পারতাম যে, তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে এ কাজ করেছ, তা হলে তো আমি তোমারদের দুজনেরই হাত কেটে দিতাম।"[১১০] তাঁর এ কথা থেকে জানা যায় যে, দলের প্রত্যেকের ওপর কিসাস বাধ্যতামূলক হবে, যদি সকলেই ইচ্ছাকৃতভাবে মানবদেহের বিরুদ্ধে কোন অপরাধে লিপ্ত হয়। তদুপরি এটা যেহেতু কিসাসের অন্যতম প্রকার, তাই হত্যার ক্ষেত্রে যেমন একজন ব্যক্তির বদলায় হত্যাকারী গোটা দলের ওপর কিসাস কার্যকর হয়, তেমনি যখমের ক্ষেত্রেও একজনের বদলায় গোটা দলের ওপর কিসাস বাধ্যতামূলক হবে।

যদি দলের মধ্যে কার কি ভূমিকা ছিল তা নিরূপণ করা সম্ভব হয় যেমন- একজন হাতের কিছু অংশ কাটল এবং অপরজন এসে হাতটি বিচ্ছিন্ন করে ফেলল, তাহলে শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে- কারো ওপর কিসাস ওয়াজিব হবে না; বরং প্রত্যেকের ওপর তার অপরাধ অনুপাতে দিয়াতের অংশবিশেষ বাধ্যতামূলক হবে। আর মালিকীগণের মতে- প্রত্যেকের ওপর তার অপরাধ

---

১০৯. ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৮, পৃ.৩৫৫

১১০. সহীহ আল-বুখারী, (কিতাবুদ দিয়াত) তারজামাতুল বাব : ইযা আসাবা কাওমূন মিন রাজুলিন..; আল-বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, হা.নং : ১৫৭৫৫, ২০৯৮১

অনুপাতে কিসাস বাধ্যতামূলক হবে। তাঁদের মত অনুযায়ী যদি অপরাধীদের একজন হাত কাটল, অপরজন পা কাটল, তৃতীয়জন চোখ উপড়িয়ে ফেলল, তাহলে যে হাত কেটেছে কিসাসস্বরূপ তার হাত আর যে ব্যক্তি পা কেটেছে কিসাসস্বরূপ তার পা কাটতে হবে এবং তৃতীয়জনের চোখ উপড়িয়ে ফেলতে হবে। আর যদি তাদের ভূমিকা সুনির্দিষ্টভাবে নিরূপণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে প্রত্যেকের হাত- পা কাটতে হবে এবং চোখ উপড়িয়ে ফেলতে হবে।[১১১]

পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি একাধিক ব্যক্তির একই অঙ্গ কর্তন বা অকেজো করে দিলে আহত এক ব্যক্তির অঙ্গের পরিবর্তে অপরাধীর ঐ নির্দিষ্ট অঙ্গের ওপরই কিসাস কার্যকর হবে এবং অপর ব্যক্তির অঙ্গের বদলে দিয়াত ওয়াজিব হবে। আর এ দিয়াত আহত দুব্যক্তির মধ্যে সমভাবে বন্টিত হবে। অপর অঙ্গের জন্য কিসাস কার্যকর করা সম্ভব না হওয়ায় দিয়াত বাধ্যতামূলক হয়েছে। আহত দু ব্যক্তির একজন উপস্থিত এবং অপরজন অনুপস্থিত থাকলেও উপস্থিত ব্যক্তির দাবি অনুযায়ী কিসাস কার্যকর হবে এবং অনুপস্থিত ব্যক্তি তার হাতের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিয়াত লাভ করবে। যদি সে একজনের একটি অঙ্গ (যেমন ডান হাত) এবং অপরজনের অন্য একটি অঙ্গ (যেমন বাম হাত) কর্তন করে, তবে কিসাসস্বরূপ তার উভয় হাত কর্তন করা হবে।[১১২]

৬. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মিল থাকা

মানবদেহের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে কিসাস বাধ্যতামূলক হবার জন্য অপরাধী আহত ব্যক্তির যে অঙ্গের ক্ষতি সাধন করেছে, তার অনুরূপ অঙ্গ বিদ্যমান থাকতে হবে। হাতের পরিবর্তে কেবল হাতেই, পায়ের পরিবর্তে কেবল পায়ে, আঙ্গুলের পরিবর্তে কেবল আঙ্গুলেই, দাঁতের পরিবর্তে কেবল দাঁতেই কিসাস কার্যকর হবে। তদুপরি শরীরের যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ডান বামের (যেমন হাত-পা) পার্থক্য রয়েছে কিংবা উপর-নিচের (যেমন দাঁত) পার্থক্য রয়েছে অথবা অবস্থানগত পার্থক্য (যেমন আঙ্গুল ও দাঁতগুলোর পৃথক পৃথক অবস্থান) রয়েছে, সে সব ক্ষেত্রেও কিসাস গ্রহণের জন্য পূর্ণ সমতা রক্ষা করতে হবে। ডান হাতের পরিবর্তে বাম হাতে বা বাম হাতের পরিবর্তে ডান হাতে, উপরের দাঁতের পরিবর্তে নিচের দাঁতে, নিচের দাঁতের পরিবর্তে উপরের দাঁতে, সামনের দাঁতের পরিবর্তে মাড়ির দাঁতে, মাড়ির দাঁতের পরিবর্তে সামনের দাঁতে, বৃদ্ধাঙ্গুলির

---

১১১. আল-খারাশী, শারহু মুখতাছারি খলীল, খ.৮, পৃ.১৪; আদ-দাসূকী, আল-হাশিয়াতু 'আলাশ শারহিল কাবীর, খ.৪, পৃ.২৫২;আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ.৬৭

১১২. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ. ২৯৯-৩০০

পরিবর্তে তর্জনীতে, তর্জনীর পরিবর্তে বৃদাঙ্গুলিতে কিসাস নেয়া যাবে না। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেলায়ও একই রূপ বিধান প্রযোজ্য হবে।[১১৩] এ কারণে যদি আহত ব্যক্তির আক্রান্ত অঙ্গের সাথে অপরাধীর অঙ্গের মিল না থাকে অথবা অপরাধীর সংশ্লিষ্ট অঙ্গ পূর্ব থেকেই না থাকে, তাহলে অপরাধীর অন্য অঙ্গে কিসাস কার্যকর করা যাবে না।

৭. কার্যক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যগত মিল থাকা

মানবদেহের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে কিসাস বাধ্যতামূলক হবার জন্য অপরাধী ও আহত ব্যক্তির দুজনের সংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহের মধ্যে কার্যক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যগত মিল থাকতে হবে। অপরাধী আহত ব্যক্তির যে অঙ্গের ক্ষতি সাধন করেছে, তার অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের অঙ্গ বিদ্যমান থাকতে হবে। একটি ত্রুটিপূর্ণ বা অকেজো অথবা অসম্পূর্ণ অঙ্গের পরিবর্তে যথাক্রমে ত্রুটিহীন বা কর্মক্ষম অথবা সম্পূর্ণ অঙ্গে বদলা নেয়া যাবে না। তবে বড়-ছোট, লম্বা-বেটে ও মোটা-ক্ষীণ হওয়া এবং সবলতা-দুর্বলতা প্রভৃতি বিষয়ে দুজনের অঙ্গের মধ্যে মিল থাকার প্রয়োজন নেই।[১১৪]

৮. অপরাধের সমপরিমাণ বদলা নেয়া সম্ভব হওয়া

কিসাস ওয়াজিব হবার জন্য কোন প্রকারের সীমালঙ্ঘন ছাড়া অপরাধীর দেহ থেকে সমপরিমাণ বদলা নেয়া সম্ভব হতে হবে।[১১৫] এ কারণে কোন গ্রন্থিসন্ধি থেকে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করলেই কিসাস কার্যকর হবে। কারণ কিসাস গ্রন্থিসন্ধিতে কার্যকর হয়, হাঁড় ভাঙ্গা বা অপসারণের জন্য কিসাস হবে না। অতএব, কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কারো হাত বা পা ভেঙ্গে দিল, তাহলে কিসাসস্বরূপ কর্তনকারীর হাত বা পা কাটা যাবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে অপরাধের সাথে পুরো সমতা রক্ষা করে অপরাধীর হাত বা পা কাটা সম্ভব নয়, যদি অপরাধী গ্রন্থসন্ধি থেকে হাত বা পা কেটে না ফেলে। কেননা অপরাধী আঘাত করে হয়ত হাত বা পায়ের কিছু অংশ ভেঙ্গে দিয়েছে বা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, গ্রন্থিসন্ধি থেকে কেটে দেয়নি। এমতাবস্থায় এর পরিবর্তে অপরাধীর গ্রন্থিসন্ধি থেকে হাত বা পা কাটা হলে তা সীমা লঙ্ঘন হবে।[১১৬] হযরত নামির ইবন

---

১১৩. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.২৯৭-৮; ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৮, পৃ.৩৪৫; আদ-দাসূকী, আল-হাশিয়াতু 'আলাশ শারহিল কাবীর, খ.৪, পৃ.২৫২

১১৪. তদেব

১১৫. ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ.২৫২; আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.২৯৭-৮

১১৬. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৬, পৃ.১৩৯; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.১০, পৃ.২৩৭; ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৮, পৃ.৩৪৫

জাবির তাঁর পিতা জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, "জনৈক ব্যক্তি তার হাতের বাজুতে তরবারী দিয়ে আঘাত করল। এর ফলে সে তার হাতটি জোড়ার নিচ থেকে কেটে ফেলল এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহায্য কামনা করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ঘটনায় দিয়াত প্রদানের নির্দেশ প্রদান করল। তখন জাবির (রা) বললেন, আমি তো কিসাসই চাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, خذ الدية ' بارك الله لك فيها. - "দিয়াত গ্রহণ করো। এতেই আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বরকত দান করুন।" তিনি কিসাসের ফায়সালা দেন নি।[১১৭]

- আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ

কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করে কারো দেহে কোন রূপ ক্ষত সৃষ্টি করে এবং এ ক্ষতের কারণে দীর্ঘ দিন অসুস্থ অবস্থায় শয্যায় পড়ে থেকে অবশেষে এ ক্ষতের প্রতিক্রিয়ায় মারা যায়, তাহলে আঘাতকারীর ওপর কিসাস বাধ্যতামূলক হবে।[১১৮]

- আঘাতের প্রতিক্রিয়া বা সংক্রমণ

কেউ যদি কারো কোন অঙ্গে আঘাত করে এবং সে আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অঙ্গটি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কিসাস বাধ্যতামূলক হবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে নির্দিষ্ট কোন অঙ্গের আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় অন্য একটি অঙ্গ নষ্ট হয়ে গেলে (যেমন কেউ কারো একটি আঙ্গুল কেটে ফেলল। এরপর ক্রমশ তার প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি পেতে পেতে পুরো হাতের মণিবন্ধ পর্যন্ত সংক্রমিত হল এবং এর ফলে গোটা মণিবন্ধই কেটে ফেলতে হল), কিসাস ওয়াজিব হবে কি না- তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। শাফি'ঈ ও অধিকাংশ হানাফী ইমামের মতে- এরূপ অবস্থায় শুধু প্রথম আক্রান্ত অঙ্গের জন্য কিসাস বাধ্যতামূলক হবে এবং সংক্রমিত অঙ্গের জন্য দিয়াত ওয়াজিব হবে। তাঁদের বক্তব্য হল- শরীরের কোন অঙ্গ সরাসরি আক্রান্ত হওয়া ছাড়া অন্য অঙ্গের আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে গেলে তাতে কিসাস বাধ্যতামূলক হবে না। পক্ষান্তরে হাম্বলী মতাবলম্বী ইমামগণের দৃষ্টিতে- এরূপ অবস্থায় অপরাধীর সংশ্লিষ্ট দুটি অঙ্গেই কিসাস ওয়াজিব হবে। তাঁদের কথা হল- শরীরের যে সব

---

১১৭. ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, (কিতাবুদ দিয়াত) হা.নং : ২৬৩৬; আল-বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, (আবওয়াবুল কিসাস ফীমা দূনান নাফ্স), হা.নং : ১৫৮৮১

১১৮. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৬, পৃ.১৬৭; আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.৩০৪

অঙ্গ আহত করার জন্য কিসাস বাধ্যতামূলক হয়, সংক্রমণের কারণে এ সব অঙ্গ নষ্ট হয়ে গেলেও কিসাস বাধ্যতামূলক হবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ) বলেন, কোন ব্যক্তি কারো একটি আঙ্গুল কেটে ফেলল এবং এর প্রতিক্রিয়ায় পার্শ্ববর্তী অপর একটি আঙ্গুল যদি অকেজো হয়ে পড়ে, তা হলে কোন আঙ্গুলের জন্যই কিসাস ওয়াজিব হবে না; বরং দুটি আঙ্গুলের জন্য দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। তদুপরি কেউ ভুলক্রমে কারো কোন অঙ্গে যখম করলে এবং এ যখমের প্রতিক্রিয়ায় অপর একটি অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হলে শুধু দিয়াতই ওয়াজিব হবে।[১১৯]

- মানবজীবন ও মানবদেহের বিরুদ্ধে একসাথে অপরাধ

মানব জীবন ও মানবদেহের বিরুদ্ধে কেউ এক সাথে অপরাধ করলে (যেমন- প্রথমে দেহের কোন একটি অঙ্গ কেটে ফেলল, অতঃপর হত্যা করল) প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট শাস্তি প্রদান বাধ্যতামূলক হবে, যদি দুটি অপরাধই এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে করা না হয় অথবা এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে করা হয়; কিন্তু প্রথম অপরাধের যখম থেকে সুস্থ হবার পর দ্বিতীয় অপরাধ করা হয়। এটা হানাফীগণের অভিমত।[১২০]

মালিকীগণের মতে হাত-পা কর্তনের অপরাধ - চাই তা নিহত ব্যক্তির হোক কিংবা অপর কোন ব্যক্তির- মানবজীবনের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে[১২১], যদি অপরাধী দুটি অপরাধই ইচ্ছাকৃতভাবে করে। যেমন কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কারো হাত কেটে ফেলল, এর পর সে তাকে হত্যা করল। অতঃপর সে ইচ্ছাকৃতভাবে অপর এক ব্যক্তির একটি পা কেটে ফেলল, তাহলে অপরাধীকে শুধু হত্যাই করা হবে। তার হাত-পা কর্তন করা যাবে না, যদি সে হাত-পা কর্তন করে দৈহিকভাবে বিকৃতি ঘটানোর ইচ্ছা না করে। যদি এরূপ ইচ্ছা করে থাকে, তাহলে হাত-পায়ের কর্তনের অপরাধ মানবজীবনের বিরুদ্ধে

---

১১৯. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.২৪, পৃ.২৮৫

১২০. যায়ল'ঈ, তাবয়ীন, খ.৬, পৃ. ১১৭-৮
এ ধরনের অপরাধের মোট ১৬টি প্রকরণ রয়েছে। যথা- কেউ হাত বা পা কর্তনের পর হত্যা করল। এ দুটি অপরাধই ইচ্ছাকৃতভাবে হতে পারে আবার ভুলবশতও হতে পারে। অথবা একটি ইচ্ছাকৃতভাবে আর অপরটি ভুলবশতও হতে পারে। এ চারটি প্রকরণের প্রত্যেকটি অপরাধ আবার এক বা একাধিক ব্যক্তির ওপর হতে পারে। এভাবে তা আট প্রকারে উন্নীত হল। এ আটপ্রকরণের প্রত্যেকটির আবার দু অবস্থা হতে পারে। একটি: যখম থেকে সুস্থ হবার আগে, আর অপরটি সুস্থ হবার পরে। (আল-হামভী, গাময়ু 'উয়ূনিল বছা'ইর, খ.১, পৃ. ৩৯৬-৭)

১২১. অর্থাৎ প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য পৃথক পৃথক শাস্তি প্রদান বাধ্যতামূলক হবে না; বরং জানের কিসাসের মধ্যে সব ক'টি অপরাধের শাস্তি হয়ে যাবে।

কৃত অপরাধের মধ্যে শামিল হবে না। এ ধরনের অবস্থায় প্রথমে হাত-পা কর্তনের জন্য কিসাস গ্রহণ করা হবে। অতঃপর তাকে হত্যা করা হবে।[১২২]

শাফি'ঈগণের মতে, যদি দুটি অপরাধই ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা ভুলবশত হয় এবং জানের বিরুদ্ধে অপরাধটি যদি হাত বা পা সুস্থ হবার পরেই সংঘটিত হয়, তা হলে হাত বা পা কর্তনের জন্য দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। যদি জানের বিরুদ্ধে অপরাধটি হাত বা পা সুস্থ হবার আগেই সংঘটিত হয়, তাহলে তাঁদের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মানবদেহের বিরুদ্ধে অপরাধের শাস্তি মানবজীবনের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের শাস্তির (কিসাস) মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। যদি দুটি অপরাধের একটি ইচ্ছাকৃতভাবে, আর অপরটি ভুলবশত সংঘটিত হয়, তা হলে তাঁদের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য পৃথক পৃথক শাস্তি প্রদান বাধ্যতামূলক হবে।[১২৩]

মানবদেহের বিরুদ্ধে কিসাসযোগ্য অপরাধসমূহ ঃ

অপরাধী কারো কোন ব্যক্তির দেহের যতটুকু ক্ষতি সাধন করবে কিসাসস্বরূপ তার দেহেরও ঠিক সে অঙ্গের ততোখানি ক্ষতি করা হবে। মানবদেহের বিরুদ্ধে অপরাধের কিসাস সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. - "সুতরাং যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে, তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে।"[১২৪] তিনি আরো বলেন, و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن و السن بالسن و الجروح قصاص. - "তাদের জন্য আমরা তাতে বিধান নির্ধারণ করেছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমসমূহের বদলে অনুরূপ যখম।"[১২৫] উল্লেখ্য যে, "যখমের পরিবর্তে অনুরূপ যখম" কথা দ্বারা বোঝা যায়, যে সব ক্ষেত্রে যখমের সমপরিমাণ বদলা নেয়া সম্ভব, কেবল সে ক্ষেত্রে এ নির্দেশ কার্যকর হবে এবং যে ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে দিয়াত বা আরশ অথবা অন্য কোন সাধারণ দণ্ড কার্যকর হবে। মানবদেহের বিরুদ্ধে নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন অপরাধে কিসাস বাধ্যতামূলক হবে।

---

১২২. আর-রু'আয়নী, মাওয়াহিবুল জলীল, খ.৬, পৃ.২৫৬; 'উলায়শ, মিনহুল জলীল, খ.৯, পৃ.৮৯
১২৩. শাফি'ঈ, আল-উম্ম, খ.৬, পৃ.৭৫; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১১, পৃ.৯২-৩
১২৪. আল-কুর'আন, ২ (সূরা আল-বাকারাহ) : ১৯৪
১২৫. আল-কুর'আন, ৫ (আল-মা'ইদা) ঃ ৩৪

১. হাত-পায়ের কিসাস

হাতের পরিবর্তে হাতে, পায়ের পরিবর্তে পায়ে কিসাস গ্রহণ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে উভয় অঙ্গের মধ্যে আকৃতি ও সামর্থ্যগত তফাৎ (যেমন ছোট-বড় হওয়া এবং সবল-দুর্বল হওয়া) কিসাসের জন্য বাধা হবে না। তবে ত্রুটিযুক্ত কিংবা অকেজো হাত-পায়ের পরিবর্তে ত্রুটিহীন কিংবা সুস্থ হাত-পায়ে কিসাস গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু ত্রুটিহীন কিংবা সুস্থ হাত-পায়ের পরিবর্তে ত্রুটিযুক্ত কিংবা অকেজো হাত-পায়ে কিসাস গ্রহণ আহত ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হবে। সে চাইলে কিসাসও গ্রহণ করতে পারে অথবা দিয়াতও গ্রহণ করতে পারে। তবে কিসাস গ্রহণ করলে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করার ইখতিয়ার তার থাকবে না।[১২৬]

২. চোখের কিসাস

চোখের পরিবর্তে চোখে কিসাস গ্রহণ করা যাবে, যদি চোখ উৎপাটন করা হয়। কিসাসের বিধান সম্বলিত উপর্যুক্ত আয়াতে চোখের বদলায় চোখে কিসাস নেবার কথা বলা হয়েছে। তদুপরি চোখ যেহেতু কোটর থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে নেয়া যায়, তাই তার অনুরূপ বদলা নেয়া সম্ভব।

বয়োজ্যেষ্ঠ লোকের চোখের বদলায় যুবকের চোখে, পূর্ণবয়স্ক লোকের চোখের বদলায় অপ্রাপ্ত বয়স্কের চোখে কিসাস গ্রহণ করা যাবে। তাছাড়া চোখের বৈশিষ্ট্যগত তফাত কিসাসের জন্য বাধা নয়। তবে অসুস্থ চোখের বদলে সুস্থ চোখে কিসাস গ্রহণ করা যাবে কি না- তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মালিকী ও হাম্বলীগণের মতে- দুর্বল দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন চোখের পরিবর্তে সুস্থ চোখে কিসাস গ্রহণ করা হবে। অধিকাংশ হানাফী ইমামের মতে- কেউ কারো টেরা চোখ উপড়িয়ে ফেললে তাতে কিসাস বাধ্যতামূলক হবে, যদি চোখের দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ন থাকে। অন্যথায় দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। ছানিপড়া চোখের পরিবর্তে অনুরূপ চোখে কিসাস হবে না। তবে ছানিপড়া দুর্বল চোখের কোন ব্যক্তি কারো কোন সুস্থ চোখ উৎপাটন করলে আহত ব্যক্তির এ ইখতিয়ার থাকবে যে, সে চাইলে ছানিপড়া চোখে কিসাসও গ্রহণ করতে পারে; চাইলে দিয়াতও নিতে পারে। ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ)-এর মতে, টেরা চোখের জন্য কিসাস প্রযোজ্য হবে না।

---

১২৬. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.২৯৭-৮

কানা ব্যক্তি যদি কারো কোন সুস্থ চোখ উৎপাটন করে, তাহলে তার সুস্থ চোখ থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে এবং তাকে অন্ধরূপে ছেড়ে রাখা হবে। এটা হানাফী ও শাফি'ঈ ইমামগণের অভিমত। মালিকীগণের মতে- আহত ব্যক্তির এ ইখতিয়ার থাকবে যে, সে ইচ্ছে করলে কিসাসও গ্রহণ করতে পারবে, ইচ্ছে করলে চোখের দিয়াতও নিতে পারবে। হাম্বলীগণের মতে, এ ক্ষেত্রে কিসাস প্রযোজ্য হবে না; দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। কেননা সে তো তার পূর্ণ দৃষ্টি শক্তি নষ্ট করে নি। তাই তার পূর্ণ দৃষ্টি শক্তি নষ্ট করে কিসাস গ্রহণ করা সমীচীন হবে না।

যদি কানা ব্যক্তি কারো দুটি সুস্থ চোখই উৎপাটন করে, তাহলে তার সুস্থ চোখে কিসাস কার্যকর হবে এবং অপর চোখের জন্য চোখের অর্ধেক দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। তবে হাম্বলীগণের মতে- আহত ব্যক্তির এ ইখতিয়ার থাকবে যে, সে ইচ্ছে করলে শুধু কিসাসই গ্রহণ করবে অথবা চোখের পূর্ণ দিয়াত নেবে।

চোখের পলক ও কিনারা উৎপাটনের ক্ষেত্রে হানাফী ও মালিকীগণের মতে কিসাস নেই। হানাফীগণের মতে- এতে দিয়াত আর মালিকীগণের মতে- ক্ষতিপূরণ দান বাধ্যতামূলক হবে। পক্ষান্তরে শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে- এতেও কিসাস কার্যকর হবে।[১২৭]

৩. নাকের কিসাস

নাকের নরম অংশের জন্য কিসাস ওয়াজিব হবে। কিসাসের বিধান সম্বলিত উপর্যুক্ত আয়াতে নাকের বদলায় নাকে কিসাস নেবার কথা বলা হয়েছে। তদুপরি নাকের এ অংশটি সুনির্দিষ্ট হবার কারণে তার অনুরূপ বদলা নিতে যেহেতু কোন রূপ অসুবিধা হয় না, তাই এ অংশে কিসাস বাধ্যতামূলক হবে। যদি কেউ নাকের হাঁড় সহ পুরো নরম অংশটি কেটে ফেলে, তাহলে নরম অংশের জন্য কিসাস ওয়াজিব হবে আর হাঁড়ে যেহেতু কিসাসের বিধান প্রযোজ্য নয়, তাই তার জন্য ক্ষতিপূরণ দান বাধ্যতামূলক হবে। নাকের নরমাংশের আংশিক কর্তনের জন্য কিসাস ওয়াজিব হবে না। এর কারণ এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। তবে শাফি'ঈ ইমামগণের দৃষ্টিতে কিসাস বাধ্যতামূলক হবে।

ছোট নাকের পরিবর্তে বড় নাকে, খাঁদা নাকের (snub nose) পরিবর্তে বাঁকা

---

১২৭. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.৩০৮; ইবনু কুদামাহ,আল-মুগনী, খ.৮, পৃ.২৬০-৩; আল-হায়তমী, তুহফাতুল মুহতাজ, খ.৮, পৃ.৪২৬

নাকে, ঘ্রাণ নিতে অসমর্থ নাকের পরিবর্তে ঘ্রাণ নিতে সক্ষম নাকে কিসাস গ্রহণ করা হবে। তবে হানাফীগণের মতে- অপরাধীর নাক যদি অতিশয় ছোট হয় আর আহত ব্যক্তির নাক বড় হয়, তাহলে আহত ব্যক্তির এ ইখতিয়ার থাকবে যে, সে ইচ্ছে করলে কিসাসও গ্রহণ করতে পারবে, ইচ্ছে করলে দিয়াতও নিতে পারবে। অনুরূপভাবে যে কোন ক্রটিযুক্ত নাকের বেলায়ও এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

ডান নাসারন্ধ্রের পরিবর্তে ডান নাসারন্ধ্রে, বাম নাসারন্ধ্রের পরিবর্তে বাম নাসারন্ধ্রে কিসাস গ্রহণ করা যাবে। তবে বিপরীত নাসারন্ধ্রে কিসাস নেয়া যাবে না। দু নাসারন্ধ্রের মধ্যবর্তী পর্দার জন্যও কিসাসের বিধান প্রযোজ্য হবে।[১২৮]

৪. কানের কিসাস

কানের বদলায় কানে কিসাস নেয়া হবে। কিসাসের বিধান সম্বলিত উপর্যুক্ত আয়াতে কানের বদলায় কানে কিসাস নেবার কথা বলা হয়েছে। তদুপরি কানের আয়তন সুনির্দিষ্ট হবার কারণে তার অনুরূপ বদলা নিতে যেহেতু কোন রূপ অসুবিধা হয় না, তাই হাত-পায়ের মত কানের পরিবর্তে কানে কিসাস গ্রহণ বাধ্যতামূলক হবে। ছোট ও বড় কানের তফাত কিসাসের জন্য বিবেচ্য নয়। তদুপরি শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কান ও বধিরের কান দুটিই যেহেতু সমতুল্য, শ্রবণশক্তির বিলুপ্তির কারণ কানের ক্রটির কারণে নয়; বরং মাথার কোন ক্রটিই এর জন্য দায়ী, তাই একটার পরিবর্তে অন্যটিতে কিসাস বাধ্যতামূলক হবে। অনুরূপভাবে সুস্থ কানের বদলায় অকেজো কানেও কিসাস গ্রহণ করা যাবে। কারণ, কান অকেজো হলেও তার শ্রবণ শক্তি সম্পূর্ণ বহাল রয়েছে।

কানের অংশবিশেষ কর্তনের বেলায়ও কিসাস বাধ্যতামূলক হবে। এটা শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের অভিমত। হানাফীগণের মতে- কর্তিত অংশ সুনির্দিষ্ট এবং তার অনুরূপ বদলা নেয়া সম্ভব হলেই কেবল কিসাস নেয়া যাবে।

ছিদ্রযুক্ত কানের পরিবর্তে সুস্থ কানে কিসাস নেয়া হবে। কারণ ছিদ্রযুক্ত হওয়া কানের দোষ নয়। অনেক সময় কানে দুল পরার জন্য এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেও কান ছিদ্র করা হয়। যদি কানের ছিদ্র যথাযথ স্থানে না হয় কিংবা কর্তনকারীর কান ফাটা এবং আহত ব্যক্তির কান সম্পূর্ণ হয়, তাহলে হানাফীগণের দৃষ্টিতে আহত ব্যক্তির এ ইখতিয়ার থাকবে যে, সে ইচ্ছে করলে

---

১২৮. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.৩০৮; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ.২৫৮; আল-হায়তমী, তুহফাতুল মুহতাজ, খ.৮, পৃ.৪২৫

কিসাসও গ্রহণ করতে পারে, ইচ্ছে করলে কানের অর্ধেক দিয়াতও নিতে পারে। যদি কর্তিত কানটি অপূর্ণাঙ্গ হয়, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দান বাধ্যতামূলক হবে। শাফি'ঈগণের দৃষ্টিতে সুস্থ কানের বদলায় ফাটা কানে কিসাস নেয়া যাবে; তবে ফাটা হবার কারণে যে পরিমাণ কান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার সম পরিমাণ দিয়াত দানও বাধ্যতামূলক হবে। হাম্বলীগণের মতে- সুস্থ কানের পরিবর্তে ফাটা কানে বদলা নেয়া হবে। তবে ফাটা কানের পরিবর্তে সুস্থ কানে বদলা নেয়া যাবে না। কারণ কানের ছিদ্র যখন ফাটা রূপে দেখা যায়, তা ত্রুটিরূপে গণ্য হয়। আর ত্রুটিযুক্ত অঙ্গের পরিবর্তে ত্রুটিহীন অঙ্গে কিসাস কার্যকর হয় না।[১২৯]

৫. জিহ্বার কিসাস

হানাফীগণের মতে (ইমাম আবূ ইউসূফ [রহ] ছাড়া) জিহ্বার ক্ষেত্রে কিসাস নেই, যদি তা মূল থেকেও কর্তন করা হয়। কেননা জিহ্বার মূলসন্ধিতে পৌঁছে কর্তন করা কঠিন ব্যাপার। কিন্তু অধিকাংশ ইমামের মতে- জিহ্বার পরিবর্তে জিহ্বাতেই কিসাস কার্যকর করা হবে। তাঁদের বক্তব্য হল- কিসাসের বিধান সম্বলিত উপর্যুক্ত আয়াতে যখমগুলোকে কিসাসযোগ্য বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তদুপরি জিহ্বারও একটি মূলসন্ধি রয়েছে যেখান পৌঁছা সম্ভব, তাই চোখের মত জিহ্বাতেও কিসাস গ্রহণ করা হবে।

তাঁদের মতানুযায়ী বাকশক্তিহীন জিহ্বা ও বাকশক্তিসম্পন্ন জিহ্বার মধ্যে যেহেতু কার্যক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে বিরাট পার্থক্য রয়েছে, তাই বাকশক্তিহীন জিহ্বার পরিবর্তে বাকশক্তিসম্পন্ন জিহ্বাতে কিসাস নেয়া যাবে না। তবে বাকশক্তিসম্পন্ন জিহ্বার পরিবর্তে বাকশক্তিহীন জিহ্বা থেকে কিসাস গ্রহণ করতে অসুবিধা নেই, যদি আহত ব্যক্তি সম্মত হয়। এটা শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের অভিমত। মালিকীগণের মতে- এ রূপ অবস্থায় কিসাস গ্রহণ করা যাবে না।[১৩০]

৬. ওষ্ঠের কিসাস

ওষ্ঠ কর্তনের জন্য কিসাস ওয়াজিব হবে, যদি তা পুরোই কেটে ফেলা হয়। এটা হানাফীগণের অভিমত। শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে ওষ্ঠ কর্তন - যেভাবেই হোক- কিসাস ওয়াজিব হবে। তাঁদের বক্তব্য হল- কিসাসের বিধান সম্বলিত উপর্যুক্ত আয়াতে যখমগুলোকে কিসাসযোগ্য বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তদুপরি

---

১২৯. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.৩০৮; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ.২৫৭; আল-হায়তমী, তুহফাতুল মুহতাজ, খ.৮, পৃ.৪২৬

১৩০. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.৩০৮; আল-হায়তমী, তুহফাতুল মুহতাজ, খ.৮, পৃ.৪২৬

ওষ্ঠেরও একটি সুনির্দিষ্ট আয়তন রয়েছে যা থেকে কিসাস গ্রহণ করা সম্ভব। তাই হাত-পায়ের মত ওষ্ঠেও কিসাস গ্রহণ করা হবে।[১৩১]

৭. দাঁতের কিসাস

দাঁত উৎপাটনের ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব হবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। অনুরূপভাবে দাঁত ভেঙ্গে ফেললেও অধিকাংশ ইমামের মতে কিসাস ওয়াজিব হবে। কেননা কিসাসের বিধান সম্বলিত উপর্যুক্ত আয়াতে দাঁতের পরিবর্তে দাঁতে কিসাস নেবার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রুবা'ই (রা) কর্তৃক এক দাসীর দাঁত ভাঙ্গার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিসাসের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তদুপরি দাঁত -উৎপাটন করা হোক কিংবা ভেঙ্গে ফেলা হোক- তার অনুরূপ কিসাস গ্রহণ করা সম্ভব। যদি উৎপাটন করা হয়, তাহলে কিসাসস্বরূপও দাঁত উৎপাটন করা হবে। যদি ভেঙ্গে ফেলা হয়, তাহলে সমতা রক্ষার প্রয়োজনে কিসাসস্বরূপ সমপরিমাণ ভেঙ্গে ফেলা হবে। যদি অপরাধীর দাঁত ভেঙ্গে ফেলার মত না হয়, তাহলে কিসাস ওয়াজিব হবে না; দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে।

বৈশিষ্ট্য ও কার্যপ্রকৃতির মধ্যে মিল থাকায় দাঁতগুলোর ছোট-বড় হওয়া এবং বেঁটে-লম্বা হওয়া কিসাসের জন্য বিবেচ্য নয়। তবে সামনের দাঁতের পরিবর্তে সামনের দাঁতেই, মাড়ির দাঁতের পরিবর্তে মাঁড়ির দাঁতেই কিসাস নেয়া হবে। উপরের দাঁতের পরিবর্তে নিচের দাঁতে এবং নিচের পরিবর্তে উপরের দাঁতে কিসাস নেয়া যাবে না। অনুরূপভাবে ভাঙ্গা দাঁতের পরিবর্তে সুস্থ দাঁতে কিসাস নেয়া যাবে না। তবে সুস্থ দাঁতের পরিবর্তে ভাঙ্গা দাঁতে কিসাস নেয়া যাবে। অতিরিক্ত দাঁতের পরিবর্তেও কিসাস নেয়া যাবে, যদি অপরাধীর অতিরিক্ত দাঁত থাকে। এটা শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের অভিমত। হানাফীগণের মতে- অতিরিক্ত দাঁতে কিসাস নেই। এ ক্ষেত্রে বিচারকের ফায়সালাই কার্যকর হবে।[১৩২]

৮. মহিলার স্তনের কিসাস

মহিলাদের স্তনের বোঁটায় কিসাস ওয়াজিব হবে। কেননা বোঁটার একটি সুনির্দিষ্ট আয়তন রয়েছে, যা থেকে সমপরিমাণের কিসাস গ্রহণ করা সম্ভব। তাই অন্যান্য অঙ্গের মত বোঁটায়ও কিসাস গ্রহণ করা হবে। তবে তাদের স্তনের যেহেতু সুনির্দিষ্ট কোন গ্রন্থেসন্ধি নেই এবং এ কারণে সমপরিমাণের কিসাস গ্রহণ করা অসম্ভব, তাই স্তনের জন্য কোন কিসাসের বিধান প্রযোজ্য হবে না। পুরুষের

---

১৩১. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.৩০৮

১৩২. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.৩০৮; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.১০, পৃ.২৩৪-৫; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ. ২৬৩-৪; আল-হায়তমী, তুহফাতুল মুহতাজ, খ.৮, পৃ.৪২৭-৮

বোঁটার পরিবর্তে মহিলার বোঁটায় কিসাস নেয়া যাবে না। তবে মহিলার বোঁটার পরিবর্তে পুরুষের বোঁটায় কিসাস নেয়া যাবে, যদি সে দাবি করে। এটা হানাফী ও শাফি'ঈগণের অভিমত। তবে মালিকী ও হাম্বলীগণের মতে, স্তনের মত বোঁটায়ও কিসাস ওয়াজিব হবে না; দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে।[১৩৩]

৯. পুরুষাঙ্গের কিসাস

পুরুষাঙ্গের জন্যও কিসাস প্রযোজ্য হবে। কেননা পুরুষাঙ্গের একটি মূলসন্ধি রয়েছে, যেখানে পৌঁছতে পারা যায়। তদুপরি এ ক্ষেত্রে কোন ধরনের সীমালঙ্ঘন ছাড়াই পূর্ণ সমতা রক্ষা করে কিসাস গ্রহণ করা সম্ভব। তাই নাকের মত পুরুষাঙ্গেও কিসাস গ্রহণ করা হবে। শরীরের হাত-পায়ের কিসাসের বেলায় যেমন বয়োজ্যেষ্ঠ ও যুবক, ছোট-বড় এবং সুস্থ ও অসুস্থ লোকের মধ্যে পার্থক্য বিবেচনায় আনা হয় না, তেমনি পুরুষাঙ্গের কিসাসের বেলায়ও তা বিবেচ্য হবে না।

খতনাকৃত পুরুষাঙ্গের পরিবর্তে খতনাবিহীন পুরুষাঙ্গে, অনুরূপভাবে খতনাবিহীন পুরুষাঙ্গের পরিবর্তে খতনাকৃত পুরুষাঙ্গে কিসাস নেয়া যাবে। খোজা পুরুষাঙ্গের পরিবর্তে খোজা পুরুষাঙ্গে এবং নপুংসকের পুরুষাঙ্গের পরিবর্তে নপুংসকের পুরুষাঙ্গে বৈশিষ্ট্যগত মিল থাকার কারণে কিসাস গ্রহণ করা যাবে। তবে খোজা বা নপুংসকের পুরুষাঙ্গের পরিবর্তে কোন পৌরুষ বিশিষ্ট পুরুষাঙ্গে কিসাস নেয়া যাবে না। এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। হানাফীগণের বিশুদ্ধ অভিমত হল- পুরুষাঙ্গে কিসাস নেই, এমনকি তা মূলসন্ধি থেকে কাটা হলেও কিসাস প্রযোজ্য হবে না। কেননা তা সর্বদা একই অবস্থায় বিদ্যমান থাকে না। কখনো সংকুচিত হয়, আবার কখনো সম্প্রসারিত হয়। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহ) ও ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ)-এর মতে- মূলসন্ধি থেকে কাটা হলে কিংবা পুরুষাঙ্গের মাথা সম্পূর্ণ কাটা হলে কিসাস ওয়াজিব হবে। তবে মাথার আংশিক কাটা হলে তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে না।

অণ্ডকোষদুটিতেও অধিকাংশ ইমামের দৃষ্টিতে কিসাস কার্যকর হবে। যদি একটি অণ্ডকোষ কর্তন করা হয়, তাহলে ডান অণ্ডকোষের পরিবর্তে ডান অণ্ডকোষে এবং বাম অণ্ডকোষের পরিবর্তে বাম অণ্ডকোষে কিসাস কার্যকর করা হবে। তবে হানাফীগণের মতে- যেহেতু অণ্ডকোষের কোন সুনির্দিষ্ট সন্ধি নেই এবং এ কারণে যথাযথ সদৃশ বদলা নেয়া সম্ভবপর নয়, তাই অণ্ডকোষের ক্ষেত্রে কিসাস

---

১৩৩. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.৩০৯; আদ-দাসূকী, আল-হাশিয়াতু..,খ.৪, পৃ.২৭৩-৪; আর-রুহায়বানী, মাতালিবু.., খ.৬, পৃ.১১৭

কার্যকর হবে না।[১৩৪]

১০. হাড়ের কিসাস

হাড় ভাঙ্গার জন্য কিসাস নেই। এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা), ইবনু মাস'উদ (রা) ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন ঃ لا قصاص في عظم إلا في السن. - "দাঁত ছাড়া অন্য হাড়ে কোন কিসাস নেই।"[১৩৫] তদুপরি হাড়ের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা রক্ষা করে বদলা নেয়া যেহেতু দুরূহ ব্যাপার, তাই এ ক্ষেত্রে কিসাস না থাকাটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।[১৩৬] শাফি'ঈগণের মতে- আহত ব্যক্তি ইচ্ছে করলে আক্রান্ত স্থানের নিচের নিকটবর্তী গ্রন্থিসন্ধি থেকে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ কিসাসস্বরূপ কেটে নিতে পারবে। অবশিষ্টের জন্য বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী ন্যায়ানুগ বিনিময়সহ অতিরিক্ত দণ্ড দেবেন।

মালিকীগণ বলেন, দেহের যে সব হাড়ে বিপদের গুরুতর ঝুঁকি রয়েছে (যেমন বক্ষ, ঘাড়, পিঠ ও উরুর হাড়), তাতে কিসাস কার্যকর হবে না। এ ক্ষেত্রে বিচারকের ফায়সালাই কার্যকর হবে। বিচারক অপরাধীর অবস্থা ও অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনা করে তা'যীরের আওতায় ক্ষতিপূরণ সহ যে কোন রূপ সাধারণ দণ্ড দিতে পারবে।

১১. মাথা ফাটার কিসাস

মাথায় যে আঘাতে মস্তকের হাড়ের উপরিভাগের ঝিল্লি কেটে হাড় প্রকাশ পায়, তজ্জন্য কিসাস বাধ্যতামূলক হবে।[১৩৭] তবে কোন কারণে কিসাস কার্যকর করা সম্ভব না হলে ক্ষতিপূরণ প্রদান বাধ্যতামূলক হবে।

১২. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়ার কিসাস

অঙ্গহানি কিংবা বিচ্ছিন্ন করার মত অঙ্গের কার্যক্ষমতা নষ্ট করলেও কিসাস বাধ্যতামূলক হবে। কোন কারণে কিসাস কার্যকর করা সম্ভব না হলে দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে।

---

১৩৪. আল-বাবরতী, আল-'ইনায়াহ, খ.১০, পৃ.২৩৯; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮, পৃ. ২৫৯; আল-হায়তমী, তুহফাতুল মুহতাজ, খ.৮, পৃ.৪২৫; আর-রুহায়বানী, মাতালিবু.., খ.৬, পৃ.১১৭

১৩৫. ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ, হা.নং : ২৭৩০৫; ইবনু হাজর, আদ-দিরায়াহ, হা.নং : ১০১৮

১৩৬. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.৩০৮

১৩৭. এ জাতীয় আঘাতকে 'মূদিহাহ' বলা হয়। এ ক্ষেত্রে যেহেতু কোন রূপ সীমালঙ্ঘন ছাড়াই সমান বদলা নেয়া সম্ভব, মাথার হাড় পর্যন্ত সহজেই ছুরি পৌঁছানো যায়, তাই এ জাতীয় আঘাতের বেলায় কিসাস কার্যকর করা বাধ্যতামূলক। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ জন্য কিসাসের নির্দেশ দিয়েছেন। (ইবনু হাজর আল আসকালানী, আদ-দিরায়াহ, হা.নং : ১০৩৩)

মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পাবার অবস্থাসমূহ ঃ

নিম্নোক্ত যে কোন অবস্থায় মৃত্যুদণ্ড ওয়াজিব হবার পর রহিত হয়ে যায়।

১. হত্যাকারী মৃত্যুবরণ করা

হত্যাকারী মারা গেলে কিংবা অন্য কোন কারণে নিহত হলে কিসাস রহিত হয়ে যাবে। কারণ যে পাত্রে কিসাস কার্যকর করা হবে, সে পাত্রই ধ্বংস হয়ে গেছে। হানাফীগণের মতে- এ অবস্থায় দিয়াতও আরোপিত হবে না। তবে শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে- তার পরিত্যক্ত সম্পদে দিয়াত ওয়াজিব হবে।[১৩৮]

২. নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছগণ কর্তৃক হত্যাকারীকে ক্ষমা

নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছরা কিসাসের অধিকারী। তারা ইচ্ছে করলে তাদের এ অধিকার ত্যাগ করে হত্যাকারীকে ক্ষমাও করে দিতে পারে। তারা সকলেই কিংবা তাদের কেউ হত্যাকারীকে ক্ষমা করলে কিসাস রহিত হয়ে যায়। হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেছেন, ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم رفع إليه شيئ فيه قصاص إلا أمر بالعفو فيه. - "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কিসাসের কোন মামলা উত্থাপিত হলেই আমি দেখেছি যে, তিনি তা ক্ষমা করে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।"[১৩৯]

তবে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছরা ছাড়া সরকার, বিচারক বা অন্য কেউ ক্ষমা করলে তা কার্যকর হবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ক্ষমাকারী ওয়ারিছকে বালিগ ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। নাবালিগ ও পাগলের ক্ষমা ধর্তব্য হবে না। তাদের অভিভাবক তাদের প্রতিনিধিরূপে গণ্য হবে এবং সে তাদের পক্ষ থেকে অধিকার প্রয়োগ বা ত্যাগ করতে পারবে।[১৪০]

নিহতের ওয়ারিছদের মধ্যে সকলেই হত্যাকারীকে ক্ষমা করলে দিয়াত আরোপিত হবে না। তবে তাদের কেউ ক্ষমা না করলে সে তার অংশমত দিয়াত লাভ করবে। এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। হযরত 'উমার (রা), ইবনু মাস'উদ (রা) ও ইবনু 'আব্বাস (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা একজন ওয়ারিছের ক্ষমা করার ক্ষেত্রে অন্যান্য ওয়ারিছের জন্য-যারা ক্ষমা করে নি, দিয়াত নির্ধারণ করেছেন।[১৪১]

হত্যাকারী একাধিক হলে এবং তাদের একজনকে ক্ষমা করা হলে কেবল

---

১৩৮. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ. ২৪৬; শাফি'ঈ, আল-উম্ম, খ.৬, পৃ.১০-১১; আল-মরদাভী, আল-ইনসাফ, খ.১০, পৃ.৬-৭

১৩৯. আবূ দাউদ, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ৪৪৯৭; নাসাঈ, আস-সুনান আল- কুবরা, (কিতাবুল কাসামাহ), হা.নং : ৬৯৮৬

১৪০. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.৩০, পৃ.১৮২

১৪১. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ. ২৪৭

ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কিসাস রহিত হবে এবং অন্যদের কিসাস বহাল থাকবে।

৩. অর্থের বিনিময়ে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছদের সাথে সমঝোতা

নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছরা হত্যাকারীর সাথে অর্থের বিনিময়ে সমঝোতা করলেও কিসাস রহিত হয়ে যায়। সমঝোতার অর্থের পরিমাণ দিয়াতের চাইতে কমও হতে পারে, বেশিও হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فمن عفي له من أخيه شيئ فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان. - "তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছু ক্ষমা করে দেয়া হলে ন্যায়নীতির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় করা বিধেয়।"[১৪২]

মানবদেহের বিরুদ্ধে অপরাধের কিসাস থেকে রেহাই পাবার অবস্থাসমূহ ঃ

১. আক্রমণকারীর মৃত্যু

আক্রমণকারী মারা গেলে কিংবা অন্য কোন কারণে নিহত হলে কিসাস রহিত হয়ে যাবে। কারণ যে পাত্রে কিসাস কার্যকর করা হবে, সে পাত্রই ধ্বংস হয়ে গেছে।

২. ক্ষমা

আহত ব্যক্তি অপরাধীকে ক্ষমা করে দিলেও কিসাস রহিত হয়ে যায়। তবে আহত ব্যক্তি অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়ার পর যখমের প্রতিক্রিয়ায় মারা গেলে ক্ষমা কার্যকর হবে না; কিসাস অনিবার্য হবে। কারণ কিসাস গ্রহণ ওয়ারিছদের অধিকার। তাই আহত ব্যক্তির ক্ষমা প্রদানে তাদের অধিকার রহিত হবে না।[১৪৩] তবে আহত ব্যক্তির ওয়ারিছরা অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়ার পর আহতের মৃত্যু হলে এই ক্ষমা কার্যকর হবে।[১৪৪]

৩. সমঝোতা

আহত ব্যক্তি কিংবা তার মারা যাবার পর তার ওয়ারিছরা যখমকারীর সাথে অর্থের বিনিময়ে সমঝোতা করলেও কিসাস রহিত হয়ে যায়।

৪. সংশ্লিষ্ট অঙ্গ না থাকা

আক্রমণকারী আহত ব্যক্তির যে অঙ্গে যখম করেছে, সে নির্দিষ্ট অঙ্গ আক্রমণকারীর না থাকলেও কিসাস রহিত হয়ে যায়।

---

১৪২. আল-কুর'আন, ২ (সূরা আল-বাকারাহ) ঃ ১৭৮

১৪৩. এটা ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর অভিমত। অন্যান্য ইমামগণের মতে-ক্ষমা করে দেয়ার পর যখমের প্রতিক্রিয়ায় মারা গেলেও ক্ষমা কার্যকর হবে। (আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.৩০, পৃ. ১৭৯-১৮০)

১৪৪. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৬, পৃ.১৫৪-৫; আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.২৪৯; মুল্লা খসরু,-দুরারুল হুক্কাম, খ.২, পৃ.১০০; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৮

[গ] দিয়াত (রক্তপণ)

ইসলামী শাস্তি আইনে কিসাসের সাথে সাথে দিয়াতের বিধান একটি ভারসাম্যমূলক ও দয়াপূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে বিধিবদ্ধ হয়েছে। নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা কিংবা আহত ব্যক্তি ইচ্ছে করলে কিসাসের পরিবর্তে হত্যাকারী কিংবা যখমকারীর নিকট থেকে দিয়াত নিয়ে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারে এবং এভাবে কিছু পরিমাণে নিজেদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে। কোন অভিভাবক কিংবা আহত ব্যক্তি তা করলে অবশ্যই আল্লাহর নিকট থেকে তাকে বিপুল ছওয়াব দেয়ারও সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فمن عفي له من أخيه شيئ فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان. ذلك تخفيف من ربكم و رحمة. - "তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছু ক্ষমা করে দেয়া হলে ন্যায়নীতির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় করা বিধেয়। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সহজীকরণ ও রহমত বিশেষ।"[১] তিনি আরো বলেন, فمن تصدق به فهو كفارة له. - "আর যে তা ক্ষমা করে দেয়, তা তার পাপের জন্য কাফফারা হবে।"[২] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يودى ' و إما أن يقاد. - "যার কোন ব্যক্তি নিহত হবে,তার দুটি ইখতিয়ার রয়েছে। সে ইচ্ছে করলে রক্তমূল্যও নিতে পারবে, ইচ্ছে করলে কিসাসও গ্রহণ করতে পারবে।"[৩] হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেছেন, ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم رفع إليه شيئ فيه قصاص إلا أمر بالعفو فيه. - "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কিসাসের কোন মামলা উত্থাপিত হলেই আমি দেখেছি যে, তিনি তা ক্ষমা করে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।"[৪]

দিয়াতের সংজ্ঞা ঃ

দিয়াত (دية) হল খুনের বদলায় হত্যাকারীর ওপর আরোপিত সুনির্দিষ্ট পরিমাণ

---

১. আল-কুর'আন, ২ (সূরা আল-বাকারাহ) ঃ ১৭৮

২. আল-কুর'আন, ৫ (আল-মা'ইদা) ঃ ৩৪

৩. সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ৬৪৮৬; আবূ দাউদ, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ৪৫০৫

৪. আবূ দাউদ, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ৪৪৯৭; নাসাঈ, *আস-সুনান আল- কুবরা*, (কিতাবুল কাসামাহ), হা.নং : ৬৯৮৬

প্রদেয় সম্পদবিশেষ।[৫] মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরুদ্ধে অপরাধের বদলায় অপরাধীর ওপর আরোপিত সুনির্দিষ্ট পরিমাণ দেয় সম্পদকেও 'দিয়াত' বলা হয়।[৬] প্রায় এ অর্থে আরো কয়েকটি শব্দ প্রচলিত রয়েছে। যেমন-

আরশ (أرش) ঃ সাধারণত মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরুদ্ধে অপরাধের বদলায় অপরাধীর ওপর আরোপিত দেয় সম্পদকে 'আরশ' বলা হয়।[৭] তবে কখনো খুনের বদলায় হত্যাকারীর ওপর আরোপিত সুনির্দিষ্ট পরিমাণ প্রদেয় সম্পদকেও 'আরশ' বলা হয়।

গুররা (غرة) ঃ ভ্রূণ হত্যার বদলায় অপরাধীর ওপর আরোপিত দেয় সম্পদকে 'গুররা' বলা হয়। এর পরিমাণ হল পূর্ণ দিয়াতের বিশভাগের একভাগ।[৮]

হুকুমাতু 'আদলিন (حكومة عدل) ঃ মানবদেহের বিরুদ্ধে যে সব অপরাধের শাস্তি স্বরূপ প্রদেয় সম্পদের পরিমাণ শরী'আত নির্ধারণ করে দেয় নি, সে সব ক্ষেত্রে বিচারক কর্তৃক অপরাধীর ওপর আরোপিত সম্পদকে 'হুকুমাতু 'আদলিন' বলা হয়।[৯]

দিয়াত কখন বাধ্যতামূলক হয়?

ক. কিসাসের পরিবর্তে দিয়াত

নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছরা কিংবা আহত ব্যক্তি নিজেই কিসাসের পরিবর্তে দিয়াত নিতে সম্মত হলে অথবা দু'পক্ষের মধ্যে দিয়াতের ওপর সমঝোতা হলে দিয়াত বাধ্যতামূলক হয়। আর যে সব ক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর করা নিষিদ্ধ (যেমন-পুত্র হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারী পিতার কিসাস) সে সব অবস্থায়ও দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে।

খ. ভুলবশত হত্যা ও যখম

প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা ও ভুলবশত হত্যা এবং ভুলবশত যখমের জন্য দিয়াত

---

৫. খুনের বদলায় হত্যাকারীর রক্তপাত ঘটাতে বাধা দেয় বলে দিয়াতকে 'আকলও বলা হয়। অথবা দিয়াত হিসেবে প্রদত্ত উট নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছদের আঙ্গিনায় বেঁধে রাখা হত বলে দিয়াতকে 'আকল বলা হত। পরবর্তীকালে শব্দটি উট ছাড়াও দিয়াতস্বরূপ প্রদত্ত যে কোন মালের জন্য বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়।

৬. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৬, পৃ. ১২৬; আল-জুরজানী, *আত-তা'রীফাত*, খ.১, পৃ.১৪২; আল-আনসারী, *ফাতহুল ওয়াহ্হাব*, খ.২৩৮

৭. ইবন মানযূর,*লিসানুল আরব*, খ.৬, পৃ.২৬৩; ইবনু নুজায়ম,*আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৮, পৃ.৩৭২; আল-জুরজানী,*আত-তা'রীফাত*, খ.১, পৃ.৩১

৮. আল-জুরজানী, *আত-তা'রীফাত*, খ.১, পৃ.২০৮

৯. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.১৮,পৃ.৬৮-৯, খ.২১, পৃ.৪৫

বাধ্যতামূলক হবে। কারণবশত হত্যা এবং যখমের জন্যও দিয়াত প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া গায়র মুকাল্লাফ থেকে কোন ধরনের হত্যাকাণ্ড কিংবা কিসাসযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হলেও দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে।

দিয়াতের প্রকারভেদ ঃ

অপরাধের প্রকৃতি এবং নিহত বা আহত ব্যক্তির অবস্থাভেদে দিয়াতের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন- খুনের বদলায় দিয়াত এবং মানবদেহের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধের দিয়াত। তাছাড়া দিয়াতকে কঠোর (مغلظة) ও সাধারণ (غير مغلظة) দু'ভাগেও ভাগ করা হয়। ইচ্ছাকৃত ও প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য 'কঠোর দিয়াত' এবং ভুলবশত ও কারণবশত হত্যার জন্য 'সাধারণ দিয়াত' প্রযোজ্য হয়। নিম্নে যথাস্থানে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

দিয়াত ওয়াজিব হবার শর্তাবলী ঃ

১. নিহত ব্যক্তি 'মা'সূমুদ দ্দাম' হওয়া

দিয়াত বাধ্যতামূলক হবার জন্য নিহত ব্যক্তির জীবনের নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকতে হবে। অর্থাৎ সে যদি অন্য কোন অপরাধে (যেমন হত্যা, ধর্মত্যাগ ও ব্যভিচার প্রভৃতি) হত্যাদণ্ডে দণ্ডিত হয় কিংবা রাষ্ট্রে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী অমুসলিম (হারাবী) হয়, তাহলে হত্যাকারীর ওপর দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে না। কেননা সে হত্যাযোগ্য অপরাধে লিপ্ত হয়ে কিংবা সে অবৈধভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করে নিজের জীবনের নিরাপত্তা নিজেই বিঘ্নিত করেছে। তবে সরকারের কর্তৃত্বের অবমাননা করার কারণে তা'যীরের আওতায় হত্যাকারীর শাস্তি হবে।

উল্লেখ্য যে, দিয়াত ওয়াজিব হবার জন্য নিহত ব্যক্তি বা হত্যাকারী কারোই মুসলিম হওয়া শর্ত নয়। মুসলিম অমুসলিমকে এবং অমুসলিম মুসলিমকে হত্যা করলে দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। অনুরূপভাবে নিহত ব্যক্তি বা হত্যাকারী কারোই মুকাল্লাফ (প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন) হওয়াও শর্ত নয়। অপ্রাপ্তবয়স্ক কিংবা পাগলকে হত্যা করা হলে যেমন হত্যাকারীর ওপর দিয়াত ওয়াজিব হবে, তেমনি তারা হত্যা করলেও তাদের সম্পদে দিয়াত ওয়াজিব হবে।[১০]

---

১০. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.২৫২ ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৮, পৃ.৩৭৩

২. হত্যাকাণ্ড ইসলামী রাষ্ট্রে সংঘটিত হওয়া

দিয়াত বাধ্যতামূলক হবার জন্য হত্যাকাণ্ড ইসলামী রাষ্ট্রে সংঘটিত হতে হবে। অতএব কোন হারাবী ইসলাম গ্রহণ করল; কিন্তু হিজরাত করে ইসলামী রাষ্ট্রে চলে আসল না। এরূপ অবস্থায় দারুল হারবের মধ্যে কোন মুসলিম তাকে হত্যা করলে এর জন্য হত্যাকারীর ওপর দিয়াত আরোপিত হবে না। কেননা সে মুসলিম হলেও দারুল হারবের বাসিন্দা হবার কারণে তার জীবনের নিরাপত্তা রক্ষা করার দায়িত্ব যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের নেই, তাই তার হত্যার জন্য হত্যাকারীর ওপর দিয়াত আরোপ করা যাবে না। এটা হানাফীগণের অভিমত। তবে অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের মতে- দিয়াত বাধ্যতামূলক হবার জন্য হত্যাকাণ্ড ইসলামী রাষ্ট্রে সংঘটিত হওয়া শর্ত নয়। তাঁদের মতানুযায়ী যে কোন ব্যক্তি দারুল হারবে কোন মুসলিমকে হত্যা করলে হত্যাকারীর ওপর দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে।[১১]

মানবজীবনের বিরুদ্ধে অপরাধের দিয়াত

ক. ভুলবশত হত্যার দিয়াত

ভুলবশত হত্যার জন্য কিসাস নেই। এ ধরনের হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারী ও তার বংশের পুরুষ লোকদের (عاقلة) ওপর দিয়াত বাধ্যতামূলক হয়।[১২] উপরন্তু হত্যাকারীকে হত্যার কাফফারা আদায় করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,
و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة و إن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و كان الله عليما حكيما. "এবং কেউ কোন মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে একজন ঈমানদার দাস বা দাসী মুক্ত করা এবং নিহতের পরিবারকে দিয়াত প্রদান করা বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং মু'মিন হয় তবে একজন ঈমানদার দাস মুক্ত করা বিধেয়। নিহত ব্যক্তি যদি তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ (অমুসলিম) সম্প্রদায়ের লোক হয় তবে তার পরিবারকে দিয়াত প্রদান এবং একজন

---

১১. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.২৫২ ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৮, পৃ.৩৭৩

১২. এটা হানাফী ও মালিকীগণের অভিমত। তাঁদের মতে- বংশের একজন সদস্য হিসেবে হত্যাকারীর ওপরও দিয়াতের একটি অংশ পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক হবে। তবে শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে- হত্যাকারীর ওপর দিয়াতের অংশবিশেষ পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক নয়। (আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৭, পৃ. ১২৭; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ. ২৯৬)

ঈমানদার দাস মুক্ত করা বিধেয়। যে তা পাবে না তাকে একাধারে দু'মাস রোযা রাখতে হবে।"[১৩]

ভুলবশত হত্যার জন্য সাধারণ (غير مغلظة) দিয়াত প্রযোজ্য হবে।[১৪] এর পরিমাণ হল- এক বৎসর বয়সের বিশটি উট ও বিশটি উষ্ট্রী, দু'বৎসর বয়সের বিশটি উষ্ট্রী, তিন বৎসর বয়সের বিশটি উষ্ট্রী এবং চার বৎসর বয়সের বিশটি উষ্ট্রী। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ' دية الخطأ أخماس عشرون بنت مخاض ' و عشرون ابن مخاض ' و عشرون بنت لبون ' و عشرون حقة ' و عشرون جذعة. - "ভুলবশত হত্যার দিয়্যাত পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। এগুলো হল- এক বৎসর বয়সের বিশটি উট ও বিশটি উষ্ট্রী, দু'বৎসর বয়সের বিশটি উষ্ট্রী, তিন বৎসর বয়সের বিশটি উষ্ট্রী এবং চার বৎসর বয়সের বিশটি উষ্ট্রী।"[১৫] দিয়াতস্বরূপ উটের পরিবর্তে ১০০০ (একহাজার) দীনার বা ১০০০০ (দশ হাজার) দিরহাম[১৬] কিংবা এর সমপরিমাণ যে কোন অর্থসম্পদও আদায় করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, হত্যাকারীর বংশের লোকদেরকে তিন বৎসরের মধ্যে সর্বোচ্চ তিন কিস্তিতে দিয়াত পরিশোধ করে দিতে হবে।[১৭] তিন বৎসরের মধ্যে দিয়াত পরিশোধ প্রসঙ্গে ইমাম আল-কাসানী (রহ) বলেন, এ বিষয়ে সাহাবা কিরামের মধ্যে ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্ণিত রয়েছে, হযরত 'উমার (রা) সাহাবা কিরামের উপস্থিতিতে এরূপ ফায়সালা দিয়েছিলেন।[১৮] তাঁদের কেউ তাঁর

---

১৩. আল-কুর'আন, ৪ (সূরা আন-নিসা') ঃ ৯২

১৪. হানাফী ও মালিকীগণের মতে- ভুলবশত হত্যার জন্য কোন অবস্থাতেই কঠোর দিয়াত কার্যকর করা যাবে না। পক্ষান্তরে শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে নিম্নোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে কঠোর দিয়াত কার্যকর করা হবে। ১. যদি হত্যাকাণ্ড মক্কার হারামের মধ্যে সংঘটিত হয়। ২. যদি হত্যাকাণ্ড নিষিদ্ধ মাসসমূহে (মুহাররাম, রজব, যুলকা'দাহ ও যুলহিজ্জাহ) সংঘটিত হয়। ৩. যদি হত্যাকারী কোন নিকটাত্মীয়কে হত্যা করে। (ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ. ২৯৮) প্রখ্যাত তাবি'ঈ মুজাহিদ (রহ) বলেন, হযরত 'উমার (রা) হারামে কিংবা হারাম মাসসমূহে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলে এবং কেউ তার নিকটাত্মীয়কে হত্যা করলে একটি পূর্ণ দিয়াত ও এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত প্রদানের নির্দেশ দিতেন। (আল বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং: ১৫৯১৪)

১৫. ইবনু 'আবদিল বারর, *আত-তামহীদ*, খ.৪, পৃ.৬৪, খ.১৭, পৃ.২৫০; ইবনু হাজর, *আদ-দিরায়াহ*, হা.নং : ১০২১

১৬. এটা হানাফীগণের অভিমত। অন্যান্য ইমামগণের মতে ১২০০০ দিরহাম। (আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.২৫৪))

১৭. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৭, পৃ.১২৭; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৬, পৃ.১৭৭

১৮. বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং: ১৬১৬৮; আল-জসসাস, *আহকামুল কুর'আন*, খ.৩, পৃ.১৯৫,২০৯

ফায়সালার বিরোধিতা করেন নি। এ থেকে জানা যায় যে, এটি তাঁদের সর্বসম্মত অভিমত ছিল।[১৯]

খ. প্রায় ভুলবশত হত্যা ও কারণবশত হত্যার দিয়াত

প্রায় ভুলবশত হত্যা ও কারণবশত হত্যার ক্ষেত্রে ভুলবশত হত্যার অনুরূপ দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে।[২০]

গ. ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত

ইচ্ছাকৃত হত্যার নির্ধারিত শাস্তি হল কিসাস। তবে দিয়াত প্রদানের শর্তে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছদের হত্যাকারীর সাথে সমঝোতা করার ইখতিয়ারও রয়েছে। এরূপ হত্যার জন্য কঠোর দিয়াত (مغلظة) প্রযোজ্য হবে। দিয়াতের এ কঠোরতা তিন দিক থেকে আরোপ করা হবে। ১. দিয়াতের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের দায়ভার কেবল হত্যাকারীর ওপরই বর্তাবে। ২. দিয়াতের সম্পূর্ণ অর্থ নগদ পরিশোধ করতে হবে।[২১] ও ৩. দিয়াতস্বরূপ প্রদেয় উটের উচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ।[২২] এরূপ হত্যার দিয়াতের জন্য একশত উষ্ট্রীর মধ্যে ত্রিশটি চার বৎসর বয়সের, আর ত্রিশটি তিন বৎসর বয়সের উট এবং ৪০টি গর্ভবতী উষ্ট্রী হতে হবে।[২৩] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا و إن شاؤا أخذوا الدية ' و هي ثلثون حقة و ثلثون جذعة و أربعون خلفة ' و ما صولحوا عليه فهو لهم ' و ذلك تشديد العقل. "যে ব্যক্তি অপরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করল, তাকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের কাছে সমর্পন করা হবে। তারা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করবে অথবা ইচ্ছা করলে দিয়াত গ্রহণ করবে। দিয়াতের পরিমাণ হল- ত্রিশটি তিন বৎসর বয়সের, ৩০টি চার বৎসর বয়সের এবং ৪০টি গর্ভবতী উষ্ট্রী। আর যদি তারা সমঝোতা করে তবে যে পরিমাণের বিনিময়ে সমঝোতা হয়েছে, তা-ই

---

১৯. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.২৫৬
২০. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ.৬৬
২১. এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে হানাফীগণের মতে- তিন বৎসরের মধ্যে আদায় করার সুযোগ থাকবে। (আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.২৫৭; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ.১২)
২২. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.২৫৭
২৩. এটা শাফি'ঈ ইমামগণ এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) প্রমুখের অভিমত। অন্যান্য ইমামগণের দৃষ্টিতে একশত উটের মধ্যে পঁচিশটি চার বৎসর বয়সের ও পঁচিশটি তিন বৎসর বয়সের উট, আর পঁচিশটি দুবৎসর বয়সের উষ্ট্রী এবং ২৫টি এক বৎসর বয়সের উষ্ট্রী হতে হবে। (ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ. ২৯৩-৪)

তারা পাবে। এ বিধান দিয়াতে কঠোরতা সৃষ্টির জন্য আরোপ করা হয়েছে।"[২৪]

নিহতের অভিভাবকদের জন্য সমঝোতার ক্ষেত্রে এ পরিমাণের বেশি দাবি করা বৈধ নয়। অবশ্যই এর কম পরিমাণের ওপরও সমঝোতা করা যেতে পারে।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইচ্ছাকৃত হত্যার নির্ধারিত শাস্তি হল কিসাস। এ কারণে দিয়াত প্রদানে হত্যাকারীর স্বেচ্ছায় সম্মত হওয়া আবশ্যক। তার সম্মতি ছাড়া তার নিকট থেকে তা জোর করে আদায় করা বৈধ নয়। হত্যার অপরাধে তার জীবন ধ্বংস করা বৈধ হলেও তার সম্পদ দখল করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. - "কোন মুসলিমের সম্পদ তার সম্মতি ছাড়া অন্যের জন্য বৈধ নয়।"[২৫] এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত।[২৬] পক্ষান্তরে হাম্বলীগণের মতে ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি হল কিসাস কিংবা দিয়াত। এ দুটি শাস্তির মধ্যে যে কোন এক ধরনের শাস্তি বেছে নেয়ার ইখতিয়ার নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছদের রয়েছে। তারা ইচ্ছে করলে কিসাস গ্রহণ করবে, ইচ্ছে করলে দিয়াতও নিতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يودى ' و إما أن يقاد. - "যার কোন ব্যক্তি নিহত হবে,তার দুটি ইখতিয়ার রয়েছে। সে ইচ্ছে করলে রক্তমূল্যও নিতে পারবে, ইচ্ছে করলে কিসাসও গ্রহণ করতে পারবে।"[২৭] তাঁদের মতানুযায়ী হত্যাকারীর সম্মতি ছাড়া তার নিকট থেকে দিয়াতের অর্থ জোর করে আদায় করা বৈধ হবে যেমন ক্ষতিপূরণের অর্থ জোর করে আদায় করা যায়।[২৮]

ঘ. প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত

'প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা'র জন্য কিসাস প্রযোজ্য নয়। এর শাস্তি হল কঠোর দিয়াত। ইচ্ছাকৃত হত্যার মতই এরূপ হত্যার ক্ষেত্রেও দিয়াতরূপে প্রদেয় উটগুলো উচ্চ বয়সের হতে হবে।[২৯] অর্থাৎ একশত উষ্ট্রীর মধ্যে ত্রিশটি চার

---

২৪. ইবনু মাজাহ, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ২৬২৬; বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং: ১৫৯০৮

২৫. আল বায়হাকী, *আস-সুনান আল- কুবরা*, হা.নং : ১১৩২৫; আবূ ই'য়ালা, *আল-মুসনাদ*, হা.নং : ১৫৭০

২৬. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ. ৬০-৩

২৭. সহীহ্ আল বুখারী, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ৬৪৮৬; আবূ দাউদ (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং: ৪৫০৫

২৮. আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ. ৩; আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৫, পৃ. ৫৪৩

২৯. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ. ৬৫

বৎসর বয়সের, আর ত্রিশটি তিন বৎসর বয়সের উট এবং ৪০টি গর্ভবতী উষ্ট্রী হতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ألا إن في قتيل عمد الخطأ ، قتيل السوط والعصا و الحجر مائة من الإبل أربعون في بطونها الإبل. - "অসতর্কতামূলক ইচ্ছাকৃত হত্যায় নিহত তথা বেত, লাঠি ও পাথরের আঘাতে নিহত ব্যক্তির ক্ষেত্রে একশতটি উষ্ট্র দিতে হবে। তন্মধ্যে চল্লিশটি গর্ভবতী হতে হবে।"[৩০] উল্লেখ্য যে, এ দিয়াতের অর্থসম্পদ আদায়ের দায়ভার কেবল হত্যাকারীর ওপর বর্তাবে না; বরং ভুলবশত হত্যার মত এ দায়ভার তার ও তার বংশের লোকদের ওপর আরোপিত হবে।[৩১] উপরন্তু তারা তিন বৎসরের মধ্যে তিন কিস্তিতে এ দিয়াত পরিশোধ করতে পারবে।[৩২]

হত্যার দিয়াত আদায়ের সামগ্রী ঃ

দিয়াত আদায়ের প্রধান বস্তু হল উট। যদি উট পাওয়া যায়, তা হলে উট দিয়ে দিয়াত আদায় করতে হবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। যদি উট পাওয়া না যায় কিংবা তা সংগ্রহ করা দুরূহ হয়, তাহলে এর সমতুল্য দিয়াত বিভিন্ন বস্তুসামগ্রীর দ্বারাও পরিশোধ করা যাবে এবং নগদ অর্থেও পরিশোধ করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও খুলাফা রাশিদূনের যুগে নগদ অর্থে পূর্ণ দিয়াতের পরিমাণ উটের সমসাময়িক বাজার দরের উঠা-নামার ভিত্তিতে স্বর্ণমুদ্রায় ৪০০ (চার শত) দীনার থেকে ১০০০ (এক হাজার) দীনার পর্যন্ত এবং রৌপ্য মুদ্রায় ৮০০০ (আট হাজার দিরহাম) থেকে ১২০০০ (বার হাজার দিরহাম) পর্যন্ত উন্নীত হয়।[৩৩]

ইমাম আবূ হানীফা (রহ) ও মালিকীগণের মতে- দিয়াত আদায়ের মূল সামগ্রী হল তিনটি- উট, সোনা ও রূপা।[৩৪] উট হলে একশতটি, সোনা হলে ১০০০ (এক হাজার) দীনার আর রূপা হলে ১০০০০ (দশ হাজার) বা ১২০০০ (বার

---

৩০. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং : ১৫৪২৫, ১৪৪২৬

৩১. এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে ইমাম যুহরী, ইবনু সীরীন ও কাতাদাহ (রহ) প্রমুখের মতে- 'প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা'র দিয়াত আদায়ের দায়ভার কেবল হত্যাকারীর ওপরই বর্তাবে। কারণ এ ক্ষেত্রে অপরাধটি ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হয়, যদিও সরাসরি হয়ত হত্যা করার উদ্দেশ্য থাকে না। তাই তার অপকর্মের ভার অপরের ওপর বর্তানো সমীচীন হবে না।

৩২. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.২৫১; আল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাহ*, খ.২, পৃ.১২০; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.২৯৪-৫

৩৩. আবূ দাউদ, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ৪৫৪২; বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং: ১৫৯৪৬, ১৫৯৪৯, ১৫৯৫০

৩৪. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ২৫৩-৪; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.১০, পৃ.২৭৫; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ.৬৮; আল-'আদাভী, আল-হাশিয়াতু..,খ.২, পৃ. ২৯৮-৯

হাজার) দিরহাম।[৩৫] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, إن في النفس الدية مائة من الإبل. "জীবনহানিতে দিয়্যাত হল একশতটি উট।"[৩৬] বর্ণিত আছে, হযরত 'উমার (রা) স্বর্ণের মালিকদের ওপর এক হাজার দীনার এবং রৌপ্যের মালিকদের ওপর বার হাজার দিরহাম দিয়াত নির্ধারণ করতেন।[৩৭] এ হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, দিয়াত আদায়ের জন্য উট, সোনা ও রূপা- এ তিনটির মধ্যে যে কোনটি ইখতিয়ার করা যাবে।

শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণ এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ) ও মুহাম্মাদ (রহ) প্রমুখের মতে- দিয়াত আদায়ের মূল উপকরণ হল পাঁচটি- উট, সোনা, রূপা, গরু ও ছাগল।[৩৮] গরুর পরিমাণ হল দুশত আর ছাগলের পরিমাণ হল দু'হাজার। বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাদের গরু আছে তাদের নিকট থেকে পূর্ণ দিয়াত বাবদ দুশত গরু এবং যাদের বকরী আছে তাদের নিকট থেকে দুহাজার বকরী নেবার নির্দেশ দেন।[৩৯]

হত্যার তা'যীরী শাস্তি ঃ

হত্যাকারী হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে কেবল একটি জীবনেরই ক্ষতি সাধন করে না; বরং সে সামাজিক নিরাপত্তাও বিঘ্নিত করে। তাই যদি কোন কারণে কিসাস বা দিয়াত বা দুটিই রহিত হয়ে যায়, তবুও তার কিছু শাস্তি হওয়া উচিত। মালিকীগণের মতে- কিসাস ক্ষমা করার ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে একশত বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের কারাদণ্ড প্রদান করা হবে। অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের

---

৩৫. হানাফীগণের দৃষ্টিতে দশ হাজার ও অন্যান্য ইমামগণের দৃষ্টিতে বার হাজার। (আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ২৫৪; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.১০, পৃ.২৭৫; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ.৬৮; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.২৯০)

৩৬. আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং : ১৪৪৭; ইবনু হিব্বান, *আস-সহীহ*, হা.নং : ৬৫৫৯; বায়হাকী, *আস-সুনান আল- কুবরা*, হা.নং : ১৫৯৭০

৩৭. আবূ দাউদ, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং: ৪৫৪২; মালিক, *আল-মু'আত্তা*, (কিতাবুল 'উকূল), হা.নং : ১৫৪৮; বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং : ১৫৯৫০

৩৮. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.২৮৯-৯০; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭,পৃ. ২৫৩-৪; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.১০, পৃ.২৭৫
ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ) ও মুহাম্মাদ (রহ) প্রমুখের মতে- কাপড় দিয়েও দিয়াত আদায় করা যাবে। বর্ণিত আছে যে, হযরত 'উমার (রা) কাপড় ব্যবসায়ীদের ওপর দুশত জোড়া কাপড় দানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। (আবূ দাউদ, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ৪৫৪২; বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং : ১৫৯৫০)

৩৯. ইবনু মাজাহ, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ২৬৩০; আবূ দাউদ, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং: ৪৫৪২; আল বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং : ১৫৯৪৯

মতে- হত্যাকারী পেশাদার দুস্কৃতিকারী হলে সরকার তাকে তা'যীরের আওতায় যে কোন ধরনের শাস্তি দিতে পারবে।[৪০] ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে সমঝোতার ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড রহিত হলেও বিচারক সুবিবেচনা অনুযায়ী দিয়াতের সাথে কারাদণ্ডের শাস্তিও যোগ করতে পারে। পিতা পুত্রকে হত্যা করলে তার ওপর কিসাস কার্যকর না হলেও সে তা'যীরের আওতায় দণ্ড ভোগ করবে।

দিয়াতের পরিমাণ ঃ

পুরুষের দিয়াতের পরিমাণ ঃ

পুরুষ হত্যার দিয়াতের পরিমাণ হল একশতটি উট কিংবা তার সমতুল্য অর্থ-সম্পদ।

মহিলার দিয়াতের পরিমাণ ঃ

মহিলার দিয়াত হল পুরুষের অর্ধেক। এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই।[৪১] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, دية المرأة على النصف من دية الرجل. - "মহিলার দিয়াত হল পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক।"[৪২] ইসলামী শরী'আতে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব অত্যল্প হওয়ায় মীরাছের বেলায় যেমন তাদেরকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় অর্ধেক দেয়া হয়েছে, তাই দিয়াতের বেলায়ও একই রূপ বিধান প্রযোজ্য হবে।

এ বিধান যেমন তাদের হত্যার জন্য প্রযোজ্য হবে, তেমনি তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন এবং যখমের জন্যও প্রযোজ্য হবে।[৪৩] হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত,

---

৪০. ইবনু রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, খ.২, পৃ. ৩৩৮; *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন* (সংকলন), খ.১, পৃ.২৬৩

৪১. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৩১২-৩১৪; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ.৭৯; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ.১১৪

৪২. আল বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং : ১৬০৮৪; ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং : ২৭৪৯৬, ২৭৪৯৭

৪৩. এটা হানাফী ও শাফি'ঈগণের অভিমত। মালিকী ও হাম্বলীগণের মতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেলায় দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত মহিলা পুরুষের সমান অংশ পাবে। দিয়াতের পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশের উপরে চলে গেলে তার দিয়াত পুরুষের দিয়াতের অর্ধেকে নেমে আসবে। যেমন- কোন মহিলার তিনটি আঙ্গুল কাটা হলে তার দিয়াতের পরিমাণ হবে ত্রিশটি উট। যদি চারটি আঙ্গুল কাটা হয়, তা হলে দিয়াতের পরিমাণ হবে বিশটি উট। (ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮,পৃ.৩১৪-৫; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ.৭৯; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৭,পৃ.৩২৯) তাঁদের দলীল হল ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. - "দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত মহিলার দিয়াত পুরুষের দিয়াতের সমান হবে।"(আন্ নাসাঈ, *আস-সুনান আল-কুবরা*,

তিনি বলেন ঃ عقل المرأة على النصف من الرجل في النفس و فيما دونها. - "প্রাণহানি ও মানবদেহের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে মহিলার দিয়াত হল পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক।"[৪৪]

অমুসলিমের দিয়াতের পরিমাণ ঃ

মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের রক্তের মূল্য সমান। তাদের দিয়াতের পরিমাণের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।[৪৫] আল্লাহ তা'আলা বলেন, و إن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. - "নিহত ব্যক্তি যদি তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ (অমুসলিম) সম্প্রদায়ের লোক হয় তবে তার পরিবারকে দিয়াত প্রদান করা বিধেয়।"[৪৬] এ আয়াতের মধ্যে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য করা ছাড়াই সব ধরনের হত্যার জন্য দিয়াত প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেকের বেলায় একই রূপ বিধান প্রযোজ্য হবে। হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ دية اليهودي و النصراني و كل ذمي مثل دية المسلم . - "ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান এবং প্রত্যেক অমুসলিম নাগরিকের দিয়াত মুসলিমের দিয়াতের মতই।"[৪৭] বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত 'আমর ইবন উমাইয়্যাহ আদ-দমরী (রা) চুক্তিবদ্ধ দুজন অমুসলিমকে হত্যা করেছিলেন। এ প্রেক্ষিতে তাদের দুজনের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুজন স্বাধীন মুসলমানের দিয়াত প্রদানের নির্দেশ

(কিতাবুল কাসামাহ), হা.নং : ৭০০৮; দারুকুতনী, *আস-সুনান*, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ৩৮)

৪৪. আল বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং : ১৬০৮৮

৪৫. এটা হানাফীগণের অভিমত। ইমাম যুহরী, শা'বী ও ইব্রাহীম (রহ) প্রমুখ তাবি'ঈও এ মত পোষণ করেন। তবে অন্যান্য ইমামগণের মতে- অমুসলিমের দিয়াত মুসলিমের অর্ধেক। (ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৩১২; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ.৮৪-৫; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৭, পৃ.৩৩৮-৯) তাঁদের দলীল হল ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, دية المعاهد نصف دية المسلم الحر. - "চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের দিয়াত স্বাধীন মুসলিমের দিয়াতের অর্ধেক।" (আবূ দাউদ, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ৪৫৮৩; আত্ তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, হা.নং : ৭৫৮২) অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن. - "কাফিরের দিয়াত মু'মিনের দিয়াতের অর্ধেক।" (তিরমিযী, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ১৪১৩)

৪৬. আল-কুর'আন, ৪ (সূরা আন-নিসা') ঃ ৯২

৪৭. 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং : ১৮৪৯৪
একই ধরনের বক্তব্য 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) (দারাকুতনী, প্রাগুক্ত, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং : ২০৩; ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং : ২৭৪৪৪) থেকেও বর্ণিত রয়েছে।

দিয়েছিলেন।[৪৮] ইমাম যুহরী (রহ) বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), হযরত আবূ বাকর (রা), উমার (রা) ও 'উছমান (রা) প্রত্যেকেই যিম্মী (অমুসলিম নাগরিক)-কে মুসলিমের সমপরিমাণ দিয়াত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।"[৪৯]

ভ্রূণ হত্যার দিয়াত ঃ

- অপূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ নষ্ট করার শাস্তি

যে ব্যক্তি কোন নারীর এমন কোন গর্ভ নষ্ট করল, যার অঙ্গসমূহ গঠিত হয় নি, তা হলে অপরাধীর ওপর কোন রূপ দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে না।[৫০] তবে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী তাকে তা'যীরের আওতায় যে কোন দণ্ড প্রদান করবেন, যদি তা উক্ত নারীর জীবন রক্ষার্থে বা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করাবার জন্য না হয়ে থাকে। তবে গর্ভপাত ঘটানোর কারণে যদি সংশ্লিষ্ট নারীর প্রতি কোন আঘাত ঘটানো হয় বা সে মারা যায়, তাহলে অপরাধী উপর্যুক্ত আঘাত বা মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত হবে। স্বামী, এমনকি নারী যদি নিজেও নিজের গর্ভপাত ঘটায়, তাহলেও বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী তাদেরকে তা'যীরের আওতায় যে কোন দণ্ড প্রদান করবেন।

- পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ নষ্ট করার শাস্তি

যে ব্যক্তি যে কোনভাবে কোন নারীর এমন কোন গর্ভ নষ্ট করল, যার কিছু বা পূর্ণ অঙ্গ বা অবয়ব গঠিত হয়েছে এবং যদি তা উক্ত নারীর জীবন রক্ষার্থে বা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করাবার জন্য না হয়ে থাকে, তাহলে গর্ভস্থ শিশু -ছেলে হোক বা মেয়ে- মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হলে সংখ্যা অনুযায়ী প্রতিটি শিশুর জন্য পৃথক পৃথকভাবে অপরাধীর ওপর দিয়াতের বিশ ভাগের এক ভাগ (অর্থাৎ পাঁচটি উট বা পঞ্চাশ দীনার) প্রদান বাধ্যতামূলক হবে।[৫১] হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ হুযায়ল গোত্রের জনৈকা মহিলার গর্ভ নষ্ট করার

---

৪৮. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ.৮৫; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.২৫৫

৪৯. আল বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং : ১৬১৩২; তাবারী, *জামি'উল বয়ান*, খ.৫, খ.২১৩

৫০. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৩২৫; *আল-ফাতাওয়াহ আল-হিন্দিয়্যাহ*, খ.৬, পৃ. ৩৪-৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ. ৩১৬
ইমাম মালিকের মতে ভ্রূণ -রক্তপিণ্ড বা মাংসপিণ্ড যে ধরনেরই হোক তা- নষ্ট করা হলে 'গুররা' ওয়াজিব হবে। (মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪,পৃ.৬৩০)

৫১. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৩২৫; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৬, পৃ.১৩৯-৪০; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ. ৩১৬; মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.১, পৃ.৪৪৬

জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গুররা (অর্থাৎ বিশভাগের একভাগ দিয়াত) প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৫২]

গর্ভস্থ শিশু জীবিত ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মারা গেলে সংখ্যা অনুযায়ী প্রতিটি শিশুর জন্য পৃথক পৃথকভাবে অপরাধীর ওপর পূর্ণ দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। তবে গর্ভপাত ঘটানোর কারণে যদি সংশ্লিষ্ট নারীর প্রতি কোন আঘাত ঘটানো হয় বা সে মারা যায়, তাহলে অপরাধী উপর্যুক্ত আঘাত বা মৃত্যুর জন্যও নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত হবে।[৫৩] স্বামী, এমনকি নারী যদি নিজেও নিজের গর্ভপাত ঘটায়, তাহলে তার ওপরও উপর্যুক্ত নিয়মে দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে।

মানবদেহের বিরুদ্ধে অপরাধসমূহের দিয়াত ঃ

মানবদেহের বিরুদ্ধে যে কোন অপরাধের জন্য কিসাস কার্যকর করা সম্ভব না হলে (যেমন- হাত-পা, আঙ্গুল ইত্যাদি গ্রন্থিসন্ধি থেকে বিচ্ছিন্ন না করে গ্রন্থিসন্ধির নিম্নাংশ বা উপরাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে অথবা কিসাস কার্যকর করলে অপরাধীর সমপরিমাণের অধিক শাস্তি পাওয়ার বা মৃত্যু ঘটার আশঙ্কা থাকলে) অপরাধীর ওপর দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে।

পূর্ণ দিয়াত ও আংশিক দিয়াত ঃ

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্ণ দিয়াতের পরিমাণ হল একশতটি উট বা তার সমতুল্য মূল্য। হত্যার জন্য এ দিয়াত প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে শরীরে যে সব অঙ্গ একটি করে রয়েছে (যেমন- নাক, জিহ্বা, পুরুষাঙ্গ, নারীর যৌনাঙ্গ, মেরুদণ্ড, গুহ্যদ্বার ও মূত্রনালী ইত্যাদি), অপরাধী তার কোন একটি অঙ্গ কর্তন করলে কিংবা বিচ্ছিন্ন করলে অথবা তার কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দিলে পূর্ণ দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে।[৫৪]

পক্ষান্তরে শরীরে যে সব অঙ্গ দুটি রয়েছে (যেমন- হাত, পা, চোখ, কান, ওষ্ঠ, ভ্রূ, স্তন, বোঁটা, অণ্ড, চোয়াল ও পাছা ইত্যাদি), অপরাধী দুটিই কর্তন করলে কিংবা বিচ্ছিন্ন করলে অথবা তার কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দিলে পূর্ণ দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। আর কোন একটি কর্তন করলে কিংবা বিচ্ছিন্ন করলে অথবা

---

৫২. সহীহ্ আল বুখারী, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ৬৫১২; মুসলিম, (কিতাবুল কাসামাহ..), হা.নং : ১৬৮১

৫৩. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৩২৬; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ. ৩২৩; মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.১, পৃ.৪৪৬

৫৪. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ. ৬৮; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৩১১; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৩৪০

তার কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দিলে অর্ধেক দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। যেমন- অপরাধী কোন ব্যক্তির একটি হাত বা পা কেটে ফেলল, তা হলে তার ওপর দু হাত বা দুপায়ের জন্য নির্ধারিত পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক হবে।[৫৫] কিন্তু এক প্রকারের একাধিক অঙ্গের মধ্যে একটি মাত্র অঙ্গ পূর্ব থেকেই সুস্থ ছিল এবং অপর অঙ্গটি পূর্ব থেকেই অকেজো ছিল, এ রূপ অবস্থায় সুস্থ অঙ্গটির ক্ষতিসাধন করলে পূর্ণ দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে।[৫৬]

শরীরে যে অঙ্গের চারটি প্রত্যঙ্গ রয়েছে (যেমন- চোখের পাতা ও অক্ষীপক্ষ্ম), কোন ব্যক্তি সে অঙ্গের সব প্রত্যঙ্গের ক্ষতিসাধন করলে পূর্ণ দিয়াত আর তার প্রত্যেকটি প্রত্যঙ্গের জন্য দিয়াতের এক-চতুর্থাংশ ধার্য হবে।[৫৭]

শরীরে যে অঙ্গে দশটি প্রত্যঙ্গ রয়েছে, (যেমন - হাত ও পায়ের আঙ্গুল) কোন ব্যক্তি সে অঙ্গের সব প্রত্যঙ্গের ক্ষতিসাধন করলে পূর্ণ দিয়াত আর তার প্রত্যেকটি আঙ্গুলের জন্য দিয়াতের এক-দশমাংশ ধার্য হবে।[৫৮]

শরীরের যে অঙ্গে বিশের অধিক প্রত্যঙ্গ রয়েছে (যেমন- দাঁতের সংখ্যা সাধারণত ৩২), তার প্রত্যেক প্রত্যঙ্গের দিয়াতের পরিমাণ বিশভাগের এক ভাগ। কোন ব্যক্তি সে অঙ্গের সব প্রত্যঙ্গের ক্ষতিসাধন করলে পূর্ণ দিয়াত এবং এর অতিরিক্ত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। এ হিসাব অনুযায়ী ৩২টি দাঁতের দিয়াতের পরিমাণ দাঁড়াবে ১.৬ দিয়াত (অর্থাৎ একটি পূর্ণ দিয়াত এবং অতিরিক্ত পাঁচ ভাগের তিন ভাগ)।[৫৯]

অনির্ধারিত দিয়াত ঃ

মানবদেহের বিরুদ্ধে যে সব অপরাধের জন্য আরশ নির্ধারিত নেই, সে সব অপরাধের জন্য বিচারক আঘাতের অবস্থা ও অপরাধের ধরন বিবেচনা করে দিয়াত নির্ধারণ করবেন। যেমন অপরাধী কোন ব্যক্তির কোন অঙ্গ গ্রন্থিসন্ধি

---

৫৫. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ.৭০; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৩১১; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৬, পৃ. ১২৯-১৩১; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৩৪০

৫৬. এটা মালিকী ও হাম্বলীগণের অভিমত। অন্যান্য ইমামগণের মতে- এ রূপ অবস্থায়ও অর্ধেক দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। (আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ.৮৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৩৪২)

৫৭. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ.৭০; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৩১১; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৩৪০

৫৮. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ.৭১; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৩১৪; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৩৪০

৫৯. *তদেব*

থেকে না কেটে তার নিম্নাংশ থেকে কর্তন করেছে। ইসলামী আইনবিদগণের মতে- এ অবস্থায় কিসাস গ্রহণ সম্ভব নয় এবং এর জন্য নির্দিষ্ট আরশও নেই। অতএব এ ক্ষেত্রে বিচারক সুবিবেচনা অনুযায়ী দিয়াত ধার্য করবেন। দেহে গজানো অতিরিক্ত (যেমন কোন ব্যক্তির হাতে বা পায়ে অতিরিক্ত আঙ্গুল) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতিসাধনের বেলায়ও অনির্ধারিত দিয়াত প্রযোজ্য হবে।[৬০]

নিম্নে মানবদেহের বিরুদ্ধে অপরাধসমূহের দিয়াতের বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হল।

ক. অঙ্গহানি বা অঙ্গের কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দেয়ার দিয়াত

হাত-পায়ের দিয়াত ঃ

হাত কর্তন বা ভাঙ্গার ক্ষেত্রে কোন কারণে কিসাস কার্যকর করা সম্ভব না হলে তার আরশ হবে এক হাতের বেলায় পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক (অর্থাৎ পঞ্চাশটি উট বা তার সমতুল্য মূল্য) এবং দু হাতের বেলায় পূর্ণ দিয়াত (অর্থাৎ একশতটি উট অথবা তার সমপরিমাণ মূল্য)।[৬১] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,.و في اليدين الدية ' و في اليد خمسون - "দু হাতের জন্য পূর্ণ দিয়াত। আর এক হাতের জন্য পঞ্চাশটি উট।"[৬২]

অকেজো হাত বা কর্তন ভাঙ্গার ক্ষেত্রে নির্ধারিত দিয়াত প্রযোজ্য হবে না। এক্ষেত্রে বিচারক তাঁর সুবিবেচনায় দিয়াত ধার্য করবেন।[৬৩] কারো একটি হাত আগে থেকেই অকেজো এবং অপর একটি হাত ভাল ছিল, এ অবস্থায় সুস্থ হাতটির ক্ষতিসাধন করা হলে পূর্ণ দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে।

হাত বিদ্যমান রেখে তার কার্যক্ষমতা পুরো নষ্ট করে দেয়া হলেও উপর্যুক্ত নিয়মে দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। হাতের কার্যক্ষমতা আংশিক নষ্ট হয়ে গেলে ক্ষতির অনুপাতে দিয়াত নির্ধারণ করা হবে। যদি ক্ষতির অনুপাত নির্ধারণ করা দুরূহ হয়, তাহলে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী দিয়াত নির্ধারণ করবেন।[৬৪]

---

৬০. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ.৮২, ১৬৬-৭; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৩০২-৩, ৩২৩

৬১. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ.৭০; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ. ৩৫৭-৮

৬২. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং : ২৬৯৪৩; 'উমর আল-আনসারী, *খুলাসাতুল বাদরিল মুনীর*, হা.নং : ২২৬৮

৬৩. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ.৮০; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৩২৩
হাম্বলীগণের মতে- এ ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। তাঁদের দলীল হল- বর্ণিত আছে যে, হযরত 'উমার (রা) অকেজো হাতের কর্তনের বেলায় এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। (আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং ১৭৪৪১; ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং : ২৭১০৭)

৬৪. যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৬, পৃ.১৩১-২; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৮, পৃ.৩৭৯-৩৮০

মণিবন্ধের নিচ থেকে হাত কর্তনের জন্য আঙ্গুলের দিয়াতের বিধান প্রযোজ্য হবে। যদি কাঁধ কিংবা কনুই অথবা বাজুর মধ্যদেশ থেকে হাত কর্তন করা হয়, তা হলে পূর্ণ এক হাতের দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে শাফি'ঈগণের মতে- মণিবন্ধের জন্য অর্ধেক দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে এবং এর উপরের অংশের জন্য বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী আরশ ধার্য করবেন।[৬৫]

হাতের মত পায়ের ক্ষেত্রেও একই রূপ বিধান প্রযোজ্য হবে।[৬৬] হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, و في الرجل الواحدة نصف الدية - "এক পায়ের জন্য পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক।"[৬৭]

হাত-পায়ের আঙ্গুলের দিয়াত ঃ

হাত-পায়ের আঙ্গুল কর্তন কিংবা ভাঙ্গার ক্ষেত্রে কোন কারণে কিসাস কার্যকর করা সম্ভব না হলে তার আরশ হবে প্রতিটি আঙ্গুলের জন্য পূর্ণ দিয়াতের এক দশমাংশ (অর্থাৎ দশটি উট বা সমতুল্য মূল্য)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, و في كل اصبع من أصابع اليد و الرجل عشر من الإبل - "হাত ও পায়ের প্রতিটি আঙ্গুলের দিয়াত দশটি উট।"[৬৮]

আঙ্গুল বিদ্যমান রেখে তার কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয়া হলেও উপর্যুক্ত নিয়মে দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে।

হাত-বা পায়ের অতিরিক্ত আঙ্গুলের জন্য বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী দিয়াত ধার্য করবেন।

আঙ্গুলের প্রতিটি গিরার জন্য সংশ্লিষ্ট আঙ্গুলের দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ প্রদান বাধ্যতামূলক হবে; কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রতিটি গিরার জন্য উক্ত আঙ্গুলের দিয়াতের অর্ধেক প্রদান বাধ্যতামূলক হবে।[৬৯]

চোখের দিয়াত ঃ

চোখ- ছোট হোক বা বড়, সুস্থ হোক বা অসুস্থ, সোজা হোক বা টেরা-

---

৬৫. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ.৮১; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ.৭৬-৭
৬৬. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৩১৪; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ. ৩৬২
৬৭. আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং : ১৪৪৭; ইবনু হিব্বান, *আস-সহীহ*, হা.নং : ৬৫৫৯; বায়হাকী, *আস-সুনান আল- কুবরা*, হা.নং : ১৫৯৭০
৬৮. আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং : ১৪৪৭; ইবনু হিব্বান, *আস-সহীহ*, হা.নং : ৬৫৫৯; বায়হাকী, *আস-সুনান আল- কুবরা*, হা.নং : ১৫৯৭০
৬৯. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৩১৪; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ. ৩৬২

উৎপাটনের ক্ষেত্রে কোন কারণে কিসাস কার্যকর করা সম্ভব না হলে তার আরশ হবে এক চোখের বেলায় পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক (অর্থাৎ পঞ্চাশটি উট বা তার সমতুল্য মূল্য) এবং দু'চোখের বেলায় পূর্ণ দিয়াত (অর্থাৎ একশতটি উট অথবা তার সমপরিমাণ মূল্য)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, و في العينين الدية ' و في العين خمسون. - "দু'চোখের জন্য পূর্ণ দিয়াত। আর এক চোখের জন্য পঞ্চাশটি উট।"[৭০]

কানা কিংবা অকেজো চোখ উৎপাটনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত দিয়াত প্রযোজ্য হবে না। এক্ষেত্রে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা দিয়াত ধার্য করবেন। তবে কারো একটি চোখ আগে থেকেই অকেজো এবং অপর একটি চোখ ভাল ছিল, এ অবস্থায় সুস্থ চোখটির ক্ষতিসাধন করলে পূর্ণ দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে হানাফীগণের মতে- এ ক্ষেত্রেও একটি চোখের জন্য অর্ধেক দিয়াতই প্রযোজ্য হবে।

চোখ বিদ্যমান রেখে তার কার্যক্ষমতা পুরো নষ্ট করে দেয়া হলেও উপর্যুক্ত নিয়মে দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। চোখের কার্যক্ষমতা আংশিক নষ্ট হয়ে গেলে ক্ষতির অনুপাতে দিয়াত নির্ধারণ করা হবে। যদি ক্ষতির অনুপাত নির্ধারণ করা দুরূহ হয়, তাহলে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী দিয়াত নির্ধারণ করবেন।

চোখের প্রান্তদেশ সম্পূর্ণরূপে কর্তন বা উৎপাটন করা হলে এবং তা পুনরায় গজিয়ে উঠার সম্ভাবনা না থাকলে তার আরশ হবে প্রতিটি প্রান্তদেশের জন্য পূর্ণ দিয়াতের এক-চতুর্থাংশ (অর্থাৎ পঁচিশটি উট বা তার সমতুল্য মূল্য) এবং চারটির জন্য পূর্ণ দিয়াত। এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে মালিকীগণের মতে- এক্ষেত্রে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী দিয়াত ধার্য করবেন।

অক্ষিপক্ষ্ম বা চোখের পাতার লোম উৎপাটন করা হলে এবং তা পুনরায় না গজালে তার আরশ হবে প্রতিটি অক্ষিপক্ষ্মের জন্য পূর্ণ দিয়াতের এক-চতুর্থাংশ (অর্থাৎ পঁচিশটি উট বা তার সমতুল্য মূল্য)। এটা হানাফী ও হাম্বলী ইমামগণের অভিমত। তবে শাফি'ঈ ও মালিকীগণের মতে- এক্ষেত্রে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী দিয়াত ধার্য করবেন।

চোখের প্রান্তদেশ ও অক্ষিপক্ষ্মসহ চোখের পাতা উৎপাটন বা কর্তন করা হলে

---

৭০. আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং : ১৪৪৭; ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং : ২৬৮৬১, ২৬৮৬৩

সবগুলোর জন্য একটি অঙ্গের দিয়াতই ওয়াজিব হবে। কেননা নাকের হাড় ও নরম অংশ মিলেই যেমন একটি অঙ্গ ধরা হয়, তেমনি চোখের প্রান্তদেশ ও পাতা মিলেও একটি অঙ্গই ধরা হবে।[৭১]

নাকের দিয়াত ঃ

পূর্ণ নাক কিংবা নাকের নরম অংশ কর্তনের কিসাস কোন কারণে কার্যকর করা সম্ভব না হলে তার আরশ হবে পূর্ণ দিয়াত (অর্থাৎ একশতটি উট অথবা তার সমপরিমাণ মূল্য)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية مائة من الإبل. "পুরো নাক কেটে ফেললে পূর্ণ দিয়াত অর্থাৎ একশতটি উট।"[৭২]

নাকের নরম অংশের আংশিক কর্তন করলে বা নাসারন্ধ্র কর্তন করলেও দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে- নাকের নরম অংশের দুপার্শ্বে অবস্থিত দু'নাসারন্ধ্রের যে কোন একটি এবং মধ্যবর্তী অন্তরাল কর্তন করলে প্রত্যেকটির জন্য এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে।[৭৩]

অনুরূপভাবে নাক বিদ্যমান রেখে তার কার্যক্ষমতা অর্থাৎ ঘ্রাণশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেওয়ার ক্ষেত্রেও পূর্ণ দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। নাকের কার্যক্ষমতা আংশিক নষ্ট হয়ে গেলে ক্ষতির অনুপাতে দিয়াত নির্ধারণ করা হবে। যদি ক্ষতির অনুপাত নির্ধারণ করা দুরূহ হয়, তাহলে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী দিয়াত নির্ধারণ করবেন।[৭৪]

কানের দিয়াত ঃ

কানের সমূলে উৎপাটন বা কর্তনের ক্ষেত্রে কোন কারণে কিসাস কার্যকর করা সম্ভব না হলে তার আরশ হবে এক কানের বেলায় পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক (অর্থাৎ

---

৭১. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ.৭০-১; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৩১৪, ৩২৩; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৬, পৃ.১৩১-২; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ. ৩৪১-৪; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ.১৩২-৩; খ.৭, পৃ. ৩৩২

৭২. আল বায়হাকী, *আস-সুনান আল- কুবরা*, হা.নং : ১৫৯৭০, ১৫৯৯৫; আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং : ১৪৪৭; ইবনু হিব্বান, *আস-সহীহ*, হা.নং : ৬৫৫৯

৭৩. তাদের কারো কারো মতে- প্রতিটি নাসারন্ধ্রের জন্য দিয়াত ওয়াজিব হবে। তবে মধ্যবর্তী অন্তরালের জন্য বিচারকের সুবিবেচনা প্রসূত রায়ই কার্যকর হবে। (আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ.৮৪)

৭৪. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ.৬৮;আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ৩২৩-৪; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৬, পৃ.১২৯-১৩০; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ. ৩৪৭-৯; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ.১২৭-২৮; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ.৬, পৃ.২৫

পঞ্চাশটি উট বা তার সমতুল্য মূল্য) এবং দু'কানের বেলায় পূর্ণ দিয়াত (অর্থাৎ একশতটি উট অথবা তার সমপরিমাণ মূল্য)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, و في الأذن خمسون من الإبل. - "এক কানের দিয়াত পঞ্চাশটি উট।"[৭৫]

কারো একটি কান আগে থেকেই অকেজো এবং অপর একটি কান ভাল ছিল, এ অবস্থায় সুস্থ কানটির ক্ষতিসাধন করলে পূর্ণ দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে।

কান বিদ্যমান রেখে তার কার্যক্ষমতা পুরো নষ্ট করে দেয়া হলেও উপর্যুক্ত নিয়মে দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। কানের কার্যক্ষমতা আংশিক নষ্ট হয়ে গেলে ক্ষতির অনুপাতে দিয়াত নির্ধারণ করা হবে। যদি ক্ষতির অনুপাত নির্ধারণ করা দুরূহ হয়, তাহলে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী দিয়াত নির্ধারণ করবেন। মালিকীগণের মতে- কান উৎপাটন বা কর্তনের কারণে কেবল শ্রবণশক্তি নষ্ট হলেই নির্দিষ্ট পরিমাণ দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে এবং শ্রবণশক্তি নষ্ট না হলে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী দিয়াত নির্ধারণ করবেন।[৭৬]

ওষ্ঠের দিয়াত ঃ

ওষ্ঠ কর্তনের বেলায় কোন কারণে কিসাস কার্যকর করা সম্ভব না হলে তার আরশ হবে এক ওষ্ঠের বেলায় পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক এবং দু ওষ্ঠের বেলায় পূর্ণ দিয়াত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, و في الشفتين الدية. - "দু ওষ্ঠের জন্য পূর্ণ দিয়াত।"[৭৭] ওষ্ঠ -উপরের হোক বা নিম্নের, ছোট হোক বা বড়- দুটিই সমান। তবে সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (রহ) ও যুহরী (রহ) প্রমুখের মতে- উপরের ওষ্ঠের চাইতে নিচের ওষ্ঠের উপকারিতা ও কার্যকারিতা যেহেতু বেশি, তাই উপরের ওষ্ঠের জন্য এক-তৃতীয়াংশ এবং নিচের ওষ্ঠের জন্য দু-তৃতীয়াংশ দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে।[৭৮]

---

৭৫. ইবনু হাজার আল আসকালানী, *তালখীছ..*, হা.নং : ১৭০৮; 'উমর আল-আনসারী, *খুলাসাতুল বাদরিল মুনীর*, হা.নং : ২২৫৭

৭৬. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ. ৩৪৪-৬; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ.৭০; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ.১০, পৃ. ৮২, ৮৭, ৯০-১; মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ.৫৬৩; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ.৮৫

৭৭. আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং : ১৪৪৭; ইবনু হিব্বান, *আস-সহীহ*, হা.নং : ৬৫৫৯; বায়হাকী, *আস-সুনান আল- কুবরা*, হা.নং : ১৬০৪৫

৭৮. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৩৪৯; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ.৬৮-৯; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.১০, পৃ. ২৭৯-২৮১

ওষ্ঠ বিদ্যমান রেখে তার কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয়া হলেও উপর্যুক্ত নিয়মে দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে।

দাঁতের দিয়াত ঃ

দাঁত উৎপাটন বা ভাঙ্গার ক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর করা সম্ভব না হলে তার আরশ হবে প্রতিটি দাঁতের জন্য পূর্ণ দিয়াতের বিশ ভাগের একভাগ (অর্থাৎ পাঁচটি উট বা সমতুল্য মূল্য)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, و في السن خمس من الإبل. - "প্রতিটি দাঁতের দিয়াত পাঁচটি উট।"[৭৯] কারো ৩২টি দাঁতই উৎপাটন করা হলে তার আরশ হবে ১.৬ দিয়াত (অর্থাৎ একটি পূর্ণ দিয়াত এবং অতিরিক্ত পাঁচভাগের তিনভাগ)। দাঁত বিদ্যমান রেখে তার কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয়া হলেও উপর্যুক্ত নিয়মে দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। কারো ৩২-এর অধিক দাঁত থাকলে ঐ অতিরিক্ত দাঁতের জন্য বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী দিয়াত ধার্য করবেন।[৮০]

জিহ্বার দিয়াত ঃ

যদি কোন কারণে জিহ্বায় কিসাস কার্যকর করা সম্ভব না হয়, তা হলে তার আরশ হবে পূর্ণ দিয়াত অর্থাৎ একশতটি উট অথবা তার সমপরিমাণ মূল্য। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, و في اللسان الدية. - "জিহ্বাতেও পূর্ণ দিয়াত।"[৮১] জিহ্বা আংশিক কর্তন করলে এবং এর ফলে জিহ্বার কার্যক্ষমতা (অর্থাৎ স্বাদ আস্বাদন শক্তি বা কথা বলার শক্তি) পুরো নষ্ট হয়ে গেলেও পূর্ণ দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। তবে জিহ্বার অংশবিশেষ কর্তন করার ফলে জিহ্বার কার্যক্ষমতার আংশিক নষ্ট হয়ে গেলে কিংবা জিহ্বা বিদ্যমান রেখে তার কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয়া হলে ক্ষতির পরিমাণ অনুপাতে দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। যদি ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা দুরূহ হয়, তা হলে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী দিয়াতের পরিমাণ ধার্য করবেন।[৮২]

---

৭৯. মালিক, *আল-মু'আত্তা,* (কিতাবুল 'উকূল), হা.নং : ১৫৫৫; বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা,* হা.নং : ১৫৯৭০

৮০. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী,* খ.৮, পৃ.৩৫৩-৪; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত,* খ.২৬, পৃ.৭১-২; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম,* খ.৬, পৃ.১৩৫-৬

৮১. আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবুয যাকাত), হা.নং : ১৪৪৭; ইবনু হিব্বান, *আস-সহীহ,* হা.নং : ৬৫৫৯; বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা,* হা.নং : ১৫৯৭০

৮২. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী,* খ.৮, পৃ.৩৪৯-৫২; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত,* খ.২৬, পৃ.৭১-২; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার,* খ.৬, পৃ.৫৭৯

উল্লেখ্য যে, জিহ্বা কর্তনের ফলে স্বাদ আস্বাদন শক্তি ও বাকশক্তি- দুটিই নষ্ট হয়ে গেলে প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক পূর্ণ দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে।[৮৩]

পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডের দিয়াত ঃ

গোড়া থেকে পুরুষাঙ্গ কর্তন করা হলে কিংবা তার পুরো অগ্রভাগ কর্তন করা হলে তার আরশ হবে পূর্ণ দিয়াত অর্থাৎ একশতটি উট অথবা তার সমপরিমাণ মূল্য, যদি কোন কারণে কিসাস কার্যকর করা সম্ভব না হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, و في الذكر الدية. - "পুরুষাঙ্গেও পূর্ণ দিয়াত।"[৮৪]

পুরুষাঙ্গের মাথার অংশবিশেষ কর্তন করলেও দিয়াত ওয়াজিব হবে। পুরুষাঙ্গের মাথার কর্তনের পরিমাণ অনুপাতে এর দিয়াত ধার্য করা হবে।[৮৫]

অণ্ডের বেলায়ও কোন কারণে কিসাস কার্যকর করা সম্ভব না হলে তার আরশ হবে এক অণ্ডের বেলায় পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক এবং দু অণ্ডের বেলায় পূর্ণ দিয়াত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, و في البيضتين الدية. - "অণ্ডদ্বয়েও পূর্ণ দিয়াত।"[৮৬] একসাথে পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডদ্বয় কর্তন করা হলে কিংবা প্রথমে পুরুষাঙ্গ, তার পর অণ্ডদ্বয় কর্তন করা হলে দুটি পূর্ণ দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে।[৮৭]

অনুরূপভাবে পুরুষাঙ্গকে বিদ্যমান রেখে তার কার্যক্ষমতা পুরো নষ্ট করে দেয়া হলেও পূর্ণ দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। পুরুষাঙ্গের কার্যক্ষমতা আংশিক নষ্ট হয়ে গেলে ক্ষতির অনুপাতে দিয়াত নির্ধারিণ করা হবে। যদি ক্ষতির অনুপাত নির্ধারণ

---

৮৩. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত,* খ.২৬, পৃ.৬৯; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার,* খ.৬, পৃ.৫৭৬; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক,* খ.৮, পৃ.৩৭৭

৮৪. আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবুয যাকাত), হা.নং : ১৪৪৭; ইবনু হিব্বান, *আস-সহীহ,* হা.নং : ৬৫৫৯; বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা,* হা.নং : ১৫৯৭০

৮৫. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত,* খ.২৬, পৃ.৬৯; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক,* খ.৮, পৃ.৩৭৬; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী,* খ.৮, পৃ.৩৬১-২; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম,* খ.৬, পৃ. ১৩০-১

৮৬. আল বায়হাকী, *আস-সুনান আল- কুবরা,* হা.নং : ১৬০৯৬

৮৭. তবে প্রথমে অণ্ডদ্বয়, তারপর পুরুষাঙ্গ কাটা হলে হানাফী ইমামগণ এবং অধিকাংশ হাম্বলীর মতে- অণ্ডদ্বয়ের জন্য পূর্ণ দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে এবং পুরুষাঙ্গের জন্য বিচারক সুবিবেচনা অনুযায়ী দিয়াত ধার্য করবেন। তবে শাফি'ঈগণের মতে- এমতাবস্থায় দুটি দিয়াত এবং মালিকীগণের মতে-এ দুটি অঙ্গ পর পর কর্তন করা হলে এবং তা যে ভাবেই হোক- একটি দিয়াতই বাধ্যতামূলক হবে। (ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার,* খ.৬, পৃ.৫৭৭; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক,* খ.৮, পৃ.৩৭৭; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী,* খ.৮, পৃ.৩৬১)

করা দুরূহ হয়, তাহলে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী দিয়াত নির্ধারণ করবেন।[৮৮]

খোজা ও নপুংসকের পুরুষাঙ্গ কর্তন করা হলে বিচারক সুবিবেচনা অনুযায়ী দিয়াত ধার্য করবেন।[৮৯]

নারী ও পুরুষের স্তনের দিয়াত ঃ

নারীর স্তন কর্তনের আরশ হল একটির ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক এবং দুটির ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়াত। স্তনের বোঁটা কর্তন করলে এবং কোন কারণে কিসাস কার্যকর করা সম্ভব না হলে উপর্যুক্ত নিয়মে দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। মালিকীগণের মতে- স্তনের বোঁটা কর্তনের পর দুধ নির্গমন ব্যাহত বা বন্ধ হলেই দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। অন্যথায় বিচারক সুবিবেচনা অনুযায়ী তার দিয়াত ধার্য করবেন।[৯০]

স্তন বিদ্যমান রেখে তার কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয়া হলেও উপর্যুক্ত নিয়মে দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে।

পুরুষের স্তন যেহেতু কেবল সৌন্দর্য বর্ধক, তার অন্য কোন কার্যকারিতা নেই, তাই অধিকাংশ ইমামের মতে তা কর্তনের জন্য নির্ধারিত দিয়াতের বিধান প্রযোজ্য হবে না। বিচারক সুবিবেচনা অনুযায়ী তার আরশ ধার্য করবেন। তবে হাম্বলীগণেল মতে- নারীদের মত পুরুষদের স্তনের জন্যও দিয়াতের বিধান প্রযোজ্য হবে।[৯১]

গুহ্যদ্বার, মূত্রনালী ও যৌনাঙ্গের দিয়াত ঃ

গুহ্যদ্বার, মূত্রনালী ও যৌনাঙ্গের পূর্ণ ক্ষতি সাধনের ক্ষেত্রেও প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক দিয়াত ওয়াজিব হবে।[৯২] কোন ব্যক্তি কোন নারীর পায়খানা ও পেশাবের নির্গমন পথ পরস্পর মিলিয়ে দেওয়ার ফলে পায়খানা বা পেশাবের

---

৮৮. আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.৬৪; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৮, পৃ.৩৭৭

৮৯. এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। শাফি'ঈগণের মতে- খোজা ও নপুংসকের পুরুষাঙ্গের বেলায়ও পূর্ণ দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। (আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ.৮০; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৩৬১)

৯০. আল-বাবরতী, *আল-'ইনায়াহ*, খ.১০, পৃ.২৮৩; মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ.৫৬৬; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৩৫৯

৯১. *তদেব*

৯২. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৩৫৯; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৮, পৃ.৩৫০; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৬, পৃ.৫৭৭

কোন একটির প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেলে পূর্ণ দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে এবং দুটির প্রতিরোধ ক্ষমতা পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেলে দুটির জন্য পৃথক পৃথকভাবে পূর্ণ দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে।[৯৩]

নারীর যৌনাঙ্গের দুপার্শ্বের স্ফীত গোশতখণ্ড কর্তন কিংবা ক্ষতিসাধন করলে এবং এর ফলে যৌনাঙ্গের হাড় প্রকাশ পেলে এক পার্শ্বের জন্য পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক এবং দু পার্শ্বের জন্য পূর্ণ দিয়াত ওয়াজিব হবে।[৯৪] বর্ণিত আছে যে, হযরত 'উমার (রা) যৌনাঙ্গের স্ফীত গোশতখণ্ডদ্বয় কর্তনের জন্য দিয়াত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৯৫]

মেরুদণ্ডের দিয়াত ঃ

মেরুদণ্ডে আঘাতের ফলে বাঁকা হয়ে গেলে অথবা বীর্য নির্গমন বন্ধ হয়ে গেলে কিংবা স্ত্রী সহবাস করতে অসমর্থ হলে পূর্ণ দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, و في الصلب الدية. - "মেরুদণ্ডের জন্য পূর্ণ দিয়াত।"[৯৬] হাম্বলীগণের মতে- মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেলে যে কোন অবস্থায় দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে।[৯৭]

চোয়ালের দিয়াত ঃ

শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে- চোয়ালের [৯৮] আরশ হল একটির ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক এবং দুটির ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়াত। চোয়াল দুটির সাথে দাঁতগুলোও উৎপাটন করা হলে চোয়াল দুটির জন্য একটি পূর্ণ দিয়াত এবং দাঁতগুলোর জন্য আলাদা দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। চোয়ালের দিয়াতের মধ্যে দাঁতগুলোর দিয়াত শামিল হবে না। হানাফীগণের মধ্যে ইমাম যায়ল'ঈ

---

৯৩. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৬, পৃ.৫৭৯

৯৪. এটা মালিকী, শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের অভিমত। এ বিষয়ে হানাফীগণের কোন স্পষ্ট বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যায় নি। (ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৩৬৬; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ.৮০)

৯৫. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.২১, পৃ.৭৫

৯৬. আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং : ১৪৪৭; ইবনু হিব্বান, *আস-সহীহ*, হা.নং : ৬৫৫৯; বায়হাকী, *আস-সুনান আল- কুবরা*, হা.নং : ১৫৯৭০

৯৭. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ.৬৯; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৩৬০; আল-বহুতী, *কাশশাফ*, খ.৬, পৃ.৪৭-৮

৯৮. চোয়াল দ্বারা নিচের দন্তপাটির দুদিকের দুটি হাড়কে বোঝানো হচ্ছে। এ দুটি থুতনিতে এসে মিলিত হয়।

(রহ) বলেন, চোয়াল যেহেতু চেহারারই অংশ, তাই এর জন্য মুখ ফেটে ফেলার বিধানই প্রযোজ্য হবে।[৯৯]

পাছার দিয়াত ঃ

পাছার গোশত সম্পূর্ণ তুলে নেয়া হলে তার আরশ হল একটির ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক এবং দুটির ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়াত। তবে গোশত সম্পূর্ণ তুলে না নেয়া হলে এবং ক্ষতির পরিমাণ জানা গেলে ক্ষতির অনুপাতে দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। অন্যথায় বিচারক সুবিবেচনা অনুযায়ী আরশ ধার্য করবেন। এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে মালিকী মাযহাবের ইবনুল কাসিম (রহ) ও ইবনু ওয়াহাব (রহ) প্রমুখ ইমামগণের মতে- পাছার জন্য নির্ধারিত দিয়াতের বিধান প্রযোজ্য নয়; বরং বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী আরশ ধার্য করবেন।[১০০]

চুলের দিয়াত ঃ

চুল মানুষের দেহের সৌন্দর্যবর্ধক। তা উৎপাটন করা হলে সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে চুলের উৎপাটনেও দিয়াত ওয়াজিব হবে। মাথার চুল বা দাড়ি উৎপাটন করা হলে এবং তা পুনরায় না গজালে পূর্ণ দিয়াত ওয়াজিব হবে। ভ্রুর চুল উৎপাটন করলে এবং তা পুনরায় না গজালে দু'ভ্রুর ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়াত এবং এক ভ্রুর ক্ষেত্রে অর্ধেক দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। তবে গোঁফ উৎপাটন করলে এবং তা পুনরায় না গজালে বিচারক সুবিবেচনা অনুযায়ী তার দিয়াত ধার্য করবেন। এটা হানাফী ও হাম্বলীগণের অভিমত। মালিকী ও শাফি'ঈগণের মতে- উপর্যুক্ত যে কোন স্থানের চুল উৎপাটনের ক্ষেত্রে বিচারক সুবিবেচনা অনুযায়ী তার দিয়াত ধার্য করবেন।[১০১]

ত্বকের দিয়াত ঃ

কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অপর কারো দেহের ত্বক এমনভাবে উৎপাটন বা কর্তন করল যে, তাতে তার মৃত্যু ঘটেনি এবং আক্রান্ত স্থানে লোমও গজায়নি,

---

৯৯. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৩৫৬-৭; গানিম, *মাজমা'উ দিমানাত*, পৃ.১৬৭; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৬, পৃ.১৩০

১০০. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৩৫৯-৩৬০; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৮, পৃ.৩৫০; আলবাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ.৮৫; আল-মাওয়াক, *আত-তাজ..*, খ.৮, পৃ.৩৪২

১০১. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ.৭১-২; আল-বাবরতী, *আল-'ইনায়াহ*, খ.১০, পৃ.২৮১-২; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৩৪৬-৭; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ. ১৩৩; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.৫৩

এ রূপ অবস্থায় বিচারক সুবিবেচনা অনুযায়ী তার দিয়াত ধার্য করবেন। তাছাড়া বিচারক প্রয়োজন মনে করলে অপরাধীকে তা'যীরের আওতায় অন্য যে কোন শাস্তিও দিতে পারবে। তবে মুখের ত্বক উৎপাটনের ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে।[১০২]

বোধশক্তি বিলোপ করার দিয়াত ঃ

বোধশক্তি বা চেতনা শক্তিই মানুষের আসল সম্পদ। যে ব্যক্তিকে বোধশক্তিহীন করা হয়েছে সে মূলত মৃতব্যক্তির মতই। তার কোন কিছু করার যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে না। তাই আঘাতের কারণে কিংবা অন্য যে কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির বোধ শক্তি পুরো নষ্ট হয়ে গেলে অপরাধীর ওপর পূর্ণ দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, و في العقل الدية. - "বোধ শক্তি বিলোপের জন্য পূর্ণ দিয়াত।"[১০৩] তবে বোধ শক্তি পুরো নষ্ট না হলে ক্ষতির পরিমাণ অনুপাতে দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। যদি ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা দুরূহ হয়, তা হলে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী আরশ ধার্য করবেন।[১০৪]

প্রত্যঙ্গের দিয়াত অঙ্গের দিয়াতের মধ্যে শামিল হবেঃ

কোন ব্যক্তি অপর কারো অঙ্গের প্রত্যঙ্গসমূহ কর্তন বা ভাঙ্গার পর সংশ্লিষ্ট অঙ্গটি কর্তন করলে বা ভেঙ্গে ফেললে বা অকেজো করে দিলে অপরাধীর ওপর কেবল অঙ্গের জন্য নির্ধারিত দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে।[১০৫] যেমন কেউ কারো প্রথমে হাতের আঙ্গুল কর্তন করল, অতঃপর হাত কর্তন করল, এরূপ অবস্থায় পৃথক পৃথকভাবে দিয়াত ধার্য হবে না; বরং হাতের জন্য নির্ধারিত দিয়াত প্রদানই বাধ্যতামূলক হবে।

খ. যখমের দিয়াত

যখমের প্রকারভেদ ঃ

১. জা'ইফাহ (جائفة) ঃ যে আঘাত দেহের অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। গলার নিম্নাংশ থেকে উরুসন্ধির মধ্যকার আঘাত জা'ইফার অন্তর্ভুক্ত। যেমন

---

১০২. গানিম, *মাজমা'উ দিমানাত*, পৃ.১৭০; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.৫৮
১০৩. আল বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং : ১৬০০৪
১০৪. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.১০, পৃ.২৮০-১; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৩৬৩-৪; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ.৮৭
১০৫. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ৩২৪

বক্ষদেশ, পেট, পিঠ, পার্শ্বদ্বয় এবং অণ্ডকোষ ও পাছার মধ্যবর্তীস্থান। দু'হাত, দু'পা, গলা ও ঘাড়ের যখম জা'ইফাহ রূপে গণ্য হবে না।[১০৬]

২. গায়র জা'ইফাহ (غير جائفة) ঃ যে আঘাত দেহের অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত পৌঁছে না। 'শিজাজ' ও 'জাই'ফাহ' বহির্ভূত দেহের অন্যান্য স্থানের আঘাত সাধারণত 'গায়র জা'ইফাহ'-এর অন্তর্ভুক্ত। দেহের গোশত ফেটে যাওয়া, হাড় অনাবৃত হয়ে পড়া বা ভেঙ্গে যাওয়া ইত্যাদি এ শ্রেণীভুক্ত।[১০৭]

জা'ইফাহ-এর শাস্তি ঃ

জা'ইফার ক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর করা যাবে না। কেননা হাড়ের মতই এ ধরনের আঘাতেও কিসাস নিতে গেলেই সীমালঙ্ঘনের আশঙ্কা থাকে। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لا قود في المأمومة و لا الجائفة و لا المنقلة. - "মা'মূমাহ, জা'ইফাহ ও মুনাক্কিলাহতে কিসাস নেই।"[১০৮]

জা'ইফার শাস্তি হল 'আরশ'। এর পরিমাণ হল দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ। তাছাড়া বিচারক সুবিবেচনা অনুযায়ী তা'যীরের আওতায় আহত ব্যক্তির চিকিৎসা খরচসহ অন্য যে কোন সাধারণ দণ্ড দিতে পারবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, في الجائفة ثلث الدية. - "জা'ইফার দিয়াত হবে পূর্ণ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ।"[১০৯]

প্রতিটি জা'ইফার জন্য পৃথক পৃথকভাবে এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। এমনকি এ জাতীয় একটি আঘাত দেহের অন্য অঙ্গে সংক্রমিত হলে তা দুটি জা'ইফাহ হিসেবে গণ্য হবে এবং দু-তৃতীয়াংশ দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। এরূপ আঘাতের ফলে কেউ মারা গেলে অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড হবে।[১১০]

গায়র জা'ইফার প্রকারভেদ ঃ

১. আদ-দামিয়াহ (الدامية) ঃ যে আঘাতে দেহের চামড়া কেটে রক্ত নির্গত হয়।

২. আল-বাদি'আহ (الباضعة) ঃ যে আঘাতে দেহের গোশত কেটে বা চিরে যায়; কিন্তু হাড় অনাবৃত হয় না।

---

১০৬. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ. ২৯৬; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৩৭০-১

১০৭. *তদেব*

১০৮. ইবনু মাজাহ, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ২৬৩৭

১০৯. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং : ২৭০৭৫; 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং : ১৭৬১৯

১১০. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ.৭৪-৫; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৩১৮-৯; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ. ৩৭০-১; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ.৬, পৃ.৮৪

৩. আল-মুতলাহিমাহ (المتلاحمة) ঃ যে আঘাতে দেহের গোশত ছিন্ন হয়ে যায়।

৪. আল-মুদিহাহ (الموضحة) ঃ যে আঘাতে দেহের গোশত কেটে হাড় অনাবৃত হয়ে যায়।

৫. আল-হাশিমাহ (الهاشمة) ঃ যে আঘাতে দেহের হাড় ভেঙ্গে যায়; কিন্তু স্থানচ্যুত হয় না।

৬. আল-মুনাক্কিলাহ (المنقلة) ঃ যে আঘাতে দেহের হাড় ভেঙ্গে স্থানচ্যুত হয়ে যায়।[১১১]

গায়র জা'ইফাহ-এর শাস্তি ঃ

গায়র জা'ইফার নিধার্রিত 'আরশ' নেই। তাই এ ক্ষেত্রে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী দিয়াতের পরিমাণ ধার্য করবে এবং তা'যীরের আওতায় আঘাতের প্রকৃতি অনুযায়ী অপরাধীকে চিকিৎসা খরচ বহনসহ অন্য যে কোন সাধারণ দণ্ড দিতে পারবে। এটা হানাফীগণের অভিমত। তাঁদের মতানুযায়ী মুখমণ্ডল ও মাথা ছাড়া দেহের অন্য জায়গার আঘাতের জন্য কিসাস ওয়াজিব হবে না। শাফি'ঈগণের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী 'মুদিহাহ'র ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব হবে। তাঁদের মতানুযায়ী দেহের যে কোন স্থানের আঘাতের জন্য কিসাস প্রযোজ্য হবে, যদি আঘাত হাড় পর্যন্ত পৌঁছে থাকে; কিন্তু তা ভেঙ্গে যায়নি। মালিকীগণের মতে, বিপদের আশঙ্কা না থাকলে দেহের যে কোন আঘাতের জন্য কিসাস প্রযোজ্য হবে, এমনকি 'হাশিমাহ'র ক্ষেত্রেও অর্থাৎ হাড় ভেঙ্গে গেলেও। এ কারণে তাঁদের মতানুযায়ী বক্ষ, ঘাড়, পিঠ ও উরু প্রভৃতি অঙ্গের হাড়গুলোতে বদলা নেয়া যাবে না। অন্যান্য হাড় ভাঙ্গার জন্য কিসাস প্রযোজ্য হবে।[১১২]

গ. শিজাজ (মুখমণ্ডলে আঘাত করা বা মাথা ফাটানো)-এর দিয়াত

শিজাজের প্রকারভেদ ঃ

১. আল-হারিসাহ (الحارصة) ঃ যে আঘাতে চামড়া আহত হয়; কিন্তু রক্ত প্রবাহিত হয় না।

২. আদ-দামিয়াহ (الدامية) ঃ যে আঘাতে চোখের রক্ত প্রবাহিত হয়।

---

১১১. *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন* (সংকলন), খ.১, পৃ. ২৭৩

১১২. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.১৬, পৃ. ৮১-২; আদ-দাসূকী, *আল-হাশিয়াতু..*, খ.২, পৃ. ১১১-২

৩. আদ-দামি'আহ (الدامعة) ঃ যে আঘাতে চোখের পানির মত রক্ত বের হলেও তা প্রবাহিত হয় না।

৪. আল-বাদি'আহ (الباضعة) ঃ যে আঘাতে চামড়া কেটে যায়।

৫. আল-মুতলাহিমাহ (المتلاحمة) ঃ যে আঘাতে গোশত কেটে যায়; কিন্তু পরে মিলিত হয়ে জোড়া লেগে যায়।

৬. আস-সিমহাক (السمحاق) ঃ যে আঘাত মস্তকের হাড়ের উপরিভাগের ঝিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে; কিন্তু তা ছিন্ন হয় না।

৭. আল-মুদিহাহ (الموضحة) ঃ যে আঘাত মস্তকের হাড়ের উপরিভাগের ঝিল্লি কেটে হাড় প্রকাশ পায়।

৮. আল-হাশিমাহ (الهاشمة) ঃ যে আঘাতে হাড় ভেঙ্গে যায়; কিন্তু স্থানচ্যুত হয় না।

৯. আল-মুনাক্কিলাহ (المنقلة) ঃযে আঘাতে দেহের হাড় ভেঙ্গে স্থানচ্যুত হয়ে যায়।

১০. আল-মা'মূমাহ (المامومة) ঃ যে আঘাতে মাথার খুলি ফেটে যায় এবং ক্ষত মগজের ঝিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

১১. আদ-দামিগাহ (الدامغة) ঃ যে আঘাতে মগজের ঝিল্লি ফেটে যায় এবং ক্ষত মগজ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।[১১৩]

শিজাজের শাস্তি [১১৪]ঃ

- হারিসাহ, দামি'আহ ও দামিয়াহ প্রভৃতি আঘাতের নিধারিত 'আরশ' নেই। তাই এ সব ক্ষেত্রে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী দিয়াতের পরিমাণ ধার্য করবে।
- বাদি'আহ, মুতলাহিমা ও সিমহাক প্রভৃতি আঘাতের ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব হবে। কেননা এ সব আঘাতের ক্ষেত্রে কোন রূপ সীমালঙ্ঘন ছাড়া সমপরিমাণ বদলা নেয়া যায়।[১১৫] এটা হানাফী ও মালিকীগণের অভিমত। তবে শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে এ সব ক্ষেত্রে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী দিয়াতের পরিমাণ ধার্য করবে।

---

১১৩. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.২৯৬; যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৬, পৃ.১৩২; আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, পৃ.২৯১-২; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.২৩

১১৪. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৩১৬-৮; যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৬, পৃ.১৩২; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ. ২৫৬-৭; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.৫০; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, খ.৭, পৃ.৮৭-৯১

১১৫. তবে কোন কারণে কিসাস কার্যকর সম্ভব না হলে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী দিয়াতের পরিমাণ ধার্য করবেন।

- মুদিহার ক্ষেত্রে যেহেতু কোন রূপ সীমালঙ্ঘন ছাড়াই সমান বদলা নেয়া সম্ভব, মাথার হাড় পর্যন্ত সহজেই ছুরি পৌঁছানো যায়, তাই এ জাতীয় আঘাতের বেলায় কিসাস কার্যকর করাই হল মূল বিধান। এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিসাসের নির্দেশ দিয়েছেন।[১১৬] তবে কোন কারণে কিসাস কার্যকর করা সম্ভব না হলে আহত ব্যক্তিকে 'আরশ' বাবদ পাঁচটি উট বা তার সমপরিমাণ মূল্য প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন و في الموضحة خمس من الإبل. - "মুদিহাহর বেলায় দিয়াত হল পাঁচটি উট।"[১১৭]

- হাশিমাহ, মুনাক্কিলাহ, মা'মূমাহ ও দামিগাহর ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটার আশঙ্কা থাকে বিধায় এ সব ক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর করা যাবে না। এর পরিবর্তে 'আরশ' বাবদ হাশিমাহর ক্ষেত্রে ১০টি উট[১১৮], মুনাক্কিলাহর ক্ষেত্রে ১৫টি উট এবং মা'মূমাহর ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ বা তার সমপরিমাণ মূল্য প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, و في المنقلة خمس عشرة من الإبل. و في المأمومة ثلث الدية. - "মুনাক্কিলাহর বেলায় দিয়াত হল পনেরটি উট এবং মা'মূহার বেলায় এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত।"[১১৯] মাওয়ার্দী বলেন, মা'মুহার জন্য বিচারক এক-তৃতীয়াংশ দিয়াতের সাথে তা'যীরের আওতায় অতিরিক্ত আরশও ধার্য করবেন।[১২০]

- দামিগাহর ক্ষেত্রেও পূর্ণ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ বা তার সমপরিমাণ মূল্য প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। কোন কোন শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামের মতে- এ ধরনের আঘাত মারাত্মক ও জীবনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হবার কারণে এ ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ

---

১১৬. ইবনু হাজার আল আসকালীন, *আদ-দিরায়াহ,* (কিতাবুয যবা'ইহ), হা.নং : ১০৩৩; আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়াহ,* খ.৪, পৃ.১৮২

১১৭. আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবুয যাকাত), হা.নং : ১৪৪৭; আল বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা,* হা.নং : ১৫৯৬৭

১১৮. এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। মালিকীগণের মধ্যে এ বিষয়ে মতবিরোধ দেখা যায়, কারো কারো মতে- এর দিয়াত হল ১৫টি উট, আবার কারো মতে- হাশিমার ক্ষেত্রে নির্ধারিত দিয়াত নেই। বিচারকই তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী আরশ ধার্য করবেন।

১১৯. আল বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা,* হা.নং : ১৫৯৮২-৫; আবদুর রযযাক, *আল-মুছান্নাফ,* হা.নং : ১৭৩৫৭, ১৭৩৬৭

১২০. আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ,* পৃ.২৯২

দিয়াতের সাথে তা'যীরের আওতায় বিচারক অতিরিক্ত আরশও ধার্য করবেন।

এক সাথে দিয়াতযোগ্য কয়েকটি অপরাধের শাস্তি ঃ

মূলনীতি হল- এক সাথে মানবদেহের বিরুদ্ধে দিয়াতযোগ্য যে ক'টি অপরাধ সংঘটিত হবে, প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক দিয়াত ওয়াজিব হবে, যদি আহত ব্যক্তি মারা না যায়।[১২১] আর যদি আহত ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে সব ক'টি অপরাধের দিয়াত প্রাণহানির দিয়াতের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে এবং এর জন্য একটি মাত্র দিয়াত ওয়াজিব হবে।

উপর্যুক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে ইসলামী আইনতত্ত্ববিদদের অভিমত হল- মানবদেহের যে কোন অঙ্গের যখম ভাল ও সুস্থ হয়ে না ওঠলে মৃত্যু পর্যন্ত দেহের ঐ অঙ্গে যে ক'টি অপরাধ হবে, তা সবই প্রাণের দিয়াতের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে, যদি অপরাধী একজনই হয়। অতএব, কেউ ভুলবশত কারো দুটি হাত কেটে ফেলল এবং আহত ব্যক্তি এ যখম থেকে ভাল হবার আগেই যদি অপরাধী পুনরায় ভুলবশত তাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে একটি মাত্র দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। অনুরূপভাবে কেউ ভুলবশত কারো সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলল, অতঃপর ভুলবশত তাকে হত্যা করল অথবা আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় মারা গেল, তাহলেও একটি মাত্র দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে।

পক্ষান্তরে মানবদেহের যে কোনের অঙ্গের যখম ভাল ও সুস্থ হয়ে ওঠার পর ঐ অঙ্গে অন্য যখম করা হলে প্রত্যেকটি যখমের জন্য পৃথক পৃথক দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে। অতএব কেউ যদি কারো নাক কেটে ফেলে এবং এর ক্ষত শুকিয়ে যাবার পর আবার যদি সে নাকের ঘ্রাণশক্তি নষ্ট করে, তাহলে তার ওপর দুটি পূর্ণ দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। অনুরূপভাবে কেউ কারো দুটি হাত ও দুটি পা কর্তন করে ফেলল; কিন্তু আহত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে ওঠল; এর প্রতিক্রিয়ায় মারা গেল না, তাহলে অপরাধীর ওপর দুটি দিয়াতই বাধ্যতামূলক হবে।

---

১২১. যেমন- কারো দুটি পা ও দুটি হাত কর্তন করা হলে এবং সে মারা না গেলে অপরাধীর ওপর দুটি পূর্ণ দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। অনুরূপভাবে কাউকে আঘাত করে তার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট করা হলে তিনটি পূর্ণ দিয়াত ওয়াজিব হবে। বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত 'উমার (রা)-এর আমলে জনৈক ব্যক্তি অন্য একজনের দিকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল। এর ফলে তার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাকশক্তি ও বোধশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয় যায়। হযরত 'উমার (রা) এ চারটি শক্তি নষ্ট করার কারণে একত্রে চারটি দিয়াত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। (আল বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং : ১৬১০৫; ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং : ২৭৩৫০)

তবে অপরাধের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হলে (যেমন- একটি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং অন্যটি ভুলবশত সংঘটিত হলে) অথবা অপরাধের ক্ষেত্র আলাদা আলাদা হলে (যেমন- হাত ও পা) যদি মাঝখানে সুস্থও না হয় কিংবা যখম সংক্রমিত হয়ে অন্য অঙ্গ আক্রান্ত হলে বা দেহের কোন রূপ ক্ষতি হলে প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য পৃথক পৃথক সংশ্লিষ্ট বিধান প্রযোজ্য হবে। অতএব কোন ব্যক্তি ভুলবশত কারো হাত কেটে ফেলল, অতঃপর আহত ব্যক্তি যখম থেকে সেরে ওঠার আগেই সে ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে হত্যা করল অথবা প্রথমে ইচ্ছাকৃতভাবে হাত কাটল, অতঃপর ভুলবশত তাকে হত্যা করল অথবা ভুলবশত প্রথমে হাত কেটে ফেলল, ক্ষত শুকিয়ে ওঠার পর আবার ভুলবশত তাকে হত্যা করল অথবা প্রথমে ইচ্ছাকৃতভাবে হাত কেটে ফেলল, ক্ষত শুকিয়ে ওঠার পর আবার ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে হত্যা করল, তা হলে এ সকল অবস্থায় সংশ্লিষ্ট দুটি বিধানই কার্যকর করা বাধ্যতামূলক হবে।[১২২]

দিয়াত পরিশোধ করার দায়িত্ব কার?

১. অপরাধী

অপরাধ ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হলে এবং কোন রূপ সন্দেহ কিংবা অন্য কোন কারণে কিসাস কার্যকর করা সম্ভবপর না হলে অথবা অপরাধীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে অপরাধ প্রমাণিত হলে কিংবা আহত ব্যক্তি বা নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছ ও আক্রমণকারীর মধ্যে মালের বিনিময়ে সমঝোতা হলে দিয়াত বা সমঝোতার অর্থ কেবল অপরাধীর ওপরই বর্তাবে। তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগলদের অপরাধের দিয়াত পুরোই তাদের বংশের লোকদের ওপর আরোপিত হবে।[১২৩]

২. অপরাধীর বংশের লোকজন

ভুলবশত কিংবা প্রায় ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত অপরাধসমূহের দিয়াত -কম হোক বা বেশি[১২৪]- অপরাধীর বংশের প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ লোকদের ওপরই বর্তাবে।[১২৫]

---

১২২. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৩০২-৩; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৬, পৃ.১১৭-৮, ১৩৫

১২৩. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.২৫৫-৬; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৬, পৃ.১৭৭; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ. ৩০০-১; আল-বহুতী, *কশশাফ*, খ.৬, পৃ.৬২

১২৪. এটা হানাফী ও শাফি'ঈগণের অভিমত। পক্ষান্তরে মালিকী ও অধিকাংশ হাম্বলীগণের মতে- যদি দিয়াতের পরিমাণ পূর্ণ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশের চাইতে বেশি হয়, তবেই অপরাধীর বংশের লোকদেরকে দিয়াত আদায় করতে হবে। যদি দিয়াতের পরিমাণ পূর্ণ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ কিংবা তার চাইতে কম হয়, তাহলে অপরাধীকেই সম্পূর্ণ দিয়াত আদায় করতে হবে। (মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ.৫৭৩; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ. ৩০১-২; আল-বহুতী, *কশশাফ*, খ.৬, পৃ.৬২)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ হুযায়ল গোত্রের দু মহিলা বিবাদের এক পর্যায়ে একজন অপরজনকে উদ্দেশ্য একটি পাথরখণ্ড ছুঁড়ে মারল। এর ফলে সে মারা গেল এবং তার গর্ভও নষ্ট হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ঘটনায় হত্যাকারী মহিলাটির বংশের লোকদেরকে দিয়াত প্রদানের নির্দেশ দিলেন।[১২৬]

বংশের লোক (العاقلة) বলতে হত্যাকারীর 'আসাবা (অর্থাৎ বাপ, চাচা, ভাই, পুত্র ও প্রপৌত্র প্রভৃতি)-কে বোঝানো হয়েছে।[১২৭] হানাফীগণের মতে- হত্যাকারী যদি বেতনভুক কর্মজীবী হয়, তাহলে তার সহকর্মীদের ওপর দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে এবং তাদের বেতনের টাকা থেকে তিন বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক বৎসরের শেষে দিয়াতের অর্থ আদায় করা হবে।[১২৮] বর্ণিত আছে যে, হযরত 'উমার (রা) রাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বেতন কাঠামো চালু করার পর সহকর্মীদের ওপর দিয়াত আরোপ করতেন। যদি হত্যাকারী বেতনভুক কর্মজীবী না হয়, তা হলে তার বংশের লোকদের ওপরই দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে।[১২৯]

হানাফী ও মালিকীগণের মতে- বংশের একজন সদস্য হিসেবে অপরাধীর ওপরও দিয়াতের একটি অংশ পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক হবে। তবে শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে- ভুলবশত সংঘটিত অপরাধের জন্য অপরাধীর ওপর দিয়াতের অংশবিশেষ পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক নয়।[১৩০]

উল্লেখ্য যে, অপরাধীর বংশের লোকদের থেকে দিয়াতস্বরূপ তিন কি চার দিরহাম বা তার সমপরিমাণ অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা যাবে। এর অতিরিক্ত গ্রহণ করা সমীচীন নয়। তদুপরি এ অর্থ তাদের থেকে তিন বৎসরের মধ্যে এবং প্রত্যেক বৎসরের শেষান্তে ১ কিংবা ১.৩৩ দিরহাম অথবা এর সমপরিমাণ অর্থ আদায় করা হবে। কারণ এ অর্থ-সম্পদ অপরাধীর ওপর তার শাস্তি লঘুকরণের

---

১২৫. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.২৫৫; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৬, পৃ.১৭৭ ; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪,পৃ.৮৭

১২৬. সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ৬৫১২; সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল কাসামাহ..), হা.নং : ১৬৮১

১২৭. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.২৫৬; আল-বহুতী, *কশশাফ*, খ.৬, পৃ.৫৯

১২৮. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.২৫৬; ;যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৬, পৃ.১৭৭

১২৯. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.২৫৬; আল-জসসাস, *আহকামুল কুর'আন*, খ.৩, পৃ.১৯৫; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৬, পৃ.১৭৭

১৩০. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.২৫৬; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৬, পৃ.১৭৯; আল-বহুতী, *কশশাফ*, খ.৬, পৃ.৬১

উদ্দেশ্যে নিরেট সমবেদনার নিদর্শন হিসেবে তাদের থেকে গ্রহণ করা হয়। তাই অপরাধীর বংশের লোক থেকে এ অর্থ আদায় করার ক্ষেত্রে কোন রূপ কঠোরতা প্রদর্শন করা বিধেয় নয়। তদুপরি বংশের লোকজন অধিক হলে প্রত্যেকের প্রদেয় দিয়াতের পরিমাণ এর চাইতে কমও হতে পারে। তবে বংশের লোকজন কম হলে তার নিকটবর্তী বংশের লোকজন এবং সহকর্মীদের ওপরও দিয়াতের অর্থ পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক হবে।[১৩১]

বংশের লোকদের ওপর দিয়াত ওয়াজিব হবার রহস্য ঃ

দিয়াত প্রদান অপরাধীর ওপর বাধ্যতামূলক হবে- এটাই সাধারণ যুক্তির কথা। একজনের অপরাধের জন্য অন্যজন শাস্তি পাবে- এটা ইসলামের সাধারণ মূলনীতিরও পরিপন্থী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,.ألا تزر وازرة وزر أخرى - "কেউ অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না।"[১৩২] এ কারণে সম্পদের ক্ষতিপূরণ দান ও ইচ্ছাকৃত অপরাধের দিয়াত প্রদানের বেলায় বংশের লোকেরা একে অন্যের যে কোন রূপ দায়ভার গ্রহণ করা থেকে মুক্ত থাকে। কিন্তু ভুলবশত হত্যার বেলায় এ সাধারণ মূলনীতির ব্যত্যয় ঘটেছে। ইতঃপূর্বে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস ও খুলাফা রাশিদূনের কর্মনীতি এ ব্যত্যয়ের পক্ষে শক্তিশালী দলীল। এখন প্রশ্ন হল, এ ব্যত্যয়ের কারণ কি? ইমাম আল-বাহুতী আল-হাম্বলী (রহ) বলেন, "ভুলবশত অপরাধ তো সচরাচর প্রায় সংঘটিত হয়। অপরদিকে দিয়াতের পরিমাণও প্রচুর। এমতাবস্থায় ভুলের মাশুলরূপে হত্যাকারীর সম্পদেই যদি কেবল দিয়াত ওয়াজিব করা হয়, তাহলে তার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই তার এ কঠিন বিপদ মুহূর্তে তার প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন ও তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসা বংশের লোকদের একান্ত কর্তব্য। বস্তুত এ কারণে তাদের ওপর দিয়াত বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে- যা যুক্তিরও একান্ত দাবি।"[১৩৩] ইমাম আল-কাসানী আল-হানাফী (রহ) এ প্রসঙ্গে বলেন, "হত্যাকারীকে অপরাধ থেকে বারণ করা বংশের লোকদের একটি গুরু দায়িত্ব। যদি বংশের লোকেরা হত্যাকারীকে হত্যাকর্ম থেকে বারণ না করে, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, তারা অবশ্যই তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছে। আর দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন একটি গুরুতর অপরাধ। অতএব তাদের এ দায়িত্ব অবহেলার কারণেই

---

১৩১. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.২৫৬; যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৬, পৃ.১৭৮
১৩২. আল-কুর'আন, ৫৩ (সূরা আন-নাজম) ঃ ৩৮
১৩৩. আল-বহুতী, *কশশাফ*, খ.৬, পৃ.৬

তাদের ওপর দিয়াত বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে- যা যুক্তিরও একান্ত দাবি।"[১৩৪]

গ. জনপদবাসী

যদি কোন জনপদে কিংবা কোন সামষ্টিক মালিকানাভুক্ত জায়গায় কোন মরদেহ পাওয়া যায়; কিন্তু খুনী চিহ্নিত করা যাচ্ছে না; তবে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা উক্ত জনপদ বা জায়গার মালিকদের প্রতি হত্যার নিসবত করল, এমতাবস্থায় পূর্বোল্লেখিত শপথের নিয়ম পালনের পর জনপদবাসী বা জায়গার মালিকদের ওপর দিয়াত ওয়াজিব হবে।[১৩৫]

ঘ. বায়তুল মাল

নিম্নোক্ত অবস্থাসমূহে বায়তুল মাল থেকে দিয়াত পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক হয়।

- অপরাধী ছিন্নমূল হওয়া অথবা তাদের দিয়াত আদায় করতে অসমর্থ হওয়া

যদি অপরাধীর বংশে অন্য কোন লোকই না থাকে (যেমন- ছিন্নমূল ও পিতৃপরিচয়হীন ব্যক্তি, হারাবী বা যিম্মী যদি ইসলাম গ্রহণ করে) অথবা তাদের দিয়াত পরিশোধ করার সামর্থ্য না থাকে, তাহলে বায়তুল মাল থেকে দিয়াত পরিশোধ করতে হবে।[১৩৬] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, أنا وارث من لا وارث له ' أعقل عنه و أرثه. - "আমি লাওয়ারিছ ব্যক্তির ওয়ারিছ। আমি তার পক্ষ থেকে দিয়াত আদায় করব এবং তার ওয়ারিছ হব।"[১৩৭]

এ হাদীস থেকে জানা যায়, অপরাধী লাওয়ারিছ হলে সরকার তার দিয়াত পরিশোধ করবে। অনুরূপভাবে নিহত ব্যক্তি লাওয়ারিছ হলে সরকারই তার দিয়াতের উত্তরাধিকারী হবে।

- **প্রশাসক বা বিচারকের ভুল রায়**

প্রশাসক বা বিচারকের ভুল রায়ের কারণে কিংবা কোন অপরাধের সাধারণ দণ্ড

---

১৩৪. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.২৫৬

১৩৫. আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.২৯১-৩; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৬, পৃ.১৭৩

১৩৬. তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর এক বর্ণনা মতে- এ রূপ অবস্থায় অপরাধীকেই সম্পূর্ণ দিয়াত পরিশোধ করতে হবে। বায়তুল মাল থেকে দিয়াত প্রদান সমীচীন হবে না। (আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.৩৫৬; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৬, পৃ.১৮১; আল-বহুতী, *কশশাফ*, খ.৬, পৃ.৬০; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.৮৫)

১৩৭. আবূ দাউদ, (কিতাবুল ফরা'ইদ), হা.নং : ২৮৯৯; ইবনু মাজাহ, (কিতাবুদ দিয়াত), ২৬৩৪

কার্যকর করার সময় কারো প্রাণ বা অঙ্গহানি হলে তার দিয়াতও বায়তুল মালের ওপর বর্তাবে। কেননা বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে, অনুরূপভাবে বিভিন্ন অপরাধর সাধারণ দণ্ড কার্যকর করার বেলায় এ ধরনের ভুল-ত্রুটি সচরাচর ঘটে থাকে। এরূপ অবস্থায় প্রশাসক বা বিচারক এবং তাঁর বংশের লোকদের ওপর ক্ষতিপূরণ দান ওয়াজিব হলে দেশের বিচার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত।[১৩৮]

- **উন্মুক্ত জায়গায় মরদেহ পাওয়া যাওয়া**

ব্যক্তি মালিকানাবিহীন কোন উন্মুক্ত জায়গায় (যেমন- হাইওয়ে, বড় মসজিদ ও কারাগার প্রভৃতি) কোন মরদেহ পাওয়া গেলে এবং তার খুনী চিহ্নিত করা না গেলে বায়তুল মাল থেকে তার দিয়াত পরিশোধ করতে হবে।[১৩৯] অনুরূপভাবে তাওয়াফ কিংবা কোন মসজিদ বা জনসমাবেশে প্রবল ভীড়ের মধ্যে পড়ে কেউ মারা গেলে এবং তার খুনী চিহ্নিত করা না গেলে বায়তুল মাল থেকে তার দিয়াত পরিশোধ করতে হবে।[১৪০] হযরত 'আলী (রা) বলেন, لا يطل دم امرئ مسلم. -" কোন মুসলিমের রক্ত মূল্যহীন যেতে পারে না।"[১৪১]

---

১৩৮. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৪৯, ৬৪; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ.১৯২; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৩০৩-৪

১৩৯. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৬, পৃ.১১২; আল-কাসানী, *বদা'ই*, খ.৭, পৃ.২৮৯; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৬, পৃ.১৭৪

১৪০. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.১১, পৃ. ২৩৬-৭, খ.২১, পৃ.৯২

১৪১. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৮, পৃ.৩১০, ৩৮৫

[ঘ] তা'যীর

শাস্তিসমূহের মধ্যে তা'যীরের ক্ষেত্র হল বিশাল। ইসলামে একে অপরাধ রোধকারী একটি কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সুস্থ আচরণ শিক্ষা দেয়া, সংশোধন করা ও ভবিষ্যতে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করা। এ কারণে তা'যীরের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান, তার মনস্তত্ত্ব ও পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং অপরাধের ধরন ও মাত্রার প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখতে হয়। কেননা সমাজে কিছু লোক থাকে, যাদের অল্প শাস্তিতে শিক্ষা হয়ে যায়। আবার এমন অনেক লোকও থাকে, যাদেরকে কঠোর ও বেশিমাত্রায় শাস্তি ছাড়া শিক্ষা হয় না। তাই প্রশাসনিক বা বিচারিক কর্তৃপক্ষ এই সব বিবেচনা করে তিরস্কার, উপদেশদান, সতর্কীকরণ, পদচ্যুতকরণ, বেত্রাঘাত, সম্পদ আটক, অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড প্রভৃতি শাস্তিসমূহের মধ্যে যা সঠিক মনে করবেন তা-ই দিতে পারবেন। তবে কখনো জননিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত উন্নীত হতে পারে।

তা'যীরী অপরাধ ঃ প্রকৃতি

হুদূদ ও কিসাস জাতীয় কয়েকটি অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট সব অপরাধই তা'যীরী অপরাধ। এ ধরনের শাস্তি কোনটা কর্তব্য সমাপন কিংবা ওয়াজিব আদায়ে অবহেলার কারণে হয়ে থাকে। যেমন- যাকাত আদায় না করা, নামায তরক করা, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণ শোধ না করা, আমানত আদায় না করা, অপহৃত সম্পদ ফিরিয়ে না দেয়া ও পণ্যের ত্রুটি প্রকাশ না করা প্রভৃতি। আবার নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হবার কারণেও এ ধরনের শাস্তির হতে পারে। যেমন- বেগানা মহিলাকে চুমো দেয়া, পরমহিলার সাথে নির্জনে সময়ে কাটানো, যিনা ব্যতিরেকে কাউকে অন্য কোন অপরাধের অপবাদ দেয়া, বিনা হেফাযতের মাল চুরি করা, গরু কিংবা কোন প্রাণির সাথে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া[১], খাদ্যে ভেজাল দেয়া, মাপে কম দেয়া, খাদ্য দ্রব্য গুদামজাত করে রাখা, প্রতারণা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, দুর্নীতি করা, দায়িত্ব পালনে ফাঁকি দেয়া, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, কাউকে

---

১. অধিকাংশদের মতে, প্রাণির সাথে ব্যভিচারকারীর ওপর কোন হদ্দ নেই। হযরত ইবনু 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি কোন প্রাণির সাথে ব্যভিচার করল, তার ওপর কোন হদ্দ নেই। তবে শাফি'ঈদের একটি মত হল, তার জন্য যিনার হদ্দ প্রযোজ্য হবে। ইমাম আহমাদ থেকেও এ ধরনের একটি মত বর্ণিত রয়েছে। শাফি'ঈদের অন্য মতানুসারে, তাকে হত্যা করা হবে। সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত।

মারধর করা ও গালিগালাজ করা প্রভৃতি। তাছাড়া যে সব অপরাধের শাস্তি সুনির্দিষ্ট (যেমন হদ্দ ও কিসাস), কিন্তু তা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়নি, কিংবা তাতে কোন ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে, তাও এ পর্যায়ের অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। তদুপরি যে সব কাজ মূলত মুবাহ; কিন্তু তা যদি কোন ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি ও পাপের কারণ হয়, তা অপরাধের পথ বন্ধকরণের সূত্র অনুযায়ী হারামে পরিণত হয়। আর এ ধরনের কাজে যে লিপ্ত হবে অধিকাংশ ইসলামী আইনতত্ত্ববিদের মতে তাকেও তা'যীর করা যাবে।

তাছাড়া যে ব্যক্তি মুস্তাহাব পরিত্যাগ করে মাকরূহ কাজ সম্পন্ন করে, তাকে তা'যীর করা যাবে কি না- এ বিষয়ে ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। এক দল ফকীহের মতে তাকে কোন রূপ তা'যীর করা জায়িয হবে না। কেননা মুস্তাহাব কাজ সম্পাদন এবং মাকরূহ কাজ বর্জন করতে কোন ধরনের শার'ঈ বাধ্যবাধকতা নেই। আর যে কাজে বাধ্যবাধকতা নেই, তাতে কোন রূপ তা'যীর করা সঙ্গত নয়। তবে অন্য কতিপয় ফকীহের মতে, এ ধরনে লোককেও তা'যীর করা যাবে। তাঁদের দলীল হলো, জনৈক ব্যক্তি যাব্‌হ করার উদ্দেশ্যে একটা ছাগলকে শায়িত অবস্থায় রেখে চুরিতে শান দিচ্ছিলো, এ অবস্থা দেখে হযরত 'উমার (রা) তাঁকে বেত্রাঘাত করেছিলেন। প্রাণিকে শায়িত অবস্থায় রেখে চুরিতে শান দেয়া মাকরূহ কাজ। আর এ জন্য হযরত 'উমার (রা) যাব্‌হকারীকে শাস্তি দিয়েছিলেন।[২] এ থেকে জানা যায়, মাকরূহ কাজ সম্পাদনকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে। অনুরূপভাবে যারা মুস্তাহাব কাজ সম্পাদনে অবহেলা করে, তাদেরকেও তা'যীর করা যাবে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ঠিক কোন অপরাধের জন্য নয়; শুধু শিক্ষা দান করার উদ্দেশ্যেও তা'যীর করা জায়িয। যেমন পিতামাতার জন্য সন্তানদেরকে কিংবা শিক্ষকের জন্য ছাত্রদেরকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শাস্তি দান করা জায়িয।[৩]

উল্লেখ্য যে, তা'যীর যদি এমন অপরাধের ক্ষেত্রে হয়, যা নিরেট আল্লাহর হকের সাথে সংশিষ্ট (যেমন- নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত পরিত্যাগ করা) অথবা যাতে আল্লাহর হকের প্রাবল্য রয়েছে (যেমন কোন বেগানা মেয়েকে চুমো দেয়া, তাকে জড়িয়ে ধরা প্রভৃতি) তাহলে তা অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। এটাই সাধারণ নিয়ম। তবে ক্ষমা করা যদি বিচারক কিংবা প্রশাসকের কাছে সার্বিক দৃষ্টিতে অধিক কল্যাণকর বিবেচিত হয়, তাহলে তা ক্ষমা করা জায়িয হবে এবং এজন্য সুপারিশও করা যাবে। আর তা'যীর যদি এমন অপরাধের ক্ষেত্রে হয়,

---

২. আল-বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, হা.নং : ১৮৯২৩

৩. মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১২, পৃ.২৫৭-২৫৮

যাতে বান্দাহর হকের প্রাবল্য রয়েছে (যেমন যিনা ব্যতিরেকে কাউকে অন্য কোন অপরাধের অপবাদ দেয়া, কাউকে গালি-গালাজ করা, মারধর করা, প্রতারণা করা প্রভৃতি অপরাধ), তাহলে তার বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দাবীর ওপরই নির্ভরশীল হবে। সে ইচ্ছা করলে বিচার দাবী করবে। ক্ষমা করে দেয়ার অধিকারও তার আছে। তবে বিচারক কিংবা প্রশাসকের জন্য তাকে ক্ষমা করে দেয়ার কিংবা তার জন্য সুপারিশ করার অধিকার নেই।

তা'যীরী শাস্তির বিভিন্ন ধরন ঃ

ক. হত্যা

ইসলামী আইনের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তা'যীরের আওতায় কাউকে হত্যা করা সমীচীন নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. "তোমরা এমন কাউকে বিনা অধিকারে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ তা'আলা নিষিদ্ধ করেছেন।"[৪] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ' و الثيب الزاني' والمفارق لدينه التارك للجماعة. "তিন ব্যক্তি ছাড়া কোন মুসলিমের রক্ত হালাল হবে না। এ তিন ব্যক্তি হল ঃ অন্যায়ভাবে অপরকে হত্যাকারী, বিবাহিত ব্যভিচারী এবং মুসলিম দল ও ধর্মত্যাগকারী ব্যক্তি।"[৫]

তবে অধিকাংশ ইসলামী আইনতত্ত্ববিদের মতে, কেউ কোন মারাত্মক অপরাধ সংঘটিত করলে কিংবা কোন বড় অপরাধ বারংবার সংঘটিত করলে জাতীয় ঐক্য, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনের তাকিদে তা'যীর স্বরূপ তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা জায়িয।[৬] যেমন কোন মুসলিম যদি ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের জন্য গোয়েন্দাগিরি করে বা কেউ যদি কুর'আন-সুন্নাহর পরিপন্থী কোন বিদ'আতের প্রতি লোকদের আহবান জানায় বা তা সমাজে প্রচলন করতে চেষ্টা করে কিংবা কেউ বারবার সমকামিতায় লিপ্ত হয়, তাহলে তাকে মৃত্যদণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর অনিষ্টতা দমন করা যদি হত্যা ছাড়া অসম্ভব হয়, তাহলে তাকে হত্যা করাই হল তার শাস্তি। হযরত আরফাজাহ আল-আশজা'ঈ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ

---

৪. আল-কুর'আন, ৬ (সূরা আল-আন'আম) ঃ ১৫১

৫. সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ৬৪৮৪; মুসলিম, (কিতাবুল কাসামাহ), হা.নং : ১৬৮৬

৬. ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৫, পৃ. ১২৩; ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.৪, পৃ.৬২-৩

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, من أتاكم و أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. "তোমরা যখন কোন এক ব্যক্তির নেতৃত্বাধীন ঐক্যবদ্ধ, তখন কেউ যদি তোমাদের ঐক্য ভঙ্গ করতে ও তোমাদের ঐক্যবদ্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করতে সচেষ্ট হয়, তাহলে তাকে হত্যা কর।"[৭] ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহ) বলেন, المفسد كالصائل إذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل. - "বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আক্রমণকারীর মতোই। যদি আক্রমণকারী হত্যা ছাড়া অবদমিত না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।"[৮]

খ. বেত্রাঘাত

তা'যীর হিসেবে বেত্রাঘাত্ব করার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। অনুরূপভাবে তার নিম্নতম পরিমাণ নিয়েও অধিকাংশ ইসলামী আইনবিদ একমত। বিচারক যদি মনে করেন যে, কোন অপরাধীর জন্য শাস্তি হিসেবে একটা বেত্রাঘাতই যথেষ্ট হবে, তাহলে এর অতিরিক্ত শাস্তি দান করা সমীচীন হবে না।[৯] তবে তার সর্বোচ্চ পরিমাণ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। কেউ বলেছেন, তা'যীর হিসেবে দশের অধিক বেত্রাঘাত করা যাবে না।[১০] হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله . - "তোমরা দশের অধিক বেত্রাঘাত করো না। তবে আল্লাহর হদ্দ তথা গুনাহের কাজ হলে অন্য কথা।"[১১] ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম শাফি'ঈ ও অধিকাংশ হাম্বলী ইমামের মতে, ৩৯টির[১২] অতিরিক্ত বেত্রাঘাত করা সমীচীন নয়।[১৩] কেননা রাসূলুল্লাহ

---

৭. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল ইমারাত), হা.নং : ১৮৫২

৮. ইবনু তাইমিয়্যাহ, আল-ফাতাওয়া.., খ.২৮, পৃ. ২৪৭

৯. হানাফীগণের মতে, বেত্রাঘাতের নিম্নতম পরিমাণ হল তিনটি। (আল-হাদ্দাদী, আল-জাওহারাহ, খ.২, পৃ.১৬২)

১০. এটা ইবনু ওয়াহাব আল-মালিকীর অভিমত। ইমাম আহমাদ (রহ) থেকেও এ ধরনের একটি মত বর্ণিত রয়েছে। (আল-মরদাভী, আল-ইনসাফ, খ.১০, পৃ. ২৪৪; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১২, পৃ. ২৬৫-৭) অধিকাংশের মতে, হাদীসে হদ্দ দ্বারা ফিকাহবিদদের পরিভাষিক হদ্দ উদ্দেশ্য নয়; সকল গুনাহই উদ্দেশ্য। আর এখানে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা হল শিক্ষামূলক শাস্তি, যা ঠিক কোন অপরাধের জন্য নয়।

১১. আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং : ৮১০৭

১২. ইমাম আবূ ইউসুফের মতে, বেত্রাঘাতের সর্বোচ্চ পরিমাণ হল ৭৯ কিংবা ৭৫। (আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.৬৪; ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৫, পৃ.৫১)

১৩. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.৬৪; ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৫, পৃ.৫১; আল-আনসারী, আসনাল মাতালিব, খ.৪, পৃ. ১৬২

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين . - "যে অপরাধে হদ্দ নেই, তাতে যে ব্যক্তি হদ্দ পরিমাণ শাস্তি দেবে, সে সীমালঙ্ঘনকারী হবে।"[১৪] উল্লেখ্য যে, হদ্দের নিম্নতম পরিমাণ হল চল্লিশটি বেত্রাঘাত। এটা দাসদের জন্য যেনার অপবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। অতএব তা থেকে একটি কম অর্থাৎ ৩৯টি বেত্রাঘাত হবে তা'যীরের সর্বোচ্চ সীমা।

তবে ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদের একটি বর্ণনা মতে, বেত্রাঘাতের কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। প্রয়োজন হলে তা'যীর হিসেবে হদ্দেরও অধিক শাস্তি প্রদান করা যাবে।[১৫] খুলাফা রাশিদূনের অনুসৃত রীতি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করে। বর্ণিত আছে যে, হযরত 'উমার (রা) ও হযরত 'আলী (রা) দুজনেই অবিবাহিত দুইজন নারী-পুরুষ যাদেরকে একই চাদরের নিচে নিদ্রিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, তাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে বেত্রাঘাত করার আদেশ দিয়েছিলেন।[১৬]

আমি মনে করি, শেষোক্ত মতটিই অধিকতর অগ্রগণ্য। তবে শিক্ষা দান করার উদ্দেশ্যে যে শাস্তি দেয়া হয়, যা ঠিক কোন অপরাধের জন্য নয়, তা অবশ্যই দশের অধিক হওয়া কোনভাবেই উচিত নয়।

শিক্ষা দান করার উদ্দেশ্যে শাস্তির হুকম

শিক্ষা দান করার উদ্দেশ্যে পিতা-মাতার জন্য সন্তানদেরকে, শিক্ষকদের জন্য ছাত্রদেরকে এবং স্বামীদের জন্য স্ত্রীদেরকে হালকাভাবে প্রহার করা জায়িয। তবে তা অবশ্য শিক্ষার উদ্দেশ্যে সাধারণ্যে প্রচলিত মাত্রায় হতে হবে। ভীষণ পীড়াদায়কভাবে প্রহার করা জায়িয নয়।[১৭] তদুপরি চেহারা কিংবা শরীরের

---

১৪. আল-বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, হা.নং : ১৭৩৬২, ১৭৩৬৩
তবে কেউ কেউ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর প্রকৃত মর্ম হল ঃ যে অপরাধের শাস্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট, এ ধরনের অপরাধে তা'যীরের শাস্তি সে পরিমাণের হতে পারবে না। যেমন নিসাব পরিমাণের কম মূল্যের সম্পদ চুরি করলে তা'যীর হিসেবে হাত কাটা যাবে না।

১৫. মালিক, আল-মুদাওয়ানাহ, খ.৪, পৃ. ৫৪৭; আর-রু'আয়নী, মাওয়াহিব..,খ.৬, পৃ. ৩১৫; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১২, পৃ. ২৬৫-৭

১৬. ইবনু হাযম, আল-মুহল্লা, খ.১২, পৃ.৪২৩

১৭. ছাত্র ও সন্তানদেরকে শিক্ষা দান করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হলে তিনটি বেত্রাঘাত করা যেতে পারে। এর অতিরিক্ত প্রহার করা সমীচীন নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত মিরদাস আল-মু'আল্লিম (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, إياك أن تضرب فوق الثلاث فإنك إن ضربت فوق الثلاث اقتص الله منك. - "তিনবারের বেশি প্রহার করবে না। যদি তিনবারের অতিরিক্ত প্রহার কর, তা হলে আল্লাহ তা'আলা তোমার থেকে বদলা নেবেন।" (আল-বুজায়রমী, তুহফাতুল হাবীব, খ.১, পৃ.৪১০)

কোন নাজুক স্থানেও প্রহার করা বৈধ নয়। তা ছাড়া প্রহারে কোন ধরনের শিক্ষা হবে না- এ ধরনের প্রবল ধারণা সৃষ্টি হলেও প্রহার করা সমীচীন নয়।

গ. বন্দী করা

তা'যীর হিসেবে অপরাধীদেরকে প্রয়োজনে বিভিন্ন মেয়াদে সশ্রম বা বিনা শ্রমে কারাদণ্ড দেয়া যেতে পারে। কখনো পরিস্থিতি এরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে যে, অপরাধীকে বন্দী করে রাখা না হলে তার কার্যকলাপে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠতে পারে। এ ধরনের অপরাধীকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হলে তাকে যেমন তার কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা সম্ভব হবে, তেমনি সে সাথে এ আশাও করা যেতে পারে, কারাগার থেকে মুক্তির পর সে কারাজীবনের দুঃসহ কষ্টের কথা স্মরণ করে কোন অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকবে। এ কারণে কারাগারের অভ্যন্তরীন পরিবেশকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে কয়েদীরা সেখানে এক অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে পড়ে ছটফট করতে থাকবে। তা হলেই পরবর্তী জীবনে এ দুঃসহ অবস্থার কথা চিন্তা করে তারা আর যে কোন অপরাধে লিপ্ত হতে মানসিকভাবে প্রস্তুত হবে না।

বর্তমানে কারাগারগুলোর অবস্থা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। এখানে বন্দীদের পরস্পরের সাথে মেলামেশা করার সুযোগ থাকার কারণে অপরাধীরা বন্দী হয়েও কারাগারের চার প্রাচীরের অভ্যন্তরে অপরিচিতির অস্বস্তি ভোগ করে না। ফলে কারাগারের শাস্তি তাদের জন্য শাস্তিরূপেই প্রতিভাত হয় না। তা হয়ে ওঠে অপরাধের উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভের মনোরম কেন্দ্র বিশেষ। প্রাথমিক পর্যায়ের কোন অপরাধী কিছুকাল কারাজীবন লাভ করতে পারলে সে একজন ঘাগু ও দুঃসাহসী অপরাধী হয়ে বের হয়ে আসে। তাই এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, বর্তমান পরিবেশে কারাগারে বন্দী করে রাখা না অপরাধীকে অপরাধবিমুখ করতে, না সমাজকে অপরাধমুক্ত বানাতে কিছুমাত্র সহায়তা করছে। তাই এ বিষয়ে গভীরভাবে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে।

ঘ. নির্বাসন বা দেশ থেকে বহিষ্কার

বিচারক কিংবা শাসক জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করলে অপরাধীদেরকে তা'যীর হিসেবে নির্দিষ্ট কোন মেয়াদের জন্য দেশ থেকে বহিষ্কারের শাস্তি কিংবা নির্বাসন দণ্ড দিতে পারেন।[১৮] নির্বাসন স্থলে তাকে বন্দী করে রাখার প্রয়োজন নেই। তবে

---

১৮. ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.৪, পৃ. ১৪
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও মেয়েদের বেশধারী নপুংসকদেরকে মদীনা থেকে বের করে দিয়েছিলেন। অধিকন্তু তাদের সম্পর্কে বলেছেন, اخرجوهم من بيوتكم. - "তোমরা তাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও।" (সহীহ আল বুখারী, হা.নং :

সার্বক্ষণিকভাবে তাকে নজরদারী করতে হবে, যাতে সে নিজ দেশে ফিরে আসতে না পারে।[১৯]

ঙ. শূলে চড়ানো

অনেক ইমামের মতে, তা'যীর হিসেবে বিচারক সমীচীন মনে করলে জঘন্য কোন অপরাধের জন্য অপরাধীকে জীবিত অবস্থায় তিন দিনের জন্য শূলে চড়ানোর দণ্ড দিতে পারেন। তবে তাকে শূলে চড়ানোর সাথে কিংবা আগে হত্যা করা যাবে না। মাওয়ার্দী বলেন, কেবল তিন দিনই জীবিত অবস্থায় শূলে চড়িয়ে শাস্তি দেয়া জায়িয। এর পর তাকে জীবিত ছেড়ে দিতে হবে। বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ নাব নামক জনৈক ব্যক্তিকে পাহাড়ের ওপর শূলীতে শাস্তি দিয়েছিলেন।[২০] তিনি আরো বলেন, এ তিন দিনের মধ্যে তাকে খাবার, পানীয় ও নামাযের ওযু থেকে বারণ করা যাবে না। আর সে ইশারায় নামায পড়বে। তবে ছেড়ে দেয়ার পর পুনরায় নামাযগুলো পড়ে দেবে।[২১] বিশিষ্ট ইসলামী আইনতত্ত্ববিদ শারবীনী বলেন, শূলী অবস্থায়ও তাকে পূর্ণ স্বস্তির সাথে নামায পড়তে দেয়া দরকার। অর্থাৎ নামাযের সময় তাকে ছেড়ে দিতে হবে। নামাযের পর আবার তাকে শূলে চড়াতে হবে। হাম্বলীগণের মতে, যদি সম্ভব না হয় ইশারা করেই নামায পড়বে; তবে মুক্ত হবার পর পুনরায় নামাযগুলো পড়িয়ে দেবার প্রয়োজন নেই।

কোন কোন আইনবিদের মতে, হত্যা করার পরেও শূলে চড়ানো জায়িয। আবার কারো মতে, হত্যার পূর্বে শূলে চড়ানো যাবে এবং এ অবস্থায় হত্যা করতে অসুবিধা নেই। যদি হত্যা করার পর শূলে চড়ানো হয় কিংবা হত্যার পূর্বে শূলে চড়িয়ে এ অবস্থায় হত্যা করা হয়, তাহলে বিশুদ্ধ মতানুসারে শূলে যে সময় পর্যন্ত রাখলে প্রচার কার্য সম্পন্ন হবে, সে সময় পর্যন্ত শূলে রাখা জায়িয। হানাফীগণের মতে, দুর্গন্ধ বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত শূলে রাখা জায়িয। আর শাফি'ঈগণের মতে, তিন দিন শূলে চড়িয়ে রাখতে হবে।[২২]

৫৫৪৭, ৬৪৪৫) হযরত 'উমার (রা) মহিলাদেরকে ফিতনায় ফেলার কারণে নাসর ইবন হাজ্জাজকে বসরায় নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। (ইবনু হাজর, ফাতহুল বারী, খ.১২, পৃ.১৬০) তাছাড়া ব্যভিচারী অবিবাহিত পুরুষকে একবছরের জন্য নির্বাসনে পাঠানোর নির্দেশও হাদীসে রয়েছে।

১৯. এটা শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের অভিমত। মালিকীগণের মতে, নির্বাসনস্থলে তাকে বন্দী করে রাখতে হবে। (আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৩, পৃ. ৪৭)

২০. আল-মাওয়ার্দী, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ২৯৬

২১. আল-মাওয়ার্দী, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ২৯৬-৭

২২. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ. ৯৫; মুল্লা খসরু, দুরারুল হুক্কাম, খ.২, পৃ.৮৫; আল-জসসাস, আহকামুল কুর'আন, খ.২, পৃ. ৫৭৮; ইবনুল 'আরবী, আহকামুল কুর'আন, খ.২, পৃ. ১০০; আল-জুমল, ফুতুহাতুল ওয়াহহাব, খ.৫, পৃ.১৫৫; আল-বাজী, আল-মুন্তকা, খ.৭, পৃ.১৭২

চ. উপদেশ বা তিরস্কার কিংবা ধমক দান

তা'যীর হিসেবে বিচারক অপরাধীকে তার দরবারে ডেকে এনে উপদেশ, তিরস্কার ও ধমক দিতে পারেন। যেমন কেউ যদি সাধারণ কোন ব্যক্তিকে এমন কোন নামে ডাকে যা সে অপছন্দ করে, (যেমন কুত্তা, গাধা, শালা, মিথ্যুক, ফাসিক, কাফির, জারজ সন্তান, মুনাফিক প্রভৃতি) তাহলে বিচারক তাকে ডেকে এনে উপদেশ দিতে পারেন কিংবা (অত্যাচারী, অভদ্র, জাহিল বা সামীলঙ্ঘনকারী প্রভৃতি শব্দ বলে) তিরস্কার করতে পারেন বা ধমকও দিতে পারেন। তাকে এজন্য বড় ধরনের অপমানিত করা কিংবা কারাদণ্ড দেয়া সমীচীন নয়।[২৩]

ছ. অপমান করা

তা'যীর হিসেবে বিচারক প্রয়োজন মনে করলে অপরাধীকে ছোট-খাট অপমানকর শাস্তিও দিতে পারেন।[২৪] যেমন কেউ যদি কোন পদস্থ ও সম্মানিত ব্যক্তিকে খারাপ নামে ডাকে, তাহলে বিচারক প্রয়োজন মনে করলে তাকে ছোট-খাট অপমানকর শাস্তি দিতে পারেন। যেমন কানধরে উঠাবসা করা, এক পায়ের ওপর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা প্রভৃতি। এ ধরনের অপরাধের জন্য কারাদণ্ড দেয়া সমীচীন নয়।

জ. বয়কট

বয়কট অর্থ সম্পর্ক ছিন্ন করা অর্থাৎ উঠাবসা না করা, কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়া,

---

২৩. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.৬৪; আর-রুহায়বানী, মাতালিব..., খ.৬, পৃ.২২৩
বর্ণিত রয়েছে, একদা হযরত আবূ যার্‌র (রা) জনৈক ব্যক্তিকে তার মায়ের নাম ধরে গালি দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা শুনে তাঁকে বললেন, يا أبا ذر ' أ عيرته بامه ! إنك امرؤ فيك جاهلية. - "আবূ যার্‌র, তুমি তাকে মায়ের নাম ধরে অপমান করছো! তোমার মধ্যে তো দেখছি, জাহিলিয়্যাত (অর্থাৎ অভদ্রতা) রয়েই গেছে!" (সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুল ঈমান), হা.নং : ৩০, (কিতাবুল আদাব), হা.নং : ৫৭০৩) এ হাদীস থেকে জানা যায়, অপরাধীকে শাস্তি হিসেবে তিরস্কার করতে কিংবা উপদেশ দিতে কোন অসুবিধা নেই। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকেও বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে এক মদ্যপায়ীকে হাজির করা হল। এ সময় তাকে বকাঝকা করার জন্য তিনি উপস্থিত লোকজনকে নির্দেশ দিলেন। তখন লোকেরা তাকে বলতে লাগলঃ ما اتقيت الله ! ما خشيت الله ! ما استحييت من رسول الله . - "তোমার কি আল্লাহর ভয় নেই! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি কি তোমার লাজ-শরম নেই!" এ হাদীস থেকে জানা যায়, অপরাধীকে তার কাজের জন্য তিরস্কার ও বকাঝকা করা যাবে। –আবূ দাউদ, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং : ৪৪৭৮

২৪. আল-বাবরতী, আল-'ইনায়াহ, খ.৫, পৃ.৩৪৪; আল-খারাশী, শারহু মুখতাছারি খলীল, খ.৮, পৃ.১১০

লেনদেন করা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি। তা'যীর হিসেবে বিচারক অপরাধীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দিতে পারেন।[২৫] যে তিনজন সাহাবী তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন- তাঁদেরকে বয়কট করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ নির্দেশের কারণে আল্লাহর কাছে তাঁদের তাওবা কবুল হওয়া পর্যন্ত সাহাবীগণের মধ্যে কেউ তাঁদের সাথে কথা বলতেন না, কেউ তাঁদেরকে সালাম দিতেন না, কেউ তাঁদের সাথে উঠাবসা-মেলামেশা করতেন না।[২৬] হযরত 'উমার (রা) সবীগকে বসরায় নির্বাসন করার পর নির্দেশ দিয়েছিলেন, সবাই যেন তাকে বয়কট করে, কেউ যেন তার সাথে মেলামেশা না করে।[২৭] আমাদের সমাজে যে সব নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশা করে, তা'যীর হিসেবে তাদেরকে সমাজ থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বিচ্ছিন্ন করে রাখা যেতে পারে।

ঝ. ঢোল-শুহরত, প্রচার ও মাইকিং প্রভৃতি

বিচারক সমীচীন মনে করলে তা'যীর হিসেবে মাইকিং, ঢোল-শুহরত, রেডিও, টিভি ও পত্রিকা প্রভৃতির মাধ্যমে অপরাধীর নাম লোকদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারেন। বর্ণিত রয়েছে, কাযী শুরাইহ (রহ) মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীর নাম বাজারে ঢোল মেরে প্রচার করতেন, বেত্রাঘাত করতেন না।[২৮] ইমাম আবূ হানীফার (রহ) মতে, মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীকে বাজারে ঘুরিয়ে তার অপকর্মের কথা প্রচার করা হবে। যদি সে বাজারী লোক হয়। অন্যথায় গ্রামের মধ্যে আসরের নামাযের পরে যেখানে লোকজন জড়ো হয় সেখানে তাকে নিয়ে তার অপকর্মের কথা ঘোষণা করা হবে। তাকে কোন রূপ প্রহার করা বিধেয় নয়। তবে সাহেবাইনের মতে, তাকে বেত্রাঘাত ও বন্দী করতে হবে।[২৯] শাফি'ঈ, হাম্বলী ও কতিপয় মালিকী ইমামের মতে, মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারীর ব্যাপারটি বিচারক কিংবা প্রশাসকের কাছে ন্যস্ত হবে। তিনি চাইলে তাকে বেত্রাঘাতও করতে পারেন, বন্দীও করতে পারেন কিংবা মাথা মুণ্ডিয়ে অপমানিতও করতে পারেন বা বাজারে তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রচারও করা যেতে পারে।[৩০]

---

২৫. ইবনু ফারহুন, তাবছিরাতুল হুক্কাম, খ.২, পৃ.২৯১

২৬. সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং : ৪১৫৬

২৭. আদ-দারিমী, আস-সুনান , (বাবঃ মান হাবাল ফুতয়া..), হা.নং : ১৪৮

২৮. ইবনু হাজার আল আসকালানী, আদ-দিরায়াহ, খ.২, পৃ. ১৭৩

২৯ আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.১৬, পৃ.১৪৫; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.৫, পৃ. ৪৭৫-৭

৩০. ইবনু ফারহুন, তাবছিরাতুল হুক্কাম, খ.১, পৃ.১৩০; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.২৬, পৃ. ২৫৫-৭

ঞ. আদালতে তলব

যদি কোন বিশিষ্ট মর্যাদাবান লোক থেকে কোন ধরনের পদস্খলন ঘটে, ছোট-খাট ত্রুটি সংঘটিত হয়, তাহলে বিচারক প্রয়োজন মনে করলে তাকে আদালতে ডেকে এনে তার কৃত অপরাধ সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে পারেন।[৩১]

ট. চাকুরীচ্যুত করণ

অপরাধীকে তা'যীর হিসেবে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা যাবে। যেমন ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ বা দায়িত্ব পালনে অবহেলাকারী কর্মকতাকে জনস্বার্থে পদচ্যুত করতে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে যে বিচারক ইচ্ছাকৃতভাবে পক্ষপাতমূলকভাবে ফায়সালা করে তাকেও পদচ্যুত করা যাবে।

ঠ. সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেয়া

তা'যীর হিসেবে অপরাধীকে কোন কোন নির্ধারিত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায়। যেমন- রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করা, চাকুরীতে প্রমোশন স্থগিত করে রাখা বা ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করে দেয়া প্রভৃতি।

ড. কাজ-কারবারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ

তা'যীর হিসেবে অপরাধীর কাজ-কারবার ও লেনদেনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যেতে পারে।

ঢ. উপায়-উপকরণ ও সম্পদ নষ্ট করা

যে সকল বস্তু পাপ ও অন্যায় কাজে সাহায্য করে কিংবা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সে সকল বস্তু ও সরঞ্জাম নষ্ট করে দেয়াও জায়িয। যেমন বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে দেয়া এবং মদের পাত্র নষ্ট করা প্রভৃতি বৈধ। তদুপরি ভেজাল মিশ্রিত সম্পদও নষ্ট করে দেয়া জায়িয। যেমন দুধে পানি মিশ্রিত করে ভেজাল দিলে তা মাটিতে ফেলা দেয়া জায়িয হবে। তদ্রূপ খারাপ সূতা দিয়ে কাপড় বুনলে তাকে ছিঁড়ে ফেলে ও আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া বৈধ।[৩২] বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদের পাত্রগুলো ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৩৩] তাছাড়া হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা)-কে কসুম্বা রঙে রঞ্জিত দুটি কাপড় জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।[৩৪]

---

৩১. যায়ল'ঈ, তাবয়ীন, খ.৩, পৃ. ২০৮; ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.৪, পৃ. ৬২

৩২. ইবনু তাইমিয়্যাহ, আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, খ.৪, পৃ. ২১১-২; ইবনুল কাইয়িম, আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, পৃ. ২২৭-৮; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১২, পৃ. ২৭২

৩৩. আল-কারাফী, আনওয়ারুল বুরূক ফী আনওয়া'ইল ফুরূক, খ.৪, পৃ.২০৭

৩৪. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল লিবাস), হা.নং : ২০৭৭

তবে আমি মনে করি, যে সকল বস্তু ব্যবহারের উপযোগী তা নষ্ট না করেই অভাবীদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া বা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করাই উত্তম। হাম্বলীগণের মতে, সম্পদ নষ্ট করা জায়িয নয়।[৩৫] তবে যা ব্যবহারের উপযোগী নয়, তা জনস্বার্থে নষ্ট করে দেয়াই উত্তম। তাছাড়া বিচারক যদি কল্যাণকর মনে করেন, তাহলেও সম্পদ নষ্ট করা জায়িয হবে। বর্ণিত রয়েছে, হযরত 'উমার (রা) ও 'আলী (রা) দুজনেই মদের দোকান জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।[৩৬]

ণ. সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা

তা'যীর হিসেবে অপরাধীর অর্থ-সম্পদ একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আটক করে রাখা যেতে পারে, যাতে সে পরিণাম বিবেচনা করে সংশোধন হতে পারে। অপরাধী সংশোধন হয়ে গেলে তার সম্পদ তাকে ফেরত দিতে হবে। সরকার তা রাজকোষে যোগ করতে পারবে না। কারণ কারো সম্পদ তার সম্মতি কিংবা আইনসম্মত পথ ছাড়া অন্য কোনভাবে ভোগ করা কারো জন্য বৈধ নয়। তবে অপরাধীর সংশোধন হবার ব্যাপারে বিচারিক বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ নিরাশ হলে তার আটককৃত মাল জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যাবে।[৩৭]

ত. আর্থিক দণ্ড

অধিকাংশ ইমামের মতে, তা'যীর হিসেবে কোন অপরাধের জন্য কাউকে আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত করা সঙ্গত নয়। এটাই হল ইমাম আবূ হানীফা (রহ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ)-এর অভিমত। ইমাম শাফি'ঈ (রহ) প্রথমে জায়িযের মত পোষণ করলেও পরবর্তীতে সে মত থেকে ফিরে আসেন। তাঁর নতুন মত অনুযায়ী অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জায়িয নয়। হাম্বলী ইমামগণের মতে, অর্থ জরিমানা করা হারাম। অনুরূপভাবে শাস্তি হিসেবে সম্পদ নষ্ট করাও হারাম। তাঁদের কথা হল, এ বিষয়ে শরী'আতের নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ) ও অধিকাংশ মালিকী মতাবলম্বী ইমামের মতে, অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জায়িয, যদি তাতে কোন কল্যাণ নিহিত থাকে।[৩৮]

---

৩৫. আর-রুহায়বানী, মাতালিব..,খ.৬, পৃ.২২৪

৩৬. ইবনুল কাইয়িম, আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, পৃ. ২২৭

৩৭. ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৫, পৃ.৪২; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১২, পৃ. ২৭১-২

৩৮. ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.৫, পৃ. ৩৪৫; ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.৪, পৃ. ৬১; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১২, পৃ. ২৭১-২

ইবনু তাইমিয়্যা (রহ) ও ইবনুল কাইয়্যিম (রহ) প্রমুখের মতে, অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জায়িয। তাঁদের কথা হলো, অরক্ষিত সম্পদ কেউ যদি চুরি করে কিংবা এ ধরনের চুরি যাতে হদ্দ প্রয়োগ করা যায় না, তাতে দ্বিগুণ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা যায়।[৩৯] বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে গাছে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ' و من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه و العقوبة. "অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যদি তা মুখের কাছে পেয়ে যায়, কোন উপায়ে তা ছিঁড়ে নেয় নি, তা খেলে তাতে কোন অপরাধ হবে না। আর যে তা কোন জিনিসের সাহায্যে ছিঁড়ে নিয়ে খাবে, তাকে তার দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে এবং তাকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে।"[৪০] তাছাড়া খুলাফা রাশিদূন যাকাত অনাদায়কারীদের থেকে তাদের সম্পদের একটি অংশও জরিমানা হিসেবে নিয়ে নিতেন।[৪১] এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, অর্থ জরিমানা করা নিষিদ্ধ নয়।

আমি মনে করি, সাধারণ অবস্থায় অর্থ জরিমানার শাস্তি না দেয়াই হল মূল বিধান। কারণ, কারো সম্পদ তার সম্মতি কিংবা আইনসম্মত পথ ছাড়া অন্য কোনভাবে ভোগ করা কারো জন্য বৈধ নয়। তবে বিচারক প্রয়োজন মনে করলে বিশেষ কোন অপরাধের ক্ষেত্রে (যেমন চুরি, যাকাত দান থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি) অর্থ জরিমানা প্রদান করতে পারে। তবে সরকার সে অর্থ রাজকোষে জমা করতে পারবে না এবং কোন সম্পদশালীকেও দিতে পারবেনা; বরং তা অভাবীদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া যেতে পারে কিংবা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

যে সব শাস্তি দান বৈধ নয় ঃ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা'যীরের উদ্দেশ্য হলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সুস্থ আচরণ শিক্ষা দেয়া, সংশোধন করা ও ভবিষ্যতে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করা। তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা ও ধ্বংস করা কোনভাবেই উদ্দেশ্য নয়। এ কারণে সাধারণত এমন কোন শাস্তি প্রদান করা জায়িয নেই, যাতে ব্যক্তির প্রাণ নাশ কিংবা কোন অঙ্গ হানির কোনরূপ আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া

---

৩৯. ইবনু তাইমিয়্যাহ, আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, খ.৪, পৃ. ২১১-২; ইবনুল কাইয়্যিম, আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, পৃ. ২২৭-৮

৪০. আবূ দাউদ, (কিতাবুল লুকতাহ), হা.নং : ১৭১০, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং : ৪৩৯০; নাসাঈ, আস-সুনান আল-কুবরা, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং : ৭৪৪৬

৪১. ইবনুল কাইয়্যিম, আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, পৃ. ২২৭

ব্যক্তি যে সব শাস্তিকে নিজের জন্য অত্যন্ত হেয় ও অপমানকর মনে করে এবং যা ভবিষ্যতে তার সুস্থ ও পবিত্র জীবন যাপনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, সে রূপ শাস্তি দেয়াও উচিত নয়। নিম্নে তা'যীর হিসেবে যে সব শাস্তি দেয়া জায়িয নয়, তা উল্লেখ করা হল ঃ

১. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে দেয়া কিংবা ভেঙ্গে দেয়া

কারো নাক, কান কেটে দিয়ে কিংবা ওষ্ঠ উৎপাটন করে বা আঙ্গুলের মাথা কর্তন করে বা হাঁড় ভেঙ্গে দিয়ে বা শরীরের অন্য কোন অঙ্গ কেটে বা ভেঙ্গে দিয়ে শাস্তি দেয়া বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন অভিযান প্রেরণের সময় নেতৃবৃন্দকে নির্দেশ দিয়ে বলতেন, لا تمثلوا - "তোমরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃত করো না।"[৪২] সাহাবা কিরামও কোন অপরাধীকে এভাবে শাস্তি দিয়েছেন মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাছাড়া তা'যীরের উদ্দেশ্যই হল শিক্ষা দেয়া। কারো কিছু ধ্বংস করে শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে না।

২. চেহারা কিংবা নাজুক কোন স্থানে প্রহার করা

শরীরের এমন কোন অংশে প্রহার করা জায়িয নেই, যাতে ব্যক্তির প্রাণ নাশ কিংবা কোন অঙ্গ হানির কোন রূপ আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। এ কারণে কারো চেহারা, গুপ্তাঙ্গ, পেট ও বুক প্রভৃতি স্থানে প্রহার করা বৈধ নয়।[৪৩]

৩. আগুনে জ্বালিয়ে কিংবা পানিতে ডুবিয়ে শাস্তি দেয়া

শরীর কিংবা শরীরের অংশ বিশেষকে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেয়া হারাম। তবে অধিকাংশ ইসলামী আইনতত্ত্ববিদের মতে, কিসাসের ক্ষেত্রে এ রূপ করা জায়িয। অনুরূপভাবে পানিতে ডুবিয়ে রেখে শাস্তি দেয়াও বৈধ নয়।[৪৪]

৪. ক্ষুধা ও পিপাসায় কষ্ট দেয়া

কাউকে ক্ষুধা ও পিপাসায় কষ্ট দেয়াও জায়িয নেই।[৪৫]

৫. ঠাণ্ডা ও গরমে কষ্ট দেয়া

কাউকে প্রচণ্ড গরম জায়গায় রেখে কিংবা খোলা প্রান্তরে প্রখর রৌদ্র তাপের মধ্যে ফেলে রেখে শাস্তি দেয়াও বৈধ নয়। অনুরূপভাবে কাউকে ভীষণ ঠাণ্ডা

---

৪২. আবূ 'আওয়ানাহ, আল-মুসনাদ, হা.নং : ৬৫০২; তাবারানী, আল-মু'জামুল কবীর, হা.নং : ৩১৮৮

৪৩. ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.৫, পৃ. ২৩১; যায়নুদ্দীন আল-'ইরাকী, তারহুত তাছরীব, খ.৮, পৃ. ১৩-৫

৪৪. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.১০, পৃ.৩১; আল-হায়তমী, তুহফাতুল মুহতাজ,খ.৯, পৃ. ১৫২

৪৫. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ. ৩২৭

জায়গায় রেখে কিংবা শীতের সময় কাপড় পরতে বারণ করে শাস্তি দেয়াও জায়িয নয়। তাছাড়া ধুয়াঁয় ভরপুর ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ রেখে শাস্তি দেয়াও সঙ্গত নয়।[৪৬]

৬. বিবস্ত্র করা

শরীরের কাপড়-চোপড় খুলে বিবস্ত্র করে শাস্তি দেয়াও হারাম। কেননা এতে লজ্জাস্থান খুলে যায়।[৪৭]

৭. হেয় ও অপমানকর শাস্তি দেয়া

যে সব শাস্তিকে ব্যক্তি নিজের জন্য অত্যন্ত হেয় ও অপমানকর মনে করে এবং যা ভবিষ্যতে তার সুস্থ ও পবিত্র জীবন যাপনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, সেরূপ শাস্তিও দেয়াও উচিত নয়। যেমন উচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তিকে চেহারায় কালি মেখে[৪৮] কিংবা মাথা মুণ্ডিয়ে অপমানিত করা প্রভৃতি। এ কারণেই আটক ব্যক্তিদের গলদেশে বেড়ী পরানো এবং প্রহার করার সময় যমীনে শোয়ানো প্রভৃতিও বৈধ নয়।[৪৯]

৮. গালিগালাজ করা

কাউকে অভিসম্পাত করে কিংবা অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে অথবা মা-বাবার নাম ধরে গালি দিয়ে শাস্তি দেয়া জায়িয নেই। তবে যালিম, সীমালঙ্ঘনকারী প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে শিক্ষা দেয়া দূষণীয় নয়।[৫০]

৯. ওযু ও নামায পড়তে এবং হাজত পূরণ করতে বাধা দেয়া

আটক ব্যক্তিকে ওযু করার ও নামায পড়ার সুযোগ দিতে হবে। ওযু ও নামায পড়া থেকে বারণ করা জায়িয নয়। অনুরূপভাবে হাজত পূরণ করতে বাধা দিয়ে শাস্তি দেয়াও বৈধ নয়।[৫১]

---

৪৬. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ. ৩২৭

৪৭. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭,পৃ. ৬০;আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ, খ.৫, পৃ. ৬৩

৪৮. হানাফী ও মালিকী ইমামগণের মতে, চেহারায় কালি মেখে শাস্তি দেয়া উচিত নয়। কেননা এটা চেহারার এক ধরনের বিকৃতি সাধন। তবে শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, এতে কোন অসুবিধা নেই। হযরত 'উমার (রা) সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীর মুখে কালি মেখে দিতেন। তবে আল্লামা সারাখসী (রহ) তাঁর এ কাজের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, হযরত 'উমার (রা) প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা কল্যাণকর মনে করেছিলেন বলে তা করেছিলেন। (আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.১৬, পৃ.১৪৫; আল-বাজী, আল-মুন্তকা, খ.৫, পৃ.১৯০; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১১, পৃ. ৩৫৩)

৪৯. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ, খ.৫, পৃ. ৬৩

৫০. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ. ৩২৮

৫১. তদেব

১০. গলা টিপে ধরা, গলা মোচড়ানো ও চপেটাঘাত করা

তা'যীর হিসেবে গলা টিপে ধরা, গলা মোচড়ানো ও চপেটাঘাত করা উচিত নয়। কারণ, এ সবে ব্যক্তিকে শুধু অপমানই করা হয়; সংশোধন কিংবা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য থাকে না বললেই চলে।[৫২]

এগুলো ছাড়াও মাথায় তেল ঢেলে দিয়ে কিংবা দাঁড়ি মুণ্ডিয়ে দিয়েও শাস্তি দেয়া হারাম। অনুরূপভাবে কাউকে বেঁধে রেখে কোন হিংস্র প্রাণি কিংবা সাপ-বিচ্ছুকে তার প্রতি লেলিয়ে দেয়াও জায়িয নয়।[৫৩]

তা'যীরের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের বিধান ঃ

তা'যীরের উদ্দেশ্য যেহেতু শিক্ষা প্রদান; কাউকে অনর্থক কষ্ট দেয়া বা ধ্বংস করা নয়, তাই শাস্তি কার্যকর করার সময় পূর্ণ সতর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান করা কিংবা অস্বাভাবিকভাবে প্রহার করা সীমালঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হবে। অধিকন্তু, এ রূপ শাস্তিতে কারো কোন ক্ষতি সাধন হলে শাস্তি দানকারী এর জন্য দায়ী থাকবে। তদুপরি কোন ধরনের সীমা লঙ্ঘন ছাড়াই স্বাভাবিক শাস্তি বা প্রহারেও যদি কেউ মারা যায় বা কারো কোন দৈহিক ক্ষতি সাধিত হয়, তাহলেও শাস্তিদানকারী এর জন্য দায়ী থাকবে।[৫৪] যেমন অবাধ্যতার জন্য কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে স্বাভাবিক প্রহার করে এবং এতে সে যদি মারা যায় বা তার দৈহিক কোন ক্ষতি সাধিত হয়, তাহলে এর জন্য স্বামী দায়ী থাকবে।[৫৫] কেননা শিক্ষা দান করার উদ্দেশ্যে শাস্তি দেয়ার অধিকার যদিও তার রয়েছে, তবে এ অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্ত্রীর সার্বিক নিরাপত্তার কথা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।

অনুরূপভাবে কোন শিক্ষক যদি কোন ছাত্রকে শিক্ষা দান করার উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক প্রহার করে এবং এতে সে যদি মারা যায় কিংবা তার কোন দৈহিক ক্ষতি হয়, তাহলেও শিক্ষক দায়ী থাকবে। কেননা শিক্ষা দান করার উদ্দেশ্যে

---

৫২. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১২, পৃ.২৫৬-২৫৭; খ.৩০, পৃ.২৭১

৫৩. ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ, খ.৬, পৃ.৫৩৪; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ. ৩২৮

৫৪. মুল্লা খসরু, দুরারুল হুক্কাম, খ.২, পৃ.৭৭; ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৫, পৃ.৫৪; গানিম, মাজমা'..., পৃ.২০১; আল-আনসারী, আসনাল মাতালিব, খ.৪, পৃ.১৬২-৩; আল-হায়তমী, তুহফাতুল মুহতাজ, খ.৯, পৃ.১৯২; আল-মরদাভী, আল-ইনসাফ, খ.১০, পৃ.১৬; আল-মাওয়াক, আত-তাজ, খ.৮, পৃ.৪৩৭; 'উলায়শ, মিনহুল জলীল, খ.৯, পৃ. ৩৫৮-৯

৫৫. এটা হানাফী ও শাফি'ঈগণের অভিমত। মালিকী ও হাম্বলীগণের মতে, এর জন্য স্বামী দায়ী থাকবে না।

শাস্তি দেয়ার অধিকার যদিও শিক্ষকের রয়েছে, তবে এ অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ছাত্রের সার্বিক নিরাপত্তার কথা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। কেননা শাস্তির উদ্দেশ্য তাকে শিক্ষা দেয়া, মেরে ফেলা নয়। মরে গেলে বোঝা যাবে যে, সে অবশ্যই সীমালঙ্ঘন করেছে।[৫৬]

তদ্রূপ কোন পিতা, দাদা বা অভিভাবক যদি তার কোন সন্তান বা পোষ্যকে শিক্ষা দান করার উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক প্রহার করে এবং এতে সে যদি মারা যায় কিংবা তার কোন দৈহিক ক্ষতি হয়, তাহলেও তারা দায়ী থাকবে। কেননা শিক্ষকদের মতো শিক্ষা দান করার উদ্দেশ্যে শাস্তি দেয়ার অধিকার যদিও তাদের রয়েছে, তবে এ অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সন্তানের বা পোষ্যের সার্বিক নিরাপত্তার কথা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।[৫৭]

তবে শাসক বা তার প্রতিনিধির হাতে কোন বিধিবদ্ধ শাস্তি কার্যকর করার সময় কেউ মারা গেলে এর জন্য সে দায়ী থাকবে না। কেননা শরী'আতের নির্দেশ কার্যকর করাই হল শাসকের দায়িত্ব। আর শরী'আতের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে কারো কোন ক্ষতি হলে বা মারা গেলে এ জন্য সে দায়ী থাকবে না।[৫৮]

অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তা'যীরের বিধান ঃ

নিছক অভিযোগের ভিত্তিতে, যদি তা প্রমাণিত না হয়, তা হলে হদ্দ কায়িম করা যাবে না। এটাই সর্বসম্মত অভিমত। তবে হানাফী ও মালিকী ইমামগণের মতে, বিচারক কিংবা শাসক অবস্থার দাবী অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তা'যীরী শাস্তি দিতে পারবে, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধে লিপ্ত হয়েছে তার কোন লক্ষণ দেখা যায়, যদিও তা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয় অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি জনগণের মধ্যে বিপর্যয় ও হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী হিসেবে কুখ্যাত হয়।

যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে জনসমাজে সুখ্যাত হয়, তা হলে তাকে কোনভাবে নিছক অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোন রূপ

---

৫৬. এটা শাফি'ঈগণের অভিমত। মালিকী ও হাম্বলীগণের মতে, স্বাভাবিক প্রহারে ছাত্র মারা গেলে শিক্ষক দায়ী থাকবে না। হানাফীগণের মতে, প্রহারের ক্ষেত্রে পিতা কিংবা অভিভাবকের অনুমতি থাকলে শিক্ষক দায়ী থাকবে না। তবে তাদের অনুমতি ছাড়াই স্বাভাবিক প্রহারে মারা গেলে শিক্ষক দায়ী থাকবে।

৫৭. এটাই ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর অভিমত। তবে সাহেবাইনের মতে, তারা দায়ী থাকবে না।

৫৮. এটা হানাফী ও হাম্বলীগণের অভিমত। শাফি'ঈগণের মতে, সে দায়ী থাকবে। কেননা শাস্তি দেয়ার অধিকার যদিও তার রয়েছে, তবে এ অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সার্বিক নিরাপত্তার কথা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। কোন কোন মালিকীর মতে, যদি শাসক নিরাপত্তা ও সুস্থ থাকার বিষয়টি মাথায় প্রবলভাবে রেখেই শাস্তি প্রদান করে থাকে তা হলে সে কোন রূপ দায়ী থাকবে না। অন্যথায় দায়ী থাকবে।

শাস্তি দেয়া যাবে না; বরং অভিযোগকারী যদি অভিযোগ প্রমাণিত করতে না পারে, তাকেই শাস্তি দেয়া হবে। যাতে কোন অসৎ ব্যক্তি পবিত্র চরিত্রের লোকদের মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে।[৫৯] যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি সৎ কি অসৎ জানা না যায়, তা হলে তাকে বন্দী করে রাখা যাবে, যতক্ষণ না তার অবস্থা স্পষ্ট হবে।[৬০] যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি কুখ্যাত অপরাধী বা সন্ত্রাসী হয়, তাহলে যে সব অপরাধ সচরাচর প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য (যেমন চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ছিনতাই, অপহরণ প্রভৃতি) সে সবের জন্য তাকে নিছক অভিযোগের ভিত্তিতে স্বীকারোক্তি লাভের উদ্দেশ্যে প্রহার করাও যেতে পারে,[৬১] বন্দী করেও রাখা যেতে পারে।[৬২] বর্তমান সমাজে এ অবস্থাই সমধিক প্রচলিত রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি সৎ কি না জানা নাই, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করানোর জন্য দুজন সাধারণ লোক কিংবা একজন ন্যায়বান লোকের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তবে কুখ্যাত অপরাধী ও সন্ত্রাসীর ক্ষেত্রে বিচারক কিংবা শাসকের অবগতিই যথেষ্ট।[৬৩]

---

৫৯. এটাই অধিকাংশ ইমামগণের অভিমত। তবে ইমাম মালিক ও আশহাবের মতে, অভিযোগকারীকে শাস্তি দেয়া সমীচীন নয়; তবে যদি প্রমাণিত হয় যে, সে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিছক সমাজে কলঙ্কিত করার বা কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যেই অভিযোগ আরোপ করেছে, তা হলেই তাকে শাস্তি দেয়া যাবে।

৬০. কারো কারো মতে, তার কারাভোগের মেয়াদ এক মাসের চাইতে বেশি হওয়া উচিত নয়। তবে মাওয়ার্দী বলেন, এর জন্য মেয়াদ নির্ধারিত করে দেয়া সমীচীন নয়; বরং বিচারক বা শাসক ব্যক্তির অবস্থা ও অভিযোগের প্রকৃতি বিবেচনা করে কম -বেশি যে কোন মেয়াদের জন্য তাকে বন্দী করে রাখতে পারবে।

৬১. এটাই মালিকী ও হাম্বলী ইমামগণের অভিমত। ইবনুল কাইয়িম বলেন, বিচারক কিংবা শাসকের জন্য এ ধরনের অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্বীকারোক্তি আদায়ের উদ্দেশ্যে মারধর করতে কোন অসুবিধা নেই। ইবনু আবিল হাকীকের ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে, জনৈক ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ লুকিয়ে রেখেছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীকারোক্তি আদায় করার উদ্দেশ্যে তাকে প্রহার করার জন্য হযরত যুবায়র (রা)কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত যুবায়র (রা) স্বীকৃতি আদায় করা পর্যন্ত তাকে প্রহার করতে থাকেন। তবে বিভিন্ন মাযহাবের অধিকাংশ ইমামের মতে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মারধর করা সমীচীন নয়; তবে বন্দী করে রাখা যেতে পারে। (আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ.২৯২)

৬২. ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.৫, পৃ. ৩৫২; ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.৪, পৃ.৬৭; আল-বাজী, আল-মুন্তকা, খ.৭, পৃ.১২৪; আল-মাওয়ার্দী, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ২৭৩-৬; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৩, পৃ.১৪৪, খ.১৪, পৃ.৯৪-৫, খ.১৬, পৃ.২৯২-৩

৬৩. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৪, পৃ.৯৫

ইসলামে আটকাদেশ ও কারাবিধান ঃ

বন্দী করে রাখার বিধিসম্মত অবস্থাসমূহ ঃ

ক. মানব জীবন ও দেহের বিরুদ্ধে কারাবাস উপযোগী বিভিন্ন অপরাধ ঃ

১. ইচ্ছাকৃত হত্যা, যদি নিহত ও খুনীর মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য থাকে

ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর সাথে নিহত ব্যক্তির মর্যাদাগত বৈষম্যের কারণে[৬৪] যদি কিসাসের বিধান প্রয়োগ করা না যায়, তা হলে হত্যাকারীকে এক বছরের জন্য কারাবাস এবং একশত বেত্রাঘাতের দণ্ড দেয়া হবে। এটা মালিকী ইমামগণের অভিমত। তবে অধিকাংশ ইমামের মতে, কারাদণ্ড দেয়া সঙ্গত নয়। হানাফী ইমামগণের মতে, এমতাবস্থায়ও কিসাস ওয়াজিব হবে। আর শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, দিয়াত দিতে হবে।[৬৫]

২. অভিভাবক কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শিত ইচ্ছাকৃত হত্যা

অধিকাংশ ইমামের মতে, ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীকে যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা ক্ষমা করে দেয়, তা হলে তাকে কারাদণ্ড দেয়া সমীচীন নয়। তবে সে যদি কুখ্যাত সন্ত্রাসী হয়, তা হলে শাসক কিংবা বিচারক অবস্থানুপাতে তাকে যে কোন শাস্তি দিতে পারবে। তবে মালিকীগণের মতে, তাকেও একশতটি বেত্রাঘাত ও এক বছরের কারাবাসের দণ্ড দেয়া হবে।[৬৬]

৩. হত্যাকাণ্ডে পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করা

অধিকাংশ ইমামের মতে, যে ব্যক্তি কাউকে আটকে রাখল যাতে অন্য জন এসে তাকে হত্যা করে, তাহলে আটককারী ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দেয়া যেতে পারে। তবে মালিকীগণের মতে, আটককারী ব্যক্তিকেও হত্যাকারীর মতোই কিসাস হিসেবে হত্যা করা হবে। কেননা সেও হত্যাকর্মে শরীক

---

৬৪. যেমন কোন স্বাধীন ব্যক্তি কোন দাসকে হত্যা করল কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের কোন মুসলিম নাগরিক কোন যিম্মী কিংবা মুস্তামনকে হত্যা করল, তা হলে মালিকী ইমামগণের মতে- কিসাস হিসাবে হত্যাকারীকে হত্যা করা যাবেনা।

৬৫. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৬, পৃ. ১৩০-১; শাফি'ঈ, আল-উম্ম, খ.৬, পৃ.৪০; মালিক, আল-মুদাওয়ানাহ, খ.৪, পৃ. ৬৩৩-৪; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ.২৯৭

৬৬. আল-বাজী, আল-মুন্তকা, খ.৭, পৃ.১২৪; ইবনু ফারহুন, তাবছিরাতুল হুক্কাম, খ.২, পৃ.২২৯; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ.২৯৮

রয়েছে। তবে যদি আটককারী না জানে যে, লোকটি এসে তাকে হত্যা করবে, তবেই তাকে একশতটি বেত্রাঘাত ও এক বছরের কারাবাস দণ্ড দেয়া হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কাউকে রশি দিয়ে পেছনে হাত বেঁধে শ্বাপদ সংকুল অরণ্য কিংবা সর্পাঞ্চলে ফেলে রাখল, এর পর হিংস্র প্রাণি কিংবা সাপ এসে তাকে মেরে ফেলল, তাহলে তাকে অধিকাংশের মতে, কারাদণ্ড দিতে হবে। কোন কোন হানাফীর মতে, তাকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিতে হবে।[৬৭]

৪. ইচ্ছাকৃত হত্যা, যদি কিসাস নিতে দেরি হয়

কিসাসের বিধান হিসেবে যাকে হত্যা করার কিংবা কোন অঙ্গ কেটে নেয়ার ফায়সালা দেয়া হয়েছে তাকে শাস্তি কার্যকর করা পর্যন্ত বন্দী করে রাখতে হবে, যাতে সে পালিয়ে যেতে না পারে। অনুরূপভাবে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা অনুপস্থিত থাকলে তাদের উপস্থিত হওয়া পর্যন্তও হত্যাকারীকে বন্দী করে রাখা প্রয়োজন। শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, অভিভাবকরা ছোট হলে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত এবং পাগল হলে সজ্ঞান হওয়া পর্যন্তও হত্যাকারীকে বন্দী করে রাখা প্রয়োজন।[৬৮]

৫. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর আঘাত হানা

যে ব্যক্তি কারো দেহের কোন অঙ্গে এমনভাবে আঘাত করল বা ক্ষতি সাধন করল, যে রূপ আঘাত বা ক্ষতির কিসাস নেওয়া সম্ভব নয়, তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং অপরাধের শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড দেয়া হবে।[৬৯]

৬. অন্যায়ভাবে কাউকে প্রহার করা, লাথি দেয়া...

যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে প্রহার করল কিংবা লাথি দিল বা চপেটাঘাত করল, তাহলে হানাফী ও মালিকীগণের মতে, তাকেও কিছু দিনের জন্য আটকাদেশ দেয়া যাবে, যদি তার কৃতকর্মের জন্য তাকে বড় ধরনের শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন পড়ে। অন্যান্য ইমামের মতে, যে কোন

---

৬৭. শাফি'ঈ, আল-উম্ম, খ.৬, পৃ.৪০; যায়লা'ঈ, তাবয়ীন, খ.৬, পৃ. ১৫৩; ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.৬, পৃ.৬২৪; আল-বাজী, আল-মুন্তকা, খ.৭, পৃ.১২১-২

৬৮. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৬, পৃ. ১০৫-৬, ১৭৮; ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.৬, পৃ.৫৬৮-৯; আর-রামালী, নিহায়াতুল মুহতাজ, খ.৭, পৃ.২৯৯; আর-রুহায়বানী, মাতালিব.., খ.৬, পৃ.৪৪

৬৯. আল-বাজী, আল-মুন্তকা, খ.৭, পৃ.১২১-২; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ.২৮৯, ২৯৮

সাধারণ তা'যীরী শাস্তি দেয়া যাবে। ইবনু তাইমিয়্যার (রহ) মতে, এ ক্ষেত্রে কিসাসের বিধান কার্যকর হবে।[৭০]

৭. বদ নজর দান

বদনজর দানকারীকে তার বদনজর থেকে লোকদেরকে বাঁচানোর জন্য গৃহবন্দী করে রাখা যেতে পারে, যদি সে নজর দিয়ে লোকদের ক্ষতি করা থেকে ফিরে না আসে। কারো কারো মতে, কারাগারেই তাকে বন্দী করা রাখা হবে, যতক্ষণ না সে ঈর্ষা মুক্ত পবিত্র মনের মানুষে পরিণত হয়।[৭১]

৮. অপরাধীকে আশ্রয় দেয়া

যে ব্যক্তি কোন হত্যাকারী কিংবা কোন সন্ত্রাসী বা অপরাধীকে আশ্রয় দান করবে, তাকেও অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীর সাথে শরীক বিবেচনা করা হবে। তাই তাকেও বন্দী এবং প্রহার করা যাবে, যতক্ষণ না সে অপরাধী সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানাবে অথবা তাকে ধরতে সহায়তা করবে।[৭২]

৯. কসম অস্বীকার করা

যে সব হত্যার প্রমাণ কসম দ্বারা হয়ে থাকে, সে সবের ক্ষেত্রে যদি কেউ কসম করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকেও কসম করা পর্যন্ত বন্দী করে রাখা যাবে। এটাই অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ) ও অন্য কতিপয় ইমামের মতে, কসম করা থেকে অস্বীকার করার কারণে বন্দী করে রাখা সমীচীন হবে না; তবে তার থেকে দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণ করা হবে।[৭৩]

১০. ভুল চিকিৎসা করা

শাস্ত্রজ্ঞানহীন কেউ যদি ভুল চিকিৎসা করে অথবা কোন ডাক্তার অবহেলা করে ভুল চিকিৎসা করে কারো ক্ষতি সাধন করে, তাকে প্রহার করা যাবে এবং কারাদণ্ডও দেয়া যাবে। এটা মালিকীগণের অভিমত। তবে হানাফীগণের মতে, তাকে তার কাজ চালিয়ে যেতে বাধা প্রদান করা হবে, যাতে সে লোকের ক্ষতি করতে না পারে।[৭৪]

---

৭০. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ.২৯৯

৭১. আল-মরদাভী, আল-ইনসাফ, খ.১০, পৃ. ২৪৯; আল-মাওয়াক, আত-তাজ.., খ.৮, পৃ.৪০৯

৭২. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ.২৯৯

৭৩. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৬, পৃ. ১১১; ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৮, পৃ. ৪৪৬-৭; আল-বাজী, আল-মুন্তকা, খ.৭, পৃ.৭৩; আল-মরদাভী, আল-ইনসাফ, খ.১০, পৃ.১৪৮-৯; আল-জুমাল, ফুতুহাত.., খ.৫, পৃ.১১০

৭৪. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ.৩০০

খ. ধর্মের বিরুদ্ধে কারাবাস উপযোগী বিভিন্ন অপরাধ ঃ

১. ধর্মত্যাগ

যদি প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলিম ধর্মত্যাগ করেছে, তাহলে তাকে বন্দী করে রাখতে হবে যতক্ষণ না তার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূরিভূত হয় এবং তাকে তাওবার জন্য সুযোগ দিতে হবে। তবে তাকে বন্দী করা ওয়াজিব কি না -এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মালিকী, শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, তাকে কতল করার আগে তাওবার সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে বন্দী করা ওয়াজিব। আর হানাফীগণের মতে, ওয়াজিব নয়; মুস্তাহাব।[৭৫]

২. ধর্মদ্রোহিতা

যিন্দীককেও[৭৬] মুরতাদের মতো তাওবার সুযোগ দিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে তাকে বন্দী করে রাখা যাবে। এটা কতিপয় হানাফী, শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামের অভিমত। তাদের বক্তব্য হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুনাফিকদের সম্পর্কে অবগত থাকার পরও তাদেরকে হত্যা করেননি। তা থেকে জানা যায় যে, যিন্দীকদেরকেও তাওবার সুযোগ দিতে হবে এবং তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। তবে মালিকী ইমামগণের মতে, যিন্দীককে হত্যা করা হবে। তাকে তাওবার সুযোগ দেয়া যাবে না। অধিকন্তু, সে তাওবার দাবী করলেও তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না; তবে সে যদি ধরা পড়ার আগেই তাওবা করে, তাহলেই তার কথা আমলে নেয়া হবে। এর কারণ হলো, তার নিকট এমন কোন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া মুশকিল, যা থেকে জানা যাবে যে, সে সত্যি সত্যিই তাওবা করে ইসলামে ফিরে এসেছে। কেননা সে তো এমনিতে ইসলামের ঘোষণা দান করে, ভাল মুসলিমের মতো জীবন যাপন করে। ভেতরে ভেতরেই কুফরী লুকিয়ে রাখে। তাই তার ফিরে আসার মধ্যে নতুন কিছুই নেই।[৭৭]

---

৭৫. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.১০, পৃ.৯৮-৯; আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.১৩৪-৫; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৯, পৃ.১৭-৮; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.৬, পৃ.৬৮-৯; আল-বাজী, আল-মুন্তকা, খ.৫, পৃ.২৮২-৩

৭৬. যিন্দীক হল মূলত কাফির, অন্তরে কুফরী ধারণাকে লালন করে; তবে বাহ্যিকভাবে নিজেকে মুসলিম হিসেবে প্রকাশ করে। তবে হঠাৎ কোন সময় তার অন্তরের এ কপটতা প্রকাশ পেয়ে যায়।

৭৭. ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৯, পৃ. ১৮-৯; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.৬, পৃ.৯৮; শাফি'ঈ, আল-উম্ম, খ.৬, পৃ. ১৬৯-৭০; আল-বাজী, আল-মুন্তকা, খ.৫, পৃ. ২৮২; ইবনু মুফলিহ, আল-ফুরূ', খ.৬, পৃ.১৬৬

৩. নবী পরিবার ও সাহাবীগণের প্রতি অশোভনীয় আচরণ

যে ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিবারের কাউকে গালি দেবে, শাস্তিস্বরূপ তাকে প্রহার করতে হবে, তার নাম জনসমাজে প্রচার করতে হবে এবং দীর্ঘ দিন তাকে কারাবন্দী করে রাখতে হবে। কেননা নবী (স সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিবারকে গালি দেয়া প্রকারান্তরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি অসম্মান করা। অনুরূপভাবে যে আরবদেরকে কিংবা বনু হাশিমকে গালি দেবে, লা'নত করবে, তাকেও প্রহার করতে হবে এবং কারাদণ্ড দিতে হবে। তাছাড়া যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি কোন মিথ্যারোপ করবে, তাকেও প্রহার করতে হবে, তার নাম জনসমাজে প্রচার করতে হবে এবং তাকে কারাবন্দী করে রাখতে হবে। কেননা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করার মানে হল তাঁকে হেয় করা। তাই তাকে ছেড়ে দেয়া যাবে না, যতক্ষণ না বোঝা যাবে যে, সে সত্যিকার অর্থে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করেছে। আর যে ব্যক্তি হযরত 'আয়িশা (রা)-এর পবিত্র চরিত্রের প্রতি কলঙ্ক লেপন করবে, তাকে তাওবার সুযোগ দিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে তাকে বন্দী করা হবে। যদি সে তাওবা না করে, তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে এবং এ কারণে তাকে হত্যা করতে হবে। আর যে ব্যক্তি কোন সাহাবী (রা)-কে গালি দেবে কিংবা তাঁদের কারো শানে কোন অশোভনীয় বাক্য উচ্চারণ করবে, তাকেও কঠোর কারাদণ্ড দিতে হবে।[৭৮]

৪. সালাত ত্যাগ করা

যে ব্যক্তি নামাযের ফরযিয়্যাতকে অস্বীকার করে কিংবা তার ফরযিয়্যাতের প্রতি তাচ্ছল্য প্রদর্শন করে নামায ছেড়ে দিল, তার ব্যাপারে ইমামগণের সর্বসম্মত মত হলো, সে কাফির মুরতাদ হয়ে গেল। তার হদ্দ হল মৃত্যুদণ্ড। তবে তাকে এ শাস্তি কার্যকর করার আগে তিন দিন সুযোগ দেয়া হবে, যাতে সে এ সময়ের মধ্যে তাওবা করে ফিরে আসে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অলসতা বশতঃ কিংবা হালকা মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দেয় প্রথমত তাকে নামায পড়ার জন্য বলা হবে। এরপরও যদি সে

---

৭৮. ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৫, পৃ.১৩৬; ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.৪, পৃ. ২৩৬-৭; আল-বাজী, আল-মুন্তকা, খ.৭, পৃ.২০৬; আর-রামালী, নিহায়াতুল মুহতাজ, খ.৭, পৃ.৪১৬; আর-রুহায়বানী, মাতালিব..,খ.৬, পৃ.২৮৭

ফিরেই নামায তরক করতে থাকে তাহলে তার শাস্তি কি হবে -এ ব্যাপারে ইমামগণের তিনটি মত দেখা যায়।[৭৯] এগুলো হলঃ

ক. ইমাম যুহরী, আবূ হানীফা ও ইমাম মুজনী আশ-শাফি'ঈ (রহ) প্রমুখের মতে, এ ধরনের ব্যক্তিকে নামায তরক করার কারণে হত্যা করা বিধেয় নয়; বরং তাকে বন্দী করে রাখা হবে, যতক্ষণ না সে নামায পড়তে অভ্যস্ত হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ' و الثيب الزاني ' والمفارق لدينه التارك للجماعة. -"তিন ব্যক্তি ছাড়া কোন মুসলিমের রক্ত হালাল হবে না। এ তিন ব্যক্তি হলঃ অন্যায়ভাবে অপরকে হত্যাকারী, বিবাহিত ব্যভিচারী এবং মুসলিম দল ও ধর্মত্যাগকারী ব্যক্তি।"[৮০] এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নামায তরককারী উপর্যুক্ত তিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং তাকে হত্যা করা যাবে না।

খ. মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামগণের মতে, এ ধরনের ব্যক্তিকে নামায তরক করার কারণে প্রথমে বন্দী করা হবে এবং তিন দিন সুযোগ দেয়া হবে, যাতে সে এ সময়ের মধ্যে তাওবা করে নামায পড়তে শুরু করে। অন্যথায় তাকে হদ্দ হিসেবে হত্যা করা হবে। তাঁদের মতে, এ ধরনের নামায তরককারী কাফির হবে না; ফাসিক হবে।

গ. ইমাম আহমাদের বিশুদ্ধ বর্ণনানুযায়ী এ ধরনের ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। সুতরাং তাকে মুরতাদের মত প্রথমে বন্দী করা হবে এবং তিন দিন সুযোগ দেয়া হবে, যাতে সে এ সময়ের মধ্যে তাওবা করে নামায পড়তে শুরু করে। অন্যথায় তাকে মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা হবে। হযরত 'আলী (রা), হাসান বসরী (রহ), আওযা'ঈ (রহ) ও আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ) প্রমুখও এ মত পোষণ করেন। তাঁরা বিভিন্ন হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল من ترك

---

৭৯. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.২, পৃ.৩৩৯, খ.১৬, পৃ.৩০২-৩, খ.২২, পৃ.১৮৭, খ.২৭, পৃ.৫৩-৪; নববী, আল-মাজমূ', খ.৩, পৃ.১৮-৯; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.২, পৃ.১৫৬-৮; আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.৬৪; ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৫. পৃ.৪৯; আশ-শাওকানী, নায়লুল আওতার, খ.১, পৃ.২৪৮

৮০. সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং : ৬৮৭৮; মুসলিম, (কিতাবুল কাসামাহ), হা.নং : ১৬৮৬

الصلوة متعمدا فقد كفر. - "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত সালাত তরক করল, সে কুফরী করল।"[৮১] - إن بين الرجل و بين الشرك و الكفر ترك الصلوة. "কোন ব্যক্তির ঈমান এবং তার শিরক ও কুফরীর পরিচয়ের মানদণ্ড হল সালাত তরক করা।"[৮২]

৫. রোযা ছেড়ে দেয়া

যে ব্যক্তি রোযার ফরযিয়্যাতকে অস্বীকার করে কিংবা তার ফরযিয়্যাতের প্রতি তাচ্ছল্য প্রদর্শন করে রোযা ছেড়ে দিল, তার ব্যাপারেও ইমামগণের সর্বসম্মত মত হলো, সে কাফির মুরতাদ হয়ে গেল। তার হদ্দ হল মৃত্যুদণ্ড। তবে তাকে এ শাস্তি কার্যকর করার আগে তিন দিন সুযোগ দেয়া হবে, যাতে সে এ সময়ের মধ্যে তাওবা করে ফিরে আসে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অলসতা বশতঃ কিংবা হালকা মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ছেড়ে দেয় তার ব্যাপারে ইমামগণের সর্বসম্মত মত হল, সে কাফির হবে না এবং তাকে হত্যাও করা যাবে না; বরং তাকে কারাদণ্ড দেয়া হবে। কারাগারের মধ্যে তাকে দিনে পানাহার থেকে বারণ করা হবে, যাতে রোযার বাহ্যিক আকৃতিটা হলেও সে অর্জন করতে পারে। অনেক সময় দেখা যাবে, সে এমতাবস্থায় সত্যিকারভাবে রোযার নিয়াতও করে ফেলবে। মাওয়ার্দীর মতে, তাকে রোযার মাস পুরোই বন্দী করে রাখা হবে।[৮৩]

রমযান মাসে যে মাদক সেবন করবে তাকে মাদক সেবনের জন্য হদ্দ হিসেবে ৮০টি বেত্রাঘাত তো করতেই হবে। এর পাশাপাশি রমযানের পবিত্রতা নষ্ট করার কারণে তাকে বন্দী করা হবে এবং অতিরিক্ত আরো ২০টি বেত্রাঘাত করা হবে। হযরত 'আলী (রা) থেকেও এধরনের মত বর্ণিত রয়েছে।[৮৪]

৬. বিদ'আত

যে বিদ'আতী লোকদেরকে বিদ'আতের প্রতি আমন্ত্রণ জানায়, তার ব্যাপারে হানাফী ইমামগণ সহ অধিকাংশ ইমামের অভিমত হল, প্রথমত তাকে তার এ

---

৮১. আত্‌ তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত, হা.নং : ৩৩৪৮

৮২. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল ঈমান), হা.নং : ৮২

৮৩. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ.৩০৩; আল-মাওয়ার্দী, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ.৭২-৩; আল-জসসাস, আহকামুল কুর'আন, খ.৩, পৃ.১২৩; ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.২, পৃ.৩১৮; ইবনু রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ.১, পৃ. ২৫০

৮৪. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৪, পৃ. ৩৩; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.৫, পৃ. ৩৪৯

প্রচারকর্ম থেকে বারণ করা হবে। যদি সে সহজে ফিরে না আসে, তা হলে ক্রমশ তাকে প্রহার করা হবে এবং প্রয়োজনে বন্দী করে রাখা হবে। তারপরও ফিরে না আসলে তাকে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে হত্যা করা জায়িয হবে। কেননা বিদ'আতী ব্যক্তি যে ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে, তা অন্য যে কোন ফিতনার চাইতে গুরুতর ও ব্যাপক। কেননা বিদ'আতের কারণে দীন বিকৃত হয়ে যায় এবং উম্মাতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। তবে ইমাম আহমাদের এক বর্ণনা মতে, তাকে বন্দী করে রাখা হবে, যতক্ষণ না সে তার অপপ্রচার থেকে বিরত থাকবে। প্রয়োজনে তাকে আমরণ কারাদণ্ড দেয়া যেতে পারে। তাকে হত্যা করা সমীচীন নয়। কোন কোন মালিকী ইমামও এমত পোষণ করেন।

তবে যে বিদ'আতী লোকদেরকে নিজের বিদ'আতের প্রতি আমন্ত্রণ জানায় না, তাকে বন্দী করে রাখা এবং উপদেশে কাজ না হলে প্রহার করাও জায়িয। এটাই হানাফী ও অধিকাংশ মালিকী ইমামের অভিমত। তবে অন্যান্যদের মতে, তাকে যে কোন রূপ তা'যীর করা যাবে। আবার কারো কারো মতে, সে যদি তাওবা করে ফিরে না আসে, তা হলে তাকে হত্যা করাও জায়িয।[৮৫] বর্ণিত আছে, ছবীগ ইবনু 'আসল সাহাবা কিরামের অনুসৃত সুন্নাত ও তাঁদের কুর'আন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যার তোয়াক্কা না করে দীনের মধ্যে বিদ'আতের ভিত্তি রচনা করার উদ্দেশ্যে কুর'আনের মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর পেছনে লেগে থাকত। এ কারণে হযরত 'উমার (রা) তাকে বন্দীও করেছিলেন এবং কয়েকবার প্রহারও করেছিলেন।[৮৬]

৭. অযোগ্য লোকের ফতোয়াবাজি

প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়া কোন ব্যক্তি যদি ফাত্ওয়া দেয়, তাহলে মালিকী ইমামগণের মতে তাকে বন্দী করে রাখা এবং নীতি শিক্ষামূলক শাস্তি দেয়া বৈধ। ইমাম মালিক তাঁর শায়খ রবী'আ (রহ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ بعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق. - "এখানে এমন অনেক মুফতী আছেন, যারা বড় বড় চোরের চাইতেও অধিকতর কারাবাসের উপযোগী।"[৮৭]

৮. কাফফারা আদায় না করা

যে ব্যক্তি কাফফারা আদায় করা থেকে বিরত থাকে শাফি'ঈগণের পুরাতন

---

৮৫. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ.২৮৯, ৩০২-৪

৮৬. আদ-দারিমী, সুনান (বাব : মান হাবাল ফুতয়া..), হা.নং : ১৪৪, ১৪৮

৮৭. 'উলায়শ, ফাতহুল 'আলী আল-মালিক, খ.১, পৃ.৮৬

মতানুযায়ী তাকে আটকে রাখা যাবে। মালিকীগণের মতে, তাকে আটকে রাখা যাবে না; তবে নীতিশিক্ষামূলক শাস্তি দেয়া যাবে। হানাফীগণের মতে, যিহারের ক্ষেত্রে নীতিমূলক শাস্তি দেয়ার পাশাপাশি যদি প্রয়োজন হয় (যেমন- স্বামী যদি কাফফারা আদায় করার আগেই স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে উদ্যত হয়), তাহলে যিহারকারীকে বন্দী করে রেখে কাফফারা আদায় করা যাবে।[৮৮]

গ. কারাবাস উপযোগী বিভিন্ন নৈতিকতা বিরোধী অপরাধ ঃ

১. অবিবাহিতের ব্যভিচার

ইমামগণের সর্বসম্মত মত হল, অবিবাহিত ব্যভিচারীর হদ্দ হিসেবে শাস্তি হল একশতটি বেত্রাঘাত। তবে তাকে দূরদেশে নির্বাসিত করা যাবে কিনা -এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মালিকী, শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, হদ্দের অংশ হিসেবে তাকে দূরদেশে নির্বাসনে এক বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠাতে হবে। তবে হানাফীগণের মতে, রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার প্রয়োজনে বিচারক কিংবা শাসক প্রয়োজন মনে করলেই তাকে এক বছরের জন্য দূর দেশে নির্বাসনে পাঠাতে পারে। নির্বাসিত স্থলে তাকে বন্দী করে রাখা সমীচীন। মালিকীগণের মতে তা ওয়াজিব এবং শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, যদি নির্বাসিত স্থলে গিয়েও তার পক্ষ থেকে কোন ধরনের অযাচিত আচরণের আশঙ্কা থাকে, তবেই তাকে বন্দী করা যাবে। হানাফীগণ মনে করেন, নির্বাসিত ব্যক্তি অনেক সময় নিজের দেশ ও আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে থাকার কারণে আরো নির্লজ্জ ও বিপজ্জনক হয়ে ওঠতে পারে, তাই শাসক যদি ভাল মনে করেন, তাহলে নিজের দেশেই তাকে বন্দী করে রাখতে পারবেন।[৮৯]

২. সমকামিতা

হানাফীগণের মতে, সমকামিতার জন্য তা'যীরী শাস্তিই প্রযোজ্য হবে। তাই বিচারক কিংবা শাসক অপরাধের অবস্থা বিবেচনা করে সমকামী দুজনকেই আজীবন বা দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ড দিতে পারবেন।[৯০]

---

৮৮. ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.৫, পৃ. ৩৭৮; 'উলায়শ, মিনহুল জলীল, খ.১, পৃ.৮৬; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ.৩০৪

৮৯. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.৯, পৃ.৪৪; আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭,পৃ. ৩৯; শাফি'ঈ, আল-উম্ম, খ. ৭, পৃ.১৭১; আল-মরদাভী, আল-ইনসাফ, খ,১০, পৃ.১৭৩-৪; আল-বহুতী, কশশাফ, খ.৬, পৃ.৯১-২; মালিক, আল-মুদাওয়ানাহ, খ.৪, পৃ.৫০৪; আল-বাজী, আল-মুন্তকা, খ.৭, পৃ.১৩৭

৯০. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.৯, পৃ. ৭৭; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.৫, পৃ. ২৬২-৩; ইবনু আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.৪, পৃ.২৭

৩. ব্যভিচারের ত্রুটিপূর্ণ মিথ্যা অপবাদ

যে ব্যক্তি কারো প্রতি যিনার অপবাদ দিল এবং সে যদি একজন সাক্ষীই পেশ করে, তাহলে তাকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাক্ষী পেশ করার উদ্দেশ্যে আটক করে রাখা হবে।[৯১] অনুরূপভাবে কেউ যদি দাবী করে যে, কোন ব্যক্তি তার প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করেছে; তবে তার সাক্ষী এলাকার বাইরে গেছে, তাহলে সাক্ষী হাজির করার জন্য বিচারকের এজলাসে উপবিষ্ট থাকা পর্যন্ত বিবাদীকে আদালতে আটক করে রাখা যাবে।[৯২]

৪. পুনঃ পুনঃ মদ সেবন

মালিকীগণের মতে, মদ্যপায়িতায় অভ্যস্ত ব্যক্তির ওপর হদ্দ কায়িম করার পর তা'যীর হিসেবে তাকে কারাদণ্ড দেয়াও জায়িয।[৯৩] বর্ণিত রয়েছে, হযরত 'উমার (রা) আবূ মিহজন আছ্-ছাকাফীকে মদ্যপায়িতার জন্য আটবার বেত্রাঘাত করেছিলেন। তারপর তাকে বন্দী করার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশের প্রেক্ষিতে তাকে কাদেসিয়ার যুদ্ধের সময় বন্দী করা হয়। পরে অবশ্যই তাওবা করে ফিরে আসার পর তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়।[৯৪]

৫. অসামাজিক ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া

অসামাজিক ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ব্যক্তিকেও কারাদণ্ড দেয়া যেতে পারে, যতক্ষণ না তারা বিশুদ্ধ তাওবা করে সুন্দর ও পবিত্র জীবন যাপনে ফিরে আসবে। এ কারণে কোন পুরুষ যদি কোন বেগানা মহিলাকে চুমো দেয়, কিংবা জড়িয়ে ধরে বা কামভাব সহকারে স্পর্শ করে অথবা যৌনসঙ্গম ছাড়া পরস্পর জড়াজড়ি করে, তাহলে তাদেরকে বন্দী করে রাখা যাবে। অনুরূপভাবে দেহ প্রদর্শনকারিণী মহিলাদেরকেও বন্দী করে রাখা যাবে।[৯৫]

---

৯১. আবুল কাসিম আল-মালিকীর মতে, যিনার অভিযোগকারী যদি একজন সাক্ষীই পেশ করতে পারে, তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করা যাবে না; তবে তাকে কারাদণ্ড দেয়া যাবে, যতক্ষণ না সে এ মর্মে শপথ করবে যে, তার কথার উদ্দেশ্য তাকে অপবাদ দেয়া নয়; বরং গালমন্দ করা। আবার কারো মতে, তাকে এক বছরের জন্য কারাদণ্ড দিতে হবে। আবার কারো মতে, তার ওপর হদ্দই কার্যকর করতে হবে। (আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ.৩০৫)

৯২. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.৬, পৃ.৫৬ খ.৯,পৃ.১০৬; মালিক, আল-মুদাওয়ানাহ, খ.৪, পৃ.৪৮৯

৯৩. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ.৩০৬

৯৪. আবদুর রাযযাক, আল-মুছান্নাফ, হা.নং : ১৭০৭৭; ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ, হা.নং : ৩৩৭৪৬

৯৫. ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৫, পৃ.৪৬; ইবনু ফারহুন, তাবছিরাতুল হুক্কাম, খ.২, পৃ.১৬৫; ইবুন তাইমিয়্যাহ, আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, খ.৩, পৃ.৪১২

৬. মেয়েলিপনা

হানাফীগণের মতে, মেয়েলী পুরুষ অর্থাৎ যে পুরুষ নারীদের মতো চলাফেরা করে এবং বেশভূষা ধারণ করে, তাকেও কারাদণ্ড দেয়া যেতে পারে, যতক্ষণ না সে বিশুদ্ধ তাওবা করে সুন্দর ও পবিত্র জীবন যাপনে ফিরে আসবে। ইমাম আহ্মাদ (রহ)-এর মতে, এ ধরনের লোকের দ্বারা যদি সমাজের পরিবেশ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবেই তাকে বন্দী করা যাবে।[৯৬]

৭. ছেলেমিপনা

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহ) বলেন, যে নারী পুরষদের বেশভূষা ধারণ করে এবং তাদের মতো চলাফেরা করে, তাকেও বন্দী করে রাখা যেতে পারে, অন্ততপক্ষে তাকে তার গৃহে হলেও বন্দী করে রাখা প্রয়োজন, যতক্ষণ না সে বিশুদ্ধ তাওবা করে সুন্দর ও পবিত্র জীবন যাপনে ফিরে আসবে।[৯৭]

৮. অশ্লীলতা

হানাফীগণের মতে, পেশাদার গায়ক-গায়িকা দ্বারা যেহেতু সমাজে অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে বেশি, তাই তাকেও বন্দী করে রাখা জায়িয, যতক্ষণ না সে বিশুদ্ধ তাওবা করে সুন্দর ও সুস্থ জীবন যাপনে ফিরে আসে।[৯৮] অনুরূপভাবে যে সব কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, নাট্যকার ও অভিনেতা সমাজে অশ্লীল ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডের বিষবাষ্প ছড়ায়, তাদেরকেও বন্দী করা রাখা জায়িয, যতক্ষণ না তারা বিশুদ্ধ তাওবা করে সুন্দর ও পবিত্র জীবন যাপনে ফিরে আসে।

ঘ. অন্যের সম্পদের ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপের কারাবাস উপযোগী অপরাধসমূহ ঃ

১. হাত কাটার পর আবার চুরি করা

কোন চোরের হাত কাটার পর যদি সে আর আবারও চুরি করে, তাহলে অধিকাংশ ইমামের মতে, জনগণকে তার অনিষ্টতা থেকে বাঁচানোর প্রয়োজনে

---

৯৬. ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.৫, পৃ.৩৫২; ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৫, পৃ.৪৬; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ.৩০৬

৯৭. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ.৩০৬

৯৮. ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.৫, পৃ.৩৫২; ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৫, পৃ.৪৬

তাকে বন্দী করে রাখা হবে। তবে চুরির সাজা হিসেবে কত বার কর্তনের পর তাকে বন্দী করা হবে- এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।[৯৯]

২. অসংরক্ষিত বস্তু চুরি করা কিংবা চুরির প্রমাণ সন্দেহ বিদ্ধ হওয়া

যে সব চুরির ক্ষেত্রে কোন কারণে হাত কাটা যায় না, সে সব ক্ষেত্রে চোরকে বন্দী করে রাখা যেতে পারে।[১০০] যেমন- মসজিদের জোতা চোর, পানির পাইপ চোর, অনুরূপভাবে যে সমস্ত বস্তু খোলা জায়গায় পড়ে থাকে, যারা এ সব জিনিস চুরি করে তাদের হাত কাটা যাবেনা; তাদেরকে বন্দী করে রাখতে হবে। অনুরূপভাবে যে চোর ঘরের মধ্যে ঢুকে মাল-মাত্তা বের করার জন্য জমায়েত করল; কিন্তু বের করে নিতে পারল না তাকেও বন্দী করে রাখা হবে। অনুরূপভাবে কোন সন্দেহের কারণে চোরের ওপর হদ্দ কার্যকর করা সম্ভব না হলে তাকেও কারাদণ্ড দেয়া যাবে।

৩. চুরির অভিযোগ

যে ব্যক্তির প্রতি চুরির অভিযোগ রয়েছে এবং এর শক্তিশালী লক্ষণও (যেমন চুরি যাওয়া মালের আশে-পাশে বেশ কয়েকবার ঘুরা ফেরা করা ও খুঁজ-খবর নেয়া প্রভৃতি।) যদি খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তাকেও কারাদণ্ড দেয়া যাবে।[১০১]

৪. অপহরণ করা

অপহরণকারীর কর্তব্য হল, অপহৃত সম্পদ তার মালিককে ফিরিয়ে দেয়া। যদি সে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে বন্দী করে রাখতে হবে, যতক্ষণ না সে ফিরিয়ে দেয়। যদি সে দাবী করে যে, অপহৃত সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে, তাহলে বিচারক তাকে অপরাধের মাত্রা ও সম্পদের পরিমাণ বিবেচনা করে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কারাদণ্ড দেবেন। কারো কারো মতে, তাকে কারাদণ্ড দেয়া যাবে না; বরং তাকে অপহৃত সম্পদের মূল্য পরিশোধ করতে হবে।[১০২]

---

৯৯. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.৯, পৃ. ১৪০-১; আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.৮৬-৮৭; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, খ.৯, ১০৯-১১০

১০০. ইবনু ফারহুন, তাবছিরাতুল হুক্কাম, খ.২, পৃ.২৮৮;

১০১. যায়ল'ঈ, তাবয়ীন, খ.৩, পৃ.২১৪; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ.৩০৭

১০২. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.১১, পৃ.৬৬; আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.১৫১

৫.জাতীয় সম্পদ অপচয় করা কিংবা নষ্ট করা

যে ব্যক্তি জাতীয় সম্পদ অপচয় করে কিংবা আত্মসাৎ করে অথবা চুরি করে, তাকেও কারাদণ্ড দেয়া যাবে।[১০৩]

৬. পাওনা আদায়ে টালবাহানা করা

অবস্থাসম্পন্ন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি[১০৪] যদি যদি ঋণ পরিশোধ করতে টালবাহানা করে, তাহলে বিচারক তার অবস্থা ও ঋণের পরিমাণ বিবেচনা করে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কারাদণ্ড দিতে পারবেন। তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালককে ঋণের জন্য কারাদণ্ড দেয়া যাবে না; তবে নীতি শিক্ষামূলক শাস্তি দেয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, স্ত্রীর বকেয়া মাহর এবং খোরপোশও স্বামীর জন্য প্রদেয় ঋণ এবং স্ত্রীর প্রাপ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই কোন স্বামী যদি স্ত্রীর দাবী সত্ত্বেও তা দিতে টালবাহানা করে, তাহলে তাকেও কারাদণ্ড দেয়া যাবে।[১০৫]

৭. যাকাত আদায় না করা

যে ব্যক্তির যাকাতের ফরযিয়াতকে স্বীকার করে; কিন্তু যাকাত পরিশোধ করে না, তাকে হানাফী ইমামগণের মতে কারাদণ্ড দেয়া যাবে।[১০৬]

ঙ. আল্লাহর কিংবা বান্দাহর হকের বিরুদ্ধে কারাবাস উপযোগী অপরাধসমূহ ঃ

আল্লাহর হক হিসেবে বিবেচিত শরী'আতের নির্দেশাবলী লঙ্ঘন করা কারাবাস উপযোগী অপরাধ। যেমন সুদী কারবার করা, ঘুষ খাওয়া, মদ বেচাকেনা করা, কারো সাথে প্রতারণা করা, খাদ্য দ্রব্য গুদামজাত করে রাখা, চারের অধিক বিয়ে করা, দুবোন একত্রে বিয়ে করা, ওয়াক্ফকৃত সম্পদ বিক্রি করে দেয়া, যাকাত ও উশর আদায় না করা প্রভৃতি এ প্রকারের অপরাধ। যে ব্যক্তি এ ধরনের অপরাধে লিপ্ত হবে, তাকেও কারাদণ্ড দেয়া যাবে।

অনুরূপভাবে বান্দাহর হক হিসেবে বিবেচিত শরী'আতের নির্দেশাবলীর লঙ্ঘনও

---

১০৩. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ.৩০৮

১০৪. যদি প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে গেছে, তা হলে তাকে অবস্থাসম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য সুযোগ দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. - "আর যদি সে দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তবেই তাকে অবস্থাসম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সুযোগ দিতে হবে। -সূরা আল বাকারা ঃ ১৮০

১০৫. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২০, পৃ.৯১; যায়ল'ঈ,তাবয়ীন, খ.৪, পৃ.১৮১-২; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.৭, পৃ.২৮৪-৫; আল-বুজায়রমী, তুহফাতুল হাবীব, খ.৩, পৃ.৬৮

১০৬. আল-মাওয়ার্দী, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ.৭২-৩; আল-জসসাস, আহকামুল কুর'আন, খ.৩, পৃ.১২৩; ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.২, পৃ. ৩১৮

কারাবাস উপযোগী অপরাধ। যেমন হকদারদেরকে ওয়াক্‌ফের সম্পদ ভোগ করা থেকে বারণ করা, বেচাকেনার পর পণ্য হস্তান্তর না করা কিংবা মূল্য পরিশোধ না করা, খুলা' তালাকের বিনিময় পরিশোধ না করা, মাহর আদায় না করা, আমানত অস্বীকার করা, আমানতে খিয়ানত করা, নির্ভরশীল লোকদের ব্যয়ভার বহন না করা প্রভৃতি এ প্রকারের অপরাধ। যে ব্যক্তি এ ধরনের অপরাধে লিপ্ত হবে, তাকেও কারাদণ্ড দেয়া যাবে।[১০৭]

চ. বিচারের সাথে সংশ্লিষ্ট কারাবাস উপযোগী উপলক্ষসমূহ ঃ

১. বিচারক পদের নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করা

মালিকীগণের মতে, শাসকের পক্ষ থেকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার পর কেউ যদি গ্রহণযোগ্য কোন কারণ ছাড়া তা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে শাসকের জন্য তাকে আটকে রাখা বৈধ হবে, যতক্ষণ না তিনি তা কবুল করবেন।[১০৮]

২.আদালত অবমাননা করা

যে ব্যক্তি আদালত অবমাননা করে যেমন কেউ আদালত নিয়ে উপহাস করল কিংবা বিচারকের প্রতি অসত্য ও অশোভনীয় মন্তব্য করল বা বিচারকের রায়ের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করল, তাহলে বিচারক আদালত অবমাননা ও অপরাধীর অবস্থা বিবেচনা করে তাকে কারাদণ্ড দিতে পারবেন এবং প্রহারও করতে পারবেন। অনুরূপভাবে যে বাদী-বিবাদী বিচারকের দরবারে এসে পরস্পর একে অপরকে গালিগালাজ করবে, তাদেরকেও আটকাদেশ দিতে পারবেন।[১০৯]

৩. হদ্দ বা কিসাস জাতীয় অপরাধে সাক্ষী-প্রমাণের যথার্থতা নিরূপণ

যে সব অপরাধে শাস্তি হিসেবে হদ্দ বা কিসাসের বিধান রয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে আদালতের কাছে সাক্ষীদের গ্রহণযোগ্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটকে রাখা যাবে। যেমন কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ করে, তাহলে আদালতের নিকট সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত বিবাদীকে আটকে রাখা যাবে।[১১০]

---

১০৭. ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.৪, পৃ.৬৭-৭৬; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ, খ.৩, পৃ. ৩৪৭-৮; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১২, পৃ. ২৫৮, খ.১৬, পৃ.৩১১

১০৮. আল-খারাশী, শারহু মুখতাছারি খলীল, খ.৭, পৃ. ১৪০-১; 'উলায়শ, মিনহুল জলীল, খ.৮, পৃ.২৬৭-৮

১০৯. মুল্লা খসরু, দুরারুল হুক্কাম, খ.৪, পৃ.৫৯৪; ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.৪, পৃ.৫৩-৪

১১০. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.৯, পৃ. ১০৬-৭, ১৭০-১; মালিক, আল-মুদাওয়ানাহ, খ.৪, পৃ. ৫২৭, ৬৪৬

৪. সাধারণ অপরাধে সাক্ষ্য-প্রমাণের যথার্থতা নিরূপণ

যে সব অপরাধের শাস্তি হদ্দ বা কিসাস নয়, সে সব ক্ষেত্রেও বিচারক অপরাধের গুরুতরতা ও ব্যক্তির অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজন মনে করলে সাক্ষীদের গ্রহণযোগ্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কারাদণ্ড দিতে পারবেন।[১১১]

৫. হয়রানী বা ষড়যন্ত্র মূলক মামলা দায়ের করা

যে ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাউকে হয়রানি কিংবা অপমানিত করার জন্য কোন মামলা দায়ের করে এবং বিচারকের কাছে যদি প্রমাণিত হয় যে, বাদী অসৎ উদ্দেশ্যে মামলা দায়ের করেছে, তাহলে বিচারক তাকে নীতি শিক্ষাদানমূলক যে কোন শাস্তি দান করবেন। আর এ ধরনের শাস্তিসমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ের শাস্তি হল কারাদণ্ড। এ ধরনের শাস্তির কারণ হল, যাতে সমাজে অসৎ ও মতলববাজ লোকদের এ ধরনের মামলা দায়েরের প্রবণতা বেড়ে না যায়।[১১২]

৬. মিথ্যা সাক্ষ্য দান করা

মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে প্রহার করা যাবে এবং দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ড দেয়া যাবে। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহ) বলেন, যে ব্যক্তি (উকিল হোক কিংবা অন্য কেউ) অপরকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার শিক্ষা দান করবে তাকেও প্রহার করা এবং বন্দী করা জায়িয।[১১৩] হযরত 'উমার (রা) ও 'আলী (রা) প্রমুখ প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে, তাঁরা উভয়ে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে প্রহার করতেন, মাথা মুণ্ডিয়ে দিতেন, চেহারায় কালি মেখে দিতেন এবং নির্দেশ দিতেন, যাতে বাজারে তাকে ঘুরানো হয়। এর পর তাকে দীর্ঘ দিন বন্দী করে রাখতেন।[১১৪]

৭. সুনির্দিষ্ট স্বীকারোক্তি না দেয়া

যে ব্যক্তি কারো জন্য কোন প্রাপ্যের কথা স্বীকার করল; তবে এ কথা খুলে বলল না যে, সে কি পাবে এবং কত পরিমাণ পাবে, এ ধরনের ব্যক্তিকেও আটক করে রাখা যাবে, যতক্ষণ না সে তার কথা পুরো খুলে বলবে।[১১৫]

---

১১১. আল-ফাসী, আল-ইতকান ওয়াল ইহকাম.., খ.১, পৃ. ১২৮

১১২. ইবনু ফারহুন তাবছিরাতুল হুক্কাম.., খ.২, পৃ.৩০০

১১৩. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.১৬, পৃ. ১৪৫; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.১৬, পৃ. ৩১৪

১১৪. ইবনু হাজার আল আঁসকালানী, আদ-দিরায়াহ, খ.২, পৃ.১৭২; যায়ল'ঈ, নাসবুর রায়াহ, খ.৪, পৃ.৮৮

১১৫. ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.৫, পৃ. ৫৪৮; আল-আনসারী, আসনাল মাতালিব, খ.২, পৃ.৩০০

৮. শাস্তি কার্যকর করতে কোন বাধা থাকা

যদি বিচারে কারো শাস্তির ফায়সালা হয়; কিন্তু কোন ওযরের কারণে সাময়িকভাবে শাস্তি কার্যকর করা সম্ভব না হয় তাহলে তাকে শাস্তি কার্যকর করার সময় পর্যন্ত বন্দী করে রাখা জায়িয, যদি তার শাস্তি থেকে পালিয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে।

ছ. ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষণের প্রয়োজনে আটকাদেশ

কারো ইজ্জত-আব্রু কিংবা জান যদি হুমকির সম্মুখীন হয়, তাহলে তার ও তার ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষণের জন্যও তাকে স্বল্প সময়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনায় কোথাও আটকে রাখা যেতে পারে।[১১৬]

জ. রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা পরিপন্থী কারাবাস উপযোগী অপরাধসমূহ ঃ

১. মুসলিমদের গোয়েন্দাগিরি

অধিকাংশ ইমামের মতে, কোন মুসলিম শত্রুদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করলে তাকে হত্যা করা যাবে না; তবে অপরাধের মাত্রা ও অবস্থা বিবেচনা করে শাসক তাকে যে কোন শাস্তি দিতে পারবেন। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ ও অন্য কতিপয় ইমামের মতে, তাকে আটকে রাখতে হবে, যতক্ষণ না প্রমাণিত হয় যে, সে তার কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়ে বিশুদ্ধ তাওবা করেছে। কতিপয় মালিকী ইমামের মতে, তাকে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য কারাদণ্ড দেয়া হবে এবং তাকে দেশ থেকে দূরে নির্বাসনে পাঠানো যাবে। ইমাম মালিক, ইবনুল কাসিম মালিকী, সাহনূন ও ইবনুল 'আকীল হাম্বলী প্রমুখ আইনবিদের মতে, শাসক যদি কল্যাণকর মনে করেন, তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ডও দিতে পারবেন।[১১৭]

২. সরকার বা রাষ্ট্রদ্রোহিতা

কিছু কিছু অবস্থায় সরকারদ্রোহী বা রাষ্ট্রদ্রোহীকে কারাদণ্ড দেয়া যাবে। যেমন-
ক. যদি বিদ্রোহীদেরকে এমন কিছু কাজ করতে দেখা যায়, যা থেকে বোঝা যায় যে, তারা সরকারের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। যেমন- অবৈধ অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করা, বিপ্লব ঘটানোর জন্য মহড়া দেয়া ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রভৃতি। এমতাবস্থায় সরকার তাদেরকে পাকড়াও করতে পারবে এবং

---

১১৬. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, খ.১৬, পৃ.২৯৭-২৯৮
১১৭. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, খ.১৬, পৃ.৩১৪

বন্দী করতে পারবে, যদিও তারা আজো বাস্তবিকপক্ষে যুদ্ধ শুরু করেনি। কেননা যদি তাদেরকে বন্দী করা না হয়, তাহলে দেশে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করবে। তদুপরি সরকারের আনুগত্য অস্বীকার করা চরম অপরাধ, যার জন্য শাস্তি প্রদান করা সমীচীন। খ. যদি বিদ্রোহীদেরকে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আটক করা হয়, তাহলে তাদেরকে বন্দী করা হবে, ছেড়ে দেয়া যাবে না, যদি এ আশঙ্কা থাকে যে, তারা অন্য বিদ্রোহী দলের সাথে গিয়ে মিলিত হবে কিংবা ফিরে আবার যুদ্ধ করবে। এ কারণ হল, যাতে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং অন্যরা হতোদ্যম হয়ে পড়ে। গ. লড়াইয়ের পর যদি তারা পালিয়ে বেড়ায়, তাহলে তাদেরকে খুঁজে বের করা এবং তাদেরকে আটক করা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মালিকী, শাফি'ঈ ও কতিপয় হানাফী ইমামের মতে, তাদেরকে খুঁজে বের করা এবং তাদেরকে আটক করা জায়িয, যদি তাদের পুনরায় মিলিত ও সংঘটিত হবার মত অনুসারী থাকে। তবে কারো মতে, তাদের অন্য কোন অনুসারী না থাকলেও তাদেরকে খুঁজে বের করা এবং তাদেরকে আটক করা জায়িয। এটি ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতরূপে বর্ণিত রয়েছে। কতিপয় মালিকী ইমামও এ মত পোষণ করেন। ইমাম আবূ ইউসূফ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, যদি তাদের পুনরায় মিলিত হবার মত কোন অনুসারী না থাকে, তাহলে তাদেরকে খুঁজে বের করা এবং তাদেরকে আটক করা জায়িয নয়। কেননা উদ্দেশ্য তো হল তাদেরকে দমন করা। আর এ উদ্দেশ্য তো তাদের পরাজয় ও পলায়নের মাধ্যমে সফলই হয়ে গেছে।[১১৮]

আজীবন কারাদণ্ড ঃ

বিচারক কিংবা শাসক যদি প্রয়োজন মনে করেন, বিপজ্জনক দুরাচারী এবং দাগী সন্ত্রাসী ও অপরাধীকে আজীবন কারাদণ্ড দিতে পারেন।[১১৯] হযরত উ'সমান (রা) বনী তামীম গোত্রের ডাকাত দাবী' ইবন হারিছকে কারারুদ্ধ করে রেখেছিলেন এবং এ অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছিল।[১২০] হযরত 'আলী (রা) এমন এক ব্যক্তিকে আমৃত্যু কারাদণ্ড প্রদান করেছিলেন, যে অপর ব্যক্তিকে এই জন্য ধরে রেখেছিল যে, অন্য জন এসে তাকে হত্যা করবে।[১২১] এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ

---

১১৮. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.১৪০; ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৫, পৃ. ১৫২; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৯, পৃ.৯-১০; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, খ.১৬, পৃ.৩১৫

১১৯. ইবনু ফারহুন, তাবছিরাতুল হুক্কাম, খ.২, পৃ. ১৫২, ১৮৩; আল-মাওয়াক, আত-তাজ.., খ.৬, পৃ. ৬১৫; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, খ.১৬, পৃ.২৮৯

১২০. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, খ.১৬, পৃ.২৮৯

১২১. আল-কুরতুবী, আকদিয়াতুর রাসূল, পৃ.৫-৬

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, اقتلوا القاتل و اصبروا الصابر. - "তোমরা হত্যাকারীকে বধ করো আর আটককারীকে আমৃত্যু বন্দী করে রাখ।"[১২২] তাছাড়া পুরুষ সমকামী, বিদ'আতের প্রতি আহ্বানকারী, জালমুদ্রা প্রচলনকারী, দাগী অপরাধী ও জঘন্য সন্ত্রাসী প্রমুখকেও আমৃত্যু কারাদণ্ড দেয়া যেতে পারে।

অনির্দিষ্ট মেয়াদের কারাদণ্ড ঃ

নিয়ম হল, বিচারের সময় কারাবাসের মেয়াদ সুনির্দিষ্ট করে দেয়া। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়াদ অনির্দিষ্ট রেখে এবং তাওবা করে স্বাভাবিক ও পবিত্রভাবে জীবন যাপনের ফিরে আসার শর্ত জুড়ে দিয়ে সাজা দেয়াও জায়িয। যেমন মুসলিম মদবিক্রেতা, শত্রু পক্ষের মুসলিম গোয়েন্দা এবং দেশদ্রোহীদেরকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য কারাদণ্ড দেয়া জায়িয। যতক্ষণ না শাসকগণ তাদের বিশুদ্ধ তাওবা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হবেন, ততদিন তাদেরকে কারাগারে বন্দী করে রাখতে পারবেন। অনুরূপভাবে চরম নেশাখোর ব্যক্তিকেও যে হদ্দের শাস্তি লাভ করার পর আর আবারও নেশা করে, তাকেও তাওবা করে নেশামুক্ত জীবনে ফিরে আসা পর্যন্ত অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য কারাদণ্ড দেয়া জায়িয।[১২৩]

কারাদণ্ড ও অন্য দণ্ডের সমাবেশ ঃ

বিচারক কিংবা শাসক যদি ব্যক্তির অবস্থা, অপরাধের মাত্রা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে অন্য যে কোন দণ্ডের সাথে কারাদণ্ড কার্যকর করা কল্যাণকর মনে করেন, তাহলে যে কোন ধরনের শাস্তির সাথে কারাদণ্ড দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই।[১২৪] যেমন অবিবাহিত ব্যভিচারী পুরুষকে হদ্দ হিসেবে একশটি বেত্রাঘাত করার পর জনস্বার্থ ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে এক বছরের জন্য কারাদণ্ড দেয়া যেতে পারে। যে আঘাতের কিসাস নেয়া সম্ভব নয়; বিনিময় নেয়ার বিধান রয়েছে, তাতে বিনিময় নেয়ার পাশাপাশি কারাদণ্ডও দেয়া যেতে পারে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে যিহার করল, তাকেও কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত বন্দী করে রাখা যেতে পারে। তাছাড়া হাঙ্গামা ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে কারাগারে শিকল পরিয়ে রাখা, দায়গ্রস্ত আটক ব্যক্তিকে প্রহার করা, মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানকারীকে মাথা মুণ্ডন করিয়ে দেয়া ও বন্দী করা,

---

১২২. আল-বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, হা.নং : ১৫৮০৯

১২৩. ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৫, পৃ.৪৬

১২৪. যায়ল'ঈ, তাবয়ীন, খ.৩, পৃ. ২১০; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ.৫, পৃ. ৩৫০; ইবনু ফারহুন, তাবছিরাতুল হুক্কাম, খ.২, পৃ. ২৯০

হত্যাকারীকে যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা ক্ষমা করে দেয়, তাকে একশটি বেত্রাঘাত সহ কারাদণ্ড দেয়া প্রভৃতি বৈধ রয়েছে।

কারাগার নির্মাণ ঃ

বন্দীদের রাখার জন্য পৃথক কারাগার নির্মাণ করা জায়িয; বরং মুস্তাহাব। কারাগার প্রশস্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। হযরত 'উমার (রা)-এর নির্দেশে তাঁর মক্কার গর্ভণর নাফি' ইবন 'আবদুল হারিছ সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা থেকে কারাগার হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটি ঘর চার হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করেছিলেন।[১২৫] হযরত 'আলী (রা) ইসলামে সর্বপ্রথম কুফায় কারাগার তৈরি করেছিলেন।[১২৬]

কারাবন্দীদের শ্রেণী বিন্যাস ঃ

ক. অপরাধের প্রকৃতি বিচারে কারাবন্দীদের শ্রেণীভেদ ঃ

অপরাধের প্রকৃতি বিচারে কারাবন্দীদেরকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন- ১. নৈতিক স্খলন জনিত অপরাধী, ২. অর্থ-সম্পদে অবৈধ হস্তক্ষেপকারী (যেমন চোর, ছিনতাইকারী) ও ৩. মানব জীবন ও দেহের বিরুদ্ধে অপরাধকারী (যেমন ডাকাত, খুনী)। উল্লেখ্য যে, এ তিন শ্রেণীর কয়েদীদেরকে একত্রে রাখা সমীচীন নয়। তদুপরি প্রত্যেক কয়েদীর সাথে আচরণের ক্ষেত্রে তার ব্যক্তি মর্যাদা, অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা প্রভৃতি বিবেচনায় আনা বাঞ্ছনীয়।[১২৭]

খ. নারী-পুরুষদের জন্য পৃথক পৃথক কারাগারের ব্যবস্থা ঃ

নারী-পুরুষদের জন্যও পৃথক পৃথক কারাগারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।[১২৮] যদি পৃথক কারাগারের ব্যবস্থা না-ই থাকে, তাহলে একই কারাগারে নারীদের জন্য পৃথক আবাসস্থলের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। একই কারাগারে যেমন এক সাথে তাদেরকে রাখা জায়িয নেই, তেমনি একই কারাগারের ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে রাখাও সমীচীন নয়, যদি পরস্পরের দেখা-সাক্ষাত করার ও মিলিত হবার সুযোগ থাকে।

---

১২৫. সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুল লুকতাহ) বাব নং : ৭; ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ, হা.নং : ২৩২০১

১২৬. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, খ.১৬, পৃ.৩১৬

১২৭. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, খ.১৬, পৃ.৩১৮-৯

১২৮. ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.৫, পৃ.৩৭৯; আদ-দাসূকী, আল-হাশিয়াতু.., খ.৩, পৃ.২৮০-১; 'উলায়শ, মিনহুল জলীল, খ.৬, পৃ.৫৬

উল্লেখ্য যে, মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য কারারক্ষীও মহিলা হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি মহিলা কারারক্ষী পাওয়া দুষ্কর হয়, তবেই একজন পরীক্ষিত সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ পুরুষকে তাদের দেখাশুনা ও হিফাযতের জন্য নিয়োগ দেয়া জায়িয হবে।

গ. হিজড়াদের জন্য পৃথক কারাগারের ব্যবস্থাঃ

নারীদের মতো হিজড়াদের জন্যও আলাদা কারাগারের কিংবা একই কারাগারে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পুরুষদের সাথে যেমন তাদের থাকার ব্যবস্থা করা সমীচীন নয়, তেমনি নারীদের সাথেও তাদের থাকার ব্যবস্থা করা উচিত নয়।[১২৯]

ঘ. বুদ্ধিমান শিশু-কিশোরদের কারাদণ্ড

কোন কোন ইমামের মতে, শিশু-কিশোররা কোন অনৈতিক কিংবা অসামাজিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হলে তাদেরকে বন্দী করা সমীচীন নয়। আবার কারো মতে, এ ধরনের শিশু-কিশোরকে শাস্তি হিসেবে নয়; বরং নীতি ও শিষ্টাচারিতা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে যখন তাদেরকে মুক্ত ছেড়ে দেয়ার চাইতে বন্দী করে রাখাটাই তাদের জন্য অধিক কল্যাণকর ও উপকারী বিবেচিত হবে তখন তাদেরকে বন্দী করে রাখা জায়িয। অধিকন্তু, যে সব শিশু দেশে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও বিদ্রোহ সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে দেশের অস্থিতিশীল ও নৈরাজ্যকর অবস্থা চলাকালীন সময়ে বন্দী করে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

আর্থিক কারবারে কিংবা কারো কোন সম্পদ নষ্ট করে ফেললে শিশু-কিশোরদেরকে বন্দী করে রাখা জায়িয নয়; তবে নীতি শিক্ষামূলক অন্য যে কোন হালকা শাস্তি দিতে অসুবিধা নেই। এটাই অধিকাংশ ইমামের অভিমত। ইমাম সারাখসী (রহ)-এর মতে, অভিভাবকরা তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী হবে। শিশু-কিশোরদের আচরণের জন্য তাদেরকে বন্দী করা যাবে এবং তাদের থেকে শিশু-কিশোরদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে।

কোন কোন হানাফীর মতে, আর্থিক কারবারের ক্ষেত্রেও শাস্তি দানের জন্য নয়; বরং নীতি শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে শিশু-কিশোরদেরকে বন্দী করা জায়িয, যাতে

---

১২৯. আর-রু'আয়নী, মাওয়াহিব..,খ.৬, পৃ.৪৩৩; আদ-দাসূকী, আল-হাশিয়াতু..,খ.৩, পৃ.৩১০; 'উলায়শ, মিনহুল জলীল, খ.৯, পৃ. ৭১৮

তারা আর অন্যের অর্থ-সম্পদের কোন রূপ ক্ষতি করতে উদ্যত না হয়। তা ছাড়া এ আটকাদেশের ফলে তাদের পিতামাতা কিংবা অভিভাবক এভাবে মর্মাহত হয়ে পড়তে পারে যে, ছেলেমেয়েদের পক্ষ থেকে তারা অপরের আর্থিক ক্ষতি পূরণ দিতে দ্রুত এগিয়ে আসবে।

শিশু-কিশোরদেরকে তাদের ঘরেই আটক করে রাখা সমীচীন। তবে কারাগারেও বন্দী করে রাখা জায়িয, যদি না তাতে তাদের নৈতিক কিংবা মানসিক ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। যদি কারাগারে বন্দী করে রাখার কারণে তাদের নৈতিক অধঃপতন কিংবা মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে, তাহলে কারাগারে বন্দী করে রাখা সমীচীন নয়; তাদের ঘরেই আটক করে রাখতে হবে।[১৩০]

ঙ. অভিযোগ আরোপিত এবং শাস্তিপ্রাপ্তদের কারাব্যবস্থা

অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তিকে নিরেট প্রশাসনিক প্রয়োজন ও স্বার্থে কারাবাস দেয়া হয় আর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিচারের মাধ্যমেই চূড়ান্তরূপেই কারাবাস ভোগ করে। তাই উভয়ের কারা অবস্থা ও সুযোগ-সুবিধা এক ধরনের হওয়া সমীচীন নয়।[১৩১]

চ. একত্রে বাস ও একাকী বাস

কয়েদীদেরকে একত্রে বাস করতে দেয়াই হল মূল বিধান। তবে ধারণ ক্ষমতার চাইতে বেশি লোককে এক জায়গায় জমায়েত করে কষ্ট দেয়া জায়িয নেই। কারাগার এতো প্রশস্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া প্রয়োজন, যাতে কয়েদীরা স্বাভাবিকভাবে পৃথক হয়ে শুইতে পারে এবং গরম ও ঠাণ্ডায় ভীষণ কষ্ট না পায়। তাছাড়া কারাগারের মধ্যে কয়েদীদের জন্য জামা'আতের সাথে নামায পড়ার ও ওযু-গোসলের সুব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। তবে বিচারক কিংবা শাসক কল্যাণকর মনে করলে যে কোন কয়েদীকে পৃথকভাবে কোন কক্ষে বাইর থেকে দরজা বন্ধ করে বন্দী করেও রাখতে পারেন।[১৩২]

ছ. গৃহবন্দী

কাউকে নিজের ঘরের মধ্যেও বন্দী করে রাখা জায়িয। ইমামগণ বলেছেন, যে অন্যায়ভাবে কাউকে প্রহার করল, তাকে তা'যীরী শাস্তি দেয়া যাবে এবং তাকে বন্দী করাও জায়িয। অন্ততপক্ষে তার ঘরে হলেও তাকে বন্দী করে রাখা যেতে

---

১৩০. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২০, পৃ.৯১, খ.২৬, পৃ...; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, খ.৩, পৃ.১০৮-৯; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, খ.১৬, পৃ.৩১৭-৮

১৩১. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, খ.১৬, পৃ.৩১৮-৯

১৩২. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, খ.১৬, পৃ.৩১৯

পারে, যাতে সে বাইরে বের হতে না পারে। অনুরূপভাবে বদনজর দানকারীকেও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা যাবে, যাতে সে লোকজনের সাথে মিশতে না পারে।[১৩৩]

জ. রোগীদের কারাবাস

রুগ্ন ব্যক্তিকেও অপরাধের দায়ে বন্দী করে রাখা জায়িয। তবে যদি তার জীবন নাশ বা অসুখ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় এবং কারাগারে তার উপযোগী চিকিৎসা ও সার্বিক পরিচর্যার ব্যবস্থা না থাকে, তবেই তাকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বিশেষ কারো দায়িত্বে কারাগারের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। যদি কারাগারেই উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে, তাহলে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে না। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও সেবার উদ্দেশ্যে ডাক্তার ও নার্সদেরকে কারাগারে প্রবেশ করতে বাধা দেয়া জায়িয নয়। কেননা এতে অসুস্থ কারাবন্দীদের ক্ষতি ও মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। উত্তম ব্যবস্থা হল- কারাগারের মধ্যেই কারাবন্দীদের জন্য একটি চিকিৎসা কেন্দ্র থাকা, যাতে তাদের চিকিৎসার জন্য বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন না পড়ে।[১৩৪]

কারাবন্দীদের সাথে আচরণ ঃ

১. পানাহারের সুব্যবস্থা করা

কয়েদী- যে শ্রেণীর হোক না কেন- তাদেরকে ক্ষুধা বা পিপাসায় কষ্ট দেয়া সমীচীন নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و أسيرا. - "তারা আল্লাহর প্রতি ভালবাসা নিয়েই মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীদেরকে আহার করায়।"[১৩৫] হযরত মুজাহিদ, সা'ঈদ ইবন যুবায়র ও 'আতা প্রমুখ তাবি'ঈ বলেন, এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, বন্দীদেরকে খাবার খাওয়ানো পুণ্যের কাজ। বন্দীদের নিজের সম্পদ না থাকলে বায়তুল মাল থেকেই তাদের পানাহারের ব্যবস্থা করতে হবে। আর যদি তাদের নিজস্ব সম্পদ থাকে, তাহলে তাদের সম্পদ থেকেও তাদের পানাহারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২. জুম'আ ও 'ঈদের নামায পড়ার ব্যবস্থা করা

কারাগারের মধ্যে যদি জুম'আ ও 'ঈদের নামাজের ব্যবস্থা করা যায়,

---

১৩৩. ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.৬, পৃ.৩৬৪
১৩৪. শায়খী যাদাহ, মাজমা'.., খ.২, পৃ.১৬৩; ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.৫, পৃ.৩৭৮
১৩৫. আল-কুর'আন, ৭৬ (সূরা আদ-দাহর) : ৮

তাহলে ভাল। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে জুম'আ ও 'ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে কারাগার থেকে বের করা যাবে কি না -এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ ইমামের মতে, এতদুদ্দেশ্যে তাদেরকে কারাগার থেকে বের করা সমীচীন নয়, যাতে তারা তাদের বন্দীদশা হাঁড়ে হাঁড়ে উপলব্ধি করতে পারে। এমতাবস্থায় বন্দীরা জুম'আর পরিবর্তে পৃথক পৃথকভাবে যুহরের নামায পড়বে। ইব্রাহীম নাখ'ঈ (রহ)-এর মতানুযায়ী বন্দীদের ওপর জুম'আর নামায ফরয নয়। কতিপয় হাম্বলী ইমামের মতে, যেহেতু শরী'আতে জুম'আ ও 'ঈদের নামাযের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, তাই বন্দীদেরকে এতদুদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে বারণ করা সমীচীন নয়।[১৩৬]

৩. স্ত্রী-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা

কারাবন্দীদেরকে বিভিন্ন প্রয়োজনে স্ত্রী-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দান করা বাঞ্ছনীয়। স্ত্রী-পরিজন ও আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কারা কারা, কোন কোন প্রয়োজনে, এবং কখন কোন সময় দেখা করতে পারবে- এর জন্য সরকার একটি সুনির্দিষ্ট আইন রচনা করবে। হাম্বলী ইমামগণের মতে, কারাগারে যদি নিভৃত স্থান থাকে, যা বাইর থেকে কারো দেখার সম্ভাবনা থাকে না, তাহলে কারাবন্দীকে মাঝে মধ্যে স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গমের সুযোগ দেয়া উচিত। কোন কোন হানাফী ও শাফি'ঈ ইমামও এ মত পোষণ করেন। তবে মালিকী ইমামগণের মতে, যেহেতু কারাগারের উদ্দেশ্য হলো কয়েদীদেরকে মানসিকভাবে যন্ত্রণা দান করা, তাই স্ত্রীর সাথে কারাবন্দীর যৌন মিলনের যদি সুযোগ দেয়া হয়, তা হলে কারাগারের উদ্দেশ্যই সফল হবে না। তাই স্ত্রীর সাথে কারাবন্দীর যৌন মিলনের সুযোগ দেয়া উচিত নয়।[১৩৭]

৪. আদালতে গিয়ে যুক্তি-তর্ক পেশ করার সুযোগ দেয়া

অভিযোগের ভিত্তিতে আটক কারাবন্দীকে আদালতে বিচারকের সামনে গিয়ে নিজের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার শুনানীতে অংশ গ্রহণ করার এবং বাদীর যুক্তি-প্রমাণের জবাব দেবার সুযোগ দিতে হবে। যদি কোন

---

১৩৬. ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৬, পৃ.৩০৮; ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.৫, পৃ.৩৭৭; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, খ.১৬, পৃ.৩২১

১৩৭. ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৬, পৃ.৩০৮; ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.৫, পৃ.৩৭৭, ৩৮৬-৭; ইবনু ফারহুন, তাবছিরাতুল হুক্কাম, খ.২, পৃ.২০৫; তানকীহ..,খ.১, পৃ.৩০৬

কারণে সে নিজেই শুনানী ও যুক্তি-তর্কে অংশ গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে সে তার পক্ষে থেকে জবাব দেয়ার জন্য উকিল নিযুক্ত করতে পারবে।[১৩৮]

কারাদণ্ড রহিত হওয়ার উপলক্ষসমূহ ঃ

১. **মৃত্যু**

কারাদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধী মারা গেলে তার শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। কেননা এমতাবস্থায় কারাদণ্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রই বিদ্যমান নেই।

২. **পাগল হওয়া**

অধিকাংশ ইমামের মতে, অপরাধ সংঘটনের পর কেউ যদি পাগল হয়ে যায়, তাহলে তার কারাদণ্ডের কার্যকারিতা মওকুফ হয়ে যাবে। কেননা পাগলদের ওপর শরী'আতের নির্দেশাবলী কার্যকরী করার বিধান নেই। তদুপরি তারা শাস্তি কিংবা শিক্ষা দেয়ার পাত্রও নয়। তবে হাম্বলীগণের মতে, পাগল হওয়ার কারণে যেহেতু তা'যীরী শাস্তি মওকুফ হয় না, তাই কারাদণ্ডও মওকুফ হবে না। তাদের বক্তব্য হল ঃ কারাদণ্ডের উদ্দেশ্য হল অপরাধীকে শিক্ষা দান এবং অপরকে অপরাধ থেকে বারণ করা। পাগলদের ক্ষেত্রে যদিও শিক্ষা দানের ব্যাপারটি অকার্যকর হয়ে গেছে, তাই বলে অপরকে অপরাধ থেকে বারণ করার দিকটিকেও অবজ্ঞা করার যৌক্তিকতা নেই। সুতরাং অপরকে অপরাধ থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে পাগলকেও কারাদণ্ড দেয়া বাঞ্ছনীয়।[১৩৯]

৩. **ক্ষমা**

কারাদণ্ড থেকে রেহাই পাবার অন্যতম উপলক্ষ হল ক্ষমা। বিশেষ করে যদি কারাদণ্ড বান্দাহর কোন হকের কারণে হয়, তবে বান্দাহ নিজেই তা ক্ষমা করে দিলে তার কারাদণ্ড রহিত হয়ে যাবে। আর যদি আল্লাহর হক হয়, তাহলে অপরাধীর অবস্থা বিবেচনা করে শাসক ইচ্ছা করলে তার কারাদণ্ড মাফ করে দিতে পারেন।[১৪০]

---

১৩৮. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২০, পৃ.৮৯-৯০; ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ.৫, পৃ.৩৭৭; ইবনু ফারহুন, তাবছিরাতুল হুক্কাম, খ.১, পৃ. ৩৭২

১৩৯. 'উলায়শ, মিনহুল জলীল, খ.৬, পৃ. ৫৯; ইবনুল খলীল, মু'ঈনুল হুক্কাম, খ.১৯৭; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, খ.১৬, পৃ. ২৯০,৩২৮

১৪০. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, খ.১৬, পৃ. ২৯০

৪. তাওবা

কারাদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধী যদি লজ্জিত হয়ে পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তাওবা করে এবং তার তাওবার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেলে কারাদণ্ড ক্ষমা করে দেয়া দূষণীয় নয়। তবে তাওবার বিষয়টি জানা ও নিশ্চিত হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন সময় নেই; বরং এমন একটি সময় অতিক্রান্ত হওয়া প্রয়োজন, যাতে ঐ সময়ের মধ্যে অপরাধী থেকে তাওবার কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তার অবস্থার সার্বিক পর্যবেক্ষণ করে তার তাওবা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। এমন কিছু বড় বড় অপরাধও রয়েছে, যে সব ক্ষেত্রে দ্রুত তাওবার বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যেমন মুরতাদদের বেলায় অধিকাংশ ইমামের মতে তাওবার সময় হল তিন দিন। এ সময়ের মধ্যে সে তাওবা না করলে তার ওপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। অনুরূপভাবে (হানাফীগণ ছাড়া অন্যান্য ইমামের মতে) নামায পরিত্যাগকারীদেরও তাওবার সময় হল তিন দিন। এ সময়ের মধ্যে সে তাওবা করে ফিরে না আসলে তাকেও হত্যা করা হবে।

কিন্তু অবিবাহিত ব্যভিচারীর ওপর হদ্দ কার্যকর করার পর যদি তাকে কারাদণ্ড দেয়া হয় এবং এক বছর শেষ হবার আগেই তার তাওবার বিষয়টি প্রকাশ পায়, তাহলেও তাকে মেয়াদ শেষ হবার আগে মুক্তি দেয়া যাবে না। কেননা মালিকীগণের মতে- এ কারাদণ্ড হদ্দের পর্যায়ভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।[১৪১]

৫. সুপারিশ

সুপারিশের ভিত্তিতেও কারাদণ্ড মাফ করে দেয়া যেতে পারে, যদি কারাদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি মারাত্মক অপরাধী ও বিপজ্জনক না হয়। তবে বিচারক কিংবা শাসক যে কোন সুপারিশকে রদও করে দিতে পারবেন, যদি তাতেই তারা কল্যাণ দেখতে পান।[১৪২]

তা'যীরী শাস্তি কার্যকর করার দায়িত্বশীল ঃ

১ রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা তাঁর প্রতিনিধি (স্থানীয় প্রশাসক কিংবা বিচারক) তা'যীরী শাস্তি কার্যকর করার দায়িত্বশীল। রাষ্ট্রের যে কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন

১৪১. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, খ.১৬, পৃ. ২৯১

১৪২. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, খ.১৬, পৃ. ২৯০

অপরাধ করে, যাতে হদ্দ বা কিসাসের বিধান নেই, তাতে তাঁরা অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা এবং অপরাধীর অবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করে যে রূপ শাস্তি দেয়া কল্যাণকর মনে করবেন, তা-ই দিতে পারবেন।[১৪৩]

২. ছেলেমেয়েদের অভিভাবকরা (পিতা কিংবা দাদা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কেউ হতে পারে)ও নিজেদের সন্তান-সন্ততি বা পোষ্যদেরকে নীতি শিক্ষা দেয়া মূলক শাস্তি দিতে পারবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مروا أولادكم بالصلوة وهم أبناء سبع سنين و

أضربوهم عليها و هم أبناء عشر.

"তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বৎসরে পৌঁছতেই নামায পড়ার জন্য নির্দেশ দাও। তারা দশ বৎসরে পৌঁছলে এর জন্য তাদেরকে প্রহার কর।"[১৪৪] এ হাদীস থেকে জানা যায়, অভিভাবকদের জন্য তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে নীতি শিক্ষামূলক শাস্তি দান করা জায়িয।

৩. শিক্ষকরাও অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে তাদের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নীতি শিক্ষা দান মূলক শাস্তি দিতে পারবে।[১৪৫]

৪. স্বামীরাও তাদের স্ত্রীদেরকে নীতি ও শিষ্টাচার শিক্ষামূলক শাস্তি দিতে পারবে, যদি স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের ন্যায্য অধিকারসমূহ আদায় করতে অবহেলা করে।[১৪৬] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, واللتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن . "যে সকল মহিলাদের অবাধ্য হওয়ার ব্যাপারে তোমরা আশঙ্কা করবে, তাদেরকে তোমরা প্রথমে উপদেশ দান কর ও তাদের শয্যা ত্যাগ কর, অতঃপর তাদেরকে বেত্রাঘাত কর।"[১৪৭]

---

১৪৩. আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.৬৪

১৪৪. আবূ দাউদ, (কিতাবুস সালাত), হা.নং: ৪৯৫

১৪৫. ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৫, পৃ.৪৫; মুল্লা খসরু, দুরারুল হুক্কাম, খ.২, পৃ. ৭৭; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, খ.১০, পৃ.২১

১৪৬. কোন ইসলামী আইনবিদের বক্তব্য থেকে এ কথা মোটেই বোঝা যায় না যে, স্ত্রীদেরকে এরূপ শাস্তি দান করা ওয়াজিব; বরং তাঁদের সকলের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, এ রূপ শাস্তি না দেয়াটাই উত্তম।

১৪৭. আল-কুর'আন, ৪ (সূরা আন-নিসা): ৩৪

এ আয়াত থেকে জানা যায়, স্ত্রীরা যদি অবাধ্য হয়ে যায় এবং যদি আশা করা হয় যে, শাস্তি প্রদান করা হলে তারা সংশোধন হবে, তাহলেই স্বামীদের জন্য তাদেরকে হালকা শাস্তি প্রদান করা জায়িয হবে। তবে আল্লাহর হক সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলী আদায় করার ক্ষেত্রে অবহেলা করলে (যেমন নামায ছেড়ে দেয়া) শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে স্বামীদের জন্য স্ত্রীদেরকে শাস্তি দেয়া জায়িয কি না -এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মালিকী ও হাম্বলীগণের মতে, তা জায়িয। তবে মালিকীগণের মতে, বিচারক কিংবা শাসকের নিকট এ বিষয়ে নালিশ দায়ের করার আগেই স্বামীদের জন্য স্ত্রীদের শাস্তি দেয়া জায়িয; নালিশ দায়ের করার পর জায়িয নেই। হানাফী ও শাফি'ঈ ইমামগণের মতে, আল্লাহর হক সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে স্বামীদের জন্য স্ত্রীদেরকে শাস্তি দেয়া জায়িয নয়। কেননা এ বিষয়গুলো স্বামীদের স্বার্থের সাথে জড়িত নয়। তাই এ বিষয়ে তার শাস্তি দেয়ার অধিকারও থাকবে না।[১৪৮]

উপসংহার

ইসলামী শাস্তি আইন ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ আইনের মৌলিকত্ব ও সারবত্তা পরিবর্তনযোগ্য নয়। তবে সময় ও অবস্থার তাকিদে এবং নতুন পরিবেশে উদ্ভূত সমস্যাদির সমাধান কল্পে ইজতিহাদের মাধ্যমে ক্ষেত্রবিশেষে এর যুগোপযোগী কার্যকর রূপ দান করা যাবে এবং তা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত করা যাবে।

ইসলামী শাস্তি আইনের প্রধান লক্ষ্য মানব জাতির কল্যাণ সাধন ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা। এ আইন নাযিল হয়েছে আল্লাহর বান্দাহদের সর্বপ্রকারের অপরাধ মনোবৃত্তি দমনের একমাত্র চিকিৎসারূপে। এ চিকিৎসা প্রয়োগের পর অপরাধ নামক কোন রোগের নাম চিহ্নও থাকতে পারে না, যদি তা যথাযথভাবে প্রয়োগ ও কার্যকর করা হয়। এ আইন দ্বারা মুসলিম উম্মাহ্ শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল ধরে সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। ইতিহাস অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, একমাত্র ইসলামী আইনই সবধরনের পাপাচার ও অপরাধ নির্মূল করতে সক্ষম। সমাজ যখনই তা কার্যকর করেছে, তখন মানুষ পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার সহকারে নিশ্চিন্ত জীবন-যাপনের সুযোগ পেয়েছে। অপরদিকে মানব রচিত শাস্তি আইন সকল অপরাধ দমনে ব্যর্থ

---

১৪৮. ইবনু নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ.৫, পৃ.৪৫; মুল্লা খসরু, দুরারুল হুক্কাম, খ.২, পৃ. ৭৭; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, খ.১০, পৃ. ২১-২

ও অকেজো প্রমাণিত হয়েছে। এ আইন দ্বারা শাসিত গোটা সমাজকে ব্যাপক বিপর্যয়, অশান্তি ও চরম দুর্যোগ গ্রাস করেছে এবং করছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের প্রাক্কালে তাবৎ দুনিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা নৈরাজ্যের প্রান্তসীমায় উপনীত হয়েছিল। ধর্ম, নীতিবোধ ও বিচার বলতে কিছুই ছিল না। 'খুনের বদলে খুন' ও 'জোর যার মুলুক তার' প্রভৃতিই ছিল তখনকার সমাজের প্রচলিত নীতি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পারস্পরিক বিবদমান ও অপরাধপ্রবণ গোত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি সুসংহত জাতিতে পরিণত করেন। ইসলামী আইনের কঠোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিনি মদীনায় মাত্র দশটি বছরে সর্বপ্রকারের অপরাধ মূলোৎপাটন করে শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, সুনীতি ও পবিত্রতার এক অতুলনীয় সমাজ গড়ে তোলেন। সে ছিল এক বিস্ময়কর বিপ্লব। এই বিপ্লবে প্রথমে আরব ভূমি কেঁপে ওঠলেও ক্রমে তার প্রতিকম্পন ছড়িয়ে পড়েছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ জুড়ে। টমাস কার্লাইলের ভাষায়- The revolution brought by prophet Mohammad (sm) was a great spark of fire which within a twinkle of an eye, burnt out all rubbishes of inhumanity and untruths that erected their heads from Delhi to Granada and from earth to sky. - "হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক সংঘটিত বিপ্লব ছিল প্রচণ্ড এক অগ্নি স্ফূলিঙ্গ, যা দিল্লী থেকে গ্রানাডা এবং মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত যে অসত্য ও অমানবিকতার আবর্জনা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তা চোখের পলকে পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলল।"

আমাদের বর্তমান কালে মুসলিম উম্মাহ ইসলামের এ শাস্তি আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন না করার কারণে প্রতিনিয়ত সামাজিক অস্থিরতা, দুরবস্থা ও বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হচ্ছে। আল্লাহর দীনের একাংশের প্রতি ঈমান ও অপরাংশের প্রতি কুফরী- এ নীতি দ্বারা মুসলিম জাতির বর্তমান দুরবস্থার পরিবর্তন কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এর ফলে অপরাধ দমন ও মূলোৎপাটন তো সম্ভবই নয়; বরং প্রতিনিয়ত এর মাত্রা বৃদ্ধি পেতেই থাকবে এবং এর পরিণাম হবে অবর্ণনীয় ক্ষতি ও বিপর্যয়। আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের মনোবৃত্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, أفتؤمنون ببعض الكتب و تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحيوة الدنيا. "তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আর কিছু অংশের প্রতি কুফরী করবে? (জেনে রেখো)

দুনিয়ায় এ নীতি অবলম্বনকারীদের লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই পরিণতি হতে পারে না।"[১৪৯]

অতএব, সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে ইসলামের শাস্তি আইন সম্পর্কে আমাদের সম্যক অবগত হওয়া, অতঃপর তা বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এ কাজের তাওফীক দান করুন! আমীন !!

---

১৪৯. আল কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারাহ) ঃ ৮৫

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল-কুর'আন

২. আত-তাফসীর ঃ

ইবনু কাছীর, আবুল ফিদা' ইসমা'ঈল, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম,* বৈরূত ঃ দারুল ফিকর, ১৪০১ হি.

কুরতুবী, আবূ আব্দুলাহ, *আল-জামি' লি আহকামিল কুর'আন,* কায়রো ঃ দারুশ শা'আব, তা.বি.

আত্ তাবারী, মুহাম্মাদ ইবন জরীর, *জামি'উল বয়ান 'আন তাভীলিল আ'ইল কুর'আন,* বৈরূত ঃ দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি.

আল-জাস্সাস, আবূ বাকর, *আহকামুল কুর'আন* , দারুল ফিকর

ইবনুল 'আরাবী, মুহাম্মাদ, *আহকামুল কুর'আন* , দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ

শফী', মুফতী মুহাম্মদ, *মা'আরিফ আল-কুর'আন,* (অনু. ও সম্পা. : মাওলানা মুহী উদ্দীন খান), মদীনা মুনাওয়ারা : খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহাদ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.

সাবূনী, মুহাম্মাদ 'আলী, *রাওয়া'ইয়ুল বয়ান তাফসীরু আয়াতিল আহকাম,* বৈরুত : মুআসসাতুল মানাহিলিল 'ইরফান , ১৯৮১

৩. আল-হাদীস

সহীহ আল বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল, *আল-জামি'* , বৈরূত ঃ দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭

সহীহ মুসলিম, *আস-সহীহ,* বৈরূত ঃ দারু ইহ্য়া'ইত্ তুরাছিল আরবী, তা.বি.

নাসাঈ, আহমদ, *আস-সুনান আল-কুবরা',* বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯১

আবূ দাউদ, সুলায়মান , *আস-সুনান* , বৈরূত ঃ দারুল ফিকর, তা.বি.

আত্ তিরমিযী, আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ, *আল-জামি',* বৈরূত ঃ দারু ইহ্য়া'ইত্ তুরাছিল আরবী, তা.বি.

ইবনু মাজাহ, আবূ 'আবদুলাহ মুহাম্মদ, *আস-সুনান,* বৈরূত ঃ দারুল ফিকর, তা.বি.

ইমাম মালিক, *আল-মুয়াত্তা,* মিসর ঃ দারু ইহ্য়া'ইত্ তুরাছিল আরবী, তা.বি.

আহমাদ, ইমাম ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ,* মিসর : মু'আস্সাতু কুরতুবা, তা.বি.

ইবনু আবী শায়বা, 'আবদুল্লাহ, *আল-মুছান্নাফ,* রিয়াদ ঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি.

আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ* , বৈরূত ঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.

হাকীম, আবূ 'আবদুল্লাহ, *আল-মুস্তাদরাক* , বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০

তাবারানী, আবুল কাসিম, *আল-মু'জমুল কবীর,* মাওসূল ঃ মাকতাবাতুয যাহরা', ১৯৮৩

আল-মু'জমুল আওসাত, কায়রো ঃ দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি.

আল-মু'জমুল সগীর, বৈরূত ঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫

আল বায়হাকী, *আস-সুনান আল- কুবরা'* , মক্কা ঃ মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪

আবূ না'ঈম আল-ইস্পাহানী, আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখ্রাজ, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪

ইবনু হুমায়দ, 'আবদ, *আল-মুসনাদ,* কায়রোঃ মাকতুবাতুস সুন্নাহ, ১৯৮৮

আল-বায্যায, আবূ বাকর আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* বৈরূতঃ মু'আসাসাতু 'উলূমিল কুর'আন, ১৪০৯

ইবনু হিব্বান, মুহাম্মাদ, *আস-সহীহ,* বৈরূতঃ মু'আসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩
আবূ ই'য়ালা, আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* দামিশক ঃ দারুল মা'মূন লিত-তুরাছ, ১৯৮৪
দারাকুতনী, আলী, *আস-সুনান,* বৈরূত ঃ দারুল মা'আরিফাহ, ১৯৬৬
ইবনু খুযায়মাহ, আবূ বকর, *আল-মুসনাদ,* বৈরূত ঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫
আদ-দারিমী, 'আবদুল্লাহ, *আস-সুনান,* বৈরূত ঃ দারুল কিতাবিল 'আরবী, ১৪০৭ হি.
আবূ 'আওয়ানা, ইয়া'কূব, *আল-মুসনাদ,* বৈরূত ঃ দারুল মা'আরিফাহ, তা.বি.
আত্ তাহাভী, আবূ জা'ফর আহমদ, *শারহু মা'আনিল আছার,* বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৯
আল-কাদা'ঈ, মুহাম্মাদ, *মুসনাদুশ শিহাব,* বৈরূত ঃ মু'আসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৬

৪. হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থ ঃ

'আসকালানী, ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী,* বৈরূত ঃ দারুল মা'আরিফাহ, তা.বি.
" *আদ-দিরায়াহ ফী তাখরীযি আহাদীছিল হিদায়াহ,* বৈরূত ঃ দারুল মা'আরিফাহ, তা.বি.
" *তালখীছুল হাবীর,* আল-মদীনাতুল মুনাওয়ারাহ, ১৯৬৪
নববী, ইয়াহয়া, *শারহু সহীহ মুসলিম,* বৈরূত ঃ দারু ইহয়া'ইত্ তুরাছিল আরবী, ১৩৯২হি.
ইবনু 'আবদিল বার্‌র, ইউসূফ, *আত-তামহীদ,* আল-মাগরিব ঃ ওয়াযারাতুল আওকাফ.., ১৩৮৭
যায়ল'ঈ, 'আবদুল্লাহ, *নাসবুর রায়াহ,* মিসর ঃ দারুল হাদীছ, ১৩৫৭ হি.
যায়নুদ্দীন আল-'ইরাকী, *তারহুত তাছরীব,* দারুল ফিকর আল-'আরবী
আস-সান'আনী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল, *সুবুলস সালাম শারহু বুলূগিল মুরাম,* দারুল হাদীস
আশ-শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী, *নায়লুল আওতার,* দারুত তুরাছ

৫. **ফিকহ (ইসলামী আইন)**

ক. **তুলনামূলক ফিকহ ঃ**

নববী, ইয়াহয়া, *আল-মাজমূ' শারহুল মুহায্‌যাব,* আল-মাত'বাআতুল মুনীরিয়্যাহ
ইবনু কুদামাহ, মুওয়াফ্‌ফাকুদ্দীন, *আল-মুগনী,* বৈরূত ঃ দারু ইহ্‌য়া'ইত্ তুরাছিল আরবী
আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়া আল-শুয়ূন আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫
আয-যুহায়লী, ড. ওয়াহ্‌বা, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু,* বৈরূত ঃ দারুল ফিকর, ১৯৮৯
আল-জাযীরী, *কিতাবুল ফিকহ 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ,* বৈরূত
যায়দান, ড.আবদুল করীম, *আল-মুফাচ্ছল ফী আহকামিল মার'আতি ওয়াল বায়তিল মুসলিমি,* বৈরূতঃ মু'আসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৭

খ. **হানাফী ফিকহ ঃ**

আস-সারাখসী, আবূ বকর মুহাম্মাদ, *আল-মাবসূত,* বৈরূত ঃ দারুল মা'আরিফাহ
আল-কাসানী, 'আলা উদ্দীন, *বদা'ইয়ুস সনা'ই,* বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ
আল-মারগীনানী, বুরহানুদ্দীন 'আলী, *আল-হিদায়াহ,* দেওবন্দ ঃ কুতুবখানা রহীমিয়্যাহ
ইবনুল হুমাম, কমাল উদ্দীন, *ফাতহুল কাদীর শারহুল হিদায়াহ,* দারুল ফিকর
যায়ল'ঈ, 'উছমান, *তাবয়ীনুল হাকা'ইক শারহু কানযিদ দাকা'ইক,* দারুল কিতাবিল ইসলামী
ইবনু নুজায়ম, যায়নুদ্দীন, *আল-বাহরুর রা'ইক শারহু কানযিদ দাকা'ইক,* দারুল কিতাবিল ইসলামী
আল-বাবরতী, মুহাম্মাদ, *আল-'ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ,* দারুল ফিকর
ইবনু 'আবিদীন, মুহাম্মাদ আমীন, *রাদ্দুল মুহতার,* বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ
আল-হাদ্দাদী, আবূ বকর, *আল-জাওহারাতুন নাইয়িরাহ,* আল-মাতবা'তুল খায়রিয়্যাহ
মুল্লা খসরু, কাযী মুহাম্মাদ, *দুরারুল হুক্কাম,* দারু ইহয়া'ইল কুতুবিল আরবিয়্যাহ
শায়খী যাদাহ, 'আবদুর রহমান দামাদ-আফন্দী, *মাজমা'উল আনহুর,* বৈরূত ঃ দারু ইহ্‌য়া'ইত্ তুরাছিল আরবী
গানিম, আবূ মুহাম্মাদ, *মাজমা'উদ দিমানাত,* দারুল কিতাবিল ইসলামী

গ. **শাফি'ঈ ফিকহ ঃ**

শাফি'ঈ, মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস, *আল-উম্ম*, বৈরূত ঃ দারুল মা'আরিফাহ
আল-আনসারী, যাকারিয়া, *আসনাল মাতালিব*, দারুল কিতাবিল ইসলামী
" *আল-গুরার আল-বহিয়্যাহ*, আল-মাতবা'আতুল ইয়ামানিয়্যাহ
" *ফাতহুল ওয়াহ্হাব*,.বৈরূত ঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪১৮হি.
আল-হায়তমী, ইবনু হাজর, *তুহফাতুল মুহতাজ*, বৈরূত ঃ দারু ইহ্য়া'ইত্ তুরাছিল আরবী
আশ-শারবীনী, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ, *মুগনিউল মুহতাজ*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ
আর-রামালী, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, বৈরূত : দারুল ফিকর
আল-জুমাল, সুলায়মান, *ফুতুহাতুল ওয়াহহাব*, বৈরূত : দারুল ফিকর
আল-বুজায়রমী, সুলায়মান, *তুহফাতুল হাবীব*, বৈরূত : দারুল ফিকর
" *আত-তাজরীদ*, দারুল ফিকরিল 'আরবী
কালয়ূবী ও 'উমায়রাহ, *আল-হাশিয়াতু 'আলা শারহিল মুহাল্লা*, বৈরূত : দারু ইহ্য়া'ইল কুতুবিল 'আরবিয়্যাহ

ঘ. **মালিকী ফিকহ ঃ**

মালিক, ইমাম, *আল-মুদাওয়ানাহ*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ
আল-বাজী, সুলায়মান, *আল-মুন্তকা শারহুল মু'আত্তা*, দারুল কিতাবিল ইসলামী
আল-মাওয়াক, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ, *আত-তাজ ওয়াল ইকলীল*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ
আর-রু'আয়নী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ, *মাওয়াহিবুল জলীল*, দারুল ফিকর
আল-খারাশী, মুহাম্মদ, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, দারুল ফিকর
ইবনু গুনায়ম, আহমদ আন-নাফরাভী, *আল-ফাওয়াকিহ আদ-দাওয়ানী*, দারুল ফিকর
আদ-দাসূকী, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ, *আল-হাশিয়াতু 'আলাশ শারহিল কবীর*, দারু ইহ্য়া'ইল কুতুবিল 'আরবিয়্যাহ
আস-সাভী, আহমদ, *বুলগাতুল সালিক লি আকরাবিল মাসালিক*, মিসর ঃ দারুল মা'আরিফ
'উলায়শ, মুহাম্মদ, *মিনহুল জলীল*, দারুল ফিকর
আল-'আদাভী, 'আলী, *আল-হাশিয়াতু 'আলা কিফায়াতিত তালিবির রব্বানী*, দারুল ফিকর

ঙ. **হাম্বলী ফিকহ ঃ**

ইবনু মুফলিহ, শামসুদ্দীন আল-মাকদিসী, *আল-ফুরূ'*, 'আলমুল কুতুব
আল-মরদাভী, 'আলাউদ্দীন, *আল-ইনসাফ ফী মা'আরিফাতির রাজিহ..*, বৈরূত ঃ দারু ইহ্য়া'ইত্ তুরাছিল আরবী
আল-বহুতী, মানছূর, *দকা'ইকু উলিন নুহা*, 'আলমুল কুতুব
" *কাশশাফুল কিনা'*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ
আর-রুহায়বানী, মুস্তফা, *মতালিবু উলিন নুহা*, আল-মাকতাবুল ইসলামী
ইবনু কুদামা আল-মাকদিসী, *আল-কাফী ফী ফিকহি ইবনি হাম্বল*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী

চ. **অন্যান্য ফিকহ ঃ**

ইবনু হাযম, আলী আয-যাহিরী, *আল-মুহল্লা*, দারুল ফিকর
আল-মুরতাদা, আহমাদ, *আল-বাহরুয যাখখার*, দারুল কিতাবিল ইসলামী
আল-ফাওযান, ড. সালিহ, *আল-মুলাখ্খসুল-ফিকহী*, রিয়াদঃ ইদারাতুল বুহুছ আল-'ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা', ১৪২৩ হি.

ছ. **ফাতাওয়া ঃ**

ইবনু তাইমিয়্যাহ, আহমাদ, *আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা'*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ
আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ (সংকলন), দারুল ফিকর
ইবনু 'আবিদীন, মুহাম্মাদ আমীন, *আল-'উকূদুদ দুররিয়্যাহ ফী তানকীহিল ফাতাওয়া আল-হামিদিয়্যাহ*, দারুল মা'আরিফাহ

'উলায়শ, মুহাম্মাদ, *ফাতহুল 'আলী আল-মালিক*, দারুল মা'আরিফাহ
আস-সুবকী, আবুল হাসান 'আলী, *আল-ফাতাওয়া*, দারুল মা'আরিফ

৬. **অভিধান**

ইবনু মানযুর, আবুল ফদল মুহাম্মাদ, *লিসানুল আরব* , বৈরূত : দারু সাদির
আর-রাযী, মুহাম্মাদ, *মুখতারুস সিহাহ*, বৈরূত : মাকতাবাতু লুবনান, ১৯৯৫
আল-মু'জামুল ওয়াসীত, ইউ.পি. : কুতুবখানা হুসায়নিয়্যাহ, দেওবন্দ

৭. **বিবিধ ঃ**

ইবনুল কাইয়্যিম, আল-জাওযিয়্যা, আবূ 'আবদুলাহ মুহাম্মদ, *ই'লামুল মু'আক্কিঈন*..., দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা
" *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ*, মাকতাবাতু দারিল বয়ান
ইবনু রুশদ, আবুল ওয়ালীদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, বৈরূত, ১৯৮১
আল-জুরজানী, 'আলী, *আত-তা'রীফাত*, বৈরূত ঃ দারুল কিতাবিল 'আরবী, ১৪০৫হি.
আল-কুরতুবী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ,*আকদিয়াতুর রাসূল*, লাহোর ঃ ইদারা মা'আরিফ ইসলামী, মনছূরা, ১৯৮৮
ইবনু ফারহুন, ইব্রাহীম, *তাবছিরাতুল হুক্কাম*, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা
ইবনুল খলীল, 'আলাউদ্দীন 'আলী, *মু'ঈনুল হুক্কাম*, দারুল ফিকর
আল-ফাসী, মুহাম্মাদ, *আল-ইতকান ওয়াল ইহকাম*, দারুল মা'আরিফাহ
আল-মাওয়াদী, আবুল হাসান 'আলী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা
আল-হামভী, আহমাদ, *গাময়ু 'উয়ূনিল বছা'ইর*, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা
আল-হায়তমী, ইবনু হাজর, *আয-যাওয়াজির 'আন ইকতিরাফিল কাবা'ইর*, দারুল ফিকর
আল-কারাফী, শিহাবুদ্দীন *আনওয়ারুল বুরূক ফী আনয়া'ইল ফুরূক*, 'আলমুল কুতুব
'আমীমুল ইহসান, মুফতী মুহাম্মাদ, *কাওয়া'ইদুল ফিকহ*, ঢাকা : ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬১
আওদাহ, 'আবদুল কাদের, *আত-তাশরী'ইল জিনা'ঈ আল-ইসলামী*, বৈরূত, ১৯৮৩
আল-রুকবান, 'আবদুল্লাহ, *আল-কিসাস ফিন নাফস*, বৈরূতঃ মু'আস্‌সাতুর রিসালাহ, ১৪০০হি.
আবদুর রহীম, মুহাম্মাদ, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইফাবা,২০০৭
সিদ্দীকী, মুহাম্মাদ ইসলাম, *The penal law of Islam*, নতুন দিল্লী, ১৯৮৮
বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (সংকলন), ঢাকা : ইফাবা, ২০০৪
মোস্তাফা কামাল, ড. মোহাম্মদ, *মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন*, ঢাকা : ইফাবা, ২০০৬

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN 984-300-003062-1